প্রকৃত ইতিহাস লেখার চাইতে শিল্পসম্মতভাবে ইতিহাসকে উপস্থাপিত করাই অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত ও বাস্তব। কেননা রচনাশৈলী ঘটনার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, অপরপক্ষে ঘটনার বর্ণনা কেবল বিস্তৃত বিবরণ মাত্র।

—এরিস্টটল

উৎসর্গ করলাম

—সেই দেশকে যে দেশে ঐতিহাসিকের অভাব

—সেই মানুষকে যার কাছে ইতিহাস পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণী

—সেই প্রত্যয়কে যে মানুষের ভাগ্য মানে

— সেই দৃঢ় বিশ্বাসকে যা মানে যে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে

# লেখকের নিবেদন

প্রায় ১৩ বছর আগের কথা যখন টিপ্ন সুলতান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি। দৈবাৎ একটা আলোচনার মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জাগে। ব্যাপারটা এই যে, যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন একদিন একজন ফরাসি ছাত্র ও আমি একই সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে আসছি। অপরিচিতরা যেমন করে সেই ভাবে আমরা উভয়েই মাথা নাড়লাম। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, আমি তাকে আমার ছাতার মধ্যে নিলাম। আমরা দুজনে একটা রেস্তোরায় গিয়ে একটা টেবিলেই বসলাম। তখনই জানলাম যে, সে সেখানে কেবল আমার মত দৃশ্য-উপভোগের জন্যেই আসেনি, তার আগ্রহ আরও নিবিড়। যেসব রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে-করতেই প্রাণ হারিয়েছে তাদের সম্বন্ধে একটা থীসিস লেখার জন্যে উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তার এই মিউজিয়মে আসা। তার মতে, এমন রাজার সংখ্যা খুব কম, এবং এটা তার অনুযোগ বলেই মনে হল যে, পরাজয়ের মুখে রাজা হয় আত্মসমর্পণ করেছে, না হয় পুনরায় যুদ্ধ করা যাবে ভেবে নিয়ে পলায়ন করেছে। আমি নির্লিপ্ত ভাবেই শুনে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার শেষ মন্তব্যটি শুনে আমার আগ্রহ জেগে উঠল, সে মন্তব্য করে বলল, "কিন্তু তোমাদের টিপু সুলতান ছিল এমন-একজন যে প্রাণ দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে—কী মহান বীর ছিল সে!"

আমার দেশবাসীর প্রতি তার এই প্রশংসাবাক্য শুনে আমি স্মিত-হাসে তাকে সমর্থন জানালেও আমার মনে হল স্কুল বা কলেজ জীবনে ইতিহাসের যে বই পড়েছি তাতে টিপু সুলতানকে বিশেষ বড় করে দেখানো হয়নি।

ফরাসি ছাত্রটির অভিমত আমার মনে রয়ে গেল।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে আমি টিপু সুলতান সম্বন্ধে কিছু বই কিনলাম, কিছু ধার করলাম। এ'তেও মন ভরল না। তার পরে আমি ও আমার বন্ধুরা তার সম্বন্ধে যত বই পেলাম সবই আমি পড়লাম। যতই পড়তে লাগলাম কৌতূহলও বাড়তে লাগল তত। প্রায় দুই শতাব্দীর কথা হতে চলল,

যখন টিপ্‌, এদেশে জীবিত ছিল ও মৃত্যুবরণ কর। তবুও এখনো এত অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক ও পরস্পরবিরোধী সব কথা চলেছে এ'তে মনে হয় আমাদের ও টিপ্‌, সুলতানের মাঝখানে রহস্যের এক দুস্তর ব্যবধান থেকেই যাবে। আমার মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয় এসে গিয়েছিল যে, আঠারো শতকের ইংরেজ ইতিহাসকারেরা টিপ্‌, সুলতানকে পয়লা-নম্বরের দুর্বৃত্ত বলে চিত্রিত করার পর থেকে তার জীবনের ঘটনাবলী সম্বলিত তার চরিত্রের একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র আঁকবার চেষ্টা কেউ করেনি। ঐসব ইতিহাসকার যা বলে গেছে পরবর্তী অনেক লেখক তা নিশ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, অনেকে সহানুভূতির সঙ্গে ও বুঝবার চেষ্টা করে কিছু লেখার প্রয়াস করেছে, কিন্তু সেসব লেখা কয়েকটি ঘটনার বিবরণ মাত্র, তা কোনো একটা জীবনকে নূতন ভাবে উপস্থাপনাও করেনি, কোনো চরিত্রের উদ্‌ঘাটনও করেনি। এ'তে এমন অনেক ব্যাপার আছে যার ধারে-কাছেও যাওয়া হয়নি, তদ্দরুন যা চিত্রিত হয়েছে তাকে খাপছাড়া ধরনের কাজ ছাড়া কিছু বলা যায় না।

আমার মনে হয়েছে এমন কোনো একজন ব্যক্তির দরকার যে নাকি রহস্যের এই জাল ছিন্ন করে ফেলতে পারবে। কিন্তু আমি এমন কাউকে পেলাম না, আমার প্রভাবে বা আমার প্রস্তাব অনুসারে এই কাজ যে করবে। সুতরাং আমি স্বয়ং আমাকেই এই কাজে নিযুক্ত করলাম।

আমার আবিষ্কারের যাত্রা যাকে বলা যায় তা আরম্ভ হল এই ভাবে। ভারতবর্ষে যত পুরাতত্ত্ব আগার ও লাইব্রেরি আছে সেখান থেকে আমি পড়বার মত সব কিছু পাঠ করলাম। দিল্লীর ন্যাশনাল আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া ও মাদ্রাজ গবর্নমেণ্টের রেকর্ড আফিস থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অপ্রকাশিত তথ্য পেয়েছি। তার উপর, ভাগ্যক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটিতে বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ ঘটেছে ( আগে এই সোসাইটি পরিচিত ছিল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল নামে, আঠারো শতকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় )। এ ছাড়া, কলকাতা, মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীর অনেক লাইব্রেরি থেকে অনেক দলিল ও তথ্য পাবার সুযোগও পেয়েছি।

তার পরে আমার গবেষণা চালিয়ে যাই অন্যত্র। অকপটে বলি, কোনো বিদেশী রাষ্ট্র থেকে কোনো উপকরণ পাব বলে কোনো ভরসাই আমার ছিল না। কিন্তু আমার এ ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। সারা

পৃথিবীর পুরাতত্ত্বশালা ও গ্রন্থাগার থেকে এমন বিপুল ঐশ্বর্যের জোগান পেয়েছি যা ছিল আমার প্রত্যাশার অতীত। এর পরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়ে আমি দেখি এখানে আসা আমার সার্থক হয়েছে। তার পর থেকেই লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যাতায়াত করি, এবং ব্যক্তিগত ভাবে ও বন্ধুবান্ধবদের মারফতে যোগাযোগের দরুন, আমি এমন তথ্যাদির সন্ধান পাই, টিপু সুলতান সম্বন্ধে সেগুলিকে বলা যায় তথ্যের ভাণ্ডার। সেখানে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক পাণ্ডুলিপি আছে, গোপন অধিবেশনের দলিল আছে, গোপনতম শলাপরামর্শের তথ্য আছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্বন্ধে মেমোরাণ্ডা ও তথ্যগ্রন্থ আছে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি (বেঙ্গল, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ) সম্বন্ধে সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতিনিধিসভার আলোচ্যবিষয়ের বিবরণ আছে, ব্রিটিশ গবর্নরদের ও গবর্নর-জেনারেলের গোপন পত্রালাপের তথ্যাদি আছে। সব একত্র করলে বিস্তৃত ভাবে ও ব্যাপক ভাবে জানতে পারা যায় সাম্রাজ্য-স্থাপনার জন্যে টিপু সুলতান সম্বন্ধে ইংরেজরা কিভাবে চিন্তা করেছে, কী ভেবেছে, কীভাবে কাজ করেছে। তার উপর, লণ্ডনের পাবলিক রেকর্ড অফিস, অক্সফোর্ডের বোদেলিয়ান, স্কটল্যাণ্ডের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এবং আরও অনেক গ্রন্থাগার, তোষাখানা, ও জাদুঘর—সারা ব্রিটেনে যা ছড়ানো আছে—তাদের সংগ্রহশালা থেকে প্রচুর সংবাদ ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে যার মূল্য অপরিসীম।

ব্রিটেনে এত উপকরণ পেয়ে বুঝতে পারলাম এই-ই সব হতে পারে না। এইসব উপকরণ থেকে এমন-সব সূত্র পাওয়া গেল যাতে বোঝা গেল যে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারেও অনেক-কিছু পাওয়া যাবে। সুতরাং, ফরাসি দেশই হল আমার পরবর্তী সন্ধানের ক্ষেত্র, অনেক দিন ধরে সেখানেই চলল আমার গবেষণার কাজ। সেখানে অসংখ্য লাইব্রেরি ও আরকাইভ আছে, তার মধ্যে যেগুলি থেকে আমি প্রচুর তথ্যাদি পেয়েছি তার দুইটির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করি, তা হচ্ছে—আরকাইভস ন্যাশনেল এবং বিবলিওথেক ন্যাশনেল। এক বন্ধুর মারফত আরকাইভ দ্যু মিনিস্তেরে দ্য অ্যাফেয়ার্স এত্রাঞ্জেরেস থেকে কয়েকটি দলিলের এমন কপি পেয়েছি যা টিপু সুলতানের ইতিহাসের পক্ষে খুবই দরকারি।

ইতিমধ্যে, আমার বন্ধুদের সদাশয়তায়, ব্যক্তিগত প্রয়াসে আমি কিছু ডচ্ দলিলের কপি পাই, অটোমান ও ইরানিয়ন দলিলের কপি পাই, টিপু সুলতান

ও তার সমসাময়িকদের সম্বন্ধে যেসবের তাৎপর্য অনেক। মজাটা হচ্ছে এই, যেখানেই আমি হস্তক্ষেপ করেছি, ঐভাবে ধৈর্য ধরে থেকেছি অনেক দিন ধরে, সেখান থেকেই প্রচুর পরিমাণে তথ্য পেয়ে গিয়েছি। অসুবিধে হয়েছিল মাত্র এক জায়গায়, পোর্তুগীজ পুরাতত্ত্বশালা থেকে সরাসরি কোনো তথ্য পাইনি. আমাকে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে অন্যবিধ তথ্য নিয়ে।

সংগৃহীত এই বিপুল তথ্য নিয়ে—এত বছরের চেষ্টায় যা হাতে এসেছে, তা নিয়ে—আমাকে একটু বিভ্রান্ত হতে হল। এগুলি পর পর সাজানো, এর বিন্যাস করা ইত্যাদি সোজা কাজ নয়। তার উপর, ফরাসি, ডচ, পারশিয়ান, টার্কিশ, পোর্তুগীজ তথ্যগুলি অনুবাদ করানো এবং তা সব বুঝে নেওয়াও এক সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এর জন্যে আমার ধৈর্যের ও অর্থের উপরেও চাপ পড়ল। কিন্তু এ অবস্থা আমি কোনো প্রকারে কাটিয়ে উঠি। হয়তো কথাটা একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে, তবুও বলি—আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহের এই শ্রম ও তা অনুবাদ করে নেবার ঝঞ্ঝাট ইত্যাদিতে একটা কথা আমার খুবই মনে হয়েছে এবং আমার আশ্চর্যও লেগেছে যে, আমাদের শত্রুভাবাপন্ন ইতিহাসকারেরা যেসব পরস্পরবিরোধী তথ্য দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে বিশেষ মতলব হাসিলের জন্যে, আমাদের ভারতীয় ইতিহাসকারেরা তা খণ্ডন করার ও সংশোধন করার জন্যে এগিয়ে আসেনি কেন। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, এ কাজের জন্যে যে পরিমাণ অর্থ, যত সময়, ও যত পরিশ্রম দরকার তা কোনো লেখক-বিশেষের পক্ষে—সে যতই উৎসর্গিতপ্রাণ হোক-না কেন—ব্যয় করা সম্ভব নয়। যুক্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে এ কাজ যত দিন করা না-হবে ততদিন আমাদের ইতিহাস কোনো সত্যের আকরও হবে না, পরবর্তী কালের মানুষের প্রেরণার উৎসও হবে না। আমাদের ইতিহাসের সংশোধিত রূপ দেওয়ার কাজ, আমি জানি, অতি বিপুল ব্যাপার। এইজন্যেই এ কাজ আরম্ভ করতে হবে এখনি, দেরি করা ঠিক হবে না. দেরি করলে এ কাজ করাই যাবে না।

কিন্তু ওসব কথা থাক্। আমার কাজটিকে শৃংখলাপূর্ণ ভাবে কি করে করব—এ সমস্যা রয়েই গেল। প্রথমেই আমি টিপু সুলতান সম্বন্ধে একটা ঐতিহাসিক রচনা লিখতে আরম্ভ করি। কিন্তু মাঝপথে আমি আমার এ-কাজের উপযোগী মেজাজ হারিয়ে ফেললাম। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, যার জন্যে টিপু সুলতান জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করেছিল,

কোনো ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তা ধরে রাখা সম্ভবই নয়। ইতিহাসকে আমি যেরকম বুঝেছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে এই যে, এ জিনিস অতীতের বহি ধরে রাখতে পারে না, এ কেবল ধরে রাখে অতীতের ভস্ম; কেননা, হৃদয়ের হাহাকার ধরে রাখা এর দ্বারা সম্ভব নয়। সেইজন্যে টিপু সুলতানের জীবন, তার প্রেম-ভালোবাসা, তার ত্যাগ ইত্যাদি সব ধরে রাখার জন্যে দরকার উপন্যাসের; কী ধরনের মানুষ সে ছিল, কী রকম ঘটনায় ও প্রেরণায় সে অভিভূত হত, কী ছিল তার বাসনা ও উচ্চাভিলাষ, সুখের ও বেদনার অনুভূতি তার ছিল কী রকম, এবং যে সময়কালের মানুষ সে সময়টাই বা কী রকম ছিল—ইত্যাদি বিষয়ও জানা দরকার। এসবের বিবরণ দেবার সময়ে এ কথাও জানাতে হবে—কে তাকে ভালোবেসেছে, কে প্রতারণা করেছে, তার চারপাশের কোন্ কোন্ নারীপুরুষ ছিল আকর্ষণীয়; তার মহত্ত্ব ছিল কতটা, তার সমসাময়িক মানুষের নির্বুদ্ধিতা ছিল কতখানি, তার সময়ে কী রকম ছিল চতুরতা ও সরসতা, এবং ইতিহাসের গতি-পথে মানবজাতি সংগ্রামের ও আদর্শরক্ষার জন্য কিসের সম্মুখীন হয়েছিল। কেবল এইসব চিত্র ফুটিয়ে তোলার পক্ষে একটা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক নয়। এসব শুনে একজন ইতিহাসকার এমন কথা বলতে পারেন যে, ইতিহাসগ্রন্থ লেখার উপযোগী যোগ্যতা শিক্ষা ও ক্ষমতা আমার নেই। এ কথা অবশ্যই তিনি বলতে পারেন। আবার এ কথাও সত্য যে, একটা উপন্যাস লেখার উপযোগী যোগ্যতা শিক্ষা ও ক্ষমতা আমার নেই—কেননা, এর আগে এমন লেখা লিখতে কখনো চেষ্টা করিনি। একটা বিষয়ে আমার ধারণা অতি স্পষ্ট, তা হচ্ছে এই যে টিপুর এমন চিত্র আঁকতে হবে যা নিরপেক্ষ ভাবে ও নিখুঁত ভাবে চিত্রিত হতে পারে, এবং অধিক সংখ্যক দর্শক যা দেখতে পায়। একটা ইতিহাস-গ্রন্থের চেয়ে একটা উপন্যাসই এর জন্যে উপযোগী বলে আমি মনে করি।

এখন আমি এই উপন্যাস প্রকাশে উদ্যত হয়েছি, টিপু সুলতান সম্বন্ধে আমি কাল্পনিক যে বিচার করেছি তার উপরে ভিত্তি করেই তার চরিত্রচিত্রণ সম্ভব—এটা আমি বেশ বুঝেছি। কিন্তু এই কাল্পনিক বিচার শুধুমাত্র কল্পনানির্ভর নয়, এর ভিৎ ইতিহাসের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার থেকে আমি বিন্দুমাত্র সরে আসিনি। ভারতীয়, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, পারশিয়ান, টার্কিশ এবং পোর্তুগীজ সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যাপী

সহকারে আমার গবেষণার ফলে যে ফসল আমি পেয়েছি তা আমি বাতিল করে দিইনি, তাদের দিয়েই কথা বলিয়েছি, যদি বা কখনো তাদের মধ্যে নাক গলিয়েছি তা কেবল সত্য ও মিথ্যা আলাদা করার জন্যেই। এ'তে কথোপকথন যা আছে তা আমার তৈরি করা, কোন-কোনো কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা যা করা হয়েছে আমিই তা করেছি। কিন্তু এর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, টিপুর সময়কালের যেসব তথ্য ও তত্ত্ব আমি পেয়েছি তার উপর নির্ভর করেই ওসব রচিত হয়েছে। কোনো ইতিহাসকার যতক্ষণ-না আমার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন ততক্ষণ আমি এই বিশ্বাস নিয়েই থাকব।

আমার পাঠকেরা যেন এমন ধারণা না-করেন যে আমি টিপু সুলতানকে আমাদের জাতীয়-স্মৃতি-মন্দিরে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করেছি। এই গ্রন্থ রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি আমার গবেষণা-কালে উপলব্ধি করেছি। অতীতকালের একটা প্রবণতা আছে বর্তমানকাল অবধি প্রসারিত হয়ে আসার এবং কখনো কখনো আমরা যখন অতীতকে ভুলে যাই তখন আমরা ভিত্তিহীন ভূমিতে নির্মাণকাজ আরম্ভ করি, আমাদের জাতীয়-চেতনার মূল আমরা নির্মূল করে ফেলি। টিপু স্বয়ং জানত যে, সমসাময়িক কালের ইতিহাস বুঝতে হলে অতীতে একবার অবগাহন করা দরকার। এই হতভাগ্য দেশের অতীত ইতিহাস তাকে এই একটি শিক্ষা দিয়েছিল যে, ভারতবর্ষকে কোনো বাইরের শক্তি যতটা দুর্বল না-করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল করেছে আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্দৈব, আমাদের নিজেদের দুর্বলতা, আমাদের নিজেদের অসুস্থতা—এর নাম হচ্ছে অনৈক্য। সে জানত আমাদের দেশ একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে,—আমাদের নিজেদের মানুষের দ্বারা হত্যার মুখোমুখি হয়েছে। এই দুঃখকর ব্যাপারে টিপু কেবলমাত্র সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবির্ভাবই দেখেনি, সে দেখেছে ভবিষ্যতকালের শিক্ষার একটা উপকরণও। আমার সুস্পষ্ট ধারণা এই যে, টিপুর সময়ে যেমন ছিল আমাদের আজকের ব্যাপারও তাই আছে।

যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন এবার তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার আমার পালা। সবার আগে সেই ফরাসি ছাত্রটির কথা বলি, যে আমাকে এ গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি তার নাম জানতে চাইনি বলে আমি

# খণ্ড ১

---

## ভগ্নদূতেরা

# ১. যুগল পশ্চাৎ-অপসরণের রাত্রি

ক

এটাকে বলা হত যুগল পশ্চাৎ-অপসরণের রাত্রি।

নিশুতি রাত্রে—প্রায় একই সময়ে—যে দুটি বিরোধী সেনাবাহিনী কিছুদিন থেকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তারা বিপরীত মুখে দ্রুত হঠে যেতে আরম্ভ করল।

উত্তর দিকে পলায়ন করতে আরম্ভ করল ব্রিটিশ বাহিনী। এর অধিনায়ক কর্নেল হাম্বারস্টোন স্থিরনিশ্চয় হয়ে গিয়েছিলেন যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণ আসন্ন এবং সফলতার সংগে তা প্রতিরোধ করা অসম্ভব। তাঁর সেনাবাহিনীর শেষ ইউনিট যখন সরে এসেছে তখন কর্নেল বেশ দুঃখের সংগেই হিসেব করতে লাগলেন গোপনে ও দ্রুতগতিতে পালিয়ে আসবার জন্যে কী পরিমাণ ভারি বন্দুক ও গাড়িবোঝাই মালপত্র ফেলে আসতে হয়েছে। কামান-বন্দুকের জন্যে তাঁর তেমন দুঃখ হল না, এসব জিনিস আবার নতুন করে যোগাড় করা যায়, এবং এতে ব্যক্তিগত লোকসানও কিছু নেই। তাঁর এবং তাঁর সেনাবাহিনী দ্বারা যে পরিমাণ ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছিল তাও যে বাধ্য হয়ে ফেলে আসতে হল—এই ব্যাপারটা তাঁকে বিশেষ ব্যথিত করল। তবুও কিছুটা সান্ত্বনা তাঁর ছিল, তাঁর ট্রাউজারের পিছনের পকেটে অনেকগুলি হীরকখণ্ড তখনও আছে এবং তাঁর ঘোড়ার জিন থেকে ঝুলছে স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই থলে। মনে-মনে তিনি হিসেব করে দেখলেন —এর পরিমাণ হবে তাঁর একশত বর্ষের বেতনের তুল্য। তিনি চিন্তা করলেন— নেহাত মন্দ না তো। তিনি আবার ফিরে তাকালেন সোনা-রুপোর কারুকাজ করা সিল্কের বস্ত্রাদির প্রতি, যা নাকি পর্বতপ্রমাণ হয়ে পড়ে আছে, চর্মের স্বর্ণের রৌপ্যের অজস্র পাত্রাদির প্রতি ফিরে তাকালেন তিনি, সবই ফেলে আসতে হয়েছে তাঁকে, শত্রুবাহিনীর দ্বারা পুনর্লুণ্ঠনের জন্যে। তিনি তাঁর বাহিনীর গতিবিধি শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার প্রয়োজনীয়তাই কেবল নস্যাৎ করে দিলেন না, তাঁর নিজেরই যে ইউনিট অগ্রবর্তী এলাকায় পাহাড়ের নীচু অংশে মোতায়েন আছে তাদের দৃষ্টির আড়ালও করতে চাইলেন না।

পাহাড়ের নীচু অংশে তাঁর যে ইউনিট ছিল তা সবই ভারতীয় সেনা দিয়ে গঠিত, এক মাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে এর কমাণ্ডিং অফিসার, তিনি হচ্ছে লেফটেন্যাণ্ট জনস্টোন। এই ইউনিট শত্রুবাহিনীর এতই কাছে ছিল যে এর অপসারণ শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের নজরে পড়ে যাবে, তার ফলে অবিলম্বে পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ হবে। এই জন্যে লে. জনস্টোনকে কর্নেল খানা-পিনার জন্যেই যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, এইভাবে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু তিনি যাতে মূল বাহিনীর সংগে সরে পড়তে পারেন, এবং নীচু পাহাড়ে অবস্থিত তাঁর ইউনিট যথারীতি যাতে শত্রুপক্ষের সংগে মাঝেমাঝেই গোলাগুলি বিনিময় করে যেতে পারে অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যে, মূলবাহিনী যে ইতিমধ্যে সরে পড়েছে তা না-জেনেই।

"তারা যে নিঃসংগ ও অসহায় তা তারা বুঝতে পারবে সকালের আলো ফুটলে, এবং তখনই ছত্রভংগ হয়ে পড়বার বোধ তাদের আসবে।" লে. জনস্টোনকে কর্নেল বেশ শান্ত ভাবে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

"ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে কোথায় ?" লে. জনস্টোন জানতে চাইলেন। কর্নেল এ কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তরুণ অফিসারটির চোখেমুখে কিমূঢ় ভাব লক্ষ করে তাঁকে বলতে হল .

"ও জন্যে ভাবছ কেন। তারা তাদের পথ চিনে নেবে, অন্তত ওদের বেশির ভাগই। তারা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, তাহলে তারা ভালো ব্যবহারই পাবে। প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় ভাবেই, আমরা যে ধনসম্পদ ফেলে এসেছি সেগুলি বিনাযুদ্ধে যখন তারা ওদের হাতে তুলে দেবে। টিপু সাহেব অবাক হয়ে চেয়ে দেখবে তার এই পারিতোষিকের দিকে, এবং তার প্রথম কাজই হবে এগুলির একটা তালিকা করিয়ে ফেলা, তার বাবা হাইদরের কাছে পাঠাবার জন্যে। এর ফলে আমাদের পিছু ধাওয়া করাতেও তার দেরি হবে কাজে-কাজেই।"

নিজের তত্ত্বকথায় কিঞ্চিৎ তেতে উঠে, এবং পশ্চাৎ-অপসরণ আরম্ভ হতে যে সামান্য সময় বাকি আছে সেই সময়টুকু কাটাবার জন্যে কর্নেল বলতে লাগলেন, "তার উপর, কাছে-দূরের ঐ পাহাড়ে কিছু উৎসাহী ছোকরাও আছে, আমরা যে লুটের মাল ফেলে যাচ্ছি তাদের সঙ্গীরা যখন আত্মসমর্পণ করতে যাবে তখন তারা তার কিছুটা অন্তত লুঠ করবে। এক্ষেত্রে টিপু কী করবে বলে তুমি মনে কর ? আমি বাজি ফেলে বলতে পারি তার অফিসারদের উপর টিপুর এই রকম নির্দেশই হবে যে, সব-কিছু ছেড়ে দাও, ওই লুঠ উদ্ধারের জন্যে ছোকরাদের

পিছু ধাওয়া কর। এ'তে আমাদের বাড়তি সুবিধে আছে। আমরা সরে পড়বার সময় পাব। যে ছোকরারা কিছুটা নিয়ে পালাতে পারবে" যে তাঁবুগুলিতে লুণ্ঠিত জিনিসপত্র জমা করে রাখা আছে সেদিকে দেখিয়ে কর্নেল হাম্বারস্টোন বলতে লাগলেন, "তারা তোমার ও আমার চেয়ে অনেক ধনী হয়ে উঠবে, হে বৎস। কিন্তু ও কথা নিয়ে আর চিন্তা কোরো না।"

সামান্য প্রতিবাদের ভঙ্গিতে লে. জনস্টোন বললেন, "কিন্তু তারা তো, সার্, আত্মসমর্পণের বা পালাবার সময়ই পাবে না। সূর্যোদয়ের পরে তারা জানতে পারবে যে তারা পরিত্যক্ত, কিন্তু টিপুর গুপ্তচরেরা এ অবস্থার কথা জেনে যাবে অনেক আগেই। পাহাড়ের চূড়া থেকে ভারী বন্দুকের আচ্ছাদন না-পেলে ওই হতভাগ্য পরিত্যক্ত সৈন্যারা এক ঝাঁক গুলিতেই একেবারে ছাতু হয়ে যাবে।"

"উত্তম। ভালো কথা", এমন গলায় কর্নেল উত্তর দিলেন যে তার আর কোনো প্রতিবাদ হয় না, তিনি বললেন, "আমাদের উৎকৃষ্ট অস্ত্রের জোরেই তারা লড়তে-লড়তে খতম হবে।"

নিজের বলার ভঙ্গির রূঢ়তায় নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে কর্নেল বললেন :

"দুঃখ কোরো না, মাই বয। আমি যদি একজনও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যকে পরিত্যাগ করতাম, তাহলে আমার বিবেক দংশন করত। আমি যাদের ফেলে যাচ্ছি তারা-সব নেটিভ। এই নেটিভরা যদি তাদের নেটিভ ভাইদের হত্যা করতে চায়, আমরা কি আমাদের সমগ্র সেনাবাহিনী খোয়াবাব ঝুঁকি নিয়ে সে ব্যাপারে মাথা গলাব ?"

এ কথা শুনে লেফটেনাণ্টের মুখে যে ভাবোদায় হল তাতে কর্নেল বিশেষ প্রীত হলেন না। বর্তমান কালের তরুণদের মতিগতি নিয়ে তিনি পরিতাপের সঙ্গে একটু চিন্তা করলেন, তারা সব বিষযেব যুক্তিব জন্যে জুলুম করতে থাকে, অনেক রকমের কৈফিযত ও ব্যাখ্যা তাদের কাছে পেশ করা হলে তার থেকে সেইটেই গ্রহণযোগ্য বলে বেছে নেয, যেটা কিনা সবচেয়ে কম যুক্তিগ্রাহ্য। কর্নেল ভাবতে লাগলেন, লেফটেনাণ্টও আমার মতনই পালাবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু নিজের সেপাইদের পরিত্যাগ করার পক্ষে এমন একটা সমর্থনযোগ্য যুক্তি চায় যাতে নিজের বিবেককে সে প্রবোধ দিতে পাবে। একটু কর্কশ ভঙ্গিতেই কর্নেল তাঁর লেফটেনাণ্টকে সেনাবাহিনীর মধ্যে তার নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে বললেন, কিন্তু তার আগে সে ঐ তাঁবু থেকে তার খুশি মত কিছু নিয়ে নিতে পারে, অবশ্য কর্নেলের ঘোড়াটির বোঝা অতিরিক্ত না-বাড়িয়ে।

তাঁর সেনাবাহিনীর শেষ কলমু যখন এগিয়ে চলেছে, কর্নেল তখন পাহাড়ের

উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। যারা চলে যাচ্ছে তিনি হতে চাইলেন তাদের সর্বশেষ শ্বেতাঙ্গ। তাঁর মনে হল জনস্টোনের মত মানুষদের মনে তাঁর এই আচরণ বেশ দাগ কাটবে। কর্নেল বেশ ভালোভাবেই জানতেন এটুকু দেরি করলে তাঁর কোনোই ক্ষতি নেই, কেননা তাঁর দ্রুতগামী অশ্বটি অনতিবিলম্বেই তাঁর পশ্চাৎ-অপসরণকারী সেনাবাহিনীর শেষ সারিকে অতিক্রম করে যাবে। তাছাড়া, তাঁর এভাবে থেকে যাওয়ার পিছনে অন্য কারণও আছে, ওইসব তাঁবু থেকে আরও লুণ্ঠন যাতে না হয় তাও তিনি চেয়েছিলেন, কেননা তাহলে তাঁর সেনারা ও ভারবাহী জন্তুরা আরও ভারী ও মন্থর হয়ে যাবে, পশ্চাৎ-অপসরণটাও হয়ে যাবে মন্থর। শত্রুশিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন :

"এই দ্যাখো, টিপু সাহেব, আমি তোমার ঐশ্বর্য পাহারা দিচ্ছি।"

কী রকম একটা ঝোঁক এল তাঁর, তাঁর ডায়েরি থেকে তিনি কয়েকটা নোট শিট ছিড়ে বার করলেন, তার প্রত্যেকটির উপর লিখলেন :

"ব্রিটিশ আর্মির কম্যাণ্ডার কর্নেল হাম্বারস্টোনের কাছ থেকে টিপু সুলতানের প্রতি :

"অভিনন্দন। সুকুমার কলার একজন পৃষ্ঠপোষক ও সৌন্দর্যের একজন বোদ্ধা বলে তোমাকে জানি বলেই আমি এই ধন-ঐশ্বর্য তোমার পরিতোষের জন্যে রেখে যাচ্ছি। যা তোমার অভিরুচি তুমি তা নিয়ো, যা তোমার ইচ্ছে তুমি তা বিলি করে দিয়ো, এবং তোমার যে বদান্যতার জন্যে তুমি বিশ্ববন্দিত ও সম্মানিত তার দ্বারা তুমি যদি প্ররোচিত হও তবে এই ঐশ্বর্যের মধ্যে যেগুলি তোমার দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট করবে না আমাকে সেগুলি উপহার-স্বরূপ পাঠাতে পার, তোমাকে আমি যে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখি কেবল তার স্বীকৃতি নয়, আমার উপদেষ্টারা আমাকে এইসব ঐশ্বর্য ধ্বংস করে ফেলতে বলেছিলেন, তাঁদের সে পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি এ সমস্তই তোমার জিম্মায় অর্পণ করেছি—আমার এই কাজের পুরস্কার স্বরূপও আমার এইটুকু প্রার্থনা।"

প্রতিটি তাঁবুর উপর এই আবেদন তিনি গেঁথে দিলেন। কর্নেল ভাবলেন. এটা হচ্ছে একটা প্রয়োজনকে মহৎ করে দেখাবার একটা দৃষ্টান্ত বিশেষ ; লে. জনস্টোন ও তাঁর অন্যান্য অফিসারেরা যদি এ আবেদন পড়ে দেখার সুযোগ পেত তাহলে তারা কী মনে করত তা চিন্তা করতে লাগলেন কর্নেল। এই আবেদনের শেষাংশটুকু অবশ্য সত্য। লে. জনস্টোন ও অন্য সব অফিসারই ঐ ধন-ঐশ্বর্য

ধ্বংস করে ফেলার জন্য চাপ দিয়েছিল, এবং টিপুর হাতে ওগুলি যাতে না-পড়ে তার জন্যে অনেক বাধার সৃষ্টি করেছিল। কর্নেল তাদের একটা কাহিনীর কথা মনে করে দিয়েছিলেন যা নাকি তিনি অস্পষ্টভাবে ভাসা-ভাসা মনে করতে পেরেছিলেন। কাহিনীটি হচ্ছে একজন রাশিয়ান ও তার কুকুর নিয়ে। একপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে তাদের তাড়া করে। যখনই নেকড়েরা রাশিয়ানকে প্রায় ধরে ফেলতে যায় তখনই সে একটা ক'রে কুকুরকে গুলি করে মারে, নেকড়েরা ঐ মৃত কুকুর নিয়ে যেই ভোজ আরম্ভ করে দেয় সেই সুযোগে পালাতে থাকে রাশিয়ানটি। নিরাপদ জায়গায় পেঁছিবার জন্য নেকড়েদের থামাতে সাতটি কুকুর এইভাবে উৎসর্গ করে সেই রাশিয়ান।

এই গল্পটির নীতিবাক্যটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কর্নেল বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমরাও আমাদের শত্রুর প্রতি মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেব এই আশায় যে এ'তে তাদের গতি যথেষ্ট পরিমাণে থেমে যাবে", তারপর তিনি বললেন, "নির্বোধের মত কামান-বন্দুক ও ধনরত্ন ধ্বংস করায় কোন কাজের কাজ কিছু হবে না, এ'তে আমাদের পলায়নপর সেনাবাহিনীর পিছু ধাওয়া করায় টিপুর ক্রোধই বেড়ে যাবে। আমাদের ফেলে-আসা ওই রান্দি মালগুলি শত্রুপক্ষকে সামরিকভাবে ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী করবে বলে তোমরা যে ভয় করছ তা ঠিক হতে পারে, কিন্তু আমার অধীনস্থ এই সাহসী অতগুলি যোদ্ধার বিনাশ আমাদের বাহিনীকে কী পরিমাণ দুর্বল করে দেবে তা ভেবে দেখো। টিপু যদি আমাদের অনুসরণ করার দিকেই পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে তা হলে আমাদের এই ক্ষতি হবে অপরিহার্য। সুতরাং আমরা তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য তাকে প্রলোভন দেখাবই। নীচু পাহাড়ে আমরা যে সেনাদল ফেলে এসেছি টিপু হয়তো তাদের একেবারে মেরে ফেলবে কিংবা তাদের বন্দী করবে। তারপর, আমরা যে উঁচু পাহাড় খালি করে ছেড়ে এসেছি সেদিকে সে ধাওয়া করবে। রক্তপাত ক'রে, কামান-বন্দুক লাভ ক'রে, ধনরত্ন করতল ক'রে সে নিজেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করবে, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের অভিনন্দন কুড়াবে; দরবার বসাবে, নিজের গৌরবে সে খেতাব বিলি করবে। তারপর যখন সে আবার আমাদের পিছু নেবার জন্যে তৈরি হবে, তখন আমরা এগিয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছি।"

তাঁর বক্তব্যের উপসংহার করে কর্নেল বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মিশন হচ্ছে এই যে, আমি তোমাদের যখন বিজয়ের গৌরব দিতে পারছিনে, তখন

অন্তত তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। সুতরাং পশ্চাৎ-অপসরণের যে ছক আমি তৈরি করেছি, তদনুযায়ী এখনি এক মুহূর্ত বিলম্ব না-করে সকলে অগ্রসর হও।"

এই কথা ঘোষণা করার পর অফিসারদের সভা শেষ হল। অফিসাররা তৎক্ষণাৎ নিজ-নিজ কাজে গিয়ে লিপ্ত হল যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা এ জায়গা থেকে সরে পড়তে পারে। তাঁকে নিজেকেও যাত্রা করতে হবে এবং তার সময়ও যখন ঘনিয়ে আসছে কর্নেল তখন এটা লক্ষ করে বেশ খুশি হলেন যে, তিনি যেভাবে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই তাঁদের পলায়নের যাবতীয় ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তিনি সমস্ত বিষয়টার খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করে নিয়েছেন—জল, লবণ, খাদ্যসামগ্রী, মালপত্র যা যা নিয়ে যেতে হবে, প্রতিটি সৈন্য ও ঘোড়া কতটা করে ওজন বইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কলম্ যাত্রা করবে, কোন্ পথ নেওয়া হবে, এ ছাড়া ছোট ও বড় নানাবিধ বিষয়, তদুপরি, গোপনীয়তা রক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা, যাতে নীচু পাহাড়ে ফেলে আসা তাঁরই সেনাবাহিনী, এবং ঐ এলাকা জুড়ে শত্রুপক্ষের যে গুপ্তচরেরা চারদিকে দৃষ্টি রেখেছে, তারা যেন ঘুণাক্ষরে তাঁর মতলব টের না পায়। হ্যাঁ, সব রকম ব্যাপারেরই প্ল্যান করা হয়েছে। যে বিষয়টি প্ল্যান করা হয়নি তা হচ্ছে তাঁরই ঐ কাজটা—যেসব ধনরত্ন তিনি সঙ্গে নিতে না-পেরে টিপুর উদ্দেশে আবেদন এঁটে দিয়ে এসেছেন তাঁবুগুলিতে।

"এ কাজ কেন করলাম ?" ভাবতে লাগলেন কর্নেল।

যখন তিনি তাঁর ডায়েরি থেকে পাতাগুলি ছিঁড়ছিলেন তখন তিনি টিপুকে তামাশা ক'রে ও অবজ্ঞা ক'রে কিছু লিখবেন ভেবেছিলেন, যাতে টিপু নিজেকে বিজেতা হিসেবে গণ্য করতে না-পারে, এবং তার হাতে এই বন্দুক-কামান ও ধনরত্ন এসে পড়েছে তার স্বোপার্জিত জয়ের ফলেই, এমন যাতে সে মনে করতে না-পারে তার সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করার জন্যই। তারপর তিনি তাঁর মেজাজ বদলে নেন—আধা-দাস্যভাবে ও আধা-হাস্যরসে—এবং শেষ পর্যন্ত কামান-বন্দুক ও ধনরত্ন ফেলে আসার স্বীকৃতি স্বরূপ কিছু উপহার প্রার্থনা করেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত আবেদনটি সমাপ্ত করার পিছনে তাঁর মনের মধ্যে কী ছিল তা তিনি জানেন।

"কিছু না-দিয়ে তুমি কিছু পেতে চাও, বেজন্মা!" মনে-মনে তিনি ভাবলেন।

তাঁর মনের নেপথ্যে আশার একটু আলো টিমটিম করছিল যে তাঁর আবেদনে টিপু বেশ সাড়াও দিতে পারে, এবং কর্নেল বেশ মোটা রকমের লাভও করে ফেলতে পারেন ; এবং কোনো কারণে যদি তাঁর এই পলায়ন ফলপ্রসূ না হয় এবং শত্রুর হাতে যদি তিনি ধরা পড়ে যান তবে তাঁর প্রতি একটু নরম ব্যবহার করা হতে পারে। তিনি কখনো টিপুর মুখোমুখি হননি, কিন্তু টিপুর অচিন্তনীয় মহানুভবতার অজস্র গল্প শুনেছেন। গত বছরের একটা দৃষ্টান্তের কথা তাঁর মনে পড়ল। কয়েকদিন ধরে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর একটা দুর্গ দখল করল টিপু, তার পরেই সে মুক্তি দিয়ে দিল সব বন্দীকে তাদের তল্পীতল্পা ও ঘোড়া সমেত। এটা সে করল তার পৃষ্ঠপোষক এক সন্তের সম্মানে যাঁর জন্মদিন পড়েছিল দুর্গ-জয়ের দিনই। এক ক্ষুদে ব্রিটিশ সেপাই একটা এমারেল্ড্ রত্ন পেয়েছিল, তাদের প্রতি এতটা সদয় ব্যবহারে সে এতই অভিভূত হয়ে যায় যে, তাকে যারা মুক্তি দিচ্ছিল তাদের সে বলে, 'এটা তোমাদের প্রভুর বদান্যতার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার উপহার রূপে তাঁকে দিয়ো।'

ঐ রত্নটি টিপুর কাছে নিয়ে যাওয়ার পর টিপু সেপাইটিকে তাঁর কাছে আনান। এই উপহারের জন্যে টিপু তাকে ধন্যবাদ জানান, এবং বলেন যে, একটা উপহারের প্রতি-উপহার আছে, এই বলে তিনি সেপাইটিকে বহু মূল্যবান রত্ন ও শ-খানেক স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটা ব্যাগ দেন। তারপর টিপু তাকে জিজ্ঞাসা করেন সে টিপুর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছে করে কি না। সেপাইটি থতমত খেয়ে যা বলল টিপুকে তা অনুবাদ করে বলা হল, "এই বন্ধু সেপাইটি বলছে দুর্ভাগ্যক্রমে সে শপথ নিয়েছে কখনো সে প্রভু পালটাবে না, এই জন্যে আপনার অধীনে কাজ নিতে পারছে না।"

উত্তরে টিপু বলল, "ওকে বলো আমাদের এই দরবারে আমরা এরকম বোকামির মর্যাদা দিই।" এই কথা ব'লে টিপু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য রত্নখচিত তার হাতের আংটি খুলে রাজার উপহার স্বরূপ দান করল সেই সেপাইকে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। এক ইংরেজ লেফটেনান্টের স্ত্রী যখন খবর পেল যে, টিপুর সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে তার স্বামী নিখোঁজ হয়েছে, ঐ লড়াইয়ে অনেকেই নিহত হয়েছে ও অনেককে বন্দী করা হয়েছে, তখন সে টিপুকে চোখের জলে একটা চিঠি লিখে জানতে চাইল সে বিধবা কিনা, অথবা সধবা। যদি এখনো সে সধবাই থেকে থাকে তাহলে তার স্বামীকে যেন অনুগ্রহ করে এই খবরটা দেওয়া হয় যে, তার স্ত্রী আগের মতই তার অনুগত আছে, এবং আগামী

মাসে তার যে ছেলেটির চার বছর পূর্ণ হবে তার সপ্রীতি শ্রদ্ধাও যেন তাকে জানানো হয়। লেফটেনাণ্টটিকে টিপু মুক্তি দিয়ে দেয়, তিরিশটি মুক্তো বসানো একটা নেকলেস তার স্ত্রীর জন্যে উপহার দেয়, এবং বলে যে, তার স্ত্রী যতটি অশ্রুবিন্দু ফেলেছে প্রতিটির জন্যে একটি করে মুক্তো দিতে পারলে সে খুশি হত। ছেলেটির জন্যে উপহার দেয় অজস্র খেলনা—ঘোড়া হাতি বাঘ সেপাই বন্দুক—সবই হাতির দাঁতে তৈরি এবং মণিমুক্তো বসানো। স্বামীর কাছ থেকে তার মুক্তির কথা এবং ভারতবর্ষ থেকে কী পরিমাণ অপূর্ব উপহার সে নিয়ে চলেছে জেনে স্ত্রী একটা আবেগপূর্ণ চিঠি লেখে টিপুকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং জানায় একদিন-না-একদিন টিপুর হস্তচুম্বন করার মত সম্মান সে পাবে। ইতিমধ্যে টিপুর একটি ছবির জন্যে সে প্রার্থনা জানায় যে ছবি 'আমাদের এই দীন কুটিরটি গৌরবময় করে তুলবে, তোমার কাছে আমরা কত ঋণে ঋণী সে কথা আমাকে ও আমার পুত্রকে সর্বদা মনে করে দেবে।' টিপু এর উত্তরে লেফটেনাণ্টকে একটা ছবি পাঠিয়েছিল—মোটা সোনার ফ্রেমে তা বাঁধানো। কর্নেলের মনে পড়ল, সোনার মোটা ফ্রেমটি যথাস্থানে পৌঁছয় নি, ছবিটা পৌঁছেছিল। সেটা আবাব অন্য কাহিনী, তার জন্যে টিপুব কোনো ত্রুটি নেই। লেফটেনাণ্টের নামে ছবিটি যখন ইংলিশ ক্যাম্পে এল তখন লেফটেনাণ্ট ইংলণ্ডে যাত্রা করে গেছে। টিপুর দূত তখন সেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরের কাছে দিয়ে আসে যথাস্থানে পাঠিযে দেবার জন্যে। একজন প্রাচ্য রাজকুমাব ও ইংরেজ পুরুস্ত্রীর মধ্যে এইরকম গোপন পত্রালাপ বিশেষ সুনজরে দেখল না ডিরেক্টর। তেমন রূঢ় হতে সে অবশ্য চাইল না। ছবিটি সে লেফটেনাণ্টকে পাঠিয়ে দিল, কিন্তু বাজেয়াপ্ত করল সোনাব ফ্রেমটি। তারপর নিলামে সে সেটা নাম মাত্র দামে খরিদ করে নিল, বাজেয়াপ্ত জিনিস বিক্রি হত নিলামেই। এখন ঐ ফ্রেমটি ডিরেক্টরের তৃতীয় স্ত্রীর ছবি শোভিত করে রেখেছে।

কর্নেল ভাবতে লাগলেন, এসব অনেক দৃষ্টান্তের কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও অনেক ব্রিটিশ পকেট পূর্ণ করে দিয়েছে টিপু ও অনেক ব্রিটিশ হৃদয়ও পূর্ণ করেছে সে অপূর্ব সব উপহার দিয়ে।

"টিপু, বন্ধু আমার", কর্ণেল চিন্তা করতে লাগলেন, "প্রার্থনা করি আল্লা তোমার ভাণ্ডারে তোমার হাত গভীরে প্রবেশ করাবেন, এবং যে ঐশ্বর্য অটুট অবস্থায় আমি তোমার জন্যে রেখে এসেছি তার পুরস্কার তুমি দেবে তোমার এই

প্রকৃত অন্তরঙ্গজনকে।” তারপর তিনি তাকালেন আকাশের দিকে ও প্রার্থনা জানালেন. ‘শোনো, আল্লা, টিপুকে কখনো বোলো না যে আমি যা করেছি তা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। তোমার-আমার মধ্যেই এটা গোপন থাক্।’

মনে-মনে একটু হেসে কর্নেল তাঁর চিন্তার হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন। নিজের মনেই তিনি বললেন, নিজের চিন্তাকে এভাবে লাগাম-ছাড়া করা ঠিক হবে না। ভারতবর্ষে তাঁর প্রথম আমলে তাঁর তদানীন্তন কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন জ্যাকবস তাঁর সম্বন্ধে কনফিডেনশাল রিপোর্টে লিখেছিলেন ‘হাম্বারস্টোন কাজের দিক থেকে খুব পোক্ত. কিন্তু চিন্তার দিক থেকে একটু কাঁচা। তার চিন্তাকে তার শায়েস্তা করতে হবে ও সুশৃঙ্খল করতে হবে. তা না হলে এই চিন্তাই তার সিদ্ধান্তকে এমন পথে নিয়ে যাবে যে সে বিপদে পড়বে।’

কিন্তু বিপদে আমি এখনো পড়িনি, কর্নেল ভাবতে লাগলেন. অথচ ক্যাপটেন জ্যাকবস পড়েছে, শোনা যায় স্বয়ং হাইদরের তরবারির আঘাতে পতন ঘটেছে তার। লোকে বলে, তার মাথার পুরু খুলি হাইদরের তরবারি ভোঁতা করে দিয়েছিল, তার দরুন হাইদর অভিসম্পাত দিয়েছে ঐ ভূপাতিত সেনাটিকে, গালাগাল দিয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে, তার নিজের সেনাবাহিনীর কাপুরুষতার জন্যে তাদের জোরগলায় গালমন্দ করেছে, এমন কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেও মানহানিকর কথা বলেছে। এটা ঠিক যে. বরাবর যে রীতি চলে আসছে তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ ভিক্ষাদান উপহার প্রদান ও খেতাব বিতরণ ইত্যাদি বিজয়-উৎসব পালনের জন্য যা-যা করণীয় তা করা হয় না, অবশেষে টিপুর উদ্‌যোগে, চার দিন বাদে, সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—হাইদরের আদেশে টিপু এই উৎসবে সভাপতিত্ব করে। মুক্তহস্তে এই উপহার দেওয়াতে এর আগের গাফিলি অনেকটাই মুছে যায়। কর্নেলের মনে পড়ল, ক্যাপটেন জ্যাকবস কড়া রিপোর্ট লেখায় খুব চোস্ত ছিল, কিন্তু পকেটস্থ করার ব্যাপারে তেমন পোক্ত ছিল না। সে চুরি করেছে, জুলুম করে আদায় করেছে, লুঠ করেছে যেমন নাকি আর-পাঁচ জন ইংরেজ অফিসার করে থাকে, সুতরাং তাকে খাঁটি সৎ মানুষের একটা দৃষ্টান্ত রূপে তুলে ধরা যায় না। কিন্তু চুরি, জুলুমবাজি. লুঠ ইত্যাদি সে করেছে এত কম এবং এমন এলোমেলো-ভাবে যে তাকে অন্যের কাছে এ কাজের দৃষ্টান্ত রূপেও ধরা চলে না। শ্রীমতী জ্যাকবসের কাছে মাঝেমাঝেই ইংলণ্ডে জাহাজে চাপিয়ে সে যা পাঠিয়েছে তাতে তার ঐ বিধবাটি কেবল একটি সামান্য কটেজ কেনার শৌখিনতাই দেখাতে পেরেছে, এবং একটা স্বামী জোগাড় করতে পেরেছে যে নাকি বয়সে তার চেয়ে অনেক কম।

কর্নেল তাঁর স্ত্রীকে এমন গভীরভাবে ভালোবাসেন যে, তিনি তাকে বিধবা হতে দিতে চান না, এবং নিজেকেও তিনি এমন ভালোবাসেন যে তিনি দীনহীন ভাবে জীবনযাপন করতে নারাজ। হ্যাঁ, নিশ্চয়, উচ্চাকাঙ্খা তাঁর আছে, উচ্চাভিলাষ আছে কর্নেলের।

তিনি যখন তাঁর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা ও উচ্চাশা নিয়ে স্বপ্নরচনা করছেন তখন কর্নেল দেখতে পেলেন তাঁর আরদালি, মুনাওয়ার খাঁ, তাঁর দিকে আসছে। কর্নেল যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই এসে জানাল মুনাওয়ার খাঁ। সে জানাল, কোনো বাধার সম্মুখীন না-হয়ে প্রথম কলম্ নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁাছে গেছে, এবং এখন পর্যন্ত শত্রুপক্ষে গোয়েন্দার কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না, অন্যান্য কলমও স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে, সঙ্গে শেষ কলমও আছে—সেটাও চলতে শুরু করেছে। সে আরও জানাল যে, কর্নেলের ঘোড়া প্রস্তুত, এবং একজন অফিসার সহ ৩০ জন সৈন্য নিয়ে যে ইউনিট গঠন করা হয়েছে পশ্চাৎদিক সামাল দেবার জন্য তারা অগ্রসর হবার জন্যে কর্নেলের নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

এই পশ্চাৎবাহিনীকে যাত্রা করার আদেশ দেওয়া হল।

এবার কর্নেল তাঁর ঘোড়ার দিকে হেঁটে চললেন, মনে মনে তিনি খুশি হলেন এ কথা ভেবে যে, এবার তিনি ঐ অভিশপ্ত পাহাড়ের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন। তিনি এখানে লোভের বশবর্তী হয়ে এসেছিলেন, এই পথে লুঠের মাল এসে পড়বে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন, এবং ভেবেছিলেন তাঁর এই যাত্রার শেষে বেশ সহজ জয়ই তাঁর হবে। তাঁর উপরওয়ালারা কর্নেল হাম্বারস্টোনকে মালাবারে পাঠাতে চেয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে হাইদর আলির রসদ সরবরাহের একটা উৎস যাতে কাটা পড়ে যায়। তাঁর পরিণত জীবনে হাইদর আলি তাঁর পুত্র টিপুকে কাছ-ছাড়া করতে চাইত না। উপরওয়ালারা নিশ্চয় এমন হিসাব করেছিল যে, কর্নেল হাম্বারস্টোন সহজেই বাজিমাৎ করতে পারবেন, কেন না তাঁকে হায়দার আলির বা টিপুর মুখোমুখি হতে হবে না, তাঁকে লড়াই করতে হবে সেই কুখ্যাত অপদার্থটির সংগে, যার নাম জং বাহাদুর আরশাদ বেগ খান, এঁকেই মালাবারের সামরিক ও অসামরিক শাসনভার অর্পণ করেছে হাইদর আলি। এমন অনেকেই ছিল যারা মনে করত না 'জং বাহাদুর' নামটার অর্থ 'সংগ্রামে বীর' বটে, কিন্তু লোকটা তার হারেমের ঝগড়া মেটাতে খুব পটু ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ ও রক্তপাত সম্বন্ধে তার তেমন আগ্রহ ছিল না, এ নিয়ে হাসি-তামাশাও

করত বহুলোক। কিন্তু তার কঠোর সমালোচককেও স্বীকার করতে হয় যে সে একজন চমৎকার কোয়ার্টার মাস্টার ও দক্ষ প্রশাসক, বিভিন্ন স্থানে সংগ্রামে লিপ্ত হাইদরের সেনাবাহিনীকে রসদ সরবরাহের কাজ সে করতে পারে সুষ্ঠুভাবে। তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক চাহিদা মেটাবার জন্যে সে পর্যাপ্ত রসদ সংরক্ষিত রাখতে পারত, এ রকম চাহিদা হামেশাই হাইদরের কাছ থেকে আসত। অন্য আরও অনেক অনুগতেরা যখন রসদ জোগান দেবার প্রতিশ্রুতি পাঠাচ্ছে, জং বাহাদুরের পাঠানো রসদ বোঝাই গাড়ির সার ততক্ষণে পেঁছে যেত, অনেক সময়ই ঐ সব প্রতিশ্রুতি হাইদরের হাতে আসার আগেই।

"এ হচ্ছে আমার কাছে তিন জন জেনারেলের চেয়েও বেশি", জং বাহাদুর সম্বন্ধে হাইদর একবার মন্তব্য করে, টিপু তখন জিজ্ঞাসা করে, "তুমি না একবার বলেছিলে তের জন, এমন বলনি, বাবা?"

কর্নেল হাম্বারস্টোনের উপরওলারা ঠিকই করেছে। ঐ পথে প্রচুর পরিমাণে লুঠের মাল আসছিল। কালিকট অধিকার করেছেন কর্নেল, এবং এখানকার যাবতীয় সমৃদ্ধ শহর লুণ্ঠন করে শেষ করে দিয়েছেন। তারপর তিনি পালঘাটচেরির দিকে যাত্রা করেছেন। পথে কয়েকটি দুর্গ জয় করেছেন, ও অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছেন। এবার, তাঁর এই অগ্রগমনের পরও তাঁর সম্মুখে আছে জং বাহাদুরের মত দুর্বল ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত সৈন্যবাহিনী। এই জং বাহাদুরই কোনোরূপ বাধা না-দিয়ে কর্নেলকে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় একটা অতি সুবিধাজনক জায়গা দখল করার সুযোগ দিয়েছে, যেখান থেকে কর্নেল একটি ছোট বাহিনী পাঠিয়ে নীচু পাহাড়টাও অধিকারে নিতে পেরেছেন। এইখানে ঘাঁটি গেড়ে, কর্নেল তাঁর এক বৃহৎ বাহিনীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন যেটা কিনা তাঁর মূল বাহিনীর পশ্চাৎবর্তী কলম্। পিছন দিক থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি এমনটি অবশ্য করলেন না, খুব ভালোভাবে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে যথাসর্বস্ব লুঠ করবার জন্যে যেমন সময় দেওয়া দরকার তেমনি প্রয়াসও প্রয়োজন। এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল পশ্চাৎবর্তী বাহিনীকে। এই বাহিনী তাদের এই কর্তব্য কতটা সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছে তার সংবাদ কর্নেলের কাছে এসে পেঁছল আংশিকভাবে। এই বাহিনীর অন্তর্গত অনেক বেইমান সেপাই লুঠের প্রাপ্য অংশের অনেক সরিয়ে

নিয়ে বাহিনী থেকে সরে পড়ে। আরও অনেকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামের অভ্যন্তর থেকে আরও লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে গ্রামে ঢুকে পড়ে, এবং এই বাহিনীর যাত্রা করার সময়ে ফিরে না-এসে এই সময়সূচী পণ্ড করে। ক্ষমতার মত্ততায়, মদ্যের প্রভাবে ও যৌন অভিপ্রায়ে অনেকে এমনি বাড়াবাড়ি করে যে, তার বদলো নেওয়া শুরু হয়ে যায়—কাউকে একাকী পাকড়াও ক'রে, বা অল্পসংখ্যক জনাকয়েককে একত্র ঘেরাও করে। পশ্চাৎবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেনকে ম্যালেরিয়ায় ধরে, কর্নেল এজন্যে ঐ অসুখকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন, কিন্তু এও বুঝি সব নয়, ঐ বাহিনীর সবচেয়ে যোগ্য লেফটেনাণ্ট যখন তার বন্দুক সাফ করছিল তখন তার ছিটকে-আসা গুলিতে ঘায়েল হয়। ছিটকে-পড়া কতক-গুলি সেপাই একজন দুজন করে আসতে লাগল, কিন্তু কর্নেল তাদের যেভাবে দলবন্ধ করে রেখে এসেছিলেন, সে ভাবে নয়।

ইতিমধ্যে, সব প্রত্যাশার বিপরীত ঘটনা ঘটল। হাইদর টিপুকে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়ে জং বাহাদুরকে রক্ষা করতে ও হাম্বারস্টোনের বাহিনীর মুখোমুখি হতে আদেশ দিল। ৭০৫ জন সৈন্য নিয়ে হাইদরের তাঁবু ত্যাগ করল টিপু। যখন তার গোয়েন্দাবাহিনী তাকে হাম্বারস্টোনের পশ্চাৎবাহিনীর অত্যাচারের খবর জানাল, টিপু তখন গোপাল রাও'কে তার ৭০০ সেনা নিয়ে গিয়ে ইংরেজের পশ্চাৎবাহিনীকে বিব্রত করতে ও কর্নেলের মূল বাহিনীর সঙ্গে যাতে তারা যুক্ত হতে না পারে সে জন্য বাধা সৃষ্টি করতে পাঠাল।

জং বাহাদুরের ক্যাম্পে টিপু পেঁছিল মাত্র পাঁচজন সেনা নিয়ে, বাকি সকলে গোপাল রাওয়ের সঙ্গে গিয়েছে হাম্বারস্টোনের বাহিনীর একেবারে পিছন পেঁছিবার জন্যে। জং বাহাদুর তার নিজের সামরিক বিচক্ষণতা সম্বন্ধে বেশি-কিছু মনে করে না, টিপুকে পেয়ে তার আনন্দ ধরে না।

"মাত্র পাঁচ-জনকে নিয়ে আমি এসেছি।" টিপু বলল।

"তুমি যে এসেছ সুলতান, এই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে তোমার সঙ্গী পাঁচ জনই আসেনি, আমার বাহিনীও এসে পেঁছে গেছে।" বলল জং।

জং বাহাদুর ঠিকই বলেছে। সেনাবাহিনীর উপর টিপুর এমনই প্রভাব ছিল যে, টিপুর সঙ্গে সঙ্গে জংএর বাহিনীও 'পেঁছে গেছে' বলে জং বাহাদুর যা বলেছে তা ঠিক। তার সেনাবাহিনী এখন হাম্বারস্টোনেব পরাজয় সম্বন্ধে এতটাই নিশ্চিত, কয়েক মুহূর্ত আগে তার জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল যতটা।

টিপুর আগমনে জং বাহাদুর যতটা খুশি হয়েছে হাম্বারস্টোন যে তা হয়নি না তা সকলেই জানত। কিন্তু কেউ যা জানত না, তা হচ্ছে, গোপাল রাও তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে এমন চমৎকার কাজ করবে, হাম্বারস্টোনের পশ্চাৎবাহিনীকে সে যে এইভাবে খতম করে দেবে ও ছত্রভঙ্গ করবে। এই বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ ক্যাপ্টেনটি এখনো ম্যালেরিয়ার প্রভাবে কাতর, তাকে তার স্ট্রেচারের মত ছোট্ট গাড়িতে চেপে কর্নেলের কাছে যেতে দেওয়া হল, সে মরে যাচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে সে চিকিৎসার সুযোগ পাবে এই ছিল তার অজুহাত। গোপাল রাও সাময়িকভাবে তাকে ছেড়ে দিল তিরস্কার করে।

"তুমি যাও, এই রোগ ও অন্যান্য রোগ তুমি ছড়াও গিয়ে তোমার শ্বেত সহচরদের মধ্যে।"

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গোপাল রাও যখন কথা বলছিল তখন তার প্রায় সমগ্র বাহিনীকেই সঙ্গে রেখেছিল এমন ভান করে যেন এরা তার দেহরক্ষী। বাকি সকলে ইংরেজ বাহিনীকে তখন তেড়ে বেড়াচ্ছে। যে আশায় গোপাল রাও ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দিয়েছে তা হচ্ছে তার নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখ থেকেই কর্নেল জানতে পারবে তার সেনাবাহিনী কীভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়েছে ও ছত্রভংগ হয়েছে কী ভাবে, এবং গোপাল রাওয়ের বাহিনী কতটা তেজীয়ান হয়ে উঠেছে ও কীভাবে শত্রুসেনা উচ্ছেদের কাজে লেগে পড়েছে।

ক্যাপ্টেনটি গোপাল রাওয়ের আশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে নি, কর্নেলকে সে সঞ্চার করে দিতে পারেনি ম্যালেরিয়া, বেশ বহাল তবিয়তেই আছে কর্নেল ; কিন্তু কর্নেলের আশায় প্রচন্ড আঘাত হেনেছে ক্যাপ্টেন। বাকিটা করেছে রসদসন্ধানীর দল, কর্নেলের বাহিনীর কাছে কোনো রসদ যাতে পেঁছতে না-পারে তার জন্যে গোপাল রাওয়ের প্রয়াসকে মদত দেওয়ার জন্যে টিপু পাঠিয়েছে এই দলকে। এখন গোপাল রাওয়ের ক্ষুদ্র বাহিনীও টিপুর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে যারা এখন সকলে মিলে মজুরের কাজে লিপ্ত, যদি-বা কোন আক্রমণ ঘটে তার জন্যে সব বনেদ শক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। হাম্বারস্টোনের বাহিনী চার রাত্রে আকস্মিক আক্রমণ করেছে, এর শেষ তিনটি হয়েছে মারাত্মকভাবে বিফল। অপর দিকে টিপুর আক্রমণ যদিও তেমন ফলপ্রসূ হয় নি, কিন্তু হাম্বারস্টোনের সেনাদের মানসিক বল তাতে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। তাঁর সেনারা মুষড়ে পড়েছে, তাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তবুও তারা জানে যে হতাশ ভাবে তাদের পশ্চাৎ-অপসারণ করতে হবে।

সমস্ত ব্যাপারটা মনে-মনে পর্যালোচনা করে নিয়ে কর্নেল নিজের মনেই বললেন, "না আর এগোনো সম্ভব নয়। এই শোচনীয় পাহাড়ে আমি যদি আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করি, তাহলে আমাকে জন্মাতে হবে আনাজের মধ্যে। সুতরাং পশ্চাতে গমন ছাড়া পথ নেই।"

পশ্চাৎ-অপসরণ সম্বন্ধে একটু সুবিধাজনক রফা করার জন্য টিপুর সংগে কথা বলা যায় কিনা, এ চিন্তা এল কর্নেলের। কিন্তু তাঁর বাহিনীতে এগারো-জন শ্বেতাংগ অফিসার আছে—এরা হাইদর আলির বন্দী ছিল এবং শর্ত-সাপেক্ষে মুক্তি পেয়েছে, তার সৈন্যের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না, এই হচ্ছে শর্ত। কিন্তু এই শর্ত ভংগ করা হয়ে গেছে। এদের কয়েকজন লুণ্ঠনে রত হয়েছে, সীমান্তের গ্রামে রমণীদের উপর অত্যাচার করেছে। টিপু তাদের আত্মসমর্পণ দাবি করবে। তার উপর, তার সংগে আছে এক ক্যাপ্টেন, মদ খেয়ে সেই নেশার ঝোঁকে টিপুর সংরক্ষিত একটি মন্দির সে কলুষিত করে, বিগ্রহের মূর্তি মাড়িয়ে দেয়, ও পুরোহিতকে খুন করে। টিপুর লোকেরা তার নাম জেনে নিয়েছে, এবং হাইদরের দরবার তাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করেছে। তার আত্মসমর্পণও দাবি করা হবে। কয়েক মাস আগে ৪,০০০ সেনার একটি ভারতীয় দল আবু ওয়াফার নেতৃত্বে হাইদরের বাহিনী ত্যাগ করে। হাইদরের দরবারে আবু ওয়াফাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এবং তার অধীনস্থ সৈন্যদেরও। তার পিতার আদালতে যারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়েছে শর্তানুসারে মুক্তিপ্রাপ্ত এমন কোনো চুক্তিভংগকারীকে, আসামীকে ও দলত্যাগীকে মুক্তি দেওয়া হবে এমন কোনো ব্যবস্থায় টিপু অংশ নিতেই পারে না, সুতরাং পশ্চাৎ-অপসরণ সম্বন্ধে তার সংগে কোনো বন্দোবস্তের কথাই ওঠে না। কর্নেল হাম্বারস্টোন অনেক সময়ই অন্যকে উৎসর্গ করে দেওয়ার কাজে বেশ উদার বটে, তবুও তিনি তাঁর দলের অতগুলি লোকের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে নিজেকে কোনো চুক্তির মধ্যে জড়িত করার কথা ভাবতেই পারেন না। এমন কাজ করলে তাঁর যে দুর্নাম রটবে তাতে সৈনিক হিসাবে তাঁর কেরিয়ার একেবারে শেষ হয়ে যাবে, এবং এর চেয়েও শোচনীয় পরিণাম তাঁর জীবনে ঘটতে পারে। এটা যদি আবু ওয়াফার ও তার অধীনস্থ সেনাদের আত্মসমর্পণ নিয়ে করা হত, তাহলে যুদ্ধের একটা দুঃখকর প্রয়োজন বলে তার ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। ক্ষমতাসীনেরা এই কৈফিয়ত মনে-মনে মেনে নিতেন না বটে, কিন্তু সরকারীভাবে মেনে নিতেই হত। যাই হোক, তারা ভারতীয়, তাদের গোরুর পাল বলে গণ্য করা যেতে পারে। ইংরেজ অফিসারদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখতে হবে।

"সে যাই হোক," নিজের মনেই বললেন কর্নেল, "বাদ দাও ওসব যুক্তি। আমার জীবনের উত্থান পতন যাই ঘটুক, আমি একজন আদর্শ অফিসার রূপে গণ্য। এতদূর এগিয়ে এসে আমি আমার ভাবমূর্তিটি নষ্ট করতে পারি নে। যা ঘটার ঘটুক, আমি আলোচনা করতে পারি নে। রাত্রের অন্ধকারেই আমাদের পলায়ন করতে হবে। ভাগ্য যদি আমার প্রসন্ন হয়, এবং কিছু পারিতোষিক যদি এসে যায়, আমি তবে টিপুর সঙ্গে যুগপৎ আমার বিজয় ঘোষণা করব।"

এখন যে নতুন আবহাওয়ার উদ্ভব হচ্ছে তা তিনি জানতেন। ইংলণ্ড থেকে আনকোরা সব সেনা আনা হচ্ছে, সাংবাদিকতায় যাদের বেশ দক্ষতা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রেই এখন জয়ের নিষ্পত্তি হয় না, এখন অনেক সময় কাগজে ও কালিতে তা হয়—সাধারণ একটা লড়াইয়ের এমন কাল্পনিক বিবরণ দেওয়া হয় যে, মনে হয় তাতেই সব হয়ে গেল। একটু হেসে কর্নেল একটা ক্ষুদে সংঘর্ষের কথা ভাবলেন, কিছুকাল আগে তাঁর সেনারা এর সামিল হয়েছিল, তাদের একমাত্র কাজ ছিল একটা মৃত উট দখল করা। আরও মজা এই—এই উট কোনো বুলেটে বা বেয়নেটের ঘায়ে মরে নি, তার স্বভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর লোকেরা ভয়ে-ভয়ে ফিরে এল নিরাপদ জায়গায়, দৌড়নোর ও হণ্টনের দরুন তাদের পায়ের পেশী একটু ক্লান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের কোনো চিহ্নই তাদের অঙ্গে ছিল না। কিন্তু বুলেটিনে যে কাহিনী বের হল তা এক বীরত্বের গাথা, এবং তার শিরোনামা হল 'নেটিভরা তাদের মৃতদের ফেলে গেছে'। কর্নেল যখন তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন পেতে লাগলেন অনবরতই, এমন যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে তাঁর কৃতিত্বের কথা বলতে আসে, তখন তিনি বুঝতে পারেন এসব অস্বীকার করা, এবং বুলেটিনে যা প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করা ঠিক না। সুতরাং যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে যা এসে যেতে লাগল তিনি গ্রহণ করলেন সেই পুষ্পমাল্যসমূহ —এই ধরনের আরও অনেক সংঘর্ষের কাল্পনিক বিবরণের দরুন।

"সত্য হচ্ছে সেই জিনিস যা নাকি সত্য বলে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়।" কর্নেল নিজের মনেই ভাবলেন। আরও ভাবলেন, "আমি যদি আমার সেনা-বাহিনীর গৌরব স্বীকার না-করি, তাহলে শত্রুপক্ষ তা স্বীকার করবে কেন এবং ভয়ই-বা পাবে কেন।" তিনি একজন ভালো যোদ্ধা, একজন দক্ষ অফিসার, অনেক সফল সংঘর্ষ তিনি করেছেন। তাঁর অনেক সহকর্মীর পক্ষেও এ কথা খাটে। এ সত্ত্বেও মনোবল বৃদ্ধির জন্যে এই সব সাংবাদিক উৎসাহ দরকার, এবং

এই সাংবাদিকতাই এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, বৃটিশ আর্মি অপরাজেয়, এ'তে শত্রু পক্ষের মনোবলও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

যাই হোক, সাংবাদিকতার এই অতিকথন উপভোগই করেন কর্নেল; তাঁর উপর ও তাঁর সহকর্মীদের বীরত্ব জাহির করা হয় বলেই অবশ্য নয়, ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্যের বনিয়াদ এতে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যাবেই নয়, গল্পগুজব করার সময় এইসব নিয়ে বেশ মজা করা যায় বেশ তামাশা করা যায় এবং তাতে একঘেয়েমি কাটে, একটা দুর্গ অধিকার করে একেবারে চুপচাপ বসে থাকার মধ্যে একটু বিরক্তি থাকে, কিংবা একটা গুলি নিক্ষেপ না-করে পশ্চাদ্ধাবন করা বা পশ্চাদপসরণ করার মধ্যে অস্তিত্বকে অস্বস্তিকর বলে বোধ হয়। এ'তে ওই সাংবাদিকতা মজা জোগায়। সাংবাদিকতার অন্যান্য কর্মতৎপরতা তাঁর অবশ্য তেমন ভালো লাগে না—যা নাকি এখন বেশ জোরালো ভাবে করা হচ্ছে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ দিয়ে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জাতির মধ্যে ধর্মের বিভেদের বীজ ছড়ানো, মন্দির ও মসজিদ কলুষিত করার উস্কানি দেওয়া, প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি পবিত্র জিনিস অপহরণের দায় চাপানোতে উৎসাহ দেওয়া, নেটিভদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য মিশনারীদের মদত দেওয়া। কেবল সাংবাদিকরাই নয়, আরও অনেককে যেমন, গীত রচয়িতা গল্পলেখক গায়ক ধর্মপাগল প্রভৃতিকে এই কাজের জন্য ভাড়াটে করে নেওয়া। হাম্বারস্টোন অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু মনে করতেন না যখন হিন্দুদের মধ্যে নানা কাহিনী প্রচার করে বলা হত যে হাইদর ও টিপু অন্য ধর্মের মানুষ, এবং মুসলমানদের মধ্যে বলা হত যে এই পিতা ও পুত্র ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করে চলেছে। কর্নেল ভাবতেন, এটা ঠিকই করা হচ্ছে, কেননা যে রাজপুরুষ ও যুদ্ধবাজেরা ব্রিটিশের পরম শত্রু তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করাই উচিত, লোকে যাতে তাদের ঘৃণা করে এমন কাজ করাই সংগত। কিন্তু যুদ্ধটা ঘরে-ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়াটা সংগত কাজ কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল, প্রত্যেকের পারিবারিক মতাদর্শ ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা, তাদের মধ্যে নূতন ঘৃণার সঞ্চার করা, নূতন শত্রুতার সূত্রপাত করা, নূতন অবিশ্বাসের বীজ বপন করা—এ কাজ সম্বন্ধে কর্নেলের মনে দ্বিধা ছিল। কর্নেল ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করতেন, যে দেশে ধর্মান্ধতার ও জাত্যভিমানের বিষ ছড়ানো হচ্ছে সেখানে খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রসারই বা হবে কী করে এবং টিকবেই বা কী করে। একজন মারাঠীকে যদি শেখানো হয়, যে একজন মহীশূরবাসী হচ্ছে একজন বিদেশী, সুতরাং তাকে ঘৃণার ও ক্রোধের চোখে দেখতে হবে, তাহলে এই দেশে ইংরেজের অধিকার

টিকিয়ে রাখার পরিকল্পনা টেকসই হবে কী ভাবে? বিদেশী বলেই তাকে ঘৃণা করতে হবে এমন যদি শেখানো হয় কোনো মারাঠীকে, তাহলে সে কি ব্রিটিশকেও সমানভাবেই প্রত্যাখ্যান করবে না, অথবা আরও উগ্রভাবে? কর্নেল তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে অনেকক্ষণ বিব্রত থেকে বললেন, "এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানিনে। যারা এই নীতি নির্ধারণ করে চলেছে তারাই এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাক। হতে পারে, আমার বয়স যখন তিন কুড়ি-দশ হবে, তখন আমি এ বিষয়ে গভীর ভাবে ভাববার অনেক সময় পাব। সেই পরিণত বয়স যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে ইতিমধ্যে আমার আর টিপুর মধ্যে মাইল মাইল ব্যবধান রচনা করাই হবে প্রথম কাজ।"

কর্নেল জানতেন যে সেই রাত্রেই তাঁর পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্তটা খুব আগে নেওয়া হয়নি। মাত্র কয়েক মিনিট আগে তাঁর গোয়েন্দারা তাকে জানিয়ে গেছে যে, শত্রু শিবিরে জোর কর্মতৎপরতা চলেছে, যার থেকে বোঝা যায় যে ভোরের দিকেই তাদের আক্রমণ কবাব সম্ভাবনা প্রবল। দূরবীন দিযে তিনি দেখলেন শত-শত মশাল শত্রুশিবিরে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করেছে, এতেই তাদের উত্তেজনা স্পষ্ট বোঝা গেল।

'দুঃখিত, হে বৎসগণ," অদৃশ্য শত্রুদের উদ্দেশ করেই যেন তিনি বললেন, "তোমাদের কৃতার্থ কবতে এখন পারছিনে। হতে পারে, এর পবের বার আমি তৈরি হয়ে নেব, আর তোমাদের সঙ্গে লিপ্ত হব যুদ্ধে।"

তাঁর পেশাগত অহমিকায় অবশ্য আঘাত লাগল। তিনি ভাবলেন, "হায় রে বাঁদরেরা। যুদ্ধের প্রাথমিক নীতি ও নিয়মই কি তারা জানে না? তারা যে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে তা এমন প্রকাশ্যে জাহির করাটা কি বুদ্ধির কাজ?'

তিনি সেইসব কাহিনী মনে করলেন, যা অবশ্য অনেকটাই কাল্পনিক— ভারতীয় প্রাচীন রাজাদের সেইসব বীরত্ব গাথা। তাঁরা আক্রমণের তারিখ সময় ও স্থান এবং সৈন্যবল সব আগে থেকে শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিতেন, যাতে শত্রুপক্ষ তদনুযায়ী নিজেদের সমান ভাবে শক্তিশালী করে নিতে পারে। যদি তারা সমান সংখ্যক সৈন্য হস্তী অশ্ব ও উট সংগ্রহ করতে না পারত তাহলে তারা তদনুযায়ী নিজেদের সংখ্যা কমিয়ে নিত। এই কাহিনী শোনার পর কর্নেল বলেছিলেন, "পাগলা ভিখারীর পাল", কিন্তু তিনি এর চমৎকারিত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তিনি শুনেছেন সে আমলে যুদ্ধ ছিল রাজারাজড়ার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ; কৃষি শিল্প আর্ট ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলত যথারীতি।
রাজারা শাসন করতেন প্রজাদের সম্মতি লাভ ক'রে, যুদ্ধজয়ের পর ছয় মাস অবশ্য এই সম্মতির প্রশ্ন উঠত না, তার পর দফায় দফায় সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হত এই সম্মতি, যেমন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ ও শূদ্র। এর যে-কোনো একটি শ্রেণীর বিপরীত অভিপ্রায় জানতে পারলেই রাজা সেই সংশ্লিষ্ট এলাকাই শুধু নয়, তার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পদ সমেত তা পরিত্যাগ করতেন। কর্নেল ভাবলেন, গল্পটা ভালো, কিন্তু পুরো সত্য না হতেও পারে, সবটাই বানানো বলে তাঁর মনে হল না, এর অনেকটারই ভিত্তি সত্যের উপরে। তা না হলে, কর্নেল ভাবলেন, যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত একেবারে অনুর্বর ভূমি, সে দেশে এত ঐশ্বর্য জমা হল কী করে—যার নাকি শেষ নেই, চারুশিল্পের এমন অনবদ্য সম্ভার ও কারুশিল্পের এত নিদর্শনই সঞ্চিত হল কী করে? কর্নেল ভাবলেন, নির্বাধ শান্তি ও জুলুমবাজি থেকে একেবারে মুক্ত থাকার দরুনই এই দেশ এমন সমৃদ্ধ হতে পেয়েছে। "কিন্তু ঐসব ধনরত্ন ও শিল্পনিদর্শন বেশিদিন এখানে থাকবে না। কেন না, আমরা আছি এখানে, ফরাসিরাও আছে, এবং অন্যান্যরাও আছে। সোনার গাছে ঝাঁকি দেব আমরা, পাকা ফল পেড়ে নেব।" তারপর, এই দেশের অসংখ্য জনতার প্রতিনিধি রূপে কয়েকজন কাল্পনিক কুমারীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "তোমাদের ধর্ষণ করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।"

গোয়েন্দারা শত্রুশিবিরের তীব্র তৎপরতার খবর দেওয়া ছাড়াও জানিয়েছে যে, সেখানে কোরান থেকে ও গীতা থেকে আবৃত্তি করছে দুটি দল—এরা টিপুর হিন্দু ও মুসলিম সহ সর্ব সম্প্রদায়ভুক্ত সেনাবাহিনীর লোক। এ'তে তাঁর বেশ মজা লাগল। "ভারতীয় রাজপুত্রটি বেশ দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছে।"

কর্নেলের যতটা জানা আছে তাতে তাঁর মনে হচ্ছে এই সর্বপ্রথম টিপু তার লোকেদের মধ্যে উদ্যম ও উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্যে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে।

টিপুর অনুপস্থিতিতেই টিপুকে সম্বোধন করে কর্নেল বললেন, "নিঃসন্দেহে তুমি সব নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্ল্যান করেছ, কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাবার জন্যে আমি এখানে থাকছিনে। কোরান ও গীতা উভয়ই একসঙ্গে নিয়ে আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তোমার আগ্রহটা কিন্তু ন্যায়সংগত নয়, কেননা গত কয়েক বছর ধরে আমি পড়া দূরের কথা, বাইবেল দেখিনি। পবিত্র কোরান তোমার সৈন্যদের বুদ্ধি নাশ করে দিক, এবং গীতা তাদের পায়ের মাংসপেশীতে টান

ধরিয়ে দিক, এবং আল্লা আগামী সকালে তোমাকে নিয়ে যাক আমার বিপরীত মুখে—এই প্রার্থনা করি।"

তিনি যেন শুনতে পেলেন যে ঘোড়ায় উঠতে যাবার সময়ে তিনি বলছেন 'আমেন', তারপর তাঁর আর্দালী মুনওয়ার খাঁকে ইশারায় কাছে ডাকলেন, পিছন-পিছনই সে আসছিল, তাকে বললেন :

"মুনওয়ার, সব নির্দেশ তুমি পেয়ে গেছ। ৪৫ মিনিট এই পাহাড়ে থাকো। আমাদের লুণ্ঠিত মালের লোভে আমাদের কোনো সেপাই যদি ফিরে আসে, কোনো প্রশ্ন তাকে কোরো না। তাকে গুলি করবে—তাকে সাফ করার জন্যে করবে গুলি। অফিসারদের কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে কেউ যেন পলাতক না হয় তা দেখার জন্যে, তাই, কেউ ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। তবুও, সতর্ক থেকো। ৪৫ মিনিট পরে আমাদের পশ্চাৎবর্তী বাহিনী যেদিকে যাচ্ছে তাদের অনুসরণ কোরো। তোমার ঘোড়া দ্রুত ছুটতে পারে। কিন্তু ঐ বাহিনীতে যোগ দিয়ো না। পনেরো মিনিটের ব্যবধানে থাকবে। যদি সন্দেহজনক কিছু ঘটে, সতর্কতার সংকেত দেবে, এবং ঐ বাহিনীতে যোগ দেবে। যে কোনো ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের আগেই তাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তার পর পরে ছুটে এসে আমার সংগে দেখা করবে। এবার, বলো তো একে-একে কি-কি নির্দেশ তোমাকে দিলাম।"

মুনওয়ার খাঁ খুব নম্রভাবে পুনরুল্লেখ করল নির্দেশগুলি।

"কিছু প্রশ্ন আছে?' তার নির্দেশ আবৃত্তি করার পর কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন।

"কিছু না, হুজুর।"

"এখনকার মত তবে বিদায়।"

"খুদা হাফিজ, হুজুর।"

'খুদা হাফিজ, মুনওয়ার।"

এই অভিবাদনের পর কর্নেল যাত্রা করলেন।

মুনওয়ার খাঁ ফিরে গেল পাহাড়ে। তার ৪৫ মিনিটের পাহারা শেষ হলে সে আশ্বস্ত হল। তাকে একা ফেলে যাওয়ায় সে এতটুকু ভীত হয় নি, কিন্তু দলের মধ্যে থাকলে তার মেজাজ সরিফ থাকে। তার চারদিকে ভিড় যখন সবচেয়ে বেশি হয়েছিল তখন সে সবচেয়ে খুশি বোধ করেছিল। তার ছেলেবেলায় গ্রামের মেলায় গিয়ে সে পুলকিত হয়ে উঠত, সেখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল বলে অবশ্য নয়, সেখানে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হত বলে। একটা দলের

মধ্যে সে চুপ করেই বসে থাকবে, সংগীদের কারুও সংগে হয়তো একটাও কথা বলবে না, তাদের কথাবার্তায়ও সে কান দেবে না, নিজের চিন্তায় এমনই বিভোর হয়ে থাকে সে। কিন্তু দলবলের মধ্যে থাকলে সে বেশ খোশমেজাজে থাকে। ক্যাম্পের জীবন তার ভালো লাগে, এখানকার বর্বরতার সংগে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। সে কথা বলে কম, তাই তার অভিমত সকলের কাছেই গ্রাহ্য। যেহেতু সে প্রথম দিকে কিছুই শোনে না বলতে গেলে, তাই সকলেই তাদের বক্তব্য পুনরায় বলার সুযোগ পায়। দিলের খান মারা যাবার পর সে কর্নেলের আরদালির পদ পেয়েছে, ভারতীয় সেনাদের মধ্যে তার কদর তাই বেড়ে গিয়েছে যদিও তার সাংগাদের সংগে খুব কমই দেখাসাক্ষাৎ করে। কোনো-কোনো সময়ে তার সঙ্গীরা তার সংগে তামাশা করে, "ওহে, তুমি লম্বা-চওড়া এক আদমির এক গা-ঘেঁষা লোক।"

তারা একথা বলে হেসে হেসেই, সেও হাসিমুখে তাদের কথা শোনে। সে জানে সকলে তাকে ভালবাসে, সেও ভালোবাসে সকলকে। সে এক নিঃসংগ লোক, তার তিনটি স্ত্রী মারা গেছে তাকে একটাও সন্তান উপহার না-দিয়ে।

মুনওয়ার খান কর্নেলের নির্দেশ পুরোপুরি মনে রেখেছে। তার ৪৫ মিনিটের পাহারা শেষ হয়েছে, এবার তাঁকে পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর দিকে যেতে হবে। কিন্তু নীচু পাহাড়ে আমার অতগুলি বন্ধুকে যে পরিত্যাগ করা হয়েছে তাদের কী হবে? সেকথা সে ভাবতে লাগল। সে কি তাদের সতর্ক করে দেবে? তাহলে কর্নেলের নির্দেশ তার লঙ্ঘন করা হয়ে যাবে। এমন কাজ সে আগে কখনো করেনি। কিন্তু, এ কথাও সত্য যে, সে আগে কখনো তার বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে নি। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে দৌলৎ খাঁ, তার সংগে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছে। মুনওয়ার খান দৌলৎকে বলেছিল, "যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আমাকে যেন ভালোভাবে কবর দেওয়া হয়। বিশেষতঃ এক পরিত্যক্ত ভূমিতে নয়, আমি সেখানেই কবরস্থ থাকতে চাই যেখানে বহু মানুষের আনাগোনা, যেখানে শিশুদের পায়ের শব্দ বাজে, আর, সম্ভব হলে যেখানে কাছাকাছি থাকবে একটি বাগান।"

"বেশ। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও, বন্ধু। আমি তোমার দেহ ঠিক জায়গায় বহন করিয়ে নিয়ে যাব।" একটু হেসে উত্তর দিয়েছিল দৌলৎ খাঁ।

"সত্যি তুমি এ কাজ করবে?" ব্যাকুলতার সঙ্গে মুনওয়ার খাঁ জানতে চেয়েছিল।

দৌলৎ খাঁ অবশ্য মজা করছিল। কিন্তু মুনওয়ারের হৃদয়ের ব্যগ্র চাউনি তাকে স্পর্শ করল, ও তার হাসি থামিয়ে দিল। সে বলল, "হ্যাঁ। চাচা। আমি শপথ করছি। আমার সাধ্যে যদি কুলোয়, আমি তা করবই।"

নীচু পাহাড়ে আছে আশরাফও। আশরাফের বিধবা মা, যার প্রতি মুনওয়ারের বেশ শ্রদ্ধা আছে, মুনওয়ারের তৃতীয় স্ত্রী মারা যাবার সময় বলেছিল, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুনওয়ারের আবার বিয়ে দিয়ে দেবে। মুনওয়ার ভাবল, যদিও আশরাফ আমার রক্তের কেউ নয়, তবু সে আমার ছেলের মত। "তাকেও আমি ফেলে পালাব?" নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল মুনওয়ার।

আর, কী হবে ওদের? সালাবত, মেহফুজ, সত্যনারায়ণ, পান্ডে, বরকত, ও তাজাদোদের—এদের সংগে একত্রে সে হুঁকা টেনেছে। আর, ঐ ছোটরা? শ্রীকান্ত, কামরান, মামুদ, আবদুল, ও তাঁতিয়া—এরা একদিন তার উপর ছেলেমানুষী অত্যাচার করেছিল বটে, কিন্তু তারা তাকে ডাকত, 'চাচা'।

মুনওয়ার জানত যে মৃত্যুর পর যে বেহেস্ত্ সে পাবে বলে তাকে অঙ্গীকার করা হয়েছে, সেখানকার সুন্দরীরা যে অমৃত তাকে দেবে তা তার কাছে তিতো ঠেকবে যদি সে তার অধিনায়কের আদেশ পালন করে। সব অমান্য করে, ধীর ও স্থির পদক্ষেপে সে যাত্রা করল নীচু পাহাড়ের দিকে। "জাগো, জেগে ওঠো ওয়াফা, দৌলৎ ও মকবুল," নীচু পাহাড়ের ফটকে সান্ত্রীর প্রতি চীৎকার করে উঠল মুনওয়ার।

এই তিনজন প্রধানকে মুনওয়ার লে. জনস্টোনের সংগে হাম্বারস্টোনের পলায়নের কথা জানাল। রত্নেমণিতে পূর্ণ তাঁবুগুলির কথা মুনওয়ার কিছু বলল না। সে জানত, এ কথা ফাঁস করলে এইসব লোককে প্রলোভনে ফেলা হবে, যার ফলে শেষপর্যন্ত তারা বিনাশ হয়ে যাবে। নীচু পাহাড়ের প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি জন্তু জেগে উঠেছে। সর্বসম্মতিক্রমে আবু ওয়াফা এদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করল, এবং এইভাবে বৃটিশ বাহিনীর শেষ সৈন্যদলের পশ্চাৎ-অপসারণ আরম্ভ হল।

খ

ওই পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল টিপুর বাহিনী। সেই রাত্রেই তার কাছে সংবাদ পৌঁছয় যে তার পিতা মৈশুর অধিপতি হাইদর আলি খাঁ'র মৃত্যু ঘটেছে। প্রার্থনা আরম্ভ হল, এবং তারপর আরম্ভ হল সেই স্থান পরিত্যাগের কাজ।

## ২. শাসক মৃত

ক

হাইদরের তাঁবুর বাইরে প্রভাতী প্রার্থনা আরম্ভ হয়েছে। ফটকে দাঁড়িয়ে আছে সৌম্যদর্শন ড্রামবাদক, এবং যখন বহুদূরবর্তী বিউগলের শেষ নিনাদ স্তিমিত হয়ে এল, তখন সে ধ্বনি তুলল তার ড্রামে। এইটেই হাইদরের প্রতি সকালে তার অনুগামীদের অভিবাদন জানাবার রীতি। ড্রামের মৃদু ধ্বনির পর তা দ্রুততর হয়ে উঠল, তার পর সে ধ্বনি হয়ে উঠল উত্তেজনাপূর্ণ—হাইদর সুস্থ আছেন এবং তিনি আজকের সূর্যোদয়ের জন্য সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, তিনি তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন এই তাঁবুর সকলের জন্যে, তাদের জীবনে যেন সাফল্য আসে ও সম্মানের সঙ্গে তারা যেন যাপন করতে পারে জীবন—ড্রামের ধ্বনির সংকেতে তিনি তাই ঘোষণা করতেন। তাঁবুর চতুর্দিকে সমবেত সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুহাস্যের সঙ্গে তাদের দক্ষিণ অংগুলি দিয়ে স্পর্শ করত তাদের দুই ঠোঁট, মহিলারা তাদের দুই হাত আকাশের দিকে সশ্রদ্ধ ভাবে তুলত, এবং বয়স্ক শিশুরা যারা সেখানে জমায়েত হত তারা তাকাত আকাশের দিকে। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা তাঁবুর প্রত্যেকে হাইদরের অভিবাদনের উত্তর দিত এইভাবে।

আজকের সকালেও এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁবুর কেউ জানত না যে হাইদর মৃত্যুশয্যায়। পাঁচ জন মন্ত্রী ও চিকিৎসক দিনরাত্রি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকতেন, এরা ছাড়া আর কেউ তার অসুস্থতার কথা জানত না। এই পাঁচজন এখন শোভাযাত্রার মত ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন তাঁবুতে, অন্যান্য দিনও এইভাবেই করেন। প্রত্যেকেই তাঁবুর ফটকে পৌঁছে সেলাম জানালেন, যেন হাইদরের অভিবাদনের উত্তরেই এই নমস্কার, হাইদরের তাঁবুতে কেউ প্রবেশ করলে হাইদরই প্রথমে অভিবাদন জানাতেন—এইটেই রীতি ছিল। যারা দূর থেকে পাঁচজন মন্ত্রীর শোভাযাত্রা সহকারে তাঁবুতে প্রবেশ করা দেখছিল, তারা ভাবল তাঁবুর অন্যপ্রান্ত থেকে হাইদর অবশ্যই তাদের অভিবাদন করেছেন। কেননা, প্রত্যেক সকালে এই রকমই হত। আজকের সকালে অবশ্য তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য হাইদর সেখানে ছিলেন না। বৃহৎ তাঁবুটির পিছন দিকের

অংশে তিনি তখন শয্যাশায়ী। তিনি জানতেন এই পৃথিবীতে এইটেই তাঁর শেষ সংগ্রাম—এটা একটা ভিন্নধরনের যুদ্ধ, যেখানে তিনি নিঃসঙ্গ ও প্রতিরোধ-হীন। তিনি একটি পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করেছেন যা তাঁর কাছে লেগেছে মনোরম। এই পৃথিবী যত রকমের সুখ ও আনন্দ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেছে তিনি তা উপভোগ করেছেন। তাঁর চোখে সর্বদাই খুশির সংকেত, ঠোঁটে মৃদু হাসি, এবং হৃদয়ে উল্লাস। এমন কি, যখন কোনো যুদ্ধে তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়েছে, কিংবা পিছনে হঠে আসতে হয়েছে, তখনও বেশিক্ষণের জন্যে জীবনের আনন্দ তাঁকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে নি। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সঙ্গীর মৃত্যু দেখেছেন, কাউকে মরতে দেখেছেন মহামারীতে ও দুর্ভিক্ষে,, কারো-কারো মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে। তিনি জানতেন সব জীবনেরই শেষ আছে—ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়। তাহলে মৃত্যুদূতকে অবশ্যই ঈশ্বরের সহৃদয় বার্তাবহ বলে মেনে নিতে হবে। তিনি জীবনকে গভীর ভাবেই ভালোবাসতেন, হাইদর জানতেন যখন এই জীবন সমাপ্ত করার ডাক আসলে তখন তিনি সোৎসাহে তাতে সাড়া দেবেন, এবং কোনো দুঃখ না-জানিয়ে, বরঞ্চ হাস্যমুখে, প্রস্থান করবেন।

কিন্তু সহৃদয় হোন বা উদার হোন, মৃত্যুর স্বর্গীয় দূত এবার হাইদরের সংগে খেলা করতে আরম্ভ করে দিলেন। হাইদর তাঁর উপস্থিতিটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর শয্যাপার্শ্বে যে চিকিৎসক সতর্ক ও একটানা নজর রেখে চলেছেন, তাঁরই পিছনে সেই উপস্থিতিটা হাইদরের চোখে পড়ছিল। বোধহয় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে হাইদরের ঠোঁট একটু নড়ল, এবং তিনি যেন ওই অশালীন চিকিৎসককে সরিয়ে দিতে চাইলেন, যে নাকি ওই মহান্ অতিথির পথে বাধা হয়ে আছে। হাইদর অনুভব করলেন তিনি যেন আলোকের ঝরনাধারায় স্নাত হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে, শরীরে আরাম বোধ হচ্ছে। কিন্তু আলোকরশ্মি তাঁর আচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র হাইদর যেন বুঝতে পারলেন যাদের তিনি রেখে যাচ্ছেন তাদের ভবিষ্যতে কী বিরাজ করছে, তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন, যে বেদনা তাঁর শরীর থেকে সরে গিয়েছিল তা যেন পুনরায় প্রবেশ করল তাঁর শরীরে। "আমি টিপুকে সাবধান করে দেব, অবশ্যই সাবধান করে দেব। একটু অপেক্ষা কর। হে বন্ধু, কী ঘটতে যাচ্ছে তা তার জানা চাই, সুতরাং একটু সবুর কর।" অনুনয় করলেন হাইদর; কিন্তু তিনি যেন ভর্ৎসিতই হলেন। তিনি যেন

শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে বলছে, "শীঘ্রই টিপু তোমাকে অনুসরণ করবে।" পুনরায় তিনি অনুনয়-বিনয় করলেন, এমনকি কিছু উৎকোচ দেবার জন্যেও তিনি ব্যগ্র হলেন, এবং নরকের অগ্নিতে নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হতে চাইলেন, যাতে নাকি তাঁর পুত্রকে সতর্ক করে দেবার জন্যে তিনি একটু সময় পান। কিন্তু মৃত্যুদূত অনড় অটল, সুতরাং আর তিনি স্বর্গদূত নন, তিনি তখন দুষমন যাকে নাকি শায়েস্তা করা দরকার। হাইদরের মনের কোমলতা দূর হয়ে গেল, হাতের মুঠি শক্ত করে তিনি বললেন "আমি যুঝব।" ঠিক তখনই চিকিৎসক ব্যস্ত হয়ে ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল। হাইদরের অসংলগ্নতা যদিও সে বুঝতে পারছিল না, তাঁর মানসিক উত্তেজনাটা টের পাচ্ছিল। পাঁচজন মন্ত্রীও তখন সেখানে প্রবেশ করল, যে অসম সংগ্রামে হাইদর এখন লিপ্ত তা প্রত্যক্ষ করার জন্যেই অবশ্য।

খ

এই একবারই সেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হাকিম হাইদরের প্রধান চিকিৎসক আল বতরের কথা ভুল বলে প্রমাণিত হল। আগের রাত্রে হাইদরের বিশ্বাসভাজন ও মন্ত্রী পুরনাইয়া হাকিমের সঙ্গে দেখা করে।

"আর কত দেরি", পুরনাইয়া জিজ্ঞাসা করেছিল।

হাকিম জানতেন এটা কোনো অবান্তর প্রশ্ন নয়।

ছয় জন বার্তাবহকে দিবারাত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। মুহূর্তের নোটিসে এই দুরূহ সংবাদটি হাইদরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী টিপুর কাছে পেঁছে দেবার জন্যে।

"আর কত দেরি ?" পুরনাইয়া পুনরায় প্রশ্নটি করল।

হাকিম আকাশের দিকে তাকালেন, এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর যেন সেখান থেকেই আসবে। তিনি পুরনাইয়ার দিকে চাইলেন, পুনরায় চাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর মৃদুস্বরে বললেন, "আজকের রাত্রের চাঁদই হবে তাঁর শেষ চন্দ্র।"

"এবং আগামীকাল ?" যেন নিশ্চিত হবার জন্যেই পুরনাইয়া জিজ্ঞাসা করল।

"আগামীকাল, বৃথাই আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব।" উত্তর এল হাকিমের।

পুরনাইয়ার আদেশে ছয় জন বার্তাবহ যারা কেউই পরস্পরকে চেনে না বিভিন্ন পথে সাংকেতিক বার্তা নিয়ে যাত্রা করল, যে সংকেত কেবল পুরনাইয়া

ও টিপুই জানে। পুরেনাইয়া টিপুকে তার পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছে ও তাকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছে। এ সংবাদ একটু আগাম হয়ে গিয়েছে।

গ

চার দিন ও চার রাত্রি হাইদর বেঁচে ছিলেন, যদিও প্রলাপের মধ্যে উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় কেটেছে তাঁর এই ক'টা দিন।

ঘ

পুরনাইয়া ধীরে ধীরে মাথা চুলকাতে চুলকাতে দেখতে লাগল বার্তাবহরা টিপুর কাছে তার বার্তা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাত্রা করল। সে জানত, যদি হাইদর বেঁচে যান তাহলে তাড়াহুড়ো করে এই বার্তা পাঠাবার জন্যে টিপুর কাছে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

এর আগে দুবার টিপুকে এভাবে ডেকে পাঠানো হয়েছে। টিপু যখন ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন হাকিমের আশার কথা শুনেও তাঁর ভীতসন্ত্রস্ত মন্ত্রীরা হাইদরের মৃত্যু আসন্ন ভেবে টিপুকে তার পিতার শয্যাপার্শ্বে ডেকে পাঠানো হয়েছে। দুই বারই হাইদর সেরে উঠেছিলেন, এবং নিরপরাধ হাকিমের উপর ও মন্ত্রীদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের গালমন্দ করেন, এমন কি টিপুর প্রতিও তিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন। তিনি জানতেন, টিপু তাব পিতার কাছে আসার দরুন দু-বার নিশ্চিত জয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হাইদর খুব ভালভাবেই জানতেন যে, তক্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে টিপু ছুটে আসে নি তার পিতার শয্যাপার্শ্বে। এ বিষয়ে হাইদরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যেভাবে নিজেকে সে সংগঠিত করেছে, টিপুর শক্তিমত্তা সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছে, তার প্রতি সেনাধ্যক্ষদের আনুগত্য ও ভালোবাসা ইত্যাদি বিবেচনা করলে টিপুর উত্তরাধিকার একেবারে নিশ্চিত। সুতরাং, টিপু তার পিতার সিংহাসনের লালসায় এসে উপস্থিত হয়নি। হাইদর তা জানতেন, এবং বুঝতেন যে দুবার এসেছিল পিতার অসুস্থতায় সান্তনা দেবার জন্যে, পিতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসা নিবেদন করার জন্যে। পিতার প্রতি টিপুর ভালোবাসার জন্যে হাইদরের আনন্দ ও ক্রোধের কথা পুরনাইয়া জানত। ক্রোধই জয়ী হত। পিতা-হাইদরের উপর রাজা-হাইদর জয়ী হয়ে যেতেন কেননা তিনি সংগ্রাম থেকে বা জয়ের সম্ভাবনা থেকে কোনো সেনাপতির চলে-আসাটা

বরদাস্ত করতেন না, হোক-না তা শুধুমাত্র কোনো অসুস্থ পিতার শয্যাপাশে উপস্থিত হবার জন্যে। টিপুকে সেই জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার পিতার শারীরিক অবস্থা যেমনই হোক সে যেন আর কখনো যুদ্ধে কোনো বিরতি না-ঘটায়।

এ বিষয়ে হাইদরের সঙ্গে পুরনাইয়া একমত হয়েছিল। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মন্ত্রীরাও জানতেন যে, রাজনৈতিক উচ্চাশা রাজাদের কাছে এমনই অর্থপূর্ণ যে কোনো ভাবাবেগ দ্বারা তা চালিত করাটা তাঁদের কাছে বিলাসিতা বলেই গণ্য, এমন বিলাসিতা তারা করতে পারেন না। পুরনাইয়া জানত নিজের স্বার্থহানি করায় টিপু কতদূর যেতে পারে। সে স্পষ্ট মনে করতে পারছে অল্প কাল আগের একটা ঘটনার কথা যখন টিপু তার সর্ব্বস্ব বিসর্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। হাইদর যখন শ্রীরঙ্গপত্তমের দিকে পিছু হঠছেন তখন ত্রিমবুক রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠী অশ্বারোহী বাহিনী হাইদরের বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। যদিও হাইদর তখন মদ্যপানে মত্ত হয়ে ছিলেন, একজন সহকারী ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়ায় তিনি ঘোড়া দাবড়িয়ে অনেক দূরে চলে যেতে পেরেছিলেন। ত্রিমবুক রাও হাইদরকে পাকড়াও করার জন্য তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু হাইদরের একজন সেনাপতি—ইয়াসীন খাঁ তার নাম—মারাঠী বাহিনীর কাছে নিজেকে হাইদর বলে পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। মহীশূরে একমাত্র ইয়াসীন খাঁরই এই ঔদ্ধত্য ছিল যে সে নিজেকে হাইদর বলে চালিয়ে দিতে পারত নিজের দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে নিয়ে, এ'তেই ছদ্মবেশের কাজ চলে যেত। ত্রিমবুক রাও যখন বোকা বনেছে, তখন টিপুর সঙ্গে মহীশূর বাহিনীর ধারণা হয়ে গেছে তাদের প্রধান পুরুষ ধরা পড়ে গেছেন। হাইদর তখন পথের পাশে পড়ে আছেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘোড়া থেকে তিনি পড়ে গেছেন। শান্তির পতাকা উড়িয়ে টিপু স্বয়ং ত্রিমবুক রাওয়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। তার ইচ্ছা মহীশূরের সাম্রাজ্যের বিনিময়ে সে হাইদরের মুক্তি প্রার্থনা করবে। মহীশূর সমর্পণের চুক্তি খসড়াও সে লিখে ফেলে, তাতে হাইদরের জন্যে একটা ছোট ভূস্বামিত্ব মাত্র দাবি করা হয় "যার খুঁটিনাটি বিষয় ও বিস্তারিত বিবরণ আপনার আদেশে ও অভিপ্রায়ে নির্ধারিত হতে পারে, ইতিমধ্যে, আমি, টিপু, হাইদরের পুত্র, আপনার কাছে প্রতিভূ হিসেবে থাকব।" কিন্তু এই বার্তাটি পাঠানো হয়নি, কেননা হাইদর যে জীবিত আছেন আগে তা চাক্ষুষ দেখার পর টিপু ত্রিমবুক রাওয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল। হাইদরের পরিবর্তে ইয়াসীন খাঁকে দেখে সে

খেলাটা বুঝল, কিন্তু কিছু ভাঙল না, হাইদরের সম্মুখে যেভাবে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানায় ঠিক সেইভাবে অভিবাদনের ভান করল। ত্রিমবক রাও'কে তার বার্তাটি সমর্পণ না-করে তার সঙ্গে অবান্তর কথা বলতে লাগল, এবং বেশ সমীহের সঙ্গে জানতে চাইল কি কি শর্তে হাইদরকে মুক্তি দেওয়া হবে ও শান্তি স্থাপিত হবে। টিপু নিরাপদে ফিরে এল। কেননা ত্রিমবক রাও একজন মাননীয় ব্যক্তি, কোনো দূতকে আটক করে রাখা মারাঠী ঐতিহ্য নয়, তা পালন করল ত্রিমবক।

নেশা কেটে গেলে হাইদর ফিরে এল তার শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গে। একজন কিষাণ তাকে পথের পাশের নালা থেকে তার কুটিরে নিয়ে গিয়ে তার সেবাশুশ্রূষা করেছিল—কে তা না জেনেই। তাকে রক্ষা করার জন্য টিপু তার রাজ্য ও স্বাধীনতা কীভাবে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছিল তা শুনে হাইদর কিছু বলেনি, কিন্তু পরে তার অনেক কিছু বলার ছিল। হাইদরের নির্দেশে পুরনাইয়া অনেক আলোচনার ও নীতিকথাব ব্যবস্থা করেছে, তাব বক্তব্য বিষয়ই ছিল এই যে, রাজার থেকে রাজ্য ও রাজমহিমা অনেক বড়, এর প্রতিবন্ধক হয়ে যেন প্রীতি বা রক্তের সম্পর্ক কখনো না দেখা দেয়।

পুরনাইয়া জানত হাইদর সে ঘটনার কথা মনে রেখেছে, ভবিষ্যতে কখনো যেন পিতার কাছে আসার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ সে না-করে—টিপুকে এই আদেশ যখন হাইদর দেয় তখনই পুরনাইয়া বুঝল ঐ ঘটনার উল্লেখ এ'তে আছে। মন্ত্রীদের হাইদর বলেছিল, "তোমাদের কেউ যদি আমার জীবিত অবস্থায় টিপুকে এভাবে ডেকে পাঠাও, তাহলে স্কন্ধে তোমাদের মাথা থাকবে না। এটা আমার পাকা কথা।"

বার্তাবহদের যাত্রা করা লক্ষ করে পুরনাইয়া আবার মাথা চুলকাল। তার ভয় হতে লাগল তাড়াহুড়ো করে টিপুর কাছে খবর পাঠাবার জন্যে তাকে হয়তো কৈফিয়ত দিতে হবে।

নিজের মনে সে বলল, "হাইদর যদি বেঁচে যান, তাহলে খুব কম মূল্যই তাকে দিতে হচ্ছে।"

৬

ছয়জন বার্তাবহ পুরনাইয়ার দেওয়া টিপুর কাছে পাঠানো খবর নিয়ে হাইদরের তাবু ত্যাগ করল। প্রত্যেকে একই খবর বহন করছে। কোনো অঘটন,

আড়াল থেকে আক্রমণ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে প্রত্যেককে বিভিন্ন পথ ধরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ওদের একজনও যদি টিপুর কাছে পৌঁছতে পারে তবেই যথেষ্ট।

পুরনাইয়া যে-যে পথের নির্দেশ দিয়েছে তদনুযায়ী পাঁচ জন সেই-সেই পথ ধরেছে। ষষ্ঠ জনের নিজেরই কোনো মতলব ছিল। সে তার নির্দিষ্ট পথ ত্যাগ করে হাইদরের বিশ্বস্ত ও প্রীতিভাজন সহকারী শেখ আয়াজের তাঁবুর দিকে ছুটল—যে নাকি এখন বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

## ৩. বিশ্বাসঘাতকের জন্ম

ক

বেদনূর প্রদেশের গবর্নর শেখ আয়াজ তার তাঁবুতে বসে ছিল। পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় সেই তাঁবু, তার জানালা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল বহুদূর পর্যন্ত মাইলের পর মাইল পথ, যে পথে বার্তাবহ পুরনাইয়ার কাছ থেকে নিয়ে আসবে সংবাদ, যা নাকি পুরনাইয়া তার জন্যে পাঠায়নি। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছিল সে।

আয়াজ জানত আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। সে কি এই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে যাবে, অথবা বেদনূরেই তাঁকে ফিরতে হবে খোঁড়ার মতন—এইটেই প্রশ্ন। সে তাঁবুর বাইরে এল, হাইদরের নির্দেশ অনুসারে পক্ষকাল আগে এই তাঁবু গাড়া হয়েছে, মনে মনে সে তার সেনাদের সংখ্যা গুনে দেখল, খুশিমনে তার পর ফিরে এল তাঁবুতে। সে চিন্তা করতে লাগল সেই জোরালো ঘোষণায় তাজা তাজা কথাগুলো, সেই চরম মুহূর্তটি এলে যা নাকি সে জারি করবে তার অধীনস্থ বাহিনীর উদ্দেশে।

অনেক উন্নতি করেছে আয়াজ, তার কল্পনার অতীত। সে হচ্ছে কালিকটের বিখ্যাত বাইজী আশিলা বানুর পুত্র—যাকে লোকে চাইত এমনই প্রবলভাবে যে, লোকে বলে, তার গান শোনার জন্যে এক মুঠি-ভরা স্বর্ণমুদ্রা দিতে হত, আর নাচ দেখার জন্যে তিনমুঠো স্বর্ণ। কিন্তু ভালোবাসা সে দিত বিনামূল্যে মুক্ত হস্তে, অবশ্য যার প্রতি সে অনুরক্ত হয়ে পড়ত। কেবলমাত্র কালিকটের শাসক (যাকে নাকি বলা হত জামোরিন) তাকে পেত তার নিজ অধিকারে। অন্যান্যদের সে তার প্রেমপ্রীতি বিলি করত, কোনো মুদ্রার বিনিময়ে নয়, কেবলমাত্র তার খুশির ও ভালোবাসার খাতিরে। অনেকে বেশ জোরের সঙ্গে বলে যে আয়াজের পিতা হচ্ছে পথের ধারের আস্তাবলের সেই সতেরো বছর বয়সের সুদর্শন বালক, যার নাম মকবুল। অন্যান্যেরা বলে আশিলার সৎ-ভ্রাতা হায়াতের কথা। প্রত্যেকের কাছেই সে নাকি গোপনে জানিয়েছে আয়াজের পিতা হচ্ছে ওই জামোরিন।

জামোরিন স্বয়ং এটা বিশ্বাস করত না, কিন্তু ব্যাপারটায় সে খুশি ছিল। সে ছিল এক অপদার্থ প্রেমিক, কিন্তু এ জনরবে তার শক্তির ও সামর্থ্যের পরিচয় ছিল

বলে সে এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। সে যে কেবল তার প্রজাদের পিতৃতুল্য তাই নয়, সে হচ্ছে এই ভূমির এক বৃহৎ সংখ্যক বেজম্মার জনক বলে পরিচিত।

আশিলা বানু, কে জানে কেন, তার পুত্র আয়াজকে হিন্দু নায়ার হিসাবে মানুষ করে। যখন তার বয়স আট, তখন বালকভৃত্য রূপে সে জামোরিনের দরবারে কাজ করতে আরম্ভ করে, তারপর বড় হয়ে উঠলে প্রাসাদরক্ষীর প্রধান রূপে কাজ করতে আরম্ভ করে।

ততদিনে আয়াজ এক সুদর্শন যুবা হয়ে উঠেছে, যুদ্ধকৌশলে তরবারি-চালনায় ও অশ্বারোহণে পারদর্শীও হয়ে উঠেছে। প্রাসাদরক্ষীর প্রধান হিসাবে তার কাজ ছিল হাল্কা ধরনের। কেননা জামোরিন বেশ জনপ্রিয় শাসক ছিল, যার কোনো বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। আয়াজ সময় কাটাত কবিতা আবৃত্তি ক'রে ও গান রচনা করে। অনেক সময় জামোরিনের প্রীতি উৎপাদনের জন্যে নাট্যানুষ্ঠানের ও অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত। হাইদরের আগমনের অগে পর্যন্ত সে শান্তিতেই ছিল।

জামোরিনের অধিনে কালিকটের নায়ারেরা বেশ সাহসের সংগেই হাইদরের সংগে লড়াই করে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও হত্যাকাণ্ডের পর হাইদর আক্রমণ করে জামোরিনের প্রাসাদ। জামোরিন যখন হাইদরের কাছে নতি স্বীকার করতে যায় তখন তার সঙ্গে যে ত্রিশজন প্রধান গিয়েছিল আয়াজ তাদের একজন। জামোরিনের ও অন্যান্য প্রধানের সংগে আয়াজও যাবজ্জীবন হাইদরের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

তারা এসেছিল তাদের প্রাণের ভয়ে। কিন্তু তারা যে ভাবে বিক্রম দেখিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, তাতে হাইদর প্রীত হয়, এবং সহৃদয়তার সংগে তাদের অভ্যর্থনা করে। তার পর চারলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণের ও বন্ধুত্বের শপথ পেয়ে হাইদর কয়েকটি সৎ বাক্য ব'লে তাদের মুক্ত করে দেয়।

খ

সে রাত্রে জামোরিন তার প্রাসাদে মদে চুর হয়ে পড়ে আছে। যদিও মদে সে তেমন আসক্ত নয়, কিন্তু গত কয়েক দিনের উত্তেজনা, পরাজয়ের গ্লানি, এবং শেষ পর্যন্ত তার জীবন রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি মিলে তাকে মদের সাহচর্য পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল করে। গান-বাজনা সে থামিয়ে দিয়েছে, পারিষদদের দূরে সরে যেতে বলেছে। কেবল তার গেলাশ পূর্ণ ক'রে দেবার জন্যে পাশে আছে

আয়াজ। জামোরিন যখন নেশায় বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আয়াজ প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যায়। প্রধানমন্ত্রীকে জাগায় আয়াজ, জামোরিন তাকে কি-কি আদেশ দিয়েছে তাকে তা বলে—ধনরত্ন বোঝাই সব সিন্দুক সরিয়ে ফেলতে হবে, হারেম নিয়ে যেতে হবে অন্যত্র, সেনাবাহিনীকে পলধা দুর্গে সরিয়ে নিতে হবে। এসব আদেশ ঠিক-মত পালিত হবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সে হাইদরের কাছে ছুটে গেল এবং জামোরিনের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিপূর্ণ সংবাদ সেখানে পেশ করল। হাইদর একথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না, কেননা জামোরিনের প্রতি সর্বদাই সে সদয়। তবুও তার গোয়েন্দাদের সে পাঠাল আয়াজের বলা জায়গাগুলিতে। তারা সৈন্যবাহিনীর গতিবিধির কথা জানাল, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল হাইদর, সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিল জামোরিনের সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, এবং কোনোভাবেই তাদের রেহাই না দিতে। তার নূতন নিযুক্ত লেফটেনান্ট আয়াজের উপর ভার পড়ল জামোরিনকে আক্রমণ করে সম্ভব হলে তাকে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে, 'আমি তাকে যাতে বিশ্বাসঘাতক খন্দে রাওয়ের মত খাঁচায় বন্দী করে রাখতে পারি মানবজাতির প্রতি সাবধান হবার উদাহরণ রূপে।" আয়াজ তার শপথের মর্যাদা রাখতে কতটা বদ্ধপরিকর তার নজির সে রাখল—এই রকম বলায় তার উপর আস্থা আসে হাইদরের, সেইজন্যই তাকে দেওয়া হয় ওই গুরু দায়িত্ব। আয়াজের নেতৃত্বে চালিত সেনারা প্রথমেই জামোরিনের প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে, এবং নেতার আদেশ অনুসারে আরম্ভ হয় অত্যাচার। অল্পক্ষণের মধ্যেই লুক্কায়িত সিন্দুকগুলি উদ্ধার করা হয়, তার পর প্রধানমন্ত্রীর দেহ ছিন্নভিন্ন করা আরম্ভ হয়—জামোরিনের প্রাসাদ-চত্বরে রক্তের ধারা বয়ে চলে। আয়াজ হাইদরেব সৈন্যদের পাঠাল সিন্দুকগুলির হেফাজত-নিতে, এবং যে পাগড়ি দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল তা সরিয়ে প্রবেশ করল জামোরিনের প্রাসাদে। তখন তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়, রক্ষীরা তাকে চিনতে পারে, সমীহ করেই তারা তার পথ ছেড়ে দেয়, কেননা তারা তখনও জানে না আয়াজ দল পরিবর্তন করেছে। প্রাসাদরক্ষীদের সে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ দিল, এবং সকলকে ফটকে মোতায়েন রাখা হল হাইদরের বাহিনীর আক্রমণ রুখবার জন্যে। একাকী সে প্রবেশ করল জামোরিনের শয্যাকক্ষে। যে বারোজন রক্ষী এখানে পাহারায় নিযুক্ত ছিল তাদের আয়াজ আদেশ দিল প্রাসাদ রক্ষার জন্যে অন্যান্য সেনার সংগে যোগ দিতে। সেখানে পড়ে রইল জামোরিন তার ঘুমের মধ্যে। সে পৃথিবী থেকে নির্বাসিত। আয়াজ ঠিকই করেছিল

জীবিত অবস্থায় জামোরিনকে সে পাকড়াও করবে না, তাহলে হাইদর যাবতীয় সত্য জানতে পারবে। শয্যাকক্ষের রক্ষীদের আস্তানার কাছ থেকে আয়াজ জ্বলন্ত মশাল তুলে নিল ও জামোরিনের শয্যার নিকট গেল। জামোরিনের মুখে সেই আলো পড়তেই সে মুহূর্তের জন্যে থমকে থেমে গেল। ধীরে ধীরে সে জামোরিনের শরীরটা উল্টে দিল। সম্ভবত তার মধ্যে একটু সৌজন্যবোধ এসে গেল। জামোরিনের মুখোমুখি সে হতে পারল না। তার চোখ এড়িয়ে সে শয্যার পাশে মশাল ধরল, এবং স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করতে লাগল মশালের শিখা জামোরিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগুনের প্রচণ্ড তাপে জামোরিন জেগে উঠল, সে বিচলিত অথচ শান্ত, কিন্তু যেই সে শয্যা ত্যাগ করার জন্যে উদ্যত হয়েছে, তখনই আয়াজ মুহূর্তের জন্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সেই জ্বলন্ত মশাল দিয়ে বারবার তাকে আঘাত করতে থাকে। যতই সেই অগ্নিশিখা তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে জামোরিন ততই কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ছটফট করে। আয়াজ তখন সব-কিছুতে অগ্নি সংযোগ করে চম্পট দেয়। যখন সে প্রাসাদের ফটকে পৌঁছল তখন সে রক্ষীদের প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়ে হাইদরের সেনাদের দিকে ছুটে চলল যারা ইতিমধ্যে জামোরিনের যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করেছে। প্রাসাদে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে। বহুদূর থেকে তা দেখা যাচ্ছে। হাইদরের তাঁবুর দিকে সে ধাওয়া করল। তার এই নতুন সহকারী পেয়ে ও প্রচুর ধনরত্ন পেয়ে হাইদর তখন খুব খুশি। তার পরাজিত শত্রুর জন্য শোক করার সময় তখন হাইদরের নেই, যে নাকি হাইদরের ক্রোধের সম্মুখীন হবার ভয়ে নিজের প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে শেষ করেছে বলে হাইদরকে বলা হয়েছে।

হাইদর আয়াজকে জামোরিনের পদ দিতে চাইলেন। আয়াজ ভয় পেল যে তার পূর্বতন সহকর্মী নায়ারেরা তার বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সন্দীহান হবে এবং তাদের প্রতিহিংসার শিকার হতে হবে তাকে, এই ভেবে সে বলল ঐ পদের থেকে সে তার মনিবের পাশে থাকাটাই বৃহত্তর গৌরব বলে মনে করে। হাইদর এতে প্রসন্ন হল, পুলকিত হল।

গ

এর পর থেকে অনেক পুরস্কার এসে জমা হল আয়াজের কাছে। হাজার হলেও সে একজন দুর্ধর্ষ অধিনায়ক, একজন দক্ষ সংগঠক, এবং একজন খোশমেজাজী সঙ্গী। হাইদরের স্নেহ ও বিশ্বাস সে অর্জন করেছে। হাইদরের

অনেক অনুগামী অনেক সময়ই নানাবিধ সম্মান ও মর্যাদার জন্যে হাইদরকে বিরক্ত করেছে, কিন্তু আয়াজ তাদের মত নয়। তাকে দু-দুবার একটা প্রদেশের গবর্নর-পদ দিতে চাওয়া হযেছে, দুবারই সে তা নিতে রাজি হয় না এই কারণে যে, তাহলে হাইদর প্রায়ই যে অভিযানে বের হয় তখন সংগী হিসাবে সে হাইদরের সঙ্গে থাকতে পারবে না—যা নাকি তার কাছে অত্যন্ত আনন্দের, অনেক ঐশ্বর্য মান মর্যাদা ইত্যাদিব থেকে যা নাকি তার কাছে অনেক বড়। অবশেষে হাইদর যখন তাকে চিতল দুর্গের গবর্নর-পদ নেবার জন্য চাপ দিল, তখন তার প্রভুকে খুশি করার জন্যে সে আরো জোরালো আপত্তি জানাল।

আয়াজ বলল, "আমি লিখতে পড়তে জানিনে। আমাকে সেপাই হয়েই থাকতে দাও।"

হাইদর বলে উঠল, "লেখা ও পড়া? ও দুটোর কোনোটাই না-জেনে আমি কী ভাবে একটা সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছি?"

"হুজুর, হাইদর মাত্র একজনই আছে, আমরা সকলেই তা জানি।" আয়াজ বলল।

কিন্তু হাইদরেরও কয়েকজন গবর্নর দরকার যাদের সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে, যাদেব উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। গবর্নরদের অন্যান্য কর্তব্য ছাড়াও হাইদরের ধনসম্পদের ভারও তাদের নিতে হয়, তিন-চার জায়গায় তা ছড়িয়ে রাখতে হয়, অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে তা রক্ষা কবতে হয়।

ঘ

চিতল দুর্গের গবর্নর থাকা কালে আয়াজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, এবং নিজেকে শেখ পদবীতে ভূষিত করে। হাইদরের কানে খবরটা এলে সে এ'তে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না, কেননা ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না হাইদর।

টিপু এ বিষযে একটু মন্তব্য করে, বলে, "একবার সে বদল করে তার প্রভু, এখন বদল করল ধর্ম ও নাম। এর পরে কী?"

আয়াজ এখন বেদনূরের শাসক, এবং হাইদরের যাবতীয় সম্পদেব এক-তৃতীয়াংশের রক্ষক। হাইদর জানত তার শরীর ভেঙে আসছে, সে চাইত তার বিশ্বস্ত অধিনায়কেরা কাছে-পিঠেই থাক্, তার মৃত্যু ঘটলে টিপুর উত্তরাধিকার যেন বিঘ্নিত না হয়। উত্তরাধিকার ব্যাপারে হাইদরের মনে বড় রকমের কোনো সন্দেহ অবশ্য ছিল না। এটা ছিল বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের প্রশ্ন মাত্র।

হাইদরের তাঁবু থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আয়াজকে ক্যাম্প করতে বলা হয়, এবং বলা হয় নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে, "আমার কাছ থেকে, অথবা খোদার যদি তেমন ইচ্ছা হয়, টিপুর কাছ থেকে যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তোমরা শপথ নিয়েছ যে তোমরা তা স্বীকার করবে ও রক্ষা করবে।"

এইসব কারণেই আয়াজ জানত যে, হাইদরের মৃত্যু আসন্ন। এও সে জানত যে টিপু তখন অনেক দূরে। টিপু এসে সিংহাসনের দাবি জানাবার আগেই তা অধিকার করে নেবার এই তো সুযোগ। ইংরেজদের সঙ্গেও সে যোগাযোগ রেখে চলেছে। তারা তাকে সমর্থন করবে, রক্ষাও করবে। হাইদরের দরবারে তার বন্ধুও আছে, হাইদর গত হলেই তারা আঘাত হানবে। এই জন্যেই টিপু এসে পেঁছে সিংহাসন দাবি করার আগেই হাইদরের মৃত্যুসংবাদ তার পাওয়া চাই। পুরনাইয়া অবশ্যই হাইদরের সবচেয়ে দ্রুতগামী বার্তাবহ গুলাম মহম্মদকে দিয়েই টিপুর কাছে খবর পাঠাবে। গুলাম মহম্মদ আয়াজের কাছ থেকে মাসোহারা পেত, এই জন্যে বেদনুরের গবর্নর যে বার্তার জন্যে পথ চেয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে তার কাছেই বার্তাটি নিয়ে আসবে গুলাম মহম্মদ।

শেখ আয়াজ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় যে দিকে হাইদরের ক্যাম্প সেই দিকে চোখ রাখল। দুপুরের এই গরম ও প্রচন্ড সূর্যের তেজ তাকে জামোরিনের শয্যাগৃহের সেই রাত্রিটার কথা মনে করিয়ে দিল। তাঁবুতে সে ফিরে গেল ও অপেক্ষা করতে লাগল।

৬

প্রায় সন্ধ্যার সময় শেখ আয়াজের তাঁবুতে এসে পেঁছল গুলাম মহম্মদ, এবং টিপুর জন্যে পাঠানো বার্তা তাকে দিল।

খুব সৌজন্য প্রকাশ করে আয়াজ সেই বার্তাবহকে কুর্শি দেখিয়ে বসতে বলল, এবং তার হাতে মদ্যের একটি শৌখিন বোতল এগিয়ে দিল।

শেখ আয়াজ সেই বার্তার সীলমোহর ভেঙে বার্তাটি খোলার আগেই বিষাক্ত মদ্যের ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

গোলাম মহম্মদ আর কাউকে কোনো দিন প্রতারণা করবে না।

৮

কিছুকাল থেকে একটু লেখা-পড়া শেখার আগ্রহ আয়াজের মনে জেগেছে।

একটু-আধটু শিখেওছে সে। কিন্তু যে কাগজটা সে পড়ার চেষ্টা করছে তার বিন্দুবিসর্গও সে বুঝছে না।

আয়াজ এটুকু অবশ্য ধরতে পেরেছে যে এটা সংস্কৃতে লেখা—যে ভাষা উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণদের, এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরনাইয়া জানত, ও বিস্মিত হবারই কথা, টিপুও বেশ ভালভাবেই জানত।

ইসলামে দীক্ষিত হবার পর আয়াজ তার দরবারের সব দপ্তর থেকে ব্রাহ্মণদের ও অন্যান্য হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এ খবর হাইদারের কানে এলে সে অভিযোগে বিশেষ গুরুত্ব না দিযে হাইদর বলেছে, "যার কাছ থেকে ভালো কাজ পাবে তাকেই সে রাখুক।" এই অভিযোগ যখন আসে টিপু তখন হাইদরের পাশেই ছিল, সে সাহস করে বলল, "তোমার প্রজাদের ধর্ম সম্বন্ধে তুমি যদি উদাসীন হও, বাবা, তাহলে তোমার গবর্নরদের কাছে এর গুরুত্ব কি আর থাকবে ?"

হাইদর ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখেছে, বলল, "পুত্র, এ প্রশ্নটা প্রজাদের ধর্ম সম্বন্ধে নয় এটা হচ্ছে তাদের কর্মচারী বাছাই সম্বন্ধে গবর্নরদের অধিকার সম্পর্কে।"

এ অবস্থায় আয়াজের তাঁবুতে এমন-কেউ ছিল না যে নাকি এই চিঠিটা পড়তে পাবে। অনেক দূর থেকে একজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ আনানো হল। চিঠিটা তাকে পড়ে শোনানো হল, তবুও এর অর্থ তার কাছে বোধগম্য হল না। এর আরম্ভ ও শেষ গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। চিঠিটা অবশ্য খুব সহজ ও সরল। এতে ছিল টিপুর প্রতি পুরনাইয়ারই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন, তার পর দুঃখ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, পুরনাইয়া সেই তাঁবুতে জীবন নিয়ে এমনই বিব্রত ছিল যে, যে বিষয়ে তারা আগে আলোচনা করেছে, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ এখন দিতে পারছে না, কিন্তু আগামী সপ্তাহে তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই সব। গীতার উদ্ধৃতি-দুটি আরও ঝাপসা। প্রথম উদ্ধৃতিটা এই

ন জায়তে ম্রিয়তে কদাচি-
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এবং দ্বিতীয়টি এই ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এর বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কিন্তু তবুও কোনো আলোকপাত এতে হল না। তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় দিল আয়াজ, বাইরে আরদালিরা তাকে জাপটে ধরল, ও চিরকালের মত তাকে চুপ করিয়ে দিল।

আয়াজ বুঝতে পারল, এটা সাংকেতিক ভাষায় পাঠানো বার্তা। এটা একটা সাধারণ চিঠির মত, এটা কী রকম ব্যাপার হল যে পুরনাইয়া একবারও হাইদরের অসুস্থতার কথাই বলেনি যা নিয়ে নাকি সর্বত্র বন্ধু ও শত্রু পক্ষের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলেছে? যে বার্তাটি দেখতে এমন নিরীহ, হাইদরের দ্রুততম বার্তাবহকে দিয়ে তা পাঠাবার তাৎপর্য কী? ঠিক, আয়াজ স্থিরনিশ্চয় হল, হাইদরের মৃত্যু হয়েছে; এই সাংকেতিক বার্তায় টিপুকে অবশ্যই তার সিংহাসনের অধিকার নেবার জন্যে ডাকা হয়েছে। একটা ব্যাপার তাকে বিচলিত করতে লাগল। হাইদরের তাঁবুর চারপাশে সে অজস্র গোয়েন্দা বসিয়ে রেখেছে, তাদের মধ্যের একজনও এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাকে কোনো খবর দিতে এল না? এ কথা সে চেপে গেল। ধূর্ত পুরনাইয়া নিশ্চয়ই হাইদরের মৃত্যুকে একেবারে গোপন রেখেছে। সে ভাবল। যদিও এ'তে তার প্ল্যানের বিশেষ ইতরবিশেষ হবে না। মূল পরিকল্পনাটি ছিল এই: হাইদরের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা হবার পরের রাত্রে আয়াজের অনুগামীরা পুরনাইয়াকে ও হাইদারের সেনাপতিদের পাকড়াও করবে। তারা গুজব ছড়িয়ে দেবে যে, অন্যান্য সেনাপতিদের সঙ্গে চক্রান্ত করে পুরনাইয়া হত্যা করেছে হাইদরকে। তখনই তারা সর্বনিকটস্থ অধিনায়ককে, অর্থাৎ শেখ আয়াজকে, ডেকে পাঠাবে। তার সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হবে আয়াজ, অনুসন্ধানাদি করবে, এবং টিপুর আদেশে হাইদরকে মারা হয়েছে এই সিদ্ধান্তে এসে যাদের সুবিধাজনক লোক বলে মনে হবে না তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে। তখন, টিপুর দুর্বলচিত্ত ভ্রাতা আবদুল করিমকে সিংহাসনে বসানো হবে—যে নাকি একটা পুতুল হয়ে থাকবে। যে ইংরেজদের সঙ্গে আয়াজের নিত্য সংযোগ আছে তারা খবর পাওয়া মাত্র টিপুর পথ আটকাবে যাতে কোথাও সে যেতে না পারে, তার পিতার হত্যায় তার ষড়যন্ত্রের কথা ঘোষণা করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে, টিপু যে সমস্ত হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ও যাবতীয় খ্রীষ্টানকে দাসত্বে পরিণত করতে চেয়েছিল সে সম্বন্ধে প্রচার করার যাবতীয় প্রস্তুত কাগজপত্র প্রকাশ করা হবে। আবদুল করিম বেশিদিন বাঁচবে না, কিন্তু আয়াজের হাতে সব ক্ষমতা আসা পর্যন্ত নিশ্চয় সে জীবিত থাকবে।

এই তো পরিকল্পনা। প্রনাইয়া ও অন্যান্যরা হাইদরের মৃত্যু গোপন রাখার চক্রান্ত যদি করে থাকে, আয়াজের দিক থেকে সেটা অনেক ভালোই। হত্যার অভিযোগটি তাহলে আরো জোরালো হবে। সে একজন বার্তাবহ পাঠাল হাইদরের 'রবারে, সেখানে তার দুই প্রতিনিধি মহম্মদ আরামিন ও শামসুদ্দিনকে হাইদরের মৃত্যুর সংবাদ জানাল, এবং হাইদরকে হত্যার চক্রান্তের কথাটা জোর প্রচার ক'রে পরিকল্পনা মত অগ্রসর হতে বলল।

মহম্মদ আরামিন হচ্ছে হাইদরের জ্ঞাতিভ্রাতা, সে হচ্ছে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক, ৪০০০ অশ্বের ভার তার ওপর; শামসুদ্দিন হচ্ছে হাইদরের বাহিনীর বেতন-বিতরণকারী।

আয়াজ তার বাহিনী নিয়ে তখন অপেক্ষা করছে, রাত্রির অন্ধকারে গ্রেপ্তার ও অভ্যুত্থানের জন্যে, এবং এজন্য আহ্বানের জন্যে।

ছ

হাইদরের মৃত্যুর গুজব সারা তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়ছে, সর্ব অবস্থার সম্মুখীন হবার মত সহ্যশক্তি আছে পুরনাইয়ার, এ খবর সে নির্বিকার ভাবে শুনছে। তার আরদালীও সাশ্রু চোখে তাকে এসে জানাল এই সংবাদ। তার পর সে দেখল কয়েকজন দলে-দলে জটলা করে চাপা গলায় এ কথা নিয়ে আলোচনা করছে। শামসুদ্দিনের তিনটি স্ত্রী বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে ছুটোছুটি করছে, এই রকম আরও অনেকে 'সংবাদ'টা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

পুরনাইয়া জানত যে এ শোক তাদের প্রকৃত, কিন্তু এর উৎস কোথায় সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল। সে প্রস্তুত হতে লাগল। সূর্যাস্তের আগেই সে ড্রাম পিটাবার ব্যবস্থা করল, এর ফলে পুরো এলাকার অধিবাসী তার বক্তব্য শোনবার জন্য ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

'ওরা তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে," সে বলল, "হাইদর আলি জীবিত আছেন, যদিও তিনি জ্বরে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসক আমাকে বলেছেন যে আমাদের কল্যাণের জন্যে ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করবেন।"

"প্রমাণ কর", মহম্মদ আরামিন বলে উঠল, এ হচ্ছে হাইদরের আত্মীয় কিন্তু পুরনাইয়া তাকে চিনত না, এ হচ্ছে শেখ আয়াজেরও এক গুপ্ত সংবাদদাতা।

মহম্মদ আরামিন বলে উঠল, "এটা কি সত্যি যে, তুমি তাকে খুন করেছ?"

উত্তরে পুরনাইয়া বলল, "আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার শোক

তোমার বুদ্ধিনাশ করেছে। কিন্তু, আমি আবার বলছি—হাইদর আলি জীবিত আছেন।"

চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল, "প্রমাণ কর। প্রমাণ কর।" এদিক-ওদিক থেকে দু-একটি ব্যঙ্গবিদ্রূপের শব্দও তার কানে এল, তাকে দোষারোপ করে, তাকে 'খুনী' বলে, 'হীন ব্রাহ্মণ' ও অনুরূপ অন্যান্য কথা বলে তাকে তিরস্কার করা হতে লাগল।

পুরনাইয়া সত্য কথাই বলেছে। টিপুর কাছে সাংকেতিক সংবাদ সে পাঠিয়েছিল বটে, তবু এটা ঠিক যে, হাইদর বেঁচে আছেন। যদিও তিনি প্রলাপ বকছেন, যদিও তিনি যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছেন। হাইদরের মৃত্যুর কিংবা সম্ভবত হত্যার গুজব শুনে সেনাবাহিনীর মন-মেজাজ যে রকম দাঁড়িয়েছে পুরনাইয়া তা পছন্দ করছিল না। হাকিম অল বতরের সঙ্গে সে আলোচনা করেছে, হাইদরের চিকিৎসক রাজি হলেন। পুরনাইয়ার কথা যারা বিশ্বাস করেনি তাদের সকলকে হাইদরের তাঁবুতে আমন্ত্রণ করা হল, তখন মিছিল করে সকলে এসে হাজির হল। হাইদর যে জ্বরাক্রান্ত তা যে চাক্ষুষ দেখবে সেই বুঝতে পারবে। কেউ কেউ মনে করল তার চোখ খোলা, কারো বা মনে হল চোখবন্ধ। কিন্তু তার প্রলাপবকুনির মধ্যে দিয়ে অসংলগ্ন যেসব শব্দ আসছিল তা সকলেই স্পষ্ট শুনতে পেল। বাইরে এসে যখন তারা জানতে চাইল হাইদর প্রকৃতই কী কথা বলছিলেন, পুরনাইয়া তখন তাদের বুঝিয়ে শান্ত হতে বলল।

পুরনাইয়া ততটা দুঃখে নয় যতটা রাগে বলল, "তোমরা তাঁর নিজস্ব নিভৃতির উপর হামলা করতে চাচ্ছ। তিনি যদি চীৎকার করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?"

লজ্জা পেয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হল, তারা স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেল যে হাইদর জীবিত, এবং এই জ্বর ও যন্ত্রণা বেশিদিন থাকবে না পুরনাইয়ার কাছ থেকে জেনে তারা খুশি হল।

পুরনাইয়া অবশ্য এ বিষয়ে খুব নিশ্চিত ছিল না। সে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। সে এক চক্রান্তের ভয় করছিল, গভীর রাত্রে আরম্ভ হয়ে যেতে পারে চক্রান্ত বলে তার মনে হচ্ছিল। আয়াজের সেই প্ল্যানের মধ্যে এমন ব্যবস্থাও ছিল যে, হাইদরের মৃত্যু যদি না ঘটে থাকে তাহলে সেজন্যেও পুরনাইয়া ও তার সহযোগীদের দায়ী করা যায়।

হাইদরের অর্থে লালিত ষাট জন ফরাসি এই হীন কাজের জন্যে মহম্মদ

আরামিন কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল, এখন তারা হাইদরের অর্থমন্ত্রী মীর সাদিককে গ্রেপ্তার করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। এই জঘন্য কাজের জন্য ৪০০০ অশ্বারোহী সেনার মধ্যে মাত্র কয়েকজনের উপর মহম্মদ আরামিন নির্ভর করতে পারছে। কিন্তু সে আশা করে প্রাথমিক সাফল্যের পর সকলেই এসে যোগ দেবে। আয়াজের আর এক সহযোগী শামসুদ্দিন আয়াজের বেতনভুক আশিজন লোক নিয়ে পুরনাইয়ার আবাসে যায়। কিন্তু ফাঁদে তারা পা দিয়ে ফেলে।

ইতিমধ্যে পুরনাইয়ার পাঠানো সেনারা মহম্মদ আরামিনকে ও ফরাসি অর্থ-গৃধ্নুদের নিরস্ত্র করে ফেলে। রক্ষীদলের ফরাসি অফিসার বুথেনো, তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে সব প্লট ফাঁস করে দেয়। অন্য দুই চাঁই—মহম্মদ আরামিন ও শামসুদ্দিন—শৃঙ্খলিত হয়, এবং শ্রীরঙ্গপতনে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেন হাইদরেরই আদেশে।

একজন বার্তাবাহী পালিয়ে যায়, সে গিয়ে আয়াজকে সাবধান করে দেয়। আয়াজ তার বেদনুর দুর্গে ফিরে যায় ও সুদ্দিনের অপেক্ষা করতে থাকে। বার্তাবাহীরা সেই দুর্গ থেকে বিশ্বঘাতকতার ও প্রতারণার খবর নিয়ে যায় ইংরেজদের ও অন্যান্যদের কাছে।

## ৪. যুদ্ধের ফলে জাত

হাইদর আলি খাঁর পুত্র ও টিপু সুলতানের ভ্রাতা আবদুল করিম পরদিন তার পিতার তাঁবুতে এসে হাজির।

শেখ আয়াজ তাকে জরুরি তলব দিয়ে এইখানে আসতে বলেছে, এবং বার্তাবহ চুপি-চুপি তাকে বলেছে, "আগামী কাল তুমি আমাদের রাজা হবে।"

বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ খাটো কিন্তু সদাচারী এই লোকটা, সে এসেছে বিনীতভাবে ব্যাপারটা জানতে।

যে চক্রান্ত চলেছে সে সম্বন্ধে কেউ তাকে কিছু বলেনি, চক্রান্ত বিকল হয়েছে তাও সে জানে না।

তার নামে কেউ রাজ্যশাসন করতে চাইলে সে তাতে সম্মতি দেবে, এ বিষয়ে তার উপর নির্ভর করা চলে, এ ব্যাপারে সে কোনো প্রশ্ন করবে না। কিন্তু এখন পুরনাইয়ার কাছে তার একটি মাত্র প্রশ্ন, "আমি কি রাজা হচ্ছি!" করিম জানতে চাইল।

"তোমার বাবা রাজা আছেন, তোমার ভাই রাজা হবেন। এই কি যথেষ্ট নয়?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" খুশিমনে উত্তর দিল করিম।

"তুমি কি রাজা হতে চাও?" মজা করে জিজ্ঞাসা করল পুরনাইয়া।

"আমাকে কি যুদ্ধে যেতে হবে?" করিম জিজ্ঞাসা করল।

"কখনো সখনো।" পুরনাইয়া বলল।

"আর যুদ্ধ চাইনে। যুদ্ধের মধ্যেই আমাব জন্ম। এটা কি যথেষ্ট নয়?"

পুরনাইয়া হেসে উত্তর দিল "নিশ্চয়। কাজে-কাজেই।"

আবদুল করিম হাইদরের তাঁবুতে গেল পিতার শয্যাপার্শ্বে বসার জন্যে, পুরনাইয়া তখন ভাবতে লাগল হাইদরের স্ত্রী ফকর-উন-নিসা কিভাবে পাল্‌কির মধ্যে করিমের জন্ম দিল যখন প্রবল লড়াই চলেছে। খবর পেয়ে হাইদর পাল্‌কির দিকে ছুটে যায়। নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে হাইদরের ভিতরে প্রবল উদাম এসে যায়, এবং অচিরেই সে হয় বিজয়ী।

করিমের উপর হাইদরের অনেক আশা ছিল। যুদ্ধের মধ্যে তার জন্ম যে যুদ্ধে হাইদর যুদ্ধকৌশলের চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে, এটাই করিমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন একটা সংকেত।

টিপু ঈশ্বরে সমর্পিত হয়েছিল—যাজকের কাজ গ্রহণের তার কথা, প্রার্থনায় ও তপস্যায় তার জীবন কাটবে এই ছিল ইচ্ছা। হাইদর ও ফকর-উন-নিসা এই সাধুসংকল্প গ্রহণ করে। করিম তার পিতার গৌরবময় পতাকা বহন করবে—এই ছিল তাদের আশা—যে আশা অচিরেই পরিণত হয় ভস্মে।

## ৫. ওরাও শোকার্ত

ক

যে ছয়জন বার্তাবহকে পুরনাইয়া পাঠায় তাদের মধ্যে সাধুরাম প্রথম টিপুর তাঁবুতে পেঁছায়। চার-দিন চার রাত্রি এবড়োখেবড়ো দীর্ঘ পথ সে পার হয়েছে। বার্তাটা কী তা সে না-জানলেও সে বুঝেছিল এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পুরনাইয়া বলেছিল যদি নিরাপদে ও শীঘ্র বার্তাটা পেঁছয় তাহলে সে পুরস্কার পাবে। সাধুরাম নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করে যে পুরস্কারের অর্ধেকটা সে দেবে সেই মন্দিরে যেখানে নিয়মিত সে প্রার্থনা করে। এখন তাকে টিপুর তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হল।

"পিতা কেমন আছেন?" পুরনাইয়ার বার্তাটি খোলার আগেই টিপু জিজ্ঞাসা করল।

"আমি যখন রওনা হই তখন তিনি বেশ অসুস্থ, কিন্তু হাকিম অল বতর তাঁর দ্রুত নিরাময় সম্বন্ধে নিশ্চিত। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

টিপু বার্তাটির সীল ভাঙল, নীরবে তা পাঠ করল। তার বুকের ভিতরে হিম প্রবাহ যেন বয়ে গেল। বার্তাটি তার কাছে পরিষ্কার। দ্বিতীয়বার আর পড়ার দরকার নেই। কিন্তু সময় বয়ে চলেছে, তার দৃষ্টি নিবন্ধ আছে ওই বার্তার দিকে। তাঁবুর ঘণ্টায় মধ্যরাত্রির নিনাদ বাজল। তার বুকের মধ্যে যে ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে তারই মধ্য থেকে টিপু ওই ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল, চিঠি থেকে চোখ তুলল।

ধীরে সে বলল, 'আমার পিতা লোকান্তরিত।"

টিপু ও সাধুরাম উভয়েই নিজের নিজের মতন করে প্রার্থনা করল।

সাধুরামকে টিপুর তাঁবুতে যারা নিয়ে এসেছে সেই আরশাদ বেগ ও ব্রাহ্মণ শিবজি সরে গেল। তারা পরে প্রার্থনা করবে সেই মৃত আত্মার জন্যে—আরশাদ মসজিদে, শিবজি মন্দিরে, অথবা তাদের তাঁবুর নিভৃতে। এখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার আছে—তাঁবুর সেনাপতিদের যুদ্ধের জন্যে নয় পশ্চাৎ-অপসারণের প্রস্তুতির জন্যে সজাগ করে দেওয়া; এবং টিপুর যাত্রার বন্দোবস্ত করা।

খ

ব্রাহ্মণ শিবজি টিপুর সেক্রেটারী ছিল। টিপু তাকে ইংরেজের বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে, সে টিপুকে ভালোবাসত। ইংরেজের শাসন কায়েম হবার সময়ে বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ লাগে শিবজির স্ত্রী তাতে মারা যায়, শিবজি তখন কাছের শহরে এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু ধার করতে গিয়েছিল। তার বন্ধুও দুর্ভিক্ষে শেষ হয়ে যায়, সেই গৃহে বন্ধুর বদলে তখন বাস করছে এক ইংরেজ লেফটেনাণ্ট। শিবজি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার ফিরতে কিছু দেরি হয়, এসে সে দেখে তার স্ত্রী ও তিন পুত্র নিখোঁজ। তার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা প্রতিবেশীরা তাকে বলে। তার ছেলেদের খাওয়াবার জন্যে এই সরল ও বেকুব মেয়েটি ইংরেজদের ক্যাম্পে গিয়েছিল তার শেষ সম্বল বিক্রী করতে। শেষ সেপাইটি যখন তাকে বলাৎকার করে তখন তার মৃত্যু হয়। নিপীড়িত শিশুদের তখন তারা ছেড়ে দেয়। পাশের বাড়ির আবদুল গফুর সে রাত্রে তাদের আশ্রয় দেয়। পরের দিন সকালে গফুর অভিযোগ পেশ করল। একজন ইংরেজ এল, প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল যে এই ব্যাপার তদন্ত করে দোষীদের সাজা দেওয়া হবে, এবং শিশুদের বাবা না-ফেরা পর্যন্ত তাদের দেখাশোনা করা হবে।

তিন বছর জোর খোঁজখবরের পর শিবজি সেই ইংরেজটির সন্ধান পেয়েছিল —সে একজন মিশনারী, নাম ফাদার উইলসন। বড় ছেলে দুটি মারা গেছে বলে শিবজিকে জানানো হয়, ছোটটিকে খ্রীষ্টান করে নেওয়া হয়। শিবজি তার এই ছেলেটি ফিরে পাবার দাবি জানাল। তাকে একটি দলিল দেখানো হল, তাতে তারই স্বাক্ষর বলে মিথ্যা সাক্ষী মানা হল। এ'তে তার তিন ছেলের তত্ত্বাবধানের ভারই কেবল দেওয়া নয়, তাদের অভিভাবকত্বও মিশনারী সোসাইটিকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং আবেদন জানানো হয়েছে যে তাদের খ্রীষ্টানরূপে মানুষ করা হোক। শিবজি তার সন্তানটিকে পাওয়ার জন্যে জোর দাবি জানানোয় তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল, এবং শিবজির মেজাজ এতে গরম হওয়ায় ফাদার উইলসনের ভৃত্যেরা তাকে মার-ধোর করে। তারা তাকে ইংরেজ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মারাত্মক রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্য নির্ধারিত জঘন্য কয়েদ-খানায় তাকে রাখা হয়। মাদ্রাজের ইংরেজরা যখন হাইদর আলির বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করে তখন পথের অবরোধ রচনায় ও অনুরূপ কাজ করার জন্যে বঙ্গদেশের কারাগার থেকে অনেক বন্দীকে পাঠানো হয়—শিবজী ছিল তাদের একজন।

টিপু যখন ইংরেজ বাহিনীকে বিতাড়িত করে দেয় তখন শিবজি মুক্তি পায়। শিবজি টিপুর অধীনে কাজ করতে চায়, এবং শেষ অবধি কাজ করে।

টিপুর সেক্রেটারি হিসেবে শিবজির কাজ ছিল টিপুর বক্তব্য টুকে নিয়ে সেই নির্দেশ যথাযোগ্য স্থানে সর্বত্র পাঠিয়ে দেওয়া। কখনো কখনো শিবজি নিজের মনেই লিখত, লিখত তাদের পুত্রদের উদ্দেশে চিঠি, যে চিঠি কখনো বিলি করা হবে না, কিন্তু নিজের মনের শূন্যতা এ'তে সে পূর্ণ করে নিত। ভোরের দিকে এই রকম চিঠি সে লিখত।

"মধ্যরাত্রে পুরনাইয়ার পাঠানো বার্তা পড়ে সুলতান বলল তার পিতার মৃত্যু ঘটেছে, তার গলার স্বর ছিল মৃদু, বলার ভঙ্গি ছিল শান্ত। রাত্রির সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি আরশাদ বেগের সঙ্গে তাঁবু ত্যাগ করলাম। সে চলল সেনাদের গতিবিধির ব্যবস্থা করতে, আমি চললাম সুলতানের প্রস্থানের বন্দোবস্ত করতে। কিছুক্ষণ পরে আমি ফিরে এসে দেখি সাধুরাম এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কুর্শিতে বসে আছে সুলতান। সাধুরামকে কাছের তাঁবুতে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমি প্রহরী-দের ডাকলাম, কিন্তু সুলতান বাধা দিয়ে বলল, 'এখানেই থাক্ ও। ভীষণ শ্রান্ত ও। ও তো আমাকে বিরক্ত করছে না। ওকে ঘুমতে দাও।' প্রহরীরা প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছে এমন সময় সুলতান বলল, 'কিন্তু তোমরা যদি সন্তর্পণে ওর পায়ের জুতো খুলে দিতে পার, দাও। ওর পোশাক ঢিলে করে দাও, ওর মাথার নীচে দাও একটা বালিশ। তাহলে ও আরামে ঘুমতে পারবে।' সুলতান এসব পর্যবেক্ষণ করে আবার মগ্ন হল তার চিন্তায়। সুলতান তখন কী ভাবছিল, বলো তো আমার প্রিয় পুত্রেরা? আমি তোমাদের যতটা ভালোবাসি ঠিক সেই রকম ভালোবাসত সে যে পিতাকে, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যেই কি শোকমগ্ন ছিল সুলতান? কিন্তু তার মুখে শোকের ছায়া আমি দেখিনি। দায়িত্বভার সম্বন্ধে তার মনে কি কোনো ভীতি এসেছিল? যেসব যুদ্ধে তাকে লিপ্ত হতে হবে, যত সব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হবে, সেইসব ভাবনায় কি বিভোর হয়েছিল সুলতান? তার মুখে আমি উদ্বেগের কোনো ছাপ দেখিনি। কিন্তু তার মুখে ও হৃদয়ের অন্তরালে আমি যা দেখতে পেয়েছি বলে আমার মনে হয়েছে, আমি তা তোমাদের বলব। সেটা হচ্ছে করুণা। হ্যাঁ, দুর্বলের জন্যে, নিরপরাধের জন্যে, অসহায়ের জন্যে করুণা—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এইসব মানুষের উপর বিদেশীরা যুদ্ধের যে যন্ত্রদানব চালিয়ে দেবে

কেবল নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্যে, ভূমি অধিকারের জন্যে, এবং ধনরত্ন অপহরণের জন্যে আরম্ভ করবে যে লুঠতরাজ। হাইদর আলির অবর্তমানে এই সুবর্ণ সুযোগ তাদের, এটা যেন তাদের কাছে ঈশ্বর প্রেরিত আশীর্বাদ—এই ভূমি পদদলিত করবে তারা, রক্তনদী বইয়ে দেবে, প্রেমিককে প্রেমিকা থেকে করবে বিচ্ছিন্ন, পিতার কাছ থেকে পুত্রকে করবে পৃথক। হ্যাঁ, আমার পুত্রেরা, সুলতান মর্মচোখে এই দৃশ্য দেখতে পেয়েছে, এই জন্যে নিজস্ব ক্ষতির জন্যে তার দুঃখ নেই, কিন্তু আমার মতন হতভাগ্যদের জন্যে তার এই বেদনা, যারা তাদের পুত্রের জন্যে হাহাকার করছে। হ্যাঁ, সে দুঃখ জানাচ্ছে তোমাদের জন্যে। ঈশ্বর তাকে…"

ব্রাহ্মণ শিবজি তার পুত্রদের কাছে লেখা অন্যান্য চিঠি যেমন অসমাপ্ত রেখেছে, এই চিঠিটাও তেমনি শেষ করতে পারল না। মাঝপথে তার চোখ ভরে এল জলে, এই বেদনার্ত হৃদয়ে সে আর লিখতে পারল না।

# ৬. তারা তেরোজন

ঠিক একই সময়ে, হাইদরের ক্যাম্প থেকে ২৮০ মাইল দূরে টিপু যখন তার পিতার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করল, হাকিম অল বতর তখন হাইদর মৃত বলে জানাল। কিংবদন্তী বলে যে পুরনাইয়া এমনই ঐশী শক্তি দেখিয়েছে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্তা সে পেঁৗছে দিয়েছে টিপুর কাছে। কিন্তু এটা কেউ লক্ষ করেনি যে, উপযুক্ত ও সংগত কারণেই চার দিন আগে পুরনাইয়া খবরটি পাঠিয়েছিল। নিয়তি এইটেই চেয়েছিল যে টিপু ও হাকিম অল বতর একই সময়ে হাইদরের মৃত্যুবার্তা পায়।

হাকিম অল বতর যখন এই মর্মন্তুদ ঘোষণাটি করে তখন হাইদরের মৃত্যু শয্যার পাশে উপস্থিত ছিল পুরনাইয়া, কৃষ্ণ রাও, শামাইয়া, আবু মহম্মদ, গোপাল নাথ ও মীর সাদিক। এরা অন্য সাতজন প্রধান অফিসারকে ডেকে আনে, ও সকলে গোপনে শপথ গ্রহণ করে।

হাকিম অল বতর তাঁবুতে বসে রইল তীক্ষ্ন নজর রেখে। তার সহকারী ডাক্তার ও শল্যবিদেরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর খোঁজ নিয়ে যেতে লাগল। হাইদরের সেনাপতিরা ও প্রধান প্রধান অফিসারেরা এমন ভাবে হাজিরা দিয়ে যেতে লাগল যেন স্বয়ং হাইদরের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে যাচ্ছে। বার্তাবাহীরা ও অন্যান্যরাও অনুরূপ ভাবে যাতায়াত করছে যেন হাইদর জীবিত ও পূর্ণ কর্তৃত্ব তার হাতে। সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, কিন্তু হাইদরের মৃত্যুর সঙ্গে যেন এর কোনো সম্পর্ক নেই, এ যেন সম্প্রতি দমন করা শেখ আয়াজের লোকেদের দ্বারা বিদ্রোহের দরুন। সেই বিদ্রোহ আবার আরম্ভ হয়ে যাবে কিনা, কে জানে। চক্রান্তকারী বিদ্রোহীরা হাইদরেব মৃত্যুর গুজব ছাড়িয়েছে, এবং পুরনাইয়া তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেছে। এ রকম গুজব যদি কেউ ছড়ায় সে জন্যে তাঁবুর সকলকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

পরদিন খুব সকালে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তায় পূর্ণ একটা বড় সিন্দুক সকলকে দেখানো হল, আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা হল যে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ কনসটানটিনোপল থেকে অটোমান খালিফ দান হিসেবে এসব পাঠিয়েছে হাইদর আলি খাঁ বাহাদুরকে। সিন্দুকটি নিয়ে গিয়ে তাতে হাইদরের দেহটি

রাখা হল, এবং তাতে যেন খালিফের উপহারসামগ্রীই আছে, সুতরাং কড়া পাহারায় তা রাখা হল, এবং এই প্রহরীদের দিয়ে তা যেন পাঠানো হচ্ছে শ্রীরঙ্গপত্তমে। ষাট মাইল দূরে কোলার, সেখানে হাইদরের পিতা ফাতা মহম্মদের কবরের পাশে রাখা হল। এখানেই তা ছিল, অবশেষে শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু যে বিশাল সমাধিভূমি তৈরি করে সেখানে তা নিয়ে যাওয়া হয়।

মণিমুক্তার সিন্দুকে হাইদরের দেহ রাখার আগে এক পবিত্র ও শান্ত উৎসব পালিত হয়, এখানে এই মৃতের উপস্থিতিতে সেনাপতিরা ও প্রধান অফিসারেরা শপথ নেয় যে তারা টিপুর অধীনে কাজ করবে। পুরনাইয়া শপথবাক্য পাঠ করায়, কৃষ্ণ রাও, শামাইয়া, গোপালনাথ, রাম মুরারি, মহাদেব ও বিশ্বনাথ প্রমুখ হিন্দু প্রধানদের। আবু মহম্মদ এর পরে মুসলিম প্রধানদের শপথবাক্য পাঠ করায়, যথা—মীর সাদিক, বদর-উজ্জমান খাঁ, মহা মীর্জা খাঁ, মহম্মদ আলি ও গাজি খাঁ।

পুরনাইয়া চারদিক চেয়ে দেখল, পুনরায় মনে-মনে গুনতে লাগল অফিসারদের। নিজেকে নিয়ে মোট তেরোজন। সে জানে খ্রীষ্টানেরা এই সংখ্যা একটু অন্য চোখে দেখে। একে-একে প্রত্যেককে সে নজর করল। লণ্ঠনের আলোয় সে দেখতে পেল ওদের মুখে অনেক ক্ষতের দাগ, এই বিশ্বস্ত লোকেরা হাইদরের হয়ে অনেক যুদ্ধে লড়াই করেছে। সে দেখতে পেল না কেবল মীর সাদিকের মুখ, দু হাতে মুখ ঢেকে সে তখন নীরবে প্রার্থনা করছে।

"না। এরা কেউ তাদের শপথ ভঙ্গ করবে না।" পুরনাইয়া চিন্তা করতে লাগল, "না, কেউ না। কেউ বিশ্বাসঘাতক হবে না।"

এই প্রার্থনাসভার পর নৈশভোজের কথা। পুরনাইয়া তা বাতিল করে দিল।

'সকলে যদি রাজি থাকো তাহলে আজ আমরা উপবাস করব, এবং আমাদের মাননীয় মৃত পুরুষের সম্মানার্থে প্রার্থনা করব।'

তার সঙ্গে সকলে একমত হল।

## খণ্ড ২

---

# মাতা, মাতা ! পিতা, পিতা !

## ৭. আমার ফুল-বালা

ক

হাইদর আলি খাঁর স্ত্রী ও টিপুর মা ফকর-উন-নিসা তখন একাকী তাঁর শয্যাকক্ষে ছিলেন। তিনি তাঁর দাসীদের ও সখীদের চলে যেতে বলে দেন। যখনই ছবি আঁকার তাঁর ইচ্ছে হত তখনই তিনি এরকম করতেন। তাঁর শয্যাকক্ষের বাইরে উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাগানে অজস্র ফুলের সমারোহ। এইসব ফুল ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠা দেখতে তিনি ভালোবাসতেন, তিনি তাঁর গণ্ড দিয়ে স্পর্শ করতেন এই ফুল, এতে লেগে থাকা ভোরের শিশির তিনি মাখতেন তাঁর কোমল গণ্ডে, তার শীতলতা অনুভব করতেন। তাঁর সাজগোজের জন্যে যেসব সুগন্ধি দ্রব্যাদি তাঁর ঘরের টেবিলে স্তূপীকৃত হয়ে থাকত, তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ করত তাঁকে এই ফুলের সৌরভ। যখনই কোনো ফুল তার সঙ্গীসাথীদের থেকে তফাতে সরে গিয়ে একাকী বিকশিত হয়ে উঠল, তখনই তিনি তাঁর স্কেচ-বই বের করে পেন্সিলে অথবা রঙে তা ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। নিঃস্ব ফুলের মেজাজ কি তাঁর নিজের মেজাজের প্রতিবিম্ব? অনেক সময় তিনি একথা ভাবতেন। অনেক সময়ে এমন ফুলের চিত্র তিনি আঁকতেন যেটা সগৌরবে তার একাকীত্ব ঘোষণা করে বিশেষ কোনো সঙ্গীর প্রার্থনা না-জানিয়ে একাই ফুটে থাকত। তাঁর অন্য আকাঙ্খিত ফুল হচ্ছে একটু চঞ্চল প্রকৃতির, সুদূরের বন্ধুর কাছে যা নাকি পাঠাচ্ছে তার মনের বার্তা। পরবর্তী আকাঙ্খিত ফুল হচ্ছে নতমস্তকে যা ফুটে থাকে একেবারে একা, যে অপরাধে তার এই নিঃসঙ্গতা তা সে জানে বলেই তার এই অবস্থা। যে মেজাজেরই হোক, ফুল তিনি ধরে রাখেন তাঁর স্কেচবইতে। ফুলের প্রতি তাঁর খুব টান।

হাইদর যখনই কোনো অভিযানে যেতেন তখন যাবার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে যেতেন ফুল—সাদা ফুল। হাইদরের ফেরার দু-একদিন আগে একজন দূত প্রাসাদে ছুটে এসে তাঁর পায়ের কাছে রাখত নানাবর্ণ ফুলের একটি তোড়া, তাঁর স্বামী তাঁর আগমনবার্তা জানাতেন এভাবে। সাদা ফুল নির্দেশ করত হাইদরের বিদায়বেলার বিষন্নতা, স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও তাদের প্রেমের পবিত্রতা,

*কিন্তু ঘরে ফেরার ও স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের আনন্দ, হাইদরের মনে হত, ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় নানাবর্ণের মিলিত ফুলেই।*

মাঝরাতে বৃহৎ এক তোড়া, সাদা সিল্কে বাঁধা, নিয়ে এল দূত। মনের খুশি নিয়ে তিনি তা খুললেন। ফুলগুলি সব সাদা—এ তো বিদায় বেলার ফুল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সারারাত তিনি ঘুমাননি। তাঁর মনে যত রকম দুশ্চিন্তা এসেছে তিনি তা প্রবল বিক্রমে দূর করার চেষ্টা করেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, তিনি একটা ভুল করেছিলেন। তাঁর স্বামী কখনো তাঁকে সাদা ফুল পাঠান নি। কোথাও যাত্রা করার সময় তিনি দিয়েছেন এমন ফুল। এবার এমন হতে পারে যে, তাঁর স্বামী স্বয়ং আহরণ করেননি ঐ ফুল, কোনো বেকুবের উপর নিশ্চয় ভার দিয়েছিলেন। সে ভুল ফুল সংগ্রহ করেছে। এটা তাঁর জানার কথা নয় যে, চিরকালের মত চোখ বোজার আগে এক আচ্ছন্ন মুহূর্তে হাইদর পুরনাইয়াকে বলেছিলেন, "ফাতিমাকে [ফকর উন-নিসা] তুমি কিছু ফুল পাঠাবেই।"

পুরনাইয়া বলেছিল, "অবশ্যই পাঠিয়ে দেব।"

"সাদা ফুল। কেবলমাত্র সাদা ফুল।" বলেছিলেন হাইদর।

ঘরের মাঝখানের টেবিলে বেশ বড় কাঁচের ফুলদানিতে ফুলগুলি তিনি সাজিয়ে রাখলেন। তিনি আঁকতে বসলেন, কিন্তু রেখাগুলি ঠিকমত আসছে না। টেবিলে রাখা অমন সুন্দর ফুলগুচ্ছ, কিন্তু আঁকতে গিয়ে সেগুলি কীরকম বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ চেহারা নিচ্ছে। তিনি আঁকা বন্ধ করলেন। তিনি প্রাসাদের অধ্যক্ষকে ডেকে পাঠালেন। হাইদরের ক্যাম্প থেকে সদ্য ফিরেছে এমন এক দূতকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যক্ষ এল। সব ঠিক আছে, দুশ্চিন্তার বিন্দু-বিসর্গ কারণ নেই। এবং টিপুর ক্যাম্পের খবর? গত রাত্রে ফিরে এসেছে দূতটি। সব ঠিক আছে। সব।

তিনি বুঝতে পারেন নি, জানতে পারেন নি যে, ঠিক মাঝরাতে, যখন তিনি ফুলের তোড়াটি খুলছিলেন তখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তাঁর স্বামী।

খ

ফকর-ন-নিসা উবসে-বসে তাঁর স্বামীর ও পুত্রের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ এই দুজনের জন্যে অপেক্ষা করে করে তাঁর কেটেছে।

যখন ত'াঁরা ত'াঁদের জয়পতাকা নিয়ে ও ধনরত্নাদি নিয়ে ফিরতেন, সংবাদ নিয়ে আসতেন ত'াঁদের যুদ্ধজয়ের ও শত্রুসেনার বিপর্যয়ের, তিনি হাজার-হাজার লোকের উম্মত্ত উল্লাসনিনাদ শুনতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি মনে-মনে গণনা করতেন তাদের যারা এ'দের সঙ্গে ঘরে ফিরে আসতে পারেনি। তিনি মনে-মনে এ'দের ঘরে-ফেরার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন এবং রণাঙ্গণে যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্যে প্রার্থনা করতেন, এবং ভাবতেন তাদের কথা যারা পতিহারা হল ও পিতৃহারা হল। তার পর ধীরে ধীরে নেমে আসত রাত্রি, হাইদর মৃদু পায়ে ঢুকতেন তাঁর শয্যাকক্ষে। হাইদরের বাহুর উপরে তিনি গা এলিয়ে দিতেন, হাইদার মৃদু হাত বুলিয়ে তাঁর শঙ্কা ও চিন্তা দূরীভূত করতেন।

হাইদরেব প্রথমা স্ত্রী শাহবাজ বেগমের কথায় তিনি হাইদরকে বিবাহ করেন। অল্পবয়সে শাহবাজকে বিবাহ কবেন হাইদর। শিরার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি শাহ মিঞা সাহেবের কন্যা হচ্ছেন শাহবাজ। শাহবাজ ছিলেন খুব হীনস্বাস্থ্যের ও প্রায়ই অসুস্থ হযে পড়তেন। তাকে দেখতে যাঁরা আসতেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ফকর-উন-নিসা, ইনি মীব মুইন-উদ-দীনের কন্যা, যিনি কিছুকাল কুড্ডাপ্পার গবর্নর ছিলেন। অন্যান্য সকলে শাহবাজ বেগমেব জন্যে দামী দামী উপহার নিয়ে আসত, ফকর-উন-নিসা আনতেন শুধু ফুল। দিন কেটে যেতে লাগল, শাহবাজ বেগম এই তরুণীটিকে ভালোবাসতে লাগলেন, এবং নিত্যই তাঁর সঙ্গলাভেব জন্যে লালায়িত হলেন। রুগ্ণ শাহবাজ এক কন্যার জন্ম দিলেন, কিন্তু এই সন্তান প্রসব কালে তিনি শোথ রোগে আক্রান্ত হলেন, যার দরুন তাঁর বাকি জীবনটা তিনি কাটান পক্ষাঘাতে। ফকর উ•-নিসা তাঁকে ফুল উপহার দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন, তাঁর কপাল মুছে দিতেন সুগন্ধ মাখা বস্ত্রে, মজার মজার চিত্র আঁকতেন তাঁর শিশুর—এসব দেখে আনন্দে হেসে উঠতেন শাহবাজ বেগম। কিন্তু ফকর-উন-নিসা চলে গেলে তাঁর বেদনা আবার বেড়ে উঠত।

চিকিৎসকের পর চিকিৎসক রায় দিলেন যে শাহবাজের এ রোগ সারবে না। হাইদর একবারও পুনর্বিবাহের কথা ভাবেননি। তিনি শাহবাজকে ভালোবাসতেন ও ভালোবাসতেন শিশুকন্যাটিকে। শয্যাশায়ী স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটাতেন। ত'াঁর হাত চেপে ধরতেন, ত'াঁর যন্ত্রণা হলেই স্ত্রীর কপালে ও ঠোঁটে চুম্বন করতেন। সারাটা সময় শাহবাজ অশেষ কষ্ট ভোগ করতেন, কিন্তু যখন ত'াঁর স্বামী কিংবা ত'াঁর বান্ধবী ফকর-উন-নিসা ত'াঁর কাছে থাকতেন তখন তেমন যন্ত্রণা ত'াঁর থাকত না। ত'াঁর শারীরিক যন্ত্রণা তো

ছিলই, তার উপর ছিল তাঁর মানসিক কষ্ট—তিনি একটি পুত্রসন্তান দিতে পারবেন না তাঁর স্বামীকে, এবং দিতে পারবেন না একজন উত্তরাধিকারী।

শাহবাজ বেগম মনে-মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এবং তাতে কিছু স্বস্তি পাচ্ছেন। একদিন বিকেলে তাঁর শয্যাকক্ষে গিয়ে হাইদর তাঁর স্ত্রীকে কিছুটা প্রসন্ন ও প্রশান্ত দেখে খুশি হলেন।

স্ত্রীর আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ দেখে হাইদর যখন তাঁর খুশি প্রকাশ করলেন তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, "আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"কী সেই সিদ্ধান্ত?" হাইদর বেশ মজা করে প্রশ্ন করলেন, "একটা নতুন আংটি নতুন পোশাক, নতুন নেকলেস?"

"না।" উত্তর দিলেন শাহবাজ, "এক নতুন স্ত্রী। আর একটি স্ত্রী তোমার প্রয়োজন।"

"একটি স্ত্রীই আমার যথেষ্ট।" উত্তর দিয়েছিলেন হাইদর।

কিন্তু শাহবাজ বললেন, "কিন্তু একটি কন্যাই তোমার যথেষ্ট নয়।"

শাহবাজ দমবার পাত্রী নন। তিনি একে-একে হাইদরের সব সংগী ও সহকারীকে ডেকে পাঠালেন, এবং ডাকলেন তাদের স্ত্রীদেরও। হাইদরের জন্যে উপযুক্ত একটি স্ত্রীর খোঁজ তারা করবে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিলেন। এর পর থেকেই হাইদরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব আসা আরম্ভ হল। ভালো ভালো বংশের সুন্দরী কন্যাদের ছবি হাইদরকে দেখানো হল। তাদের ঐশ্বর্যের ও যোগ্যতার বিবরণ দেওয়া হতে লাগল। একে-একে হাইদর সবগুলি বাতিল করে দিলেন।

শাহবাজের যখন জ্বর এল তখন তিনি হাইদরকে বিবাহের জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। তাঁর নিজের জন্যে না হলেও তাঁদের কন্যার কথা ভেবে অন্তত। ওকে দেখাশোনার জন্যে। হাইদর চিন্তা করলেন, সম্মতি দিলেন। তিনি কত প্রস্তাব পেয়েছেন তাও বললেন, এবং কি কি কারণে তিনি তাদের বাতিল করে দিয়েছেন তারও বিবরণ দিলেন, কারণ জানালেন।

অবশেষে হাইদর বললেন, "তুমিই আমার জন্যে একটি স্ত্রী বেছে দাও।"

"তুমি বিয়ে করবে আমার ফুল-বালাকে।" বললেন শাহবাজ বেগম।

# গ

হাইদরের দ্বিতীয় বিবাহের দুই বছর পরে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ফকর-উন-নিসার বাহুর উপরে মারা গেলেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী শাহবাজ বেগম। বেশ অনাগ্রহেই হাইদর এই বিয়ে করেন, কিন্তু এই দুবছরের মধ্যে তিনি ফকর-উন-নিসাকে ভাল বাসতে আরম্ভ করেন। শাহবাজ বেগমের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহ ও তাঁর প্রতি আনুগত্য লক্ষ করেন হাইদর। এই কর্কশ নির্মম ও গর্বিত সৈন্যাটির আচরণ দেখে ভয় পেতেন ফকর-উন-নিসা, কিন্তু তাঁর কাছে একাকী যখন থাকতেন হাইদর তখন তিনি অন্য মানুষ, তখন তিনি শান্ত প্রকৃতির এক প্রেমিক। হাইদর তাঁর ভয়ভীতি দূর করে দিতেন, ফুল দিতেন তাঁকে এবং দিতেন চুম্বন। প্রতিটি রাত্রি মধুযামিনীতে পরিণত হত। কিন্তু তাঁদের এত সুখও যেন শূন্যতায় পূর্ণ। হাইদর আলি তখনও পুত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত।

তাঁর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শাহবাজ বেগম তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা আরকটে সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার কাছে তীর্থদর্শনে যাবেন এবং তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন।

## ৮. তীর্থযাত্রা

সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়াকে মস্তু কালান্দার ও সচল ফকিরও বলা হত। তিনি একজন ভ্যাগাবণ্ড্। তাঁর কোনো বাড়িঘর ছিল না। যেখানে তাঁর খুশি সেখানেই তিনি ঘুমোতেন—রাস্তায়, বনে, পাহাড়ে, এবড়ো-খেবড়ো ভূমিতে, ঘাসের উপরে। গায়ে কোনো আচ্ছাদন নেই, মাথায় নেই বালিশ। কেউ তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখেনি, কখনো মন্দিরে বা মসজিদে যান না, কী তাঁর ধর্ম—তাও কেউ জানে না। আরকটে তিনি আসতেন যেমন হঠাৎ, তেমনি হঠাৎই চলে যেতেন। কেউ তাঁর পিছু নিলে তিনি পালিয়ে যেতেন। যদি তবুও কেউ পিছু না ছাড়ত তাহলে তিনি ইঁটপাটকেল ছুঁড়তেন। অনেক সময় তিনি মত্তের মতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচতেন যতক্ষণ-না অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কখনো কখনো তিনি চোখ বুজে নিজের মনেই কথা বলতেন। গাছকে সম্বোধন করে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে যেতেন। পাখিরা গাছেই বসে থাকত, কিন্তু অন্য কেউ সেখানে এলেই উড়ে পালাত পাখিরা। পথের কুকুরেরা তাঁকে ঘিরে থাকত, এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা বহু লোক তাঁকে যা খাবার দিত তিনি তা কুকুরদের মধ্যে বিলি করে দিতেন। অনেকে দিব্যি কেটে বলেছে যে, তাঁকে বনের মধ্যে তারা বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। অনেক বারই তিনি অনেকের দেওয়া অতি সুখাদ্য গ্রহণে রাজি হননি, কিন্তু খেয়েছেন গাছের পাতা। কোনো রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে এলে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো-কখনো তিনি উঠে রোগীকে আশীর্বাদ করেছেন এবং এতেই রোগ নাকি সেরে গেছে। নবাব সাদুতুল্লা খাঁ তাঁর কাছে স্বয়ং এসেছিলেন, তাঁর কন্যা প্রবল জ্বরে মরণাপন্ন, তাকে সুস্থ করে দেবার প্রার্থনা জানাতে ; তখন তাঁকে নাকি ফিরে যেতে বলা হয় এবং কন্যাটি সুস্থ হয়ে গেছে বলে জানান এই সন্ত এবং বাস্তবিকই কন্যাটি নাকি সুস্থ হয়ে যায়। আর একটা গল্প আছে—একচোখ কানা এমনি এক নৈশ প্রহরী পথের উপর ঘুমন্ত এই সন্তের গায়ে হোঁচট খায়। রাগে সন্ত তার হাতের লণ্ঠন কেড়ে নিয়ে দেয়ালে ঠুকে তা ভেঙে দেন ও প্রহরীটিকে অন্ধ বলে তিরস্কার করেন। প্রহরীটি দুঃখে

দাঁড়ায়, মস্তু কালান্দারও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তৎক্ষণাৎ প্রহরীর দ্বিতীয় চোখেরও দৃষ্টি শক্তি চলে যায়। দুচোখ অন্ধ লোকটিকে তার ছেলেরা মস্তু কালান্দারের কাছে নিয়ে যায়, তখনও তিনি গালমন্দ করেন, ও কোথায় সে যাচ্ছে দেখতে বলেন। দুই চোখে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে সে মস্তু কালান্দারের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

মস্তু কালান্দার কোনো মানুষের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারতেন না। কেবল মাত্র একটি বালককে কখনো কখনো চুপচাপ তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখা যেত। লোকে বলে, এটি তাঁর ছেলে।

নবাব সাদুতুল্লার অনুনয় বিনয়েব উত্তরে তিনি বলেছিলেন তাঁর জন্যে নবাব যে বাড়ি তৈরি করে দেবেন সেখানে তিনি বাস করবেন, এ কথা বলে একটি জায়গা দেখিয়ে বলেন তিনি যত্রতত্র বাস করবেন কিন্তু মরবেন ওই জায়গাটায়, "তা হলে আমি মারা গেলে তুমি আমার জন্যে বাড়ি তৈরি করে দিতে পার।" কয়েক মাস পরে সেই জায়গাটিতে পাওয়া গেল তাঁর মৃতদেহ। তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে নবাব ওই জায়গায় এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দেন।

নিকট থেকে অথবা দূর থেকে পুরুষনারী নির্বিশেষে সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অথবা কোনো অসুখ নিরাময়ের জন্যে ওই সমাধিবেদীতে আসে। কখনো কখনো তারা মস্তু কালান্দারের পুত্রকে দেখতে পায় যে নাকি এখন তার বাপের মতই উন্মাদ, কিন্তু রোগ-নিরাময়ের জাদু তার জানা নেই।

এই সমাধিবেদীতে হাইদর ও ফকর-উন-নিসা সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য যাত্রা করেছেন।

## ৯. প্রতিশ্রুতি

ক

বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অবশ্য নয়, হাইদর আলি নিয়মরক্ষার মতন করে টিপু মাস্তান আউলিয়ার সমাধিবেদীতে মাথা নত করলেন ও অনেক উপঢৌকন জমা দিয়ে চলে এলেন। ফকর-উন-নিসা প্রার্থনা জানাতে সেখানেই রয়ে গেলেন। প্রত্যেক দিন সকালে তিনি এসে প্রার্থনা জানাতেন সন্ধ্যা এস্তোক ও ধ্যানস্থ থাকতেন। এমনি সাতদিন। এখানকার আবহাওয়া তাঁর মনে শান্তি ও স্বস্তি আনে। বেদীটির স্থাপত্য দেখে তিনি খুশি হন, কিন্তু চারদিক পাহাড়ী ও জনশূন্য। "এখানে গাছ লাগাবার ও ফুল ফোটাবার কথা কেউ ভাবেনি কেন" ভাবতেন তিনি। দূরে অপেক্ষারত ভৃত্যদের ডেকে তিনি একথা বলেন, অল্পদিনের মধ্যেই একদল মজুর তারা সংগ্রহ করে। তিনি এই সমাধিবেদীর অছিদের ও রক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলেন, তারা এখানে উদ্যানরচনার পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করে। মাটি খোঁড়া আরম্ভ হতেই ঐ সমাধি থেকে ছুটে আসে রুক্ষ চেহারার এক লোক এবং এখানকার শান্তি নষ্ট করা হচ্ছে কেন জানতে চায়। এ হচ্ছে সেই লোকটি যাকে মস্ত্ কালান্দারের ছেলে বলে অনেকে জানে। এ'কে অছি ও রক্ষকদের সকলেই তীব্র ভাবে অপছন্দ করে বটে, কিন্তু কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। মজুরেরা যখন ফকর-উন-নিসাকে দেখাল তখন তিনি স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে জানালেন যে, এখানে ফুলের গাছ লাগানোর কথা ঠিক হয়েছে।

"কেন ?" কর্কশভাবে বলল লোকটি।

"কেন ?" পুনরুচ্চারণ করলে ফকর-উন-নিসা, "আমার মনে হয় টিপু মাস্তান আউলিয়া এতে আনন্দ পাবেন।"

লোকটি ছুটে সমাধির দিকে গেল, একটু পরেই ফিরে এল।

"না।" সে বলল, "টিপু মাস্তান আউলিয়া আনন্দ পাবেন না। কোনো স্ত্রীলোক তাঁর জন্যে কিছু করে তা তিনি চান না। যদি ফুলগাছ লাগাতে চাও তবে তোমার ছেলেকে পাঠাও।"

"কিন্তু আমার ছেলে নেই।" ফকর-উন-নিসা আমতা-আমতা করে বললেন, "সম্ভবত আমার স্বামী..."

"আমি জানি। একাধিক পুত্র তোমার হবে। এই জন্যেই তুমি এখানে এসেছ। তোমার প্রার্থনা পূরণ হয়েছে। এবার যাও।"

ফকর-উন-নিসা লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন, সে বলল, "কিন্তু পুত্র দিয়ে কী দরকার, তাদের তো মেরে ফেলা হয় যুদ্ধে।"

এ কথা অভিশাপের মত বাজল কানে।

"না। না।" ফকর-উন-নিসা উঁচুগলায় বললেন, "তারা বেঁচে থাকবে, এই আশীর্বাদ চাই।"

"তোমার প্রথম পুত্রকে ঈশ্বরের সেবায় লাগাবে?" ধীর গলায় বলল লোকটি।

"হ্যাঁ। আমি লাগাব।" শান্ত গলায় উত্তর দিলেন ফকর-উন-নিসা।

"তা হলে ফিরে যাও নিশ্চিন্ত মনে। তোমার প্রথম পুত্র হবে রাজকুমার, সুলতান, প্রজাদের মধ্যে রাজা। সে যেন ঈশ্বরের সেবক হয়, তাঁর পতাকা বহনে সক্ষম হয়। সে যেন কেবল ঈশ্বরের আদেশ পালন করে, আর কারও নয়। যাও।" লোকটার যাবতীয় বন্যভাব এখন আর নেই। সে এখন অন্য মানুষ। তার কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু তাতে আদেশ আছে এবং ফকর-উন-নিসা তাঁর সম্মুখে অপর এক জনের উপস্থিতি যেন অনুভব করছেন।

"ধন্যবাদ।" কম্পিত বক্ষে বললেন তিনি, লোকটির পরিচ্ছদ স্পর্শ করলেন মুখ দিয়ে।

তাঁর পালকিতে তিনি ফিরে এলেন এবং তিনি যখন প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তখন লোকটি তার বন্যতা ফিরে পেয়ে চীৎকার করে বলল, "তোমার ছেলে একজন সুলতান, শুনতে পাচ্ছ? টিপু এই রকম বলছেন।"

খ

ফকর-উন-নিসা ঐ ঘটনার যেসব বিবরণ দিলেন হাইদর তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলেন না। "এটুকু অবশ্য বোঝা গেল," হাইদর বললেন, "এখনো পর্যন্ত পুত্র আমাদের হয়নি বটে, কিন্তু আমরা তার নাম পেয়ে গিয়েছি। আমরা তাকে টিপু সুলতান বলে ডাকব।"

"এবং তাকে বড় করবো ঈশ্বরের সেবার ভিতর দিয়ে।" বললেন ফকর-উন-নিসা।

"বহুৎ আচ্ছা", হাইদর একটু অসংলগ্ন কথা বললেন, "চটপট তুমি আমাকে একটি পুত্র উপহার দাও, আমি যাতে তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের কাজে লাগাতে পারি।"

পালকি চলতে লাগল. পাঁচ মিনিট অন্তর হাইদর তামাশা করে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন মেকি উদ্বেগের সঙ্গে—বেদনা উঠেছে কিনা এবং প্রসব যদি আসন্ন হয়ে থাকে তবে পালকি-বেয়ারাদের ধীরে ধীরে চলতে বলবেন কিনা। মাঝেমাঝেই তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ঈশ্বরের কাজে নিয়োগের জন্যে তিনি হাইদরের পুত্র যদি কামনা করে থাকেন তাহলে ফকর-উন-নিসা তা প্রথমেই প্রসব করে দেবেন কেন। মানুষের সাহায্য বা সহায়তা ছাড়া ঈশ্বর কি স্বয়ং তা পেতে পারেন না? হাইদরের আরও আশ্চর্য লাগছিল যে, তিনি নিজেই সে সময়ে একজন জুনিয়র কম্যান্ডার মাত্র, তিনি যদি তাঁর পুত্রকে সুলতান (বা রাজা) বলে নামকরণ করেন তবে লোকে বলবে কি। "বোধহয় আমাকেও একজন রাজা হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে", বললেন হাইদর। ফকর-উন-নিসাও বেশ সরিফ মেজাজে ছিলেন, তাই হাইদরের তামাশায় বাধা দিলেন না, কিন্তু তিনি বললেন, "একজন সুলতান। কিন্তু জাগতিক বা পার্থিব অর্থে নয়, আত্মিক আদর্শে, ঈশ্বরের সেবাকার্যে—আমার পুত্রের এই হচ্ছে ভাগ্য, এই নিয়তি, এই অদৃষ্টে লেখা।"

"আমাদের পুত্র বলো।"

"হ্যাঁ। আমাদের পুত্র।" সসম্মানে মেনে নিলেন ফকর-উন-নিসা। যাত্রার অবশিষ্ট পথটুকু উভয়ের একই চিন্তার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল।

## ১০. আনন্দধ্বনি করো, একটি পুত্র জন্মেছে

ক

দেবনহালিতে, শুক্রবারে, ২০ নভেম্বর ১৭৫০, তাঁর বিবাহের পাঁচ বছর পরে, এবং সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার সমাধিতীর্থে প্রথম দর্শনের নয় মাস পরে, ফকর-উন-নিসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করল এক পুত্র।

তার নাম রাখা হল টিপু সুলতান।

খ

তাঁর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফকর-উন-নিসা পুনরায় সেই তীর্থভূমিতে গিয়েছেন, এবং সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার পুত্রের খোঁজ করেছেন।

উদ্যানের পরিচালক বেশ বিরক্তির সংগেই বললেন, "সে তাঁর ছেলে ছিল না। ছেলের মতন ভান করেছিল মাত্র। সব সময়ে মদ্যে ও নানাবিধ ওষুধে চুর হয়ে থাকত। ভগবানের দয়াই বলতে হবে, সে মারা গিয়েছে, আমরা তার অত্যাচারের হাত থেকে বেঁচেছি।"

"কোথায় কবর দেওয়া হয় তাকে?" ফকর-উন-নিসা জানতে চাইলেন।

"কবর?" পরিচালকটি চমকে ওঠার মতন করে বেশ জোরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "সে মুসলিমই ছিল না। তাকে পুড়িয়ে ফেলা হোক, এই রকম সে বলে গিয়েছিল।

"তার চিতাভস্ম রাখা হয়েছে কোথায?" জানতে চাইলেন ফকর-উন-নিসা।

খুব খুশিমনে উত্তর দিল পরিচালক. বলল, "কোথায়ও না, কোথাও না, সে বলে গিয়েছিল ছাই যেন চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, বাতাসে তা উড়ে যাবে সর্বত্র—নদীতে, সমুদ্রে, পাহাড় ডিঙিয়ে, তারকাদের কাছে, সমস্ত উদ্যানে, যাবতীয় গৃহে। সে পাগল ছিল, বদ্ধ পাগল।"

ফকর-উন-নিসা বললেন, "সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়া সম্বন্ধেও লোকে এই রকম কথাই বলত না?"

এই রকম অদ্ভুত তুলনা উভয়ের মধ্যে করায় পরিচালকটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এতে দুঃখিত হলেন ফকর-উন-নিসা, তবুও তিনি প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন, "আচ্ছা, এমন অনেকেই তার ভক্ত ছিলেন, তাঁরা ওকে সন্তের পুত্র বলেই জানত ও মানত। তারা কি তার জন্যে প্রার্থনা জানায়? তারা সব কোথায়?"

পরিচালকটি স্বীকার করল, "এমন কিছু কিছু পথভ্রষ্ট লোক অবশ্য ছিল। কিন্তু তারা ওই ভস্মের মতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে। এমন ইচ্ছাও সে প্রকাশ করে গিয়েছে যে, তার জন্যে যেন কোনো বেদী, কোনো মন্দির বা কোনো সমাধি তৈরি করা না হয়। তার জন্যে প্রার্থনা জানাতে কোনো সমাবেশ বা সভা যেন না করে ভক্তেরা। কেবল মাত্র ·" এই পর্যন্ত বলেই পরিচালক হঠাৎ থেমে গেল।

"কেবল মাত্র কী?" ফকর-উন-নিসা প্রশ্ন করলেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিচালকটি বলল, "শুধু এই মাত্র বলে গেছে যে, তাকে ভালোবাসে এমন কোনো পুরুষ বা নারী কখনো-কখনো যেন একটা দীপ জেলে দেয় আমার কথা ভেবে, আমার ভস্ম উড়ে যাবার সময় তা ওদের পথ আলোকিত করে দেবে।"

প্রতি রাত্রে ফকর-উন-নিসার শোবার ঘরে একটি দ্বীপ জ্বালা হত। টিপু সুলতান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন দীপটি জ্বলছিল। এর পরও পনেরো বছর ধরে দীপ জ্বালা হয়। তারপর আর জ্বালা হয় না। সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার ও তাঁর পুত্রের কাছে ফকর-উন-নিসা যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ভংগ করা হয়ে গেল চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণভাবে টিপুর পনেরো-তম জন্মদিনে। সে এখন যোদ্ধা হয়ে গেল, ঈশ্বরের সেবায় সে নিয়োজিত হল না।

# ১১. এস, একটি রাজত্বের ভার নাও

ক

ফকর-উন-নিসার প্রথম সন্তানটির দিকে বেশ গর্বের সঙ্গে তাকালেন হাইদর, "সুলতান বলার পক্ষে এ যে খুবই ছোট, অত্যন্তই ছোট" এই হল হাইদরের প্রথম মন্তব্য। তার পর যখন তিনি দেখলেন শিশুটি ফকর-উন-নিসার বুকের সঙ্গে বেশ ক্ষুধার্তের মত লেগে আছে, তখন বললেন, "ঈশ্বরের সেবায় লাগার পক্ষে উপযোগী বুঝি নয়, এ যে বড়ই লোভী।"

ফকর-উন নিসাকে তিনি বললেন, "ওই অপরূপ বক্ষ-দুটির প্রশংসা করার জন্যে, এখন দেখছি, আমরা দুজন।" ফকর-উন-নিসা লজ্জায় রাঙা হন, শিশুটি যেন আপত্তি জানাল, হাইদর মার্জনা চাইলেন।

"আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, বৎস", তিনি বললেন, "এ রকম রসিকতা ঈশ্বরের সেবকের সম্মুখে সাজে না।" শিশুটিকে চুম্বন করার জন্যে তিনি নত হলেন, সে তাঁর চুল ধরল, কেঁদে উঠল।

"বেশ, বেশ। আমি জানি এখন আমি অবাঞ্ছিত।" এই কথা বলে এবং ফকর-উন-নিসাকে চুম্বন করে তিনি প্রস্থান করলেন। তাঁর এই পুত্রের জন্মের জন্য মদ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করার জন্যে তিনি চলে গেলেন।

সে সময়ে হাইদর একজন জুনিয়র অফিসার, যদিও বেশ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। কয়েক বছরের মধ্যে যে গৌরবের চূড়ায় তিনি ওঠেন তখনও তা তাঁর আয়ত্তে নয়। কিন্তু বন্ধু ও সঙ্গীসাথীদের আপ্যায়নে তিনি তখনও বেশ দরাজ। তিনি যখন তাঁর পুত্রের কী নাম রাখা হয়েছে ঘোষণা করেন তখন ঠাট্টা তামাশা আরম্ভ হয়, তিনি তাতেও যোগ দেন।

"এটা কেমন হল হাইদর, তুমি এক রাজকীয় খেতাব [ সুলতান ]-ধারী একটা পুত্র উৎপাদন করে ফেললে?" একজন বলল, "কিন্তু এমন সামান্য হল তার পিতৃপরিচয় ও বংশ?"

অন্য একজন বলল, "কিন্তু ভুলো না বন্ধুরা সকলে, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজনও একটা পুত্র-উৎপাদনের জন্যে এত দীর্ঘ সময় লাগায়নি। এক

যুগেরও বেশি সময় সে এই কর্মে লেগে আছে। সুতরাং এই পরিশ্রমের ফসল রাজকীয় না হলে চলবে কেন।"

অপর একজন বলল, "খাঁটি কথা। একজন সংগীতজ্ঞ তৈরি করতে সাত মাস লাগে, একজন মুচি তৈরি করতে লাগে আট মাস, একজন ব্যবসায়ী বানাতে লাগে নয় মাস, দশ মাস লাগে একটা চোর বা হাইদরের মত আনাড়ি একজন সেপাই বানাতে! কিন্তু যাকে বলে রাজকীয়তা, তার জন্যে সময় অবশ্যই লাগবে।"

অন্য আর একজন মন্তব্য করল, "কিন্তু হাইদর খুব বেশি দিন সামান্য সেপাই হয়ে থাকবে না। সুলতানের কাছে সে দরবার করবে, অর্থাৎ পুত্রের কাছে, তাকে যেন অবিলম্বে দেওয়া হয় এক উচ্চপদ।"

"না, না, তা হয় না।" অপর-একজন বেশ নৈতিকতার ভান করল, বলল, 'পিতার কর্তব্য হচ্ছে দান করা, গ্রহণ করা নয়।"

সমস্বরে সকলে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক।" তার পর নেমে এল নীরবতা। সকলে তামাশা করেই চুপ করে গিয়েছিল।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন বলল, "পুত্রের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য, পুত্রের গৌরব যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য হাইদরকে রাজা বানাতেই হবে।"

"এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম সকলে, গ্রহণ করলাম,"—এই সকল সমস্বরে বলতে-বলতে তার মাথায় রাজমুকুট হিসেবে মদের বোতল, গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি বসাতে লাগল সকলে।

উৎসব শেষ হল। পুরনাইয়া কখনো মদ খেত না, তাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তার অবস্থা, হাইদরের সংগে সে তাঁর গৃহে গেল। হাইদরও অল্পই পান করেছেন। তাঁর গৃহে এক পুত্রের উদয় হয়েছে। এই আশ্চর্যজনক ঘটনায় তিনি অভিভূতই আছেন। শিশুটির সংগ পাবার জন্যে তিনি একেবারে স্বাভাবিক থাকতে চেয়েছেন।

পুরনাইয়া বলল, "ওই ঠাট্টাতামাশার মধ্যে কারণ একটা আছে।"

পুরনাইয়া কী বলতে চায় তা না বুঝেই হাইদর বললেন, 'ওটা নিছক তামাশাই।

'তবুও ওর মধ্যে কিছু সত্য আছে।" পুরনাইয়া আবার বলল।

"কি সেই সত্যটি?" জানতে চাইলেন হাইদর। পুরনাইয়াকে তিনি পছন্দ

করেন. কিন্তু সব বিষয় নিয়ে তার বিশ্লেষণের অভ্যাস তাঁর তেমন ভালো লাগে না।

পুরনাইয়া বলল, "সোজা কথায় সে সত্যটি হচ্ছে যে, রাজা হবার জন্যে সবাই চেষ্টা করছে। যে কোনো লোক এই পদ নিয়ে নিতে পারে। দুর্নীতি চারদিকে ছড়িয়ে গেছে, কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে, ব্যবসায়ীদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, সেনাবাহিনীর মধ্যে অশান্তি ও অতৃপ্তি, জনসাধারণের মধ্যে চাপা চাঞ্চল্য। রাজা এখন শক্তিহীন, তাঁর মন্ত্রীদ্বয় দেবরাজ ও নঞ্জরাজ দুই ভাই বটে, কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করার জন্যে উভয়ের মধ্যে চলেছে জঘন্য চক্রান্ত।"

"এই রকম অবস্থা?" স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হাইদর।

"হ্যাঁ। এই রকম। রাজা হবার পাল্লা চলেছে।" বলল পুরনাইয়া, "যে-কেউ এখন রাজমুকুট পেয়ে যেতে পারে। সেই পারে যে সাহস করে এগিয়ে আসবে।

হাইদর পুরনাইয়ার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। না, পুরনাইয়া মদ্য পান করেনি, সে প্রকৃতিস্থ আছে, হাইদর জানেন।

হাইদর একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে, তুমি মনে কর যে, আমিও বাজস্বটি পেয়ে যেতে পারি?"

"না। হাইদর। না। আমি কেবল ঐ তামাশার মধ্যেই যে সত্য আছে তার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম।" বলল পুরনাইয়া, "তুমি যখন জিজ্ঞাসাই করলে তবে আমিও বলি, যে সাহস করে ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে, তারই সম্মুখেই এই সুবর্ণসুযোগ আছে। তুমি যদি রাজা হতে না-পার, যেটা অবশ্য মস্ত উচ্চাশা—তাহলে তোমার জন্যে অনেক পথ আছে, যাকে নাকি রাজপথও বলা যায়। তুমি কমাণ্ডাণ্ট হতে পার, গভর্নর হতে পার, মন্ত্রী হতে পার। যে সর্বনাশ নিশ্চিতভাবেই আসন্ন, কে বলতে পারে, তার মধ্যেই তুমি কতটা উচ্চাসন পেয়ে যেতে পার।"

হাইদর হাসলেন। এটা একটা দিল-খোলা উচ্চহাস্য। আদর ক'রে পুরনাইয়ার পিঠে একটা চাপড় দিলেন হাইদর, তার পরেই কিছুক্ষণের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"আমি শিশু নই, পুরনাইয়া," তিনি বললেন, "আমি শুরু করি দেরিতে। আমার যখন চব্বিশ বছর বয়স তখন আমি প্রথম যুদ্ধের স্বাদ পাই। উনত্রিশ

বছর বয়সে আমি একক ভাবে সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব পাই। এখন, এই ত্রিশ বছর বয়সে আমি পেলাম একটি পুত্র—যার বয়স এখনো একদিনও পূর্ণ হয়নি।"

পুরনাইয়া বলল, "সংকটজনক যে অবস্থা আসছে তার জন্যে দরকার পরিণত-বুদ্ধির মানুষ।"

এর পরে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এদের দুজনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। এমন কথিত আছে যে, এই আলোচনার মধ্যেই বন্ধুবৎসল ও মধুরভাষী হাইদরের মনে উচ্চাশার বীজ উপ্ত হয়। এবং হাইদর তদনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

খ

তাঁর সহজভাবে জীবনযাপনের দিন গত। কোনো সংগ্রাম-সংঘর্ষে হাইদর এখন আর তৃপ্ত নন। শ্যেন দৃষ্টিতে তিনি রাজনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখতেন, শক্তিমান বন্ধুদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতেন, সামরিক কাজ করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে, যুদ্ধে যাবার জন্যে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হতেন এবং সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে থাকতেন সর্বাগ্রে।

মহীশুরের নামমাত্র শাসক তখন একজন পুতুল বিশেষ। আসল ক্ষমতা তখন দুই ভ্রাতা দেবরাজ ও নঞ্জরাজের হাতে, তাঁরা ছিলেন মন্ত্রী। এঁদের কর্মের ফলেই বলা চলে যে, হাইদর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৭৪৯ সালে দেবনহালি অবরোধে হাইদর নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, তার ফলে ৫০টি অশ্ব ও ২০০ পদাতিক বাহিনীর একক অধ্যক্ষপদ পান। এই ছিল তাঁর পদাধিকার, যেটা হচ্ছে এক সামান্য সেনাধ্যক্ষের পদ—এই সময়ে ১৭৫০ সালে টিপু জন্মগ্রহণ করেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং ইতিহাসের মধ্যে স্থান পেয়ে যান। টিপুর জন্মের কয়েক মাস পরে, হাইদরাবাদের নিজামত যুদ্ধে নঞ্জরাজ হাইদরের উপর ৩০০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্ববাহিনী পরিচালনার ভার দেন। এই যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে যায়, কিন্তু নাজির জঙ্গের কোষাগারের একটি অংশ অবরোধ করেন হাইদর। স্বর্ণবাহী তিনটি উটের একটি তিনি পাঠান নঞ্জরাজের কাছে, এতে বিশেষ প্রীত হন তিনি, এবং দুইটি পাঠান দেবনহালিতে—হাইদরের নিজের শহরে। এই লুঠের অর্থ দিয়ে হাইদর অনেক পেশাদারী

সৈনিক সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, ফরাসি দলত্যাগীদের দিয়ে তিনি তাদের ট্রেনিং দেন।

আর একটি অভিযানে—ত্রিচিনোপলিতে—হাইদর পুনরায় নিজের বিশিষ্টতার প্রমাণ দেন। নঞ্জরাজ সোনা-ভরতি উটের কথা মনে করে এবং হাইদরের আরও অনেক দক্ষতার কথা স্মরণ করে হাইদরকে ডিণ্ডিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত করলেন —এখানে কিছু কিছু বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করার জন্যে কড়া লোকের দরকার ছিল। হাইদর এবার অনেক অর্থসঞ্চয়ের, সৈন্য সংগ্রহের ও তাদের শিক্ষা দেবার এবং বন্দুকধারী সেপাইদের সংগঠনের ও অস্ত্রাগার স্থাপনের প্রভৃত সুযোগ পেলেন।

ইতিমধ্যে দুই ভ্রাতা দেবরাজ ও নঞ্জরাজের মধ্যে বিষম কলহ বেধে যায়। দেবরাজ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ধনাদির অংশ নিয়ে ভাইয়ের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। ত্রিচিনোপলির সংগ্রামে অনেক অর্থব্যয় হওয়ায় নঞ্জরাজ অর্থের একটু অনটনেই ছিলেন, তখনই আবার মারাঠা কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং সেই জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁকে শান্তি ক্রয় করে নিতে হয়। নিজামও এই সময় তাঁকে শাসাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে নঞ্জরাজ অনেক মন্দির লুণ্ঠন ক'রে ও রাজমুকুটের মণিমুক্তা দিয়ে নিজামের দাবি পূরণ করেন।

নঞ্জরাজের উপর আরও একটা প্রবল আঘাত এসে পড়ল। তাঁর নিজেরই সেনারা বিদ্রোহ করল। তাঁদের মাইনে স্বাভাবিক কারণেই বাকি পড়ে গিয়েছিল। গর্বিত নঞ্জরাজ এই অবস্থায় হাইদরকে আহ্বান জানালেন তাঁকে রক্ষা করার জন্যে।

এটা হল হাইদরের জীবনের এক বৃহৎ সুযোগ, তাঁর ভবিষ্যতের একটা সংকেত। পুরনাইয়া এরই জন্যে প্রস্তুত রেখেছিল হাইদরকে।

শ্রীরঙ্গপত্তমে রওনা হলেন তিনি এবং দেববাজকে সঙ্গে কবে নিয়ে আসবার জন্যে অনেক কৌশল করলেন। দুই ভায়ের মধ্যে এক আনন্দদায়ক পুনর্মিলন ঘটল। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা দলপতি তিনি তাদের ঘেরাও করলেন, তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দিলেন। বাকি যারা ছিল তাদের তিনি কেবল তাদের পাওনাই মিটিয়ে দিলেন না, অতিরিক্ত কিছুও তাদের দিলেন বোনাস হিসেবে। দেবরাজের কোষাগার ও নিজের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা এ কাজ তিনি করতে পারলেন। কৃতজ্ঞতায় নঞ্জরাজ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, সেনাবাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানাল এবং বিদ্রোহী সেনাদের উৎপাত থেকে মুক্ত জনগণ তাদেব ত্রাণকর্তা রূপে তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

তাঁর মর্যাদা ও তাঁর প্রভাব এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, যখন মারাঠা কর্তৃক পুনরায় আক্রমণের হুমকি এল তখন হাইদরকে করা হল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। মারাঠা সেনাদের কয়েক মাস যুদ্ধে লিপ্ত রেখে অবশেষে তাদের কাছ থেকে শান্তির শর্ত পেলেন এবং বিজয়ীর গৌরবে তিনি ফিরে এলেন শ্রীরঙ্গপত্তমে। একদিন যিনি ছিলেন অখ্যাত অজ্ঞাত এক সেপাই, তখন যাঁর পরিচয় ছিল হাইদর নায়েক, তাঁকে এখন দেওয়া হল ফাতা হাইদর বাহাদুর খেতাব। এই উৎসবে পুরনাইয়া উপস্থিত ছিল। খেতাব-দানের পালা সাঙ্গ হলে হাইদর তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলেন, বললেন, "আমাকে বলো, তোমার ইচ্ছে কি আমি পূর্ণ করিনি?"

"এটা হচ্ছে আরম্ভের আরম্ভ মাত্র।" উত্তর দিল পুরনাইয়া।

গ

নঞ্জরাজ বৃদ্ধ হয়ে আসছেন।

দুই ভায়ের মধ্যে মিটমাট হবার কিছুকাল পরেই দেবরাজ মারা যান। তাঁর ক্যানসার হয়েছিল, তিনি জানতেন বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। সংকটের সময়ে তাঁর ভাইকে পরিত্যাগ করার জন্যেই ভগবান তাঁকে শাস্তিস্বরূপ এই রোগ দিয়েছেন বলে তিনি মনে করতেন। সেইজন্যেই তাঁর ভ্রাতা নঞ্জরাজের কাছে ফিরে আসার জন্যে হাইদর অনুরোধ করতেই তিনি রাজি হয়ে যান।

যে ভাইকে তিনি এমন ভালোবাসতেন তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার জন্যে নঞ্জরাজের মনেও গভীর দুঃখ ছিল। তাঁর মনে অনেক ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল এই জন্যে যে, এমন গুজব অনেকে ছড়িয়েছে যে, তিনি তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে পুনরায় বিরোধ এড়াবার জন্যে ও তাঁর সর্বস্ব করায়ত্ত করার জন্যে তাকে বিষপ্রয়োগ করেছেন। সব সময়ই তিনি তাঁর বারবার সামরিক পরাজয়ের কথা ভাবতেন। সেই সঙ্গে তাঁরই হাতে তৈরি হাইদরের এমন বিপুল মর্যাদা দেখে তিনি রাগতে আরম্ভ করেন। এই হঠাৎ-নবাব এমনই অর্থের দাবি করে যা নাকি তাঁর পূরণ করাই কষ্ট। রাজ্য এখন শান্তিতে আছে, এখন সেনাবাহিনীর লোক ছাঁটাই করাই বিধেয়, কিন্তু হাইদর নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেই চলেছে। অবস্থা আবার শোচনীয় হতে শুরু করেছে, আবার সৈনিকদের বেতন বাকি পড়ছে। কিন্তু হাইদরকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। তিনি নিজের বেতন নেওয়া তো বন্ধ করেছেনই, তার উপর তাঁর দরিদ্র সৈনিকদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে তিনি

নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করেও দিচ্ছেন। মস্ত নবাবদের মতন তিনি তাঁর রন্ধনশালায় তৈরি অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য খাচ্ছেন না। তিনি সাধারণ রান্নাঘরে সকলের সঙ্গে সাধারণ খানা খাচ্ছেন। নঞ্জরাজের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে নঞ্জরাজ তা লক্ষ করছেন। তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও পরাজিত বলে বোধ করছেন, যে সমস্যা চারদিকে জমে উঠছে তা সমাধান করা তাঁর পক্ষে কঠিন। এক মাত্র হাইদরই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন। অন্যান্যরা তাঁকে উপহাস করে, বিদ্রূপ করে। তিনি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অবসর নেবেন ঠিক করলেন, মনের কোণে অবশ্য ক্ষীণ আশা তাঁর ছিল যে, হাইদর যখন রাজ্যের রাজস্বের বিলি ব্যবস্থা করতে অপারগ হবে, তখন তাকেই সবাই ডেকে আনবে।

নঞ্জরাজ চলে গেলেন, হাইদর তাঁর স্থান দখল করলেন। কিন্তু হাইদরের বিরুদ্ধে প্রাসাদের লোকজনের এক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হল, হাইদরেরই এক কালের বন্ধু ও সহায় এই চক্রান্তের মূলে। আচমকা এই আক্রমণে, হাইদরকে পালাতে হল। তিনি সাহায্যের জন্যে নঞ্জরাজের কাছে গেলেন। এঁরা দু' জন আলাদা হয়েছিলেন বন্ধুভাবেই, কারও প্রতি কারও কোনো বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়নি। নঞ্জরাজ জানতেন যে, তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলে তা একমাত্র হাইদরের জন্যেই হবে। তিনি এখন তাঁর প্রচুর অর্থের ভাণ্ডার হাইদরের হাতে দিলেন, এই অর্থ নঞ্জরাজ মহীশূরের অর্থাগার থেকেই হরণ করেন। এই অর্থের বলে হাইদর এক সেনাবাহিনী সংগ্রহ ও সংগঠন করেন এবং তাঁর শত্রুদের পরাজিত ও বশীভূত করতে সেখানে ফিরে যান।

যে অর্থ তিনি নঞ্জরাজের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন, তিনি তা প্রত্যর্পণ করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সমপরিমাণ অর্থও তাঁকে দেন। নিজের জন্যে তিনি গ্রহণ করেন মহীশূর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব—এর কম নয়।

# খণ্ড ৩

---

## রাজকুমার

## ১২. চল্লিশদিন

হাইদর নায়েক ও ফকর-উন-নিসার পুত্র টিপু সুলতানের বয়স হল চার সপ্তাহ।

হাইদর জিজ্ঞাসা করল, "কখন তুমি তৈরি হবে, মহাশয়া ?"

ফকর-উন-নিসা লজ্জায় রাঙা হল। টিপুর বয়স যখন এক সপ্তাহ তখন থেকে হাইদর এই প্রশ্ন প্রত্যহ করে চলেছে। একই কথা বার বার বলা সত্ত্বেও কথাটার প্রভাব ফকর-উন-নিসার উপর সমানই আছে। এ কথা প্রথম যখন হাইদর বলে তখন ফকর-উন-নিসা একটু হতভম্ব হয়ে যায়।

"কিসের জন্যে তৈরি ?" সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"কিসের জন্যে ?" হাইদরের দুই ভুরু কপালে উঠল মেকি বিস্ময় প্রকাশ করার জন্যে, বলল, "তোমার স্বামীর সঙ্গে শয্যার অংশ গ্রহণের জন্য তৈরি, যে ভালোবাসা ও তৎসহ অন্য যেসব ব্যাপার থেকে এতদিন সে বঞ্চিত হয়ে আছে, সেই হৃত সৌভাগ্য পুনরায় দেবার জন্যে তৈরি। এই প্রসঙ্গে বলি—তুমি আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ও অনেক কাম্য হয়ে উঠেছ।"

ফকর-উন-নিসার মুখ গোলাপের মত রক্তিম হল। হাইদরের হাতের উপর নিজের হাত রাখল যাতে সেই হাত ইতিউতি কিছু কিছু অনুসন্ধান থেকে বাধা পায়। হাইদর যখন প্রশ্নটা আরও জোরালো ভাবে করল তখন সে তাকে মনে করে দিল সন্তানজন্মের পর চল্লিশ দিন বিরতির রীতি তাদের বংশে আছে।

সে বলল মজা করেই, "আমি জানতাম না একজন কামুক বুড়ো মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।"

"বুড়ো মানুষ, হ্যাঁ। কামুক, না।" হাইদর উত্তর দিল। সে বক্তৃতার মতন করে বলল, "কর্তব্য, কর্তব্য। কর্তব্য কাজের জন্যে তাড়াতাড়ি হচ্ছে বড় কথা। পুরনাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলেই সে বলবে—যত তিক্তই হোক, তার কর্তব্য কাজ থেকে বিরত হওয়া কারও উচিত নয়। সেই সূত্রেই জিজ্ঞাসা করি—যতই মধুর ও যতই সুস্বাদু হোক আমার কি উচিত আমার কর্তব্য কাজ থেকে বিরত হওয়া ? হ্যাঁ, মহাশয়া, আমি বৃদ্ধ তাই আমার তাড়া। তোমার প্রথম সন্তান

ঈশ্বরে অনুরক্ত হবে, তুমি বলে থাক। আমার বুড়ো বয়সে আমাকে তবে দেখবে কে ? সুতরাং সময় নষ্ট করা আমার কি উচিত ? না। সুতরাং আমি তোমাকে মনে করে দিই যে জরুরি কর্তব্যকাজে মন আমাদের দিতেই হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের জীবনের অভ্রান্ত চরম ও প্রার্থিত আদর্শ হচ্ছে," একটু থামল হাইদর, উপযুক্ত কথা খুঁজতে লাগল তার বক্তব্যটি পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্যে, অবশেষে বলল, "প্রেমনিবেদন ও সন্তান-উৎপাদন—হ্যাঁ, সেই আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং, এসো, আর দেরি না ক'রে ত্বরা করি।"

তার কথার গুরুত্বের কিছুটা হানি হয়ে যাচ্ছিল তার হাতের চাঞ্চল্যে, ফকর-উন-নিসা, মজা করতে সর্বদাই সপ্রতিভ, প্রাণখুলে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে সে বলল, "আশ্চর্য নয়, তোমার সৈন্যেরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেয় আবার বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে। এমন প্রাণহরণকরা বক্তৃতার এই তো মহিমা।"

"কেউ না, কেউ না।" বলে হাইদর একটু থামল, কোমল গলায় বলল, "তাহলে আজ রাত্রিই হচ্ছে আমাদের মধুযামিনী।"

"প্রিয় স্বামী আমার, চল্লিশটা দিন পার হোক," অনুনয় করার মতন করে সে বলল, "তুমি যা বললে তাতে আমারও আগ্রহ আছে। কী বললে তুমি ? প্রেম-নিবেদন, সন্তান-উৎপাদন—ঠিক কর্তব্যের খাতিরেই, যদি তাতে তুমি খুশি হও।"

হাইদর বলে উঠল, "চল্লিশটা দিন ? তুমি জান বুড়োমানুষের কাছে এটা কত লম্বা সময়।"

"হাইদর নায়েক", স্বামীকে তার সরকারী নামে সম্বোধন করে সে বলল, "তোমাকে বুড়ো বলে থাকলে সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি তরুণদেরও দেখেছি। তাঁদের কেউই এত সুপুরুষ ও এত বলিষ্ঠ নয় আমার স্বামীর মতন।"

"কোথায় দেখেছ জানতে পারি কি ?" একটু ঈর্ষার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল হাইদর, "কোথায় দেখেছ তরুণদের ?"

"চুপ কর। চুপ কর। এখানে-সেখানে সর্বত্র। জানলা দিয়ে কুচকাওয়াজ দেখি, ঘোড়সওয়ার দেখি, আর দেখি তারা যখন তোমাকে কোনো সরাইখানার গণ্ডগোল থেকে তুলে নিয়ে আসে।"

"আমাকেও তবে বলতে দাও, মহাশয়া। আমিও অনেক তরুণী দেখেছি। আমি শপথ করে বলতে পারি তাদের কেউই আমার পুত্রের এই জননীর মতন এমন সুন্দরী নয়।"

ফকর-উন-নিসা বলল, "তুমি যে কাঁচ মেয়ে দেখেছ এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমাদের পুত্রের জন্মের পর থেকে তুমি ফিরতে বেশি রাত্রি কর, আমাকে বলা হয় তুমি পুরনাইয়ার কাছে গিয়েছ। তুমি তার কাছে নিশ্চয় দুধ খেতে যাও না। শুনেছি সে মদ্যপান করে না।"

"তুমি ঠিকই শুনেছ। সে মদ খায় না বটে, কিন্তু ঘরে রাখে। বন্ধুদের দেয়। এর পর আমি তাকে দুধ দিতে বলব। এ'তে আমি আরও তরুণ ও আরও বলিষ্ঠ হব বলে তুমি মনে কর?"

ফকব-উন-নিসা এর উত্তর দিতে চাইল না, কিন্তু তার বদলে জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের ঘরের মদ থেকে পুরনাইয়ার মদ বেশি উপাদেয়, এটা কেমন কথা? সেখানে অতিরিক্ত কিছু থাকা সম্ভব—কিছু গান কিছু সঙ্গ?"

"সেখানে সংগও আছে, সঙ্গীতও আছে। পুরনাইয়ার স্ত্রী অসুস্থ, তার এক চোখ ট্যারা। সে আছে সেখানে। তার ছোট ছেলে সিতার অভ্যাস করে।" হাইদর বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলল, "তুমি কি মনে কর যে, আমি সেখানে চরিত্রভ্রষ্ট হতে পারি?"

"তুমি রোজ পুরনাইয়ার ওখানে যাও কেন, অত সময় কাটাও কেন?" এই ছিল ফকর-উন নিসার সোজা প্রশ্ন।

"এতে রক্তমাংসের গন্ধ নেই।"

"কী আছে তবে?"

হাইদর বলল, "রাজনীতি।"

"রাজনীতি?" ফকর-উন-নিসা বলল, "ও জিনিসের মানে কী?"

"ঠিক ধরেছ আমাকে," হাইদর বলল, "এর ঠিক ব্যাখ্যা পেতে হলে তোমার জিজ্ঞাসা করতে হবে পুরনাইয়াকে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে রাজনীতি হচ্ছে নিজের কাজ গুছানো; সুবর্ণসুযোগের পথ আবিষ্কারই হচ্ছে এই কাজ। তোমার সহচরদের থেকে এগিয়ে যাওয়া, নিজেকে প্রাধান্য দেবার জন্যে কৌশল খাটানো, যাতে তোমার সমতুল্য যারা, যারা তোমার থেকে অনেক উন্নত, তারাও তোমাকে তাদের নেতা বলে মানে—সর্বদা স্বেচ্ছায় অবশ্য নয়, ভয়ে। তোমার গুণের জয়ঢাক বাজানো, তোমার দোষের কথা চাপা দেওয়া, যাতে তুমি সৎ স্বার্থত্যাগী সদাচারী বলে স্বীকৃত হও, শত্রুরা যাতে বাড়তে না-পারে সেজন্যে তাদের দিকে নজর রাখা, বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি রাখা যাতে তারা তোমাকে ছেড়ে না যায়, তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে যারা কাজ করে তাদের দুর্বলতা, তাদের শক্তি,

এমনকি তাদের যাবতীয় গোপন খবরও নখদর্পণে রাখা। তোমার বিরোধীদের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করা, তোমার অনুগতদের মধ্যেও আরো বেশি করে ফারাক রচনা ; প্রাচুর্যের সময় দুর্দশার অবস্থা রচনা, কোষাগারে যখন অর্থাদি রাখার জায়গা পাচ্ছ না তখন দেউলিয়া হয়ে যাবার ভণ্গি করা ; সামরিক বাহিনীর লোকলস্কর উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করা, যুদ্ধকৌশল জানা, যোগাযোগ, ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা…"

"প্রেমপ্রণয় কিছু নয় ?" বাধা দিল ফকর-উন-নিসা।

"না।" উত্তর দিল হাইদর, "সে কাজের জন্যে পুরনাইয়ার গৃহ যথেষ্ট নয়। সেজন্যে আমাকে আসতে হবে তোমার শোবার ঘরে।"

"তোমাকে স্বাগত জানাই, হে প্রভু আমার, যখন অবশ্য চল্লিশ দিন গত হবে।" একটু হেসে বলল ফকর-উন-নিসা।

## ১৩. ষাট দিন

"আমি এর মধ্যে ঐশ্বরিক কোনো দীপ্তিই দেখছিনে।" টিপুর দিকে চেয়ে বলল হাইদর, টিপুর বয়স তখন ষাট দিন. "কিন্তু হাসে বড় মিষ্টি, তাই না ?"

গর্বিত মাতার হাসি তার মুখে চেয়ে রইল সে পুত্রের দিকে, হাইদর তার পুত্রের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে অনেক মুখভঙ্গি করতে লাগল। তারপর ছেলেকে সে কোলে নিল।

"শুনছ ?" হাইদর জিজ্ঞাসা করল, "একে ধর্মীয় ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করেছ ?"

ফকর-উন-নিসা একটু হেসে বলল, "সবুর কর। এখন, এই মুহূর্তে আমি ওকে স্বাস্থ্যবিধি শেখাচ্ছি।"

"ও কথা বোলো না।" হাইদর আপত্তি জানিয়ে উঠল, "ঈশ্বরের সেবকও সাধাবণ মানুষের দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ পায়নি ?"

ফকর-উন-নিসা উত্তর দিল না. টিপু দিল, কেননা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠল হাইদর, "সেরেছে, সেরেছে।"

ফকর-উন-নিসা চমকে তাকাল। হাইদর বলল, "পরিতাপের সঙ্গে আমি এক্ষুনি জানতে পারলাম যে. ঈশ্বরের সেবকেরাও মানুষেরই মত,মানবিক দুর্বলতা এদেরও আছে। আমার সবচেয়ে ভালো পোশাকটা মাটি হয়ে গেল।"

যে-কোনো প্রথম সন্তানেব মতই টিপুকে মানুষ করা হচ্ছিল. আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। যদি পার্থক্য কিছু থেকে থাকে তাহলে অতি সূক্ষ্ম এবং অবচেতন মনের প্রভাব, এবং তা চোখে পড়ে না। বিশেষ করে ফকর-উন-নিসা ও কখনো কখনো হাইদর শিশুকে নিজের নিজের মতন করে আদর করত। টিপু ঘুমিয়ে থাকলে ফকর-উন-নিসা তার আপাদমস্তক চুমো খেত ব্যগ্র ও ব্যাকুলভাবে। তাকে বুকে চেপে ধরে, ঠোঁটে চুমো খেয়ে আদর করত ফকর-উন-নিসা, কিন্তু বাচ্চাটি যখন জেগে থাকত তখন তার চুমো হত হালকা ও আলতো, গালে বা কপালে একটু আদরের ছোঁয়া, এতই আলগোছে যেন মনে হত এজন্যে শিশুটির অনুমতি প্রার্থনা করছে তার মা। তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল

হয়ে আছে যে, তার শিশু ঈশ্বরের সেবক রূপেই নির্ধারিত হয়ে আছে। সাধু সন্তের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, তার মর্মচোখে সে দেখতে পায় যে, তার ছেলেকে ঈশ্বর নির্বাচন করে রেখেছেন। এই জন্যে, এই শিশুর প্রতি তার যে সম্মান ও শ্রদ্ধা মনে মনে আছে তার জন্য সে বিস্মিত নয়। কিন্তু যখন শিশুটি ঘুমাত, তখন সে উত্তপ্ত চুম্বন দিয়ে মনের পিপাসা মেটাত, দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরত।

হাইদরের মনেও শিশু একটি বিস্ময় ছিল, কিন্তু তার মনের ভাব সে চাপা দিত তামাশা করে। হাইদর ও ফকর-উন-নিসা শুতো একটা মস্ত বিছানায়। অনেক সময় ফকর-উন-নিসা শিশুটির বিছানা থেকে তাকে নিয়ে আসত নিজেদের শয্যায়। হাইদর ধীরে ধীরে তার গায়ের বাহুবেষ্টন থেকে শিশুটিকে পৃথক করে একবার শিশুকে একবার তার মাতাকে অবিরত চুম্বন করে যেত। টিপু জেগে যাচ্ছে বলে মনে হলেই বিছানার কিনারে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ত, যেন টিপুকে দেখাতে চায় যে সে চুপচাপ ঘুমাচ্ছে ও কাউকে কোনো রকম বিরক্ত করে নি, না তাকে, না তার মাকে। টিপু জেগে যায়, তার মায়ের গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, এবং গড়িয়ে চলে আসে তার বাবার কাছে, তার ছোট ছোট হাত হাইদরের ভুরু ও মাথার লম্বা চুল স্পর্শ করে, যা নাকি শিশুটির খুব পছন্দ, যা তাকে অনেক সময় আকর্ষণ করে। হাইদর তখন নালিশ জানাবার ভান করে বলে ওঠে, "আমার পূর্বপুরুষদের আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তবে এসো, আমাকে বাঁচাও, কেননা আমি হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি, আমার পবিত্র পুত্রটি আমার চুলের মুঠি ধরেছে।"

এই প্রচণ্ড গরমে, অন্যান্য শিশু যদিও উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ থাকে, কিন্তু ফকর-উন-নিসা টিপুকে পুরো জামা পরিয়ে রাখে।

হাইদর অনেক সময় অনুযোগ জানায় যে, "লোকে সন্দেহ করবে যে, আমাদের এই ক্ষুদে শিশুটির কিছু হয়তো প্রকৃতই অতি ক্ষুদ্র, তা না হলে তার আপাদ-মস্তক সর্বদা ঢেকে রাখা হয় কেন।"

যখন কোনো প্রতিবেশী বা আত্মীস্বজন কখনো টিপুর অতিরিক্ত পোশাক সম্বন্ধে মন্তব্য করে তখন হাইদরই বলে আমাদের ছেলেটির গায়ের চামড়া এতই স্পর্শকাতর যে, মশার কামড় সহ্য করতে পারে না। এই কারণ শুনে সবাই বোঝে ও তারিফ করে।

হাইদরের একটু একটু অবশ্য মনে হয় যে ফকর-উন-নিসা অনেক ফকির

দেখেছে যারা গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়ায়, তাদের পরনে নেংটি ছাড়া কিছুই নেই। হয়তো ফকর-উন-নিসা চায় না যে তার পুত্র ফকির হয়ে গেলেও যেন এভাবে জীবন যাপন করে। কিংবা, টিপুর এই ধরনের ভবিষ্যৎ সে একেবারেই চায় না। হাইদর এ বিষয়ে নিশ্চিত নয়। এসব ব্যাপার নিয়ে ফকর-উন-নিসার সঙ্গে সে আলোচনাও করেনি।

টিপুর যখন এক বছর বয়স হল, তখন সে বুঝতে পারল যে, সে জেগে থাকলে তার বাবা-মা তাকে খোলা-মেলা ভাবে তেমন আদর করে না, কিন্তু চোখ বুজে থাকলে তাকে চুমো খায়, আদর করে।

ভালোবাসা পেতে শিশুর আগ্রহ বিশ্বের যাবতীয় লালসাকে হার মানায়। নিজের বোধ দিয়েই সে বুঝতে পারে এ অবস্থায় কী তার করণীয়। সে ঘুমের ভান করে, এই সুযোগে সে তার বাবা-মায়ের প্রবল ভালোবাসার উত্তাপ অনুভব করে থাকে।

তার উত্তরজীবনে টিপু একটু পৃথক থাকতে ও একটু দূরে থাকতে চাইত, তার মনের মধ্যে কোনো বাঁধ বা বাধা অবশ্য ছিল না। সে সঙ্গী ও স্নেহ পাবার জন্যে লালায়িত ছিল, কিন্তু কখনো কখনো সে তাব মন থেকে সেই অবস্থা ঝেড়ে ফেলতে পাবত না, যা নাকি তার জীবনের প্রথম আমলে তার জীবনের সংগে লেগে ছিল। তাব পরবর্তী জীবনে সেই সৌজন্যবোধ ও শালীনতা ত্যাগ করতে পারেনি, তাব পোশাক পরিচ্ছদে তার বাবা-মা তাকে যা দিয়ে আবৃত রেখেছিল। তাব অন্তরংগ আপনজনও তার মুখ হাত ও পা ছাড়া শরীরের কোনো অংগ কখনো অনাবৃত দেখেনি। এমনি পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত থাকত সে।

## ১৪. তিন বছর

তিন বছর কেটে গেছে। ফকর-উন-নিসা ও হাইদর উভয়েই দ্বিতীয় পুত্র লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

"শোনো, বলি, তুমি যদি আমার কাছে কথা না-রাখ," হাইদর সতর্ক করে দিয়ে বলল, "তাহলে ঈশ্বরের কাছে দেওয়া কথাও রাখতে পারবে না। আমাদের ক্ষুদে সুলতান তাহলে ঈশ্বরের সেবাকাজে নিযুক্ত নাও হতে পারে। এ কথাটি মনে রেখো।"

"ধৈর্য ধর, প্রভু! আর একটি পুত্র হবে।" ফকর-উন-নিসা উত্তর দিল।

"ওই তীর্থে [সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার] কি স্পষ্ট ভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি পেয়েছ?" জিজ্ঞাসা করল হাইদর।

"তুমি জান, প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্ট ছিল।"

"ঠিক কি কি কথা তিনি ব্যবহার করেছিলেন?" হাইদর জানতে চাইল।

"নিজেকে অত চিন্তিত ও বিব্রত কোরো না। বিশ্বাস রাখ।"

"এবং, ধরো, তিনি তোমাকে ভুল বুঝিয়েছেন।"

"তাঁর বদনাম করো না। আমি যেমন বিশ্বাস নিয়ে আছি তেমনি থাক।" বলল ফকর-উন-নিসা।

## ১৫. চতুর্থ বছর

ক

টিপুর বয়স যখন চার তখন হাইদর একদিন জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক কী ভাবে ও কখন ঈশ্বরের সেবাকাজের জন্য আমরা টিপুকে পাঠাব ?"

ফকর উন-নিসা জবাব দিলেন, "ঈশ্বরই তা জানেন।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আমিও একটু জানতে চাই।" হাইদর বলল, "ঈশ্বরের কাছে কি কোনো দূত পাঠাতে হবে ? তা যদি হয় তবে তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে সে কথা আমাকে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় বলে দেবে। কিংবা, এমন কি হবে যে, বেহেস্তু থেকে নেমে আসবে রথ, সংগে থাকবে চারণেরা, সংগে থাকবে ললনারা—তারা নিয়ে যাবে আমাদের পুত্রকে ?"

ফকর-উন-নিসা একটু হেসে বলল, "তেমন মনে হয় না। কিন্তু তেমন রথ যদি আসে, আমার আশঙ্কা, তাহলে তুমিই আমাদের ছেড়ে যাবে।"

"আহা! তুমি সতিাই তাই মনে কর নাকি ?' আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাইদর বলল, 'স্বর্গের ওই ললনারা একবার যদি এই স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন তোমার স্বামীটিকে দেখে, তাহলে তারা তাকে নিয়ে যাবার জন্যেই জুলুম করবে।"

ফকর-উন-নিসা বলল, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ নেই।"

হাইদর তার মন্তব্য সমর্থন করে বলল, "হয়তো তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই—আমি যাব না। তারা যদি আমার এই সুশ্রী ও সুমিষ্ট স্ত্রী থেকে রূপসী হয় তা হলে হয়তো আমার একটু প্রলোভন হবে। কিন্তু আমি জানি, তারা তা নয়। সত্যি কথা বলতে কী—আমার মনে খুবই সন্দেহ আছে যে, স্বর্গের তারা ঠিক তেমন রূপবতী নয়। স্বর্গই বলো আর বেহেস্তই বলো. সেখানেও কিছু ঘাটতি ও কিছু কমতি আছে।"

নিজেদের কথার আসল তাৎপর্য ছেড়ে দিয়ে ফকর-উন-নিসা বলল, "স্বর্গে ঘাটতি ?"

"নিশ্চয়।" হাইদর বলল, "সেখানে যদি প্রাচুর্যই থাকবে, তবে তাঁর সেবার জন্যে আমাদের পুত্রটির উপর এই দাবি কেন। তাঁর নিজের এলাকা থেকেই তিনি এ কাজের জন্য উপযুক্ত সেবক সংগ্রহ করতে পারতেন।"

"সবই বুঝলাম", ফকর-উন-নিসা একটু বিচলিত ও বিব্রত হয়ে বললেন, "তুমি তামাশা করছ, তাও জানি। কিন্তু তবুও বলি—তুমি খোদার উপর এখন অশ্রদ্ধা দেখিও না। ঈশ্বরের এলাকা কতটা আমরা কি তার সীমা টানতে পারি?"

'তুমি ঠিক বলেছ।" চট করে স্বীকার করে নিল হাইদর, "আমরা চটুল রসিকতা দিয়ে সময় নষ্ট করছি। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে : আমরা আমাদের পুত্রের নির্ধারিত অদৃষ্টের জন্যে তাকে কী ভাবে প্রস্তুত করব।"

"আমিও জানিনে।" ফকর-উন-নিসা কথা খুঁজতে লাগল, তারপর বলল, "কিন্তু প্রথমেই তাকে শিখতে হবে লেখা-পড়া। সে শুরু অবশ্য করেছে।"

"খুব খাঁটি কথা।" হাইদর বলল, "অশিক্ষিত হাইদর নায়েক ইতিমধ্যে ঈর্ষার জ্বালা বোধ করতে আরম্ভ করেছে এই কথা ভেবে যে, তার পুত্র সুশিক্ষিত হবার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। তার শিক্ষক বলেছেন, সে নাকি উত্তম হাতের লেখায় বেশ দক্ষতা দেখাচ্ছে। আর চাই কী?"

"তার জন্যে আমাদের একজন ধর্মশিক্ষক চাই।" ফকর-উন-নিসা বলল, "বেশ নাম করা কেউ, এমন কেউ যে নাকি মৌলভি ওবেদুল্লা বা আলি হুসাইনি বা মির্জা শ্যামস অথবা আবদুল গফুরের মতন।"

"কেবল মুসলিম?" হাইদর প্রশ্ন করল, "তুমি কি কেবল ওকে ইসলাম ধর্মই শেখাতে চাও?"

"তাছাড়া, আর কী?" জানতে চাইল ফকর-উন-নিসা।

হাইদর বলল, "এই মুসলিম রাজ্যে সব সময়ই অধিক সংখ্যক হিন্দু থাকবে। ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হতে হলে, আমার মনে হয়, উভয় সম্প্রদায়ের কাজ করতে হবে। শুধু তা কেন, সব ধর্মের লোকেরই সেবা চাই।"

"কিন্তু অনেক ধর্মের শিক্ষা দিলে কি তার মনের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ দেখা দেবে না?" ফকর-উন-নিসা জানতে চাইল।

"ধর্মে ধর্মে কোনো বিরোধ নেই," হাইদর বলল, "ধর্মনিষ্ঠ মানুষেরাই মাঝেমাঝে ঝগড়া করে. ধর্মে ধর্মে কখনো বিবাদ নেই।"

"তাহলে সব ধর্মকে ও সব মানুষকে সমান ভাবে সেবা ক'রে সে হোক ঈশ্বরের সেবক। তুমি তার জন্যে শিক্ষক নির্বাচন কর।"

"তুমি যাঁর নাম করেছ, সেই মৌলভি ওবেদুল্লাই হবেন উপযুক্ত লোক।" হাইদর বলল, "অন্য একজনের কথা আমার মনে হচ্ছে, তিনি হলেন গোবর্ধন পণ্ডিত। এঁর সম্বন্ধে পুরনাইয়া প্রচুর প্রশংসা করে।"

"ও, তাহলে তুমিও এ বিষয়ে চিন্তা করছিলে ?" আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ফকর-উন-নিসা।

"অবশ্যই। আমি আসলে এক চিন্তাপ্রাণ ব্যক্তি, যদিও বেশির ভাগ লোক মনে করে আমি কেবল কর্মপ্রাণ।" সগর্বে ঘোষণা করল হাইদর।

খ

"আমরা তো ধর্মীয় শিক্ষার কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম।" হাইদর বলল, "অন্যান্য বিষয়ের কী হবে ?"

"যেমন—" ফকর-উন-নিসা জিজ্ঞাসা করল।

"যেমন, ধরো ঘোড়ার চড়া।" উত্তর দিল হাইদর।

"ঘোড়ায় ?" ফকর-উন-নিসা প্রশ্ন করল, "কেন, ঘোড়সওয়ারী শেখার তার দরকার কী ?"

হাইদর একটু রূঢ় ভাবেই বলল, "তুমি কি ভেবে দেখেছ ওই দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো ? খালি পায়ে কত জনের কাছে গিয়ে সে ঈশ্বরের বার্তা পেঁছে দিতে পারবে, তার চেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে কি তারও অনেক বেশি লোকের কাছে পেঁছতে পারবে না ?"

"কিন্তু কোনো ধর্মযাজককে আমি ঘোড়ার পিঠে দেখিনি।" আপত্তি জানাল ফকর উন নিসা।

"অতীতে যা দেখনি ভবিষ্যৎ তোমাকে তা দেখাবে—এটুকু আশা নাহয় আমরা করলাম।" বলল হাইদর।

"বেশ। তুমি যদি এটা প্রয়োজন মনে কর, তবে সে শিখুক ঘোড়ায় চড়া।"

কিন্তু হাইদর বলল, "আর, অন্যান্য ব্যাপার। যেমন তীরধনুক চালনা, অস্ত্র চালনা, লড়াই করা, লক্ষ্যভেদ, সামরিক জ্ঞান ?"

"হাইদর নায়েক !" বলে উঠল ফকর-উন নিসা, "তুমি কি আমাকে বোকা বানাচ্ছ ? ধর্মযাজকেরা কখনো সামরিক শিক্ষা নেয় না, এসব তাদের দরকার হয় না।"

"এই জন্যেই পৃথিবীতে ধর্মপ্রাণ মানুষের সংখ্যা এত কমে এসেছে। তারা নিজেদের রক্ষা করতে শেখেনি।" হাইদর বলল।

বিচলিত হয়েছে ফকর উন নিসা, বলল, "কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার তার শেখার দরকার কি ! সে হচ্ছে ঈশ্বরের সেপাই, আর কারো নয়, কিংবা তুমি কি ভুলে গিয়েছ এসব কথা ?"

"না।" হাইদর বলল, "আমি ভুলিনি। কিন্তু তোমাকে দুটো কথা মনে করে দিই—প্রথমত, আমরা হয়তো ভুলে যাইনি কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন, এবং তাঁর সেবার কাজ থেকে আমাদের পুত্রটি বাতিল হয়ে যেতে পারে; দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর হয়তো তাঁর কাছে ব্যর্থ না হতে পারেন, কিন্তু তুমি নিজে বিফল হতে পার।"

"আমি বিফল হব? কী ক'রে?" ফকর উন নিসা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

"কী করে?" একটু হাসল হাইদর, বলল "তুমি আমাদের দ্বিতীয় পুত্রটি দিতে না পার। সে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পুত্রটিকে কারও কাছে সমর্পণ করছিনে, এমনকি সর্বশক্তিমানকেও না।"

"হাইদর নায়েক," বেশ মোলায়েম গলায় বলল ফকর-উন-নিসা, কিন্তু তার কথাগুলো তার কণ্ঠস্বরের মত মোলায়েম নয়, সে বলল, "আমি লক্ষ্য করে চলেছি তুমি ক্রমেই কুচিন্তায় বিভোর হচ্ছ। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে, ঈশ্বর আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমাকে—যাই ঘটুক-না কেন, দ্বিতীয় পুত্র আমাদের হবে।"

"সুন্দর বলেছ।" দুই হাতে তালি বাজিয়ে হাইদর বলল, "বিশ্বাস কর, এই কথা তোমার মুখে শোনার জন্যেই এই আলোচনা আরম্ভ করি।"

হাইদর ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। তার দিকে নিক্ষিপ্ত বালিশটি তার গায়ে লাগল না, হাইদর হাসল, বলল, "নিশানা ঠিক না-হলে কারোই চলে না, সে সৈনিকই হোক, ধর্মযাজকই হোক, কিংবা হোক সামান্য মহিলা।"

## ১৬. করিম ভাই

ক

ফকর উন-নিসা ও টিপুকে ডিণ্ডিগুলে নিয়ে যাচ্ছিল হাইদর, এইখানেই সে ফৌজদার রূপে বহাল হয়েছে। তার এই মস্ত পদোন্নতিটি ঘটেছে নিজামতের লড়াইয়ে তার বিপুল শৌর্যের, এবং ত্রিচিনোপলি অভিযানে ও অন্যান্য কঠোর সংগ্রামে তার বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ। একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে সে এখন দক্ষিণ-পূর্বের সেই অঞ্চলে চলেছে যেখানে বিশৃঙ্খল ও বিরোধী প্রকৃতির লোকেদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার জন্যে কড়া মানুষ দরকার।

ফকর-উন-নিসা তখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

হাইদরের খুশির পেয়ালা তখন কানায়-কানায় পূর্ণ। তার পুত্র টিপুর বয়স পাঁচ হতে চলল। টিপুর জন্মের পরে এই পাঁচ বছরে সম্মান অর্থ পদাধিকার ও খ্যাতি হাইদরকে অভিভূত করেছে। এখন সে দ্বিতীয় পুত্রের আশায় আশান্বিত।

খ

ডিণ্ডিগুলের উপকণ্ঠে হাইদর ও তার সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণের জন্যে ওঁৎ পেতে শত্রুরা অপেক্ষা করছিল। সেনাবাহিনীর অনেক আগে-আগে যাচ্ছিল হাইদর ও তার ত্রিশজন সঙ্গী। পিছনে ছিল ফকর-উন নিসা, তার পরিচারিকারা ও টিপু। টিপুর পালকির পাশে-পাশে চলছিল একটা টাট্টু ঘোড়া, পালকির মধ্যে তার একঘেয়ে লাগলে যাতে সে সেই ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারে; কিন্তু তারা এখন পাহাড়ি এলাকায় আছে বলে হাইদর এখন টিপুকে ঘোড়ায় চাপতে বারণ করেছে। এক ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে জানাল যে ঘোড়ায় চড়ার জন্যে টিপু খুব আব্দার করছে, সেজন্যে তার বাবার অনুমতি চায়। হাইদর অনুমতি দিল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, ফকর-উন নিসা অনুরোধ করে পাঠাল যে, হাইদর যেন অন্যদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করতে যাওয়ার আগে তার এই ছেলেটিকে শৃঙ্খলা শিখিয়ে যায়।

হাইদর বলল, "বেশ, আমি ঐ বেয়াড়া ছেলেকে আমার ঘোড়ার পিঠেই নেব।" এই বলে ঘোড়া দাবড়ে সে পালকিটির দিকে গেল। সেই মুহূর্তেই বলতে গেলে, যে সরু পথ দিয়ে তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী যাচ্ছিল, পাহাড়ে লুকায়িত শত্রুরা শেকল দিয়ে ঝোলানো বড় বড় পাথর তাদের উপর ছুড়ল। পাশের পাহাড় থেকে তখনই গোলাগুলি ছুড়ল। একটা ভয়ংকর লড়াই হল। হাইদরের সংগী ত্রিশজনের মধ্যে আঠাশজনই সংগ্রামলিপ্ত হবার আগেই খতম হয়ে গেল। হাইদরের দশাও ওদের মতই হত, কিন্তু তার ছেলের আব্দার সামাল দেবার জন্যে সে পিছনে পালকির দিকে যাওয়ায় রক্ষা পেয়ে গেল। তার বাহিনীর আরও অনেকেই মারা যায়, কিন্তু সে অনাহত থেকে যায়, এবং তার বাহিনীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে জোর লড়াই করে, শত্রুরা তখন চম্পট দেয়—ফেলে রেখে যায় তাদের মৃত ও আহতদের।

হাইদর আলি ও ফকর উন-নিসার দ্বিতীয় ও শেষ পুত্র, আবদুল করিম, ওই যুদ্ধ চলা কালে ওই পালকিতেই জন্ম নেয়।

## ১৭. ডিণ্ডিগুলের সেনানায়ক

ডিণ্ডিগলের ফৌজদার হাইদর আলি তাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন না যারা নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে আক্রমণ করেছিল। সমস্ত রাজনৈতিক অপরাধীকে মার্জনা করে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর শাসন—তাঁর ফৌজদারি। অর্থনৈতিক সব অবরোধ ও বাধা দূর করলেন এবং জনসাধারণকে যতটা সম্ভব কাজকর্মে স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন যা কিনা তারা যুগ যুগ ধরে কখনো ভোগ করেনি। তিনি অনেক কর হ্রাস করে দিলেন এবং তা দেবার সময়ও বাড়িয়ে দিলেন অনেক, অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে।

তিনি যে নূতন রাজনৈতিক দর্শন কাজে লাগাবার জন্যে এমন করেছেন, এমন নয়, ফৌজদারটি যে একজন সদাশয় ব্যক্তি তা প্রমাণ করার জন্যও নয়। তিনি ছিলেন সংস্কারবাদী। তিনি সকলের শুভেচ্ছা চেয়েছেন, কেউ তাকে অভিশাপ না দেয়—এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। তখন তাঁর নবজাত শিশুটি, আবদুল করিম, জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাচ্ছে। দুশ্চিন্তায় হাইদর রোগা হয়ে গিয়েছেন, তাঁর নিদ্রা নেই—শিশুটির নিশ্বাসপাতের শব্দ শোনার জন্যে কয়েক বারই তিনি রাত্রে উঠে পড়েন, শিশুর একটু কান্না বা একটু কাঁস তাঁর হৃদয় টুকরো-টুকরো করে দেয়।

ফকর-উন-নিসা প্রার্থনা করেন, হাইদর করেন,. কিন্তু তাঁদের থেকে বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করে পাঁচবছরের টিপু। ঈশ্বর যেন এই নবজাতকের জীবন রক্ষা করেন।

প্রথমে কয়েকটি উদ্বিগ্ন সপ্তাহ কেটে গেল। আবদুল করিম বাঁচবে। সে ওজন ও শক্তি সঞ্চয় করছে। ফকর উন-নিসা প্রার্থনা করেন, কিন্তু টিপুর মতন অত ঘন-ঘন নয়। সারাটা দিন সে তার ভাইয়ের বিছানার পাশে থাকে।

আবদুল করিম সম্পূর্ণ নিরাপদ ডাক্তারেরা এ কথা ঘোষণা করার পর হাইদরের খুশি ধরে না। আবদুল করিম নাকি শক্তি ও স্বাস্থ্য নিয়েই জীবন কাটাতে পারবে।

ইতিমধ্যে হাইদরের সদাশয় ও শান্ত নীতির ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র ত্যাগ করেছে, সংঘর্ষের ঘটনা কমে গিয়েছে অনেক, এজন্যে

শান্তিমূলক-ভাবে বিদ্রোহীদের উপর হামলা-জনিত খরচ আর করতে হচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা, পরিব্রাজকেরা ও কিষাণেরা নিরাপদ বোধ করছে। অর্থনৈতিক উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এসেছে—এর দরুন হাইদরের কর আদায়ের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যতটা আশা ছিল তার তিন গুণ আদায় হয়েছে এই খাজনা। মহীশূরের তাঁর উপরওয়ালারা যতটা পরিমাণ বেঁধে দিয়েছিলেন তার অনেক বেশি পরিমাণ তিনি পাঠাতে পারলেন। কিছু অংশ তিনি করিমের জীবনলাভের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মন্দির ও মসজিদ নির্মাণে ও সংরক্ষণে নিয়োগ করলেন। বাকিটা তিনি রাখলেন নিজের কাছে—সেনা-সংগ্রহের জন্যে, কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ফরাসি এঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রাগার নির্মাণের জন্যে।

তাঁর সদাশয়তার জন্য ডিণ্ডিগুলের নাগরিকদের সকৃতজ্ঞ কার্যকলাপ হাইদরকে মস্ত রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছে বলা চলে। তিনি বুঝতে পেরেছেন সব সময় তরবারি দিয়ে শাসন করা দরকার হয় না। পুরনাইয়াকে বলতে হবে তিনি ভাবলেন, কতটা চিন্তা ও সংকল্প নিয়ে তিনি এই রকম নীতি গ্রহণ করেছেন, একবারও অবশ্য তাঁর মনে হয়নি যে, এই নীতির দরুন ঈশ্বর প্রীত হবেন ও করিমের জীবন ব্যাপারে প্রসন্ন হবেন—যদিও মনের নিভৃতে এই অভিপ্রায় অবশ্যই ছিল, এ কথাও তিনি ভুলে ছিলেন যে, তিনি মনে-মনে শপথ নিয়েছিলেন—যদি করিমের জীবন রক্ষা না-পায় তা হলে তিনি এই সমস্ত ভূভাগ ভস্মে পরিণত করবেন।

সে যাই হোক, এটা তাঁর পক্ষে খুব বড় রকমের একটা রাজনৈতিক শিক্ষা—পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

# ১৮. দুইই যথেষ্ট

অসময়ে পুত্রের জন্মদান-জনিত শারীরিক ধকলের থেকে এখন সেরে উঠেছেন ফকর উন-নিসা। তাঁর অস্থিরতাও আর নেই। তাঁর মুখমণ্ডলের বর্ণ ফিরে এসেছে। তাঁকে সুস্থ ও প্রসন্ন দেখে হাইদর বেশ উল্লসিত।

কর ও শুল্ক হিসেবে সোনা রুপা ও শস্য যা এসে জমেছে সেসবের হিসাব নিয়ে সকালটা তাঁর মন্দ কাটল না। আট জন কর-আদায়কারীর স্বীকারোক্তি তিনি আদায় করতে পেরেছেন, কেবল যে তাদের লুকানো সোনাই বাজেয়াপ্ত করেছেন এমন নয়, প্রকাশ্যে তাদের চাবুক মারার ব্যবস্থাও করেছেন। আরও বড় কথা—সেই দিন সকালেই মহীশুর থেকে তাঁর উদ্যমের প্রশংসা করে তাঁর কাছে একটা চিঠি এসেছে তারই চিঠির জবাবে, সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, প্রতি তিন মাস অন্তর তিনি ঐ পরিমাণ অর্থ পাঠাতে পারবেন। তার জন্যেই এই অভিনন্দনপত্র পেলেন তিনি। কিন্তু মজার কথা এই, একদিন আগে তিনি পরবর্তী তিন মাসের দরুন যে অর্থ পাঠিয়েছেন গতবারের চেয়ে তার অংক আরও ভারী। তিনি বুঝলেন তাঁর দূত মহীশুরে পেঁছিলে নঞ্জরাজ কতটা খুশি হবেন। নঞ্জরাজ একটু লোভী প্রকৃতির অবশ্য, কিন্তু হাইদর জানেন, ভালো কাজ করতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করতেও জানেন নঞ্জরাজ—এরই উপর হাইদরের ভরসা।

টিপুকে মুখের কাছে তুলে ধরলেন, ও বিছানায় শায়িত করিমের দিকে ঝুঁকে তাকে চুমো খেলেন। টিপু তাঁকে হাল্কা একটা চুমো খেলো এবং করিম খুশির হাসি হেসে হাইদরের মোটা ভুরু চেপে ধরল।

ফকর-উন-নিসার কাছে হাইদর যখন একা, তখন একগুচ্ছ ফুল উপহার দিয়ে একটি চুম্বন দাবি করল।

হাইদর বললেন, "তোমাকে এতটা ভালো দেখে খুবই ভালো লাগছে।" নঞ্জরাজের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছেন, চারদিকের যত ঘটনাদি ঘটছে, কত অর্থ তিনি সঞ্চয় করেছেন, কত কারখানা বানাবার পরিকল্পনা করেছেন, একে একে সব কথা বললেন হাইদর।

আরও বললেন, "আমাদের সমস্যা এখন দূরে হয়েছে। টিপু বেশ বেড়ে

উঠছে, করিমও সুন্দর ও স্বাভাবিক হচ্ছে। ভালো কথা, শোনো, ঈশ্বরের সেবার কাজের জন্যে টিপু তোমার হোক, তোমার ইচ্ছে হলে তুমি তাকে পুরোহিত বানাতে পার ; করিম আমার থাক্, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হবে, এক বিজয়ী পুরুষ, একজন সম্রাট্—কে জানে কী হবে সে।"

তার পর একটু মজা ক'রে বললেন, "কিন্তু, মহাশয়া, আমাদের তৃতীয় পুত্রের কী হবে ? তার জন্যে কোন্ ভবিষ্যৎ তৈরি করব ?"

ফকর-উন নিসা তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে কোমলতা ও ভালোবাসার মাধুর্য, কিন্তু চোখে তাঁর জল।

"আমার কাছ থেকে তৃতীয় পুত্র আর পাবে না, প্রভু।" শান্ত গলায় উত্তর দিলেন ফকর-উন-নিসা।

"অমন কথা বোলো না। তুমি অসুস্থ ছিলে। অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে সেরে উঠবে। তোমাকে যে ফুল উপহার দিলাম, ইতিমধ্যেই তুমি তার থেকে অনেক তাজা হয়ে উঠেছ।"

"কিন্তু কথাটা সত্যি।" বললেন ফকর-উন-নিসা।

"খুব সত্যি। সবচেয়ে সুন্দর ফুলটির চেয়েও তুমি সুন্দর।"

"কিন্তু যে কথাটা সত্যি, তা হল আমার কাছ থেকে তুমি আর কোনো সন্তান পাচ্ছ না।"

হাইদর এবার বুঝলেন যে, ডাক্তাররা যে রায় দিয়েছেন সেই কথাই বলছেন ফকর-উন-নিসা। হাইদর কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন, তার পর বললেন, "এইটেই কি শেষ কথা। এসব কি সারানো যায় না ?"

"আমার মনে হয়—না।" উত্তর দিলেন তিনি।

কোন্ কোন্ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, তাঁরা ঠিক কী কী কথা বলেছেন—জানতে চাইলেন হাইদর।

তাঁর মনে যে গুমট নেমে এল তিনি তা সামলে নিলেন, বললেন, "তবে তাই হোক। আমরা উভয়কে ভালোবাসতে পারি। প্রেমের ক্রীড়াও চলতে পারে তার জন্যে কোনো খেসারত না দিয়ে। বেশি সন্তান কে চায় ? যে দুটি রত্ন আমরা পেয়েছি, আমাদের দুজনের জন্যে তাই যথেষ্ট।"

ফকর-উন-নিসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন তাঁর হৃদয়ে কোনো আঘাত লাগল না এমনি প্রসন্নভাবে তিনি বললেন, "আমার কোনো পুত্র হবার উপায় নেই। কিন্তু তুমি পেতে পার।"

"এটা কোন্ ধরনের ধাঁধা, বেগম ?" হাইদর জিজ্ঞাসা করলেন।

"অতি সহজ," মুখে মিষ্টি হাসি এনে ফকর উন-নিসা বলতে লাগলেন, "তোমাকে আবার বিয়ে করতে হবে। তোমার স্ত্রী নির্বাচনের অধিকার আমাকে দিয়ো। আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি আমার পছন্দ তোমাকে খুশি করবে। কিংবা তার চেয়েও ভালো হয়, আমি যাদের কথা ভেবেছি তাদের সম্বন্ধে তোমাকে একটু বলি, তারপর তাদের তালিকা তৈরি ক'রে নেওয়া যাক, তার থেকে একজনকে বাছাই করে নেওয়া যাবে। যেমন, ধর, একজন হচ্ছে মিএগ মমতাজ সায়েবের কন্যা। ও, দেখ, পুরো তালিকাই আমার কাছে আছে।" তাঁর গহনার বাক্স থেকে একটা লম্বা কাগজ টেবিলের উপরে রেখে তা পড়তে যাচ্ছেন, হাইদর বাধা দিলেন।

"এটা কি মেয়েদের তালিকা তৈরি করেছ আমার জন্যে ?" হাইদর বললেন।

"হ্যাঁ।"

"দয়া করে আমাকে দাও।" হাইদর চাইলেন।

"কেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন ফকর-উন-নিসা। তিনি জানতেন হাইদর পড়তে পারেন না।

"আমাকে দাও।" আদেশ করার মতন করে বললেন হাইদর। তাঁকে তালিকাটি দেওয়া হলে তিনি তার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি জান আমি পড়তে জানিনে।" তিনি কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কার্পেটের উপর ফেললেন। তাঁর ডান পায়ের কাছে যে টুকরোগুলি পড়েছিল তিনি তা লাথি মারার মত করে পা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

খুব দৃঢ় অথচ নম্র গলায় তিনি বললেন, "আমার কথা শোনো, মন দিয়ে শোনো কি বলছি আমি। আমি যেন ভবিষ্যতে আর কখনো আমার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে কোনো কথা না-শুনি। বিষয়টি আমার পছন্দ না। বিষয়টির নিষ্পত্তি এখানেই হয়ে গেল।"

"কিন্তু..." ফকর-উন-নিসা আপত্তি জানাতে গিয়েছিলেন।

"খুব হয়েছে", হাইদর বাধা দিলেন, "আমি বারণ করছি।" এ কথা বলার পর তাঁর জীবনে এই প্রথম তিনি ফকর-উন-নিসাকে চড়া গলায় কথা বললেন, "ফাতিমা, আমি নিষেধ করছি, আবার বললাম আমি। আর কখনো ও কথা তুলবে না। কি, বুঝেছ আমার কথা ?"

রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হাইদর। তাঁর অনুপস্থিতিতে ফকর-উন-

নিসা বললেন, "ধন্যবাদ, প্রভু।" তিনি কি ঈশ্বরকে সম্বোধন করলেন, অথবা হাইদরকে—তিনি নিজেই তা জানেন না।

একটু পরেই ফিরে এলেন হাইদর। রাত্রিটা তাঁরা প্রেমপ্রণয়ে কাটালেন। প্রেমিক হিসেবে হাইদর সর্বদাই মধুর। সে রাত্রিটা এমন উষ্ণতায় ও মধুরতায় কাটল ফকর-উন-নিসা যা ইতিপূর্বে অনুভব করেননি।

# ১৯. পণ্ডিত ও মৌলভি

ক

টিপুর ধর্ম-শিক্ষার জন্য মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন শিক্ষক রূপে। তাঁর পুত্র পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে এমন ধরনের ফকির যেন না হয়, ফকর-উন-নিসার এই আশা পূরণ করার জন্যেই এঁদের এই নিয়োগ। টিপু যেন একজন সুপণ্ডিত শিক্ষক হয়ে ওঠে, চারদিকে যেন তার নাম ছড়ায়, সর্বত্র যেন সে বন্দিত হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের বাণী যেন প্রচার করতে পারে চারদিকে—এই হচ্ছে ফকর-উন-নিসার একান্ত বাসনা। তিনি মর্মচোখে যেন দেখতে পান যে, তাঁর পুত্রের কাছে মাথা নত করছেন সুপণ্ডিতেরা ও রাজপুত্রেরা শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে, এবং তাঁর পুত্র সর্বত্র যেন সুসমাচার বিস্তার করে সকলের মন আলোকিত করে দিচ্ছে। যাদের মনে দুঃখকষ্ট আছে তারা সান্ত্বনার জন্যে আসছে তাঁর পুত্রের কাছে, তাঁর পুত্র তাদের যন্ত্রণা নিরাময় করে দিচ্ছে। তাঁর পুত্র হবে একজন শিক্ষক, একজন পথ-প্রদর্শক। মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিত উভয়ের কাছে তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে বলেছেন, "আপনাদের জ্ঞানের উপযোগী করে তুলুন একে।"

তিনি মর্মে-মর্মে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর পুত্র যোগ্য থেকেও যোগ্যতর হয়ে উঠতে পারবে। এবং হয়তো তারও বেশি।

গ

"যে-কোনো ধরনের ধর্মের মধ্যে ভগবান আবদ্ধ নন, তিনি যে-কোনো ধরনের ধর্মের বাইরেও নন।"—এই হচ্ছে একটা বাণী গোবর্ধন পণ্ডিত টিপুর মনের মধ্যে যা গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

ডিণ্ডিগুলেই টিপুর ধর্মীয় শিক্ষা বেশ জোরদার করে আরম্ভ করা হয়, এইখানেই হাইদর নিযুক্ত হন ফৌজদার হিসেবে এবং এখানে আসার পথে ফকর-উন-নিসা জন্মদান করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের—করিমের।

মৌলভি ওবেদুল্লা গোবর্ধন পণ্ডিতের মত স্পষ্টভাবে কথা বলতেন না। তিনি

কোনোরকম ঘোষণা করতেন না, বা কোনো বিষয়ে রায় দিতেন না। জীবনব্যাপী ধ্যান মনন প্রার্থনা ইত্যাদি করা সত্ত্বেও তাঁর মনের অনেক প্রশ্নেরই তিনি উত্তর পাননি, অনেক বিষয়ই অমীমাংসিত থেকে গেছে। এ'তে অবশ্য তিনি বিচলিত নন। তিনি জানতেন শীঘ্রই তাঁর স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, এবং হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছেই পাবেন। তিনি মনে করতেন এই উত্তরগুলিই একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। একথাও তিনি জানতেন যে ঈশ্বরের কাছে পেঁাছবার জন্যে অনেক সরুপথ বা অনেক রাজপথ আছে, এবং ধর্ম হচ্ছে সেইরকমের একটা পথ।

তাঁর মুখ্য বিশ্বাস অবশ্য ছিল ইসলামের মূল নীতিতে—যেমন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, দান, করুণা, প্রেম, এবং অচ্ছেদ্য মিলনে, যার দ্বারা সকলেই যুক্ত হতে পারে। তিনি জানতেন বাইরে থেকে যাকে বিভেদ বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে দার্শনিক ও ধার্মিক চিন্তাধারার মিলিত স্রোত—যার প্রতি ঈশ্বরের অনুকম্পা সমান ভাবে প্রবাহিত। ইসলাম কখনো তাঁকে এমন শিক্ষা দেয়নি, তিনিও কখনো বিশ্বাস করেননি যে, বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা থাকতে পারে, বা অন্য-কোনো চিন্তাধারার প্রতি বিদ্বেষ থাকতে পারে। যেসব মতবাদ তারস্বরে নিজেদের কথা প্রচার ক'রে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে তার নিজস্ব স্থান অধিকার করা থেকে বঞ্চিত করে, ঈশ্বরের কাছে বা মানুষের কাছে তার প্রাপ্ত মর্যাদা দিতে কৃপণতা করে, মৌলভি ওবেদুল্লা সেইসব মতবাদ একেবারে অগ্রাহ্য করতেন। এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে সদয়তার সঙ্গে দেখেন, এবং তার হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ করেন।

গোবর্ধন পণ্ডিত ও মৌলভি ওবেদুল্লা উভয়ে উভয়ের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মৌলভি সায়েব চাইতেন তাঁর ক্ষুদে ছাত্রটির মনে সহনশীলতা, প্রার্থনা, নিষ্ঠা ইত্যাদি যাতে বদ্ধমূল হয় তার জন্যে ঐকান্তিক চেষ্টা করে যাওয়া।

গোবর্ধন পণ্ডিতের দাবি ছিল একটু বেশি। সে যে কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা উপাসনা ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তাইই নয়। দাক্ষিণ্য ও মুক্তি—এই বিষয়ের বাণীই ছিল তাঁর কাছে বড়। তিনি মনে করতেন যে, কেবল ঈশ্বরের নাম করা ও প্রার্থনা করাই সব নয়, যে কেবল এই কাজ করে, কিন্তু নিজের মহানুভবতা প্রকাশ করার জন্যে বিন্দুবিসর্গ শক্তি ব্যবহার করে না, সে পাপী। তিনি মনে করতেন, কেবল নিজের হৃদয়ের মধ্যে করুণা জমা রেখে

সময় কাটালেই চলবে না, যখন বাহিরবিশ্বে বেদনার্ত মানুষেরা হাহাকার করছে, দরিদ্রেরা আমাদের দোর-গোড়ায় মারা যাচ্ছে, এবং পৃথিবীতে যখন একটি মাত্র প্রাণীও নিরন্ন নিরাবরণ থাকছে কিংবা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, অপদস্ত করা হচ্ছে তাদের—তখন ঐ নিভৃত করুণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। জীবনের আরাধনা-উপাসনা-তপস্যার তিনি অনুরাগী অবশ্যই, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে মানুষ যদি সর্বত্র কর্মধারা প্রসারিত করে জীবজগতের কল্যাণসাধন করতে না-পারে, তাহলে সব তপস্যাই বৃথা।

টিপুর কিশোর মনে তার শিক্ষকদের এই চিন্তাধারার ছাপ পড়ে, সে তা গ্রহণ করতেও পারে ভালোভাবে। তাঁরা তাকে এইসব শিক্ষা দিয়েছেন খুব তাড়াহুড়ো করে নয়, খুব ধীরে ধীরে, গল্প উপকথা ইতিকথার মাধ্যমে, কখনো কখনো ছড়ায় কবিতায় গানে। এইসব শিক্ষা তাঁরা তো দিতে লাগলেনই, সেইসঙ্গে টিপুর মনে জ্ঞানলাভের আকাঙ্খা জাগাতে ও হৃদয় করুণায় পূর্ণ করতে, ও জানার কৌতূহলে তার মন কৌতূহলী করে তুলতে চাইলেন।

এই শিক্ষকদের মনে জ্ঞানের যে বিস্তার ও প্রসার ছিল উত্তর জীবনে টিপুর মধ্যে তা দেখা গিয়েছে, টিপুর ঘোরতর শত্রুও এ ব্যাপারে টিপুর প্রশংসাই করেছে। টিপুর মনে সুবিচার সম্বন্ধে যে ধারণা, সর্বশক্তিমানের প্রতি যে বিশ্বাস, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি যে ভরসা, জাতীয় মর্যাদা ও নীতি সম্বন্ধে তাঁর যে আদেশ ও নির্দেশ—এসবই এমনকি তাঁর নিজের জীবনও সেই শিক্ষার দ্বারাই বিশেষ ভাবে লালিত। তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যখন বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে এসে তাঁকে ঘেরাও করে, অনুচরেরা যখন তাঁকে বর্জন করে তখনও তিনি ঐ শিক্ষার প্রভাবে নিজেকে বলশালী রাখতে পেরেছেন।

## ২০. সৌভাগ্যের সিঁড়ি

যাকে বলা যায় রাজনৈতিক পেশী, হাইদর আলীর সেইটি ক্রমেই তৈরি হয়ে উঠছিল।

তিনি যে কেবল প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছেন, ডিণ্ডিগুলে অনেক কারখানা গড়ে তুলেছেন, অনেক সেনা সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক রূপেও সুনাম অর্জন করেছেন। ঐ অঞ্চলে কেউ যদি শান্তিস্থাপন করে থাকেন তা করেছেন তিনি, এবং এর অর্থনৈতিক সুস্থিতির দরুন তিনি যেমন লাভবান হয়েছেন, তেমনি উপকৃত হয়েছেন তাঁর মনিবেরা, এবং সেইসংগে সমগ্র প্রদেশটিই।

তাঁর পুত্রের শিক্ষক রূপে মোলভি ওবেদুল্লার ও গোবর্ধন পণ্ডিতের তাঁর গৃহে প্রবেশের দরুন হাইদরের রাজনৈতিক চেহারা তখন তুংগে। ডিণ্ডিগুলের কমাণ্ডান্ট রূপে হাইদর পরিচিত, তিনি একজন সৈনিক রূপেই চিহ্নিত—এই পরিচয়েই তিনি যেমন সকলের সম্মান লাভ করেছেন, সকলে ভয় করেছে তাঁকে। কিন্তু এই মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি এত শ্রদ্ধা যে আছে, কে জানত, যার প্রভাবে তিনি তাঁর পুত্রের শিক্ষার জন্য দুইজন নাম-করা ধর্মব্যাখ্যাতা নিযুক্ত করবেন। মনে হতে লাগল সকলে যেন সহসাই হাইদরের আর একটি দিক দেখতে পেল—সেটা হচ্ছে তাঁর মানসিক দিক, কিন্তু বিশ্ব তাঁর কাছ থেকে যা কাজ চায় তা তিনি করে চলেছেন। কেউ জানত না যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তাঁকে পালন করতে হবে, সে শপথ ভাঙলে তার সর্বনাশ হতে পারে বলে সংস্কার ছিল তাঁর মনে। সকলে তাঁকে ধর্মপ্রাণ বলে মনে করতে লাগল, এটা আগে কখনো প্রকাশ হয়নি।

টিপু সুলতানকে ধর্ম-শিক্ষা দেবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক অনুসন্ধান সম্বন্ধে সমস্যার কথা নিয়ে হাইদর যখন পুরনাইয়ার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন তখন পুরনাইয়াই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হাইদরের ডিণ্ডিগুলে যাত্রা করার কিছু আগেই তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

পুরনাইয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেন?"

হাইদর উত্তর দিলেন না, কিন্তু পুরনাইয়া সব বুঝতে পারলেন।

প্রনাইয়া প্রবলভাবে উল্লাস প্রকাশ করে বললেন, "আমি তোমাকে আদাব জানাই। ঠিক। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার ছাত্র, এখন দেখছি আমার গুরু তুমি।

"কিসের কথা তুমি বলছ ?" জানতে চাইলেন হাইদর।

প্রনাইয়া মাথা নাড়লেন, তার দ্বারা তিনি বোঝালেন যে, তিনি যে সব বুঝেছেন, এমন নয় ; এতে তাঁর সমর্থনও আছে। এতে হাইদর উত্তেজিত হয়ে প্রনাইয়ার কাঁধ ধ'রে ঝাঁকি দিলেন এবং সেইসঙ্গে প্রশ্নটি আবার করলেন।

প্রনাইয়া হেসে বললেন, "খুব হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি মুহূর্তের জন্যে আমাকে বোকা বানিয়েছিলে, কিন্তু আর না। বেশ বুঝতে পারছি আমি যে, একজন নামজাদা প্রশাসক এখন হতে চাইছেন ঈশ্বরের অনুরাগী। ভয়ে যার কাছে মাথা হেঁট করে সকলে, তারাই মাথা আরও নত করবে শ্রদ্ধায়, এবং তার নাম লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হবে মানে-মর্যাদায়। এটা মন্দ ব্যাপার নয়, হাইদর।" এই কথা বলে প্রনাইয়া আরও বললেন, "এত জলদি তোমার খেলু যে দেখতে পেলাম, এটা আমারই বুদ্ধির পরিচয়। কি বল ?"

হাইদর একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "যে ছাগলের দুধ তুমি খাও সেটা নিশ্চয় প্রচুর মদ্য পান করেছে।"

প্রনাইয়া তাকে শুধরে দিয়ে বলল, "আমি গোরুর দুধ খাই।'

উত্তরে হাইদর বলেছিল, "গোরু হোক, ছাগল হোক, উট হোক, গোখরো হোক কিংবা যে-কোনো জীব হোক অথবা মাছ হোক—যার দুধই তুমি খাও—সব নিপাত যাক।"

একটু দ্বিধা করে হাইদর প্রনাইয়াকে বলেছিলেন সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার স্মৃতিতীর্থে ফকর উন-নিসার প্রতিশ্রুতির কথা, সে প্রতিশ্রুতি পালনের শপথও জানিয়েছিলেন হাইদর, কেননা তিনি বেশ ভালোভাবেই বিশ্বাস করতেন যে সেই স্বর্গীয় প্রভাবেই দীর্ঘকালের প্রত্যাশার পরে তাঁর গৃহে এক পুত্রের আবির্ভাব হয় ; এবং সেই শপথ না রাখলে তার পরিণাম সম্বন্ধে ভয়ও তাঁর ছিল।

প্রনাইয়া মনোযোগ দিয়ে হাইদরের সব কথা শুনে একটু হেসেছিল, হাইদর তিরস্কার করে তখন তাঁকে বলেন, "একজন ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার উচিত এসব কথা মাথা নত করে শোনা ; কিন্তু তুমি কেবল অশ্রদ্ধা দেখাবার ভঙ্গি করছ !"

"মার্জনা করো আমাকে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের হে জনক", প্রনাইয়া

বিন্দুমাত্র নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করেননি, তবু বললেন, "আমি হাসছি আমারই বোকামির জন্যে, আমি ভেবেছিলাম ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের জন্যেই তুমি এসব ভাবছ, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা চালিত তুমি হওনি।" একটু থেমে অবশ্য পুরেনাইয়া বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বললেন, "সে যাই হোক, তুমি ভাবছ এটা দরকার। বোধ হয় দরকারই। যদিও অবশ্য নানা কারণে আমি এটাকে মস্ত বড় একটা পরীক্ষা বলে মনে করি। কারণ যাই হোক, এর ফল শুভই হবে।"

তার পর উভয়ে অনেকের নাম এবং তাঁদের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করলেন যাঁদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করা যায়, এবং কাকে পাওয়া যেতে পারে, কে এ কাজে সম্মত হতে পারেন তাও তাঁরা বিচারবিবেচনা করলেন।

হাইদর চলে যাবার আগে পুরেনাইয়া তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে, হাইদর যে শপথ নিয়েছেন সে কথা মনে করে দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে তোমার ও তোমার স্ত্রীর মধ্যে। আর কেউ যেন না-জানে।"

"যাকে আমি এ কথা বলেছি সে হচ্ছ একমাত্র তুমি।" বলেছিলেন হাইদর।

পুরেনাইয়া আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আমি যা ভুলে যেতে চাই তা বেশিক্ষণ মনে থাকে না।"

পুরেনাইয়া শ্রীরঙ্গপত্তমে থেকে গিয়েছিলেন, তারপর ডিণ্ডিগুলে হাইদরের কর্মকুশলতার খবর যখন তাঁর কানে এল তিনি খুশি হলেন, এবং সকলে যাতে এ খবর জানতে পারে সে দিকে নজর দিলেন। এর পরে সৈনিকেরা যখন ছুটিতে এল, এবং দূতেরা ও হাজার হাজার অসামরিক ব্যক্তি যখন শ্রীরঙ্গপত্তম ও ডিণ্ডিগুলের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগল তখন খবর রটে গেল সেই বিরাট সৈন্যাধ্যক্ষ, হাইদর, দুই জন ধর্মশিক্ষককে নিযুক্ত করেছেন। এর প্রভাব জনসাধারণের উপর কিভাবে পড়বে অনুমান করে পুরেনাইয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। খবরটা তিনি রটাতে আরম্ভ করলেন অনেক রংচং দিয়ে এবং হাইদরের মহত্ত্বের অনেক কাহিনী যোগ করে। হাইদরের কয়েকজন পুরাতন কমরেড ও পুরেনাইয়ার বন্ধুরা এ ব্যাপার নিয়ে বেশ মজা করতে লাগলেন।

"ব্যাপারটা দেখ। যে মুহূর্তে ঐ অনাচারী ব্রাহ্মণের সংসর্গ থেকে সে দূরে গেছে অমনি সে আলোর সন্ধান পেল।" পুরেনাইয়া সম্বন্ধে তাদের ঐ মন্তব্য।

এসব মন্তব্য শুনে পুরেনাইয়া প্রাণ খুলে হাসত। হাইদরের ভাবমূর্তি যে বেশ একটা আকার নিচ্ছে, একথা ভেবে তার খুশি ধরে না। তাকে নিয়ে কে কী

বলছে, এ'তে তার কিছু আসে-যায় না। অনেকে তাকে যখন জিজ্ঞাসা করত সেই ভ্যাগাবন্ড খোসমেজাজী ও আমোদপ্রিয় হাইদর কখনো ধর্মের দিকে মন দিতে পারে এমন কি সে কখনো ভেবেছিল, তখন সে মনে করত অল্প কথায় এর উত্তর হয় না। সে বলেছিল, হাইদরের মধ্যে কেবল সে দক্ষ প্রশাসকের ও কুশলী যোদ্ধার রূপই দেখেনি, তার মধ্যে সে সততার নিষ্ঠার ও বিশ্বস্ততার মূর্তি দেখেছে, এবং বন্ধুদের প্রতি বান্ধবোচিত মনোভাব লক্ষ্য করেছে। সে জানতে চেয়েছে, অন্যান্য সেনাপতিরা যেমন করে থাকে হাইদর কি সে রকম কখনো লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ পাবার জন্যে তার অফিসার ও অন্যান্যদের বঞ্চিত করেছে? যুদ্ধের সময়ে সে কি কখনো অসুস্থ আহত বা অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে? সে জানতে চেয়েছে। "যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছে তাদের বিধবাদের ও পুত্রকন্যাদের জন্য যেন সংস্থান করা হয় তার ব্যবস্থা কি সে করেনি, এমনকি খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে কি খোঁজ করেনি যে, তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না?"

এই রকম প্রশ্ন করে যেত পুরনাইয়া, অবশেষে বলত, ধর্মের প্রতি হাইদরের ঝোঁক সে স্পষ্টভাবে লক্ষ করেনি বটে, কিন্তু এটা স্পষ্ট দেখেছে যে, সে একজন মান্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি, এবং সে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য; এই কথা বলে পুরনাইয়া মন্তব্য করত যে, মাননীয় ব্যক্তি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য একেবারে নেই বললেই চলে।

এই ভাবে পুরনাইয়া হাইদরের সুনাম ও ভাবমূর্তি রক্ষা করে চলেছিল। পুরনাইয়ার পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন সেনাপতিদের উদ্দেশে অনেক রকমের উপহার ডিণ্ডিগুল থেকে শ্রীরঙ্গপত্তমে অবিরত চলে আসত। কখনো কখনো বিচলিত হাইদর জানতে চাইত, "এসবে আমার কী উপকার হচ্ছে?"

উত্তরে পুরনাইয়া বলত, "মানুষের শুভেচ্ছা লাভের জন্যে লগ্নি করতে শেখ।"

হাইদরের কোন পরিচিত জনের মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা হাইদরের নামে সহানুভূতিপূর্ণ সুলিখিত চিঠি পেত এবং কখনো-কখনো তার সংগে উপহার হিসেবে কিছু নগদ। পুরনাইয়া এসব উপহারের কথা ভালোভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করত। প্রত্যেক ডাকে ক্রমশ চিঠি আশা বাড়তে লাগল—আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে এসব চিঠি আসত। হাইদর এ'তে বিরক্ত হত, কিন্তু পুরনাইয়া হত খুশি। পুরনাইয়ার পরামর্শে কোনো-কোনো

চিঠির উত্তর যেত সাহায্য সহই। কোনো-কোনো সময়ে হাইদর পুরনাইয়া মারফত দরখাস্তকারীকে তার নিজের অসুবিধার কথা জানিয়ে লিখে পাঠাত ঐ চিঠি নিয়ে অমুক অমুক ব্যাঙ্কারের কাছে গিয়ে উক্ত টাকা আগাম হিসেবে তাকে দিতে এবং সেই টাকা হাইদরের নামে ঋণ হিসেবে লিখে রাখতে। ব্যাঙ্কার যাতে অনুরোধ রক্ষা করে তার বন্দোবস্ত করত পুরনাইয়া।

পুরনাইয়া বলত, "কী রকম মানুষ, দ্যাখো। নিজের বন্ধুদের সাহায্য করার জন্যে সে দেনা পর্যন্ত করে; এবং এই রকম উঁচু হারে সুদে!"

তার সেনাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে না-পারায় যখন প্রায় বিদ্রোহ বেধে গিয়েছিল, তখন পুরনাইয়া অদ্ভুত উদ্যোগ দেখিয়েছে। নঞ্জরাজ স্বয়ং যখন হালে পানি না পেয়ে সেনাদের কাছে সময় চাইছেন, তখন পুরনাইয়া ও তার বন্ধুরা ক্যাম্পে-ক্যাম্পে ঘুরে বলে বেড়াতে লাগল যে, এই সময়ে হাইদর এখানে থাকলে এ সমস্যার একটা সমাধান হতই। যেসব অনাচারী কর্মচারী অজস্র টাকা সরিয়ে ফেলে লুকিয়ে রেখে সেনাদের বঞ্চিত করেছে, সেই গুপ্তধন উদ্ধার করা হতই, এবং সেনাদের মধ্যে যথোপযুক্তভাবে বিলি করা হত। নঞ্জরাজ যখন সেনা-নায়কদের সংগে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন তখন তিনি তাদের বলেন যে, তাঁর ভাই দেবরাজ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, তিনি ওই এলাকার ধনসম্পদ দেখাশোনা করার জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাচ্ছেন, সুতরাং তারা একটু অপেক্ষা করুক।

"আমি আমার প্রবীণতম গবর্নর মীর সায়েবকে পাঠাব।"

সেনা-নায়করা অসন্তোষ প্রকাশ করল। তারা বলল, মীর সায়েবকে কেউ বিশ্বাস করে না। সাধারণ সেপাইরা তো ক্ষেপেই আছে, অফিসাররাও কম ক্ষিপ্ত নয়। তারা জানাল। মীর সায়েবের নিয়োগে আগুনে ঘৃতাহুতিই দেওয়া হবে।

নঞ্জরাজ জানতে চাইলেন, "তাহলে কার কথা তোমরা ভাবছ? আলম খাঁ? ইসমাইল বেগ? নন্দলাল? সুরজমল? এঁরা হচ্ছেন আমাদের গবর্নর।"

কমাণ্ডাররা জানতে চাইল, "আর কি কেউ নেই?"

"জুনিয়রদের মধ্যে আছেন পৃথ্বীরাজ ও হাইদর আলি।" নঞ্জরাজ বললেন।

কমাণ্ডাররা ভাবতে লাগল, তারপর তাদের মধ্যের একজন বলল, "বেশ। হাইদর আলি হবেন বেশ উপযুক্ত।"

অন্য সকলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। নঞ্জরাজ আনন্দিত হলেন। নিঃসন্দেহে হাইদর তাঁরই লোক। তাঁরই, একমাত্র তাঁরই কৃপায় হাইদরের এই

পদোন্নতি। অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রাতা দেবরাজের হাত ছিল, কিন্তু হাইদরের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নঞ্জরাজই যা করার করেছেন। হাইদর বেশ জুনিয়র, সুতরাং পরামর্শ মানাতে ও শৃঙ্খলা রাখতে তাকে দিয়ে সুবিধে হবে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে নঞ্জরাজ সেনা-নায়কদের নির্বাচন মেনে নিলেন, এবং জরুরি বার্তা-সহ হাইদরকে ডেকে আনার জন্যে পাঠানো হল দূত।

নঞ্জরাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট তাঁর ভ্রাতা দেবরাজের সঙ্গে হাইদরের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিল পুরনাইয়া, এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করে দেবার জন্যে হাইদরের সঙ্গে তার কথা হয়। বাকিটা তো ইতিহাস—দুই ভাইয়ের পুনর্মিলনে পৌরোহিত্য করে হাইদর, পরে মহীশূরের সেনাবাহিনীর প্রধান হয়, অবশেষে হয়ে যায় মহীশূরের অধিপতি।

## ২১. আমাদের পুত্রদের গ্রহনক্ষত্র

ঐতিহাসিকদের কাছে, রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে, এমনকি এদেশ ও বিদেশের রাজারাজড়াদের কাছেও হাইদরের এই ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ একটা রহস্যবিশেষ—যার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারবেন না। একজন অখ্যাত ও অজ্ঞাত সামান্য সেপাই, ১৭৫০ সালে যে কিনা মাত্র ৫০টি অশ্ব ও ২০০ পদাতিক বাহিনীর পরিচালক ছিল, ১৭৬১ সালে সে হয়ে উঠলো মহীশূর রাজ্যের সর্বশক্তিমান অধীশ্বর? কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, কোনো হত্যাকাণ্ড নয়, কোনো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নয়—নির্বিঘ্নে হয়ে গেল ক্ষমতার এই হস্তান্তর? এধরনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সময়ে মারাত্মক যুদ্ধ ও সর্বনাশা সংগ্রাম ইত্যাদি হয়ে থাকে, কিন্তু সেসব কিছুই নেই এখানে। এক্ষেত্রে একটি গুলি নিক্ষিপ্ত হল না। এ কথা সত্যি যে অনেক রণক্ষেত্রে হাইদর তার দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে, কিন্তু এরকম তো অনেক সেনাপতিই দিয়েছে। তার উপর, একটা দূরে প্রদেশের একজন সুদক্ষ প্রশাসক হিসেবেও নিজের কুশলতা দেখিয়েছে হাইদর, কিন্তু তার চেয়েও প্রবীণ এবং অনেক সম্মানের অধিকারী ও ক্ষমতার কেন্দ্রের অনেক নিকটবর্তী আরও তো অনেকে ছিলেন। আরও বলার কথা এই যে, লিখতে বা পড়তে সে জানত না। এসব সত্ত্বেও হাইদর বেশ সহজে ও অনায়াসে উন্নতি করতে লাগল, উন্নীত হতে লাগল, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ তাকে ক্রমে-ক্রমে ধীরে ধীরে অনেক উচ্চে তুলে নিয়ে গেল, এমনকি তার নিজের স্বপ্নেরও যা অতীত ছিল সেই উচ্চতায়।

কী করে এমন হল এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ঐতিহাসিকেরা অপারগ। কিন্তু অলস খোসগল্প এই অপারগতার কথা ভাবে না। ঐতিহাসিকেরা যা লক্ষ করে না, ঐ কাহিনীকারেরা তা লক্ষ করে।—পুত্রদের গ্রহনক্ষত্র পিতার অদৃষ্ট নির্ধারণ করে দেয়। এটা কি সত্যি নয় যে, তার পুত্রের জন্মের মুহূর্ত থেকে ক্ষমতার চূড়ায় ওঠার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল হাইদরের?

## ২২. কথা ও কাহিনী

হাইদর প্রায়ই টিপুর পড়ার ঘরে চুপে-চুপে ঢুকে টিপুর পড়া বা খেলা দেখতেন। টিপু তাঁকে দেখামাত্র ছুটে আসত, দুই হাত বাড়িয়ে হাইদর তাকে তুলে নিতেন। ছাদ খুব উঁচু, টিপুকে অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিতেন, টিপু হাসত, কখনো ভয় পাবার ভান করত।

তাঁর পুত্রকে এই ধর্মীয় শিক্ষার চাপে ফেলার জন্য প্রথম দিকে হাইদর একটু দুঃখ বোধ করতেন, ভাবতেন কী একঘেয়ে ও আনন্দহীন অভিজ্ঞতাই এটা হবে। তিনি স্বয়ং নিরক্ষর, যদিও তা তিনি স্বীকার করতে চাইতেন না, তবুও তিনি তাঁর পুত্রকে শিক্ষিত করার জন্য আগ্রহী, শিক্ষার ও শিক্ষিতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম। তিনি ভাবতেন, শুধু স্তোত্র পাঠ করা ও প্রার্থনা করা তাঁর পুত্রের উপর আরোপ করাটা ঠিক হল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই ভুল ধারণা দূর হল। টিপু ও তার শিক্ষক তাঁকে দেখতে না-পায় এমন ভাবে তিনি তাদের উপর লক্ষ রাখতেন, তিনি শুনতেন টিপুকে গল্পের পর গল্প, কথা ও কাহিনী শোনানো হচ্ছে—তার মাঝেমাঝে আবৃত্তি করা হচ্ছে পদ্য! এই যদি হয় ধর্ম-শিক্ষা, তাহলে হাইদর এ'তে খুব রাজি।

পাহাড়-পর্বতের ও নদনদীর কাহিনী বলা হত টিপুকে, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের আশ্চর্য রহস্যময়তার কথা, গঙ্গা ও কাবেরির অনন্তকালব্যাপী জীবন-দায়িণী বারিধারার কথা, তার পর অশোক ও আকবরের কথা—একজন কী ভাবে পরিহার করলেন যুদ্ধ, অন্যজন কিভাবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করলেন; সংস্কৃত কবি কালিদাস থেকে ও মধ্যযুগের সংস্কারক ও হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব ও একেশ্বরবাদের মর্মকথা প্রচারক কবীর থেকে কবিতা আবৃত্তি; তারপর রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বীর-কাহিনী; ঈশ্বরের পুত্র যিশু সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে সেসব কথা, তার পর পয়গম্বর মহম্মদের কথা; জ্ঞানী গৌতমের কথা; বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রচারক পবিত্র কোরান; কর্মে অনুপ্রেরণা দান করেছে যে ভাগবত গীতা তার কথা, মানবিক চিন্তার উৎকর্ষসাধন করেছে যে উপনিষদ তার কথা, ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা মনুর কথা, যোগসূত্র রচয়িতা পতঞ্জলির কথা। এইসব শেখানো হত টিপুকে।

সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে বিনষ্ট তো হয়ই নি, বরঞ্চ সব একত্র হয়ে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর একত্বে পরিণত হয়েছে। বিজয়ীদের সঙ্গে যে সংস্কৃতি এসে গেছে তরবারির মাধ্যমে তা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি তার সৌজন্য ও শালীনতা দ্বারা তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এসব কথা শেখানো হয়েছে টিপুকে।

## ২৩. পাখিরা বাঁচুক

ধর্ম-শিক্ষার আরও উচ্চতর ও গভীরতর স্তর টিপুর জন্যে আছে—তা জানতেন মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিত। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁরা টিপুর মনে সেই বীজ উপ্ত করার কাজে ও তার মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগ্রত করার কাজে ব্যাপৃত। তার মনে তাঁরা এমন কৌতূহলও জাগাতে চান যাতে সম্পূর্ণ সত্যটি উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত সে প্রশ্ন করে যাবে। এখনো সে ত্যাগ করার জন্যে বা আত্মবঞ্চনার জন্য বা ধ্যান করার জন্যে প্রস্তুত হয়নি। তার আত্মা যদি জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার হৃদয় যদি নির্মল আনন্দে পূর্ণ হয়, তবেই যথেষ্ট। তার শিক্ষকরা জানতেন যে তার মন এখন একটা শিশুতরুর মত। ধীরে ধীরে একে লালন করতে হবে যাতে এ হয়ে উঠতে পারে মহীরুহ—যাতে ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে পারে, ক্লান্ত পথিকদের জন্যে দিতে পারে ফল ও আশ্রয়।

তার শারীরিক দিকের প্রতিও তাঁরা অমনোযোগী ছিলেন না। গোবর্ধন পণ্ডিত ইতিমধ্যেই তাকে যৌগিক ব্যায়াম শেখাতে আরম্ভ করেছেন। খুব ভোরে নিয়মিত টিপুকে অশ্বারোহণ করতে হত, তার সঙ্গী হয়ে থাকত হাইদরের সেনাবাহিনীর অফিসর গাজী খাঁ। হাইদর প্রায়ই এসে যোগ দিতেন, পিতা ও পুত্র গ্রামাঞ্চলে চলে যেত ঘোড়া ছুটিয়ে। কখনো-কখনো টিপুর ঘোড়াকে অনেক এগিয়ে যেতে দিতেন। তার পিতা কৌশল করে তাকে এগিয়ে যেতে দিয়েছে বুঝতে পেরেও টিপু আহলাদিত হত। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাইদরের অশ্ব দিলখুশ এই খেলার মজা বুঝতে পেরে টিপুর ঘোড়ার পাশাপাশি ছুটত—ঠিক সমান গতি রক্ষা করে।

তার জ্ঞানী শিক্ষকদের এক্তিয়ারের মধ্যে যা নেই টিপু সুলতানকে তা শিক্ষা দেওয়া গাজী খাঁ তার কর্তব্যের মধ্যে ধরত।

মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিতের কথা তুলে গাজী খাঁ হাইদরের কাছে অনুযোগ করল, "ওর মাথা ওঁরা নষ্ট করে দিচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের পবিত্র বাজেকথা দিয়ে ওকে এমন জড়িত করে রাখছেন যে, অনেকে মনে করবে আপনি আপনার ছেলেকে একজন ফকির বানাতে চান। তাকে একজন মানুষ বা একজন রাজকুমার বানাবার সময় পাব কখন?"

মৌলভি ওবেদুল্লা প্রতিবাদ করে উঠলেন, "গাজী খাঁ, তুমি যে ন্যায়নিষ্ঠ

মানুষ না, তোমার এই খ্যাতি তুমি অন্যায় ভাবে অর্জন করনি।  শুনেছি, তুমি টিপুকে তীর-নিক্ষেপ এত সুন্দর ভাবে শিখিয়েছ যে তোমার পুত্রকে আরও বেশি দিন ধরে শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তার উপর সে টেক্কা দিচ্ছে। এর কারণ তুমি নিশ্চয় জান। গোবর্ধন পণ্ডিত তাকে যে যৌগিক ব্যায়াম শিখিয়েছেন তার জন্যেই তার মন লক্ষ্যনিষ্ঠ হয়েছে।"

"তাহলে সাঁতারে ও ডুবসাঁতারে টিপু যে আমার ছেলেকে হারিয়ে দিচ্ছে," গাজী খাঁ বলল, "তার কারণও আপনি নিশ্চয় বলবেন যে সত্যের সন্ধান ক্রিয়া তাকে শেখানোর দরুনই সে জলে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছে বলেই তার এই কৃতিত্ব।"

এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যংগ ছিল তা উপেক্ষা করে মৌলভি বললেন, "তা হতে পারে। যদিও আমার মনে হয় যৌগিক ব্যায়ামের দরুন টিপু তার দম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলেই তার এই দক্ষতা।"

"বেশ। বেশ।" গাজী খাঁ জানতে চাইল, "তাহলে কুস্তিতে দৌড়ঝাঁপে ও অন্যান্য খেলাধুলায় টিপুর কৃতিত্বের জন্য আপনি নিশ্চয় ঐ একই কারণ দেখাবেন, মাননীয় মৌলভি ?"

"ব্যাপারটা আমি অত গভীর ভাবে ভাবিনি। আমি ভেবে দেখব, পরে আপনাকে জানাব।" মৌলভি বললেন।

গাজী খাঁ একটু ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতেই বলল, "হাইদর সাহেব, আমার মনে হয় সৈনিকদের যে ধরনের শিক্ষা দিয়ে আসা হচ্ছে তা বন্ধ করে দেওয়া হোক, এখন থেকে তাদের সমর্পণ করা হোক মৌলভি ও তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকজনের হাতে, কেননা দেখা যাচ্ছে তাঁদের দেওয়া শিক্ষায় এত লাভবান হওয়া যাচ্ছে, এত পাওয়া যাচ্ছে ইহলোক ও পরলোকের জন্যে।"

এ কথা শুনে হাইদর হাসতে লাগলেন, মৌলভি গাজী খাঁর মাথায় হাত রেখে তাকে যেন আশীর্বাদ করলেন, বললেন, "তোমাকে ধন্যবাদ, বৎস। ঈশ্বব সব শুনতে পান, হাইদরকে তুমি যা বললে তিনি তোমাকে নিশ্চয় পুরস্কৃত করবেন তার জন্যে।"

মৌলভি চলে গেলে গাজী খাঁ বলল, "আমার ভুল হয়েছে, হাইদর সায়েব।"

"কিন্তু তুমি বল," হাইদর জানতে চাইলেন, "টিপু ভালোভাবেই এগচ্ছে ?"

গাজী খাঁ বলল, "ওর শক্তি আছে, এ কথা সত্যি। ঘোড়ায় চড়া হোক, সাঁতার-দেওয়া হোক, সে সবেতেই কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কিন্তু ঐসব ব্যাপারে সময় নষ্ট না

করলে সে আরও কত ভালো করতে পারত। অত পাণ্ডিত্যে তার দরকার কী?"

"আমি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি, গাজী খাঁ," উত্তর দিলেন হাইদর, "আমি নিরক্ষর, ঈশ্বর-উপাসনায় আমি অশিক্ষিত। আমার জন্যে যা করা হয়েছে আমি আমার পুত্রের জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি করব। আমি পূর্বে যা পাপ করেছি, ভবিষ্যতে যা করব তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে সে।"

"তা হতে পারে", বলল গাজী খাঁ, "কিন্তু তার বংশের মহত্ত্ব হয়তো সে অর্জন করতে পারবে না।"

"সে যদি তার চিত্তের মহত্ত্ব অর্জন করে, তাহলে তাই হবে আমার জীবনের পরম শান্তি" হাইদর বললেন এবং জানতে চাইলেন, "কিন্তু মৌলভির বা পণ্ডিতের ট্রেনিং তোমার ট্রেনিংকে বিব্রত করছে, বলো।"

গাজী খাঁ বলল, "খুব বেশি নয় বটে কিন্তু কিছু-কিছু লক্ষণে আমি চিন্তিত।"

"যথা—"

"যেমন তার আচরণ," গাজী খাঁ উত্তর দিল, "আমি বুঝতে পারিনে ব্যাপারটা। যখন সে কোনো খেলায় জিতে যায় তখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্যে না-পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। সে উগ্র হয়ে উঠে না, ব্যঙ্গ করে না, কোনোরকম উল্লাসও প্রকাশ করে না। যখন সে হেরে যায় তখন সে হাসে এবং তার পরাজয়কে অভিনন্দন জানায। তার বয়সী ছেলের পক্ষে এ রকম আচরণ অস্বাভাবিক। কলাওলার ঝুড়ি থেকে সে কলা তুলে নেয় না, দুধওলার বালতিতে ইঁট ছোড়ে না, বাচ্চাদের উপর অত্যাচার করে না। হার ও জিৎ দুইই তার কাছে সমান। গতকাল," গাজী খাঁ বলতে লাগল, "সুলতান একটা পাখিকে গুলি করতে অস্বীকার করল, কোনো জীবন্ত লক্ষ্যে সে গুলি করবে না বলল।"

"ভালো কথাই। পাখিরা বাঁচুক। ঈশ্বরের জগতের অন্যান্য জীবকে বিনাশ করার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি হয়নি।" হাইদর বললেন, "যাই হোক। গুলি করা তাকে শিখতে হবে কেন। আমার মনে হয় আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, রক্তপাত হয় এমন কোনো খেলায় তাকে যোগ দিতে দিয়ো না।"

"সে হচ্ছে একজন অভিজাত পুরুষের সন্তান। আপনি কি চান যে তার বয়সী অন্য ছেলেদের থেকে সে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে?"

হাইদর বললেন, "গাজী খাঁ, এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা অনুগ্রহ করে আমার উপর ছেড়ে দাও। এমন অনেক কারণ আছে যা আমি জানি, আর আমার মন জানে।"

## ২৪. উদ্ধার

১৭৬১ সালে মহীশূর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের ঠিক আগে হাইদরের জীবনে এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। তাঁর অজ্ঞাতসারেই অতি আচমকা প্রাসাদে এক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের দল বেশ পুষ্ট করে নেয়। হাইদরের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাত্রিকালে তাঁকে পলায়ন করতে হয়। যে কয়জন অশ্বারোহী তাঁর ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক নিয়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল তাঁদের কাবেরী নদীর শান্ত স্রোত সাঁতার দিয়ে পার হতে হয়। বাঙ্গালোরে নিরাপদ স্থানে পোঁছনোর আগে পর্যন্ত তিনি থামেন না, আশি মাইলের এই দীর্ঘপথ তিনি একটানা পার হন।

তাঁর দশ বছর বয়সী পুত্র টিপু সুলতান তাঁর পাঁচ বছরের ভাই আবদুল করিম সহ রয়ে গেছে শ্রীরঙ্গপত্তমে। ফকর-উন-নিসা তাঁর বাবাকে দেখতে গিয়েছে, সুতরাং নিরাপদে আছে। চক্রান্তকারীরা শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের অভ্যন্তরে মসজিদের কাছে টাওয়ার হাউসের সর্বোচ্চ তলায় শিশু দুটিকে নিয়ে গেছে। এদের প্রতি তারা সদয় ব্যবহার করে, এরা সঙ্গে যা-খুশি নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কড়া পাহারায় তাদের থাকতে হয় প্রতীভূ রূপে—এদের পিতা নিশ্চয় এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা নেবেনই, তার সফলতা ও বিফলতার উপর নির্ভর করছে এদের ভাগ্য। তাদের সঙ্গে একজন ভৃত্য নেবার অনুমতি তারা পেয়েছিল, তাকেও এদের সঙ্গে আটক করা হয়। গোবর্ধন পণ্ডিত, মৌলভি ওবেদুল্লা ও গাজি খাঁ এবং আরো অনেক পরিচারক ও পরিচারিকা যারা ডিণ্ডিগুল থেকে আসে তাদের কারও প্রতিই দুর্ব্যবহার করা হয় না। এরা কেউ জানত না বাচ্চা দুটিকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের অগণিত ঘরের জানালায় তারা খোঁজ করেছে।

যে ঘরে ভৃত্য-সহ ছেলে-দুটিকে রাখা হয়েছিল সেই ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু অন্ধকার ও আনন্দহীন। ঘরে একটি লোহার দরজা, সব সময় তা বন্ধ এবং সৈনিকের পাহারা বসানো। কোনো জানালা নেই। ছাদের একটু নীচে একটা ভেন্টিলেটর—সেই পথেই যা আলো আসে।

লোহার খাটের উপর দাঁড়াল ভৃত্যটি, তার কাঁধে উঠে টিপু ভেনটিলেটরের গরাদে ধরল। কিন্তু বৃথা। ঐ মরচে-পড়া গরাদে যদি মুচড়ে দুমড়ে ভেঙে ফেলাও যেত, তাহলেও এক শ ফুটেরও বেশি নীচে ঐ পাথুরে স্তূপের উপর পড়তে হত। পাথরের ঐ স্তূপের ধারেই হচ্ছে মসজিদ, টিপু জানত যে মৌলভি ওবেদুল্লা ঐ পথেই যাবেন, কিন্তু ঐ গরাদে ধরে ঝুলতে-ঝুলতে টিপু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে সে আবার উঠল, বিছানার চাদর শক্ত করে বাঁধল গরাদের সঙ্গে, কয়েক বারের চেষ্টায় চাদরের গ্রন্থিতে সে নিজেকে অস্বস্তিকর অবস্থায় বসিয়ে নিতে পারল। তার সংগে ছিল তীর ও ধনুক—অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এসব সে নিয়ে আসতে পেরেছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে মৌলভি ওবেদুল্লাকে যেতে দেখল। তাঁর সংগে আরও দুজন ছিল, টিপু তাদের চেনে না। তীরের সঙ্গে সে একটা বার্তা বেঁধে নিল, তাতে লেখা ছিল তারা কোথায় আছে, তার বাবা-মাকে যেন খবর দেওয়া হয় যে, তারা বেঁচে আছে, ভালো আছে, সুখে আছে। মৌলভি ওবেদুল্লার কাছাকাছি গিয়ে পড়ল তীর, তাঁর সঙ্গীদের একজন সেটা কুড়িয়ে নিল। মৌলভি ওবেদুল্লা সেটা কেড়ে নিয়ে পড়লেন, তারপর পকেটে রাখলেন। তিনি যদি মসজিদের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন তবে সদাশয় ভগবান সব বুঝতে পারবেন ও ক্ষমা করবেন। সম্ভ্রান্ত মৌলভি সায়েব প্রায় ছুটে গৃহে গেলেন, এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্থ গৃহের সকলকে জানালেন যে, বাচ্চা-দুটো বেঁচে আছে। গাজি খাঁকে তিনি বললেন তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ফকর-উন-নিসাকে খবর দিতে যে তাঁর ছেলেরা ভালো আছে। ফকর-উন-নিসাকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন শ্রীরঙ্গপত্তমের ধারে-কাছে না-আসেন, নিজেকে যেন লুকিয়ে রাখেন। গাজী খাঁ রাজি হল, কিন্তু নিজে গেল না, এক বার্তা-সহ এক ভৃত্যকে পাঠাল। অন্যান্য অনেক কাজের বিলিব্যবস্থার জন্যে সে থেকে গেল।

গভীর রাত্রে দেয়ালের গায়ে লম্বা একটা মই লাগানো হল। নিজের গায়ে দড়ি জড়িয়ে নিয়ে একটা লোক উঠে গেল সেই মইয়ের ডগায়। একটা হাতুড়ি দিয়ে গজাল পুঁততে পুঁততে বিপজ্জনক অবস্থায় সে ক্রমশ আরো উঁচুতে উঠতে লাগল। ভেনটিলেটরের গায়ে মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনতে পেয়ে ভৃত্যটি টিপুকে জাগাল। চাদরের সেই গ্রন্থি বেয়ে টিপু উঠে গেল। দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হল তাকে, সে তা জাপটে ধরল। ওপাশে লোকটি আর উঠতে না-পেরে ভেনটি-লেটরের প্রায় দশ ফুট নীচে রইল। কেননা, কেউ যাতে আর উঠতে না পারে

তার জন্যে ভাঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। দড়ি ধরে টিপু টানল, দেখল, তার সংগে একটা ছোট ধারালো করাত বাঁধা, ভেন্টিলেটরের লোহার গরাদে কাটার জন্যেই অবশ্য। ভৃত্যটি বিছানার সংগে দড়ি বাঁধল। গরাদে কাটার শব্দ যাতে কেউ না-পায় সে জন্যে সে বেশ কাশতে লাগল। কিন্তু এর দরকার ছিল না। তাদের ও প্রহরীর মাঝখানে মস্ত লোহার দরজা, তার উপর বজ্রপাতের শব্দসহ সারারাত বৃষ্টিপাত চলেছে। টিপু যে শব্দই করুক, এ'তে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। তার উপর মরচে-পড়া গরাদেও সহজেই কেটে গেল। দড়ির একপ্রান্ত খাটের সঙ্গে বাঁধা, ভৃত্যটিও শক্ত করে ধরেআছে, অন্য প্রান্ত ধরেআছে গাজি খাঁ ও তার সংগীরা, দেয়াল থেকে বেশ তফাতে, যাতে ঐ কাঁচের টুকরো থেকে দূরে থাকে। অনেক কষ্টে টিপুর পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল করিমকে, উভয়কে একত্র বেশ ভালো করে বেঁধে দেওয়া হল। ধীরে ধীরে করিম-সহ টিপু দড়ি বেয়ে নামতে লাগল। যে সময়টা যুগ যুগব্যাপী দীর্ঘকাল বলে মনেহল। তার পরে টিপুরা পেঁছে গেল গাজি খাঁর হাতের মধ্যে। দড়ির ঘর্ষণে তার হাত রক্তাক্ত। তার চোখে হয়তো জল ছিল, কিন্তু বৃষ্টিতে তার সর্বাংগ সিক্ত। চোখের জল হচ্ছে বিজয়ীর অশ্রু ও ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাবার চিহ্ন। সে তার ভাই করিমকে চুম্বন করল।

ভৃত্যটিকে আনা গেল না। ভেন্টিলেটরের ফোকর দিয়ে তার শরীর গলবে না। সে দড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে, গাজি খাঁ তা টেনে নিয়েছে। সে বিছানা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যেন ঘুমিয়ে আছে ছেলে-দুটি। কিন্তু সকাল হলে সব ফাঁস হয়ে গেল। ভৃত্যটিকে ফাঁসি দেওয়া হল। দরজার প্রহরীদেরও হল সেই দশা।

অল্পদিনের মধ্যেই বিজয়ী বীরের মতন ফিরে এলেন হাইদর। পরিবারের পুনর্মিলন ঘটল। বিশ্বস্ত ভৃত্যটির মৃত্যুর বদলা নিয়েছিলেন হাইদর।

## ২৫. খোদা, আমার অর্ঘ তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ

তার শৈশবকালে আবদুল করিমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপারটি ছিল তার হাসি। তার চেহারা ছিল এলোমেলো, তার গায়ের রং ছিল ঝাপসা, কিন্তু তার হাসি তার মুখমণ্ডলকে এমনই উদ্ভাসিত করে দিত যে সকলের হৃদয় তা স্পর্শ করত। এই হাসি প্রথম লক্ষ করে টিপু সুলতান, তার অসময়ে ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন সে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দোল খাচ্ছে তখনই এই হাসিটা দেখে টিপু। টিপু এমনই উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে ওঠে যে, তার বাবা মা তাতে বিচলিত হন, ফকর-উন-নিসা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন, বাড়ির লোকজন ঐ ঘরে ছুটে যায়, একজন ভৃত্য ছুটে যায় হাইদরের কাছে। টিপু এমন শান্তপ্রকৃতির, সে যদি এমন চেঁচিয়ে ওঠে তাহলে এ'তে সন্ত্রস্ত হবার কারণ আছে বলে সকলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তার ভাইয়ের হাসি দেখে সে এমনই পুলকিত হয়েছিল যে, সকলে সে আনন্দের ভাগ পাক এই ছিল তার ইচ্ছে। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবং করিমের পুনরায় হাসি দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। সে হাসল, দুই চোখ বিস্ফারিত হল, মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল—এই উষ্ণতায় সকলে নিজেদের যেন উত্তপ্ত করে নিল। ঠিক এই সময় থেকে চিকিৎসকেরা আশার আলো দেখলেন পিতা-মাতাও নিশ্চিত হলেন যে তাঁদের পুত্রটি বাঁচবে।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্রটির জন্য যে গৌরব ও যে আনন্দ হাইদর অনুভব করলেন তার তুলনা হয় না। আকাশের দিকে দুই চোখ তুলে তিনি প্রার্থনা জানালেন। তাঁর পুত্র রক্ষা পেয়েছে বলে তিনি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেন। পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্যে তিনি কামনা জানালেন। তিনি তার যশ ও খ্যাতির জন্যে প্রার্থনা করলেন। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর প্রার্থনা ঠিক জায়গায় পেঁছেছে।

ডিণ্ডিগুল থেকে প্রায়ই হাইদরকে অন্যত্র যেতে হত। ফিরে এলে তিনি তাঁর এই আদরের পুত্রটির কাছ-ছাড়া হতেন না। করিমকে কোলের মধ্যে নিয়েই তিনি সরকারি খবরাখবর জানতেন, দর্শনার্থীদের সংগে দেখা করতেন, এবং চিঠিপত্র লেখাতেন। করিম কাঁদতে থাকলে তাকে নিয়ে যাওয়া হত না, হাতের কাজই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেত। কান্না থামছে না দেখলে হাইদর তাকে

কোলে নিয়ে ফকর-উন-নিসার কাছে পৌঁছে দিতেন। এক সময়ে তাঁর প্রথম পুত্রের প্রতি সমান আকর্ষণের দরুন এই পক্ষপাতিত্বের জন্য হাইদরকে তিরস্কার করেন ফকর-উন-নিসা।

হাইদর জবাবে বলেন, "ও আমাদেরই, কেবল আমাদেরই।"

আবদুল করিম হেসেই চলেছে. সে হাসি এমনই যে তা সকলকে আকৃষ্ট করে মোহিত করে বিগলিত করে। অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে ফকর-উন-নিসা লক্ষ করলেন সেই হাসি ভ্রূকুটিতে পরিণত হল। তাঁর এই নবজাতকের মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে এই সন্দেহ যখন তাঁর কানে প্রবেশ করল করিমের বয়স তখন তিন। ছেলেটি শ্লথ ও শিথিল, কিন্তু কখনো-কখনো তার মধ্যে উত্তেজনা এসে যেত, দুই চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত ভয়ঙ্কর, তার হাত কাঁপত, দাঁতে লেগে যেত দাঁত, কপাল ভিজে উঠত ঘামে। "হে খোদা, হে আল্লা, আমার ছেলেকে রক্ষা কর, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করি"—ফকর-উন-নিসা অবিরত করে যেতেন প্রার্থনা। প্রথম প্রথম তিনি তাঁর আশঙ্কাকে বিশেষ আমোল দেননি, তিনি মনে করেছিলেন প্রতিটি শিশু নিজের-নিজের মতন ভাবেই বড় হয়ে উঠবে। তিনি আরও ভেবেছিলেন যে, কোনো কোনো শিশু প্রথম দিকে শ্লথ থাকে, পরে তা সেরে যায়। কিন্তু করিমকে মাঝেমাঝেই যে উৎকট উত্তেজনায় পেয়ে বসে, তা দেখেই তিনি ভীত হয়ে ওঠেন। অনবরতই তিনি প্রার্থনা করে চলেন। কিন্তু করিমের ঐ ধরনের উত্তেজনা ঘন-ঘন হতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে চলে দেখে তিনি হাইদরকে তাঁর মনের কথা বললেন। হাইদর দেখলেন, তিনি যেন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি চিকিৎসকদের ডাকালেন। তাঁরা এলেন প্রথমে ডিণ্ডিগুল থেকে, তারপর শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে, তার পরে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। সব রকমের চিকিৎসা হল। মসজিদে মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা করা হল। জ্যোতিষীদের আনা হল। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না।

ফকর-উন-নিসা তীর্থযাত্রায় গেলেন সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার সমাধি-ভূমিতে। তাঁর পুত্রটি যেন নিরাময় হয় এই প্রার্থনা তিনি করে চললেন দিনের পর দিন। তিনি তাঁর প্রার্থনার উত্তর প্রার্থনা করতে লাগলেন। বাতাস বইতে লাগল হু হু শব্দে। এ ছাড়া আর সব নিশ্চুপ। সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকে তাঁর শয়নকক্ষে প্রতিরাত্রে যে মোমবাতি জ্বলত তিনি সেই আলো সাক্ষি রেখে প্রার্থনা করতেন। মোমবাতির শিখা কাঁপত যেন তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রে।

মাসের পর মাস করিমের অবস্থা শোচনীয় হতে লাগল। যে কোনো শব্দে সে বিচলিত হত, উত্তেজিত হয়ে উঠত। যে কোনো জিনিস রঙিন হোক বা তার অচেনা হোক তার সামনে চকচক করে উঠলে সে ভয়ে কেঁপে উঠত। একটা খেলনা যদি ভাঙত, একটা গেলাস বা পেয়ালা যদি পড়ে যেত তখনি শুরু হত তার কম্পন। ফকর-উন-নিসা তখন তাকে বুকে চেপে ধরতেন কাঁপুনি না-থামা পর্যন্ত। এ রকম সময়ে হাইদর যদি তাকে ধরত তবে সে তার দুর্বল হাত ছুড়ে আপত্তি জানাত। হাইদর বিরক্ত হতেন। হাইদরের তবু দৃঢ় ধারণা ছিল এটা একটা সাময়িক অবস্থা। কিন্তু তা নয়। করিম কখনোই একটা পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হল না।

কিন্তু শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গে যখন টিপুর সঙ্গে সে বন্দী হয়েছিল, আশ্চর্যের ব্যাপারই, তখন ঐ অচেনা পরিবেশে সে কিন্তু ছিল খুশি ও স্বাভাবিক। টিপু যখন দড়ি বেয়ে তাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এল তখন সে এমন ভাব দেখাল যেন সে এই অভিযানটিতে আনন্দ পাচ্ছে। টিপুর রক্তাক্ত হাতে সে চুমু খেয়েছে, এবং নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গাজি খাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। তা ছাড়াও, দুই ভাই যখন গাজি খাঁর সঙ্গে লুকিয়ে ছিল তখনও সে বেশ ভালো আচরণ দেখিয়েছে। পিতা-মাতার সঙ্গে পুনর্মিলনের সময়েও কোনো ভীতিপ্রদ উত্তেজনা দেখায়নি। যে কোনো স্বাভাবিক শিশুর মতই সে খুশি-ভাব দেখিয়েছে। তার বাবার সম্মানে যে কুচকাওয়াজ হয় সে তা দেখেছে, সে দেখেছে এর পরই তার পিতা মহীশুর সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব নিলেন। সে তখন আনন্দে হাততালি দিয়েছে, আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়েছে। সে নিজেকে ও পরিবারের সকলকে রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হতে দেখে, প্রাসাদের জাঁকজমক দেখে খুশি হয়েছে।

ফকর-উন-নিসাকে হাইদর বললেন, "ঈশ্বর আমাকে রাজসিংহাসন দিয়েছেন, আর আমার ছেলেকে ফিরে দিয়েছেন।"

ফকর-উন-নিসা কথা বললেন না, মনে-মনে প্রার্থনা জানালেন।

ছয় মাস পরে, করিম একটি তরবারি তুলে নিল, প্রাসাদে যত ছবি টাঙানো ছিল, কেটে ফেলল তা থেকে সব চোখ। কারণ জানাল সে, বলল, "ওরা আমার দিকে চেয়ে আছে, ঐ অচেনা চোখগুলো।"

তার পর সে নিয়ে এল চক, প্রাসাদের দেয়ালে আঁকতে আরম্ভ করল চোখ। তার পর সে তাদের উপর কিল মারতে শুরু করল, হাত রক্তাক্ত হল। তাকে দিনে রাত্রে সকলে নজরে রাখে। তবুও সবার নজর এড়িয়ে বাগানে চলে যায়, গভীর

জলে ঝাঁপ দেয়। সে সাঁতার জানত না। যখন তার অবস্থা উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং সকলকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলত কতটা, তা সে তার স্বাভাবিক অবস্থার সময়েবেশ বুঝতে পারত। অনেক সময়ে সে অনুতপ্ত হত। কিন্তু বেশি গুরুত্ব পাবার জন্যে সে ইচ্ছে করে উত্তেজিত হয়ে উঠবার ভানও করত। সে টিপুর বইয়ের সংগ্রহ কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে, এর মধ্যে অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপিও ছিল, টিপুর প্রত্যেক জন্মদিনে মৌলভি ওবেদুল্লা এগুলি উপহার দিয়েছিলেন টিপুকে। টিপু এ'তে কষ্ট পায়, কিন্তু কিছু বলে না, আদর করে করিমের গলা জড়িয়ে ধরে—যেন সে বুঝেছে কেন এমন হচ্ছে। চোখে জল আসত করিমেরই। কিন্তু হঠাৎই করিমের উত্তেজনা যখন এসে পড়ত তখনকার কথা আলাদা, অন্য সময় করিম ছিল শান্ত নম্র।

এর পরে তার উত্তেজনা আরো গুরুতর হয়ে উঠে। চিকিৎসকের পর চিকিৎসক আসতে থাকেন। কেউ দূর থেকে, কেউ-বা কাছ থেকে আসেন। কনস্টানটিনোপলের খালিফ তাঁর নিজস্ব চিকিৎসককে পাঠান। অন্যান্য অনেকে আসেন মসকট থেকে, পারশিয়া থেকে, এমনকি ফ্রান্স থেকে। প্রত্যেকেই আশা দেন, কিন্তু আরোগ্য দেন না কেউ।

হাইদরের মনের মধ্যে যে ক্রোধ জমে উঠছে তার কোনো পরিমাপ নেই। এই রকম মর্মান্তিক অবিচার তিনি মেনে নেবেন কী ক'রে! একজন সামান্য জোয়ান অথবা একজন দীন কিষাণ অজস্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে, সেই সন্তানেরা একে একে সকলেই উৎকৃষ্টতর স্বাস্থ্য পেতে পারে, কিন্তু তিনি একটা সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও, অনেকের জীবন তাঁর জিম্মায় থাকা সত্ত্বেও, তাঁর প্রতি এমন নির্দয় ব্যবহার করা হবে! মৌলভি ওবেদুল্লা একদিন যখন বলেন, "ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিস্ময়জনক" তখন হাইদরের এক বিকৃত ইচ্ছা জেগে ওঠে, ঐ শীর্ণ ও বৃদ্ধ মৌলভিকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে জাগে। দেখতে ইচ্ছে হয় যখন মৌলভির শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে তখনও তিনি ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক অভিপ্রায়ের কথা ভাবেন কিনা। রাজা হচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি, পৃথিবীতে তাঁর কাজ করার জন্যেই রাজারা প্রেরিত—এ কথা হাইদর মানেন। কিন্তু, তিনি নিজেও তো একজন রাজা। তিনি নিজে যখন বিড়ম্বিত হচ্ছেন তখন কি তাঁকে মহানুভবতা দেখাতে হবে? কী পাপ তিনি করেছেন, ঈশ্বরের কোন্ কাজে তিনি অযোগ্যতা দেখিয়েছেন, যার জন্যে নাকি তাঁর উপর এই প্রতিহিংসা নেওয়া হচ্ছে! তিনি ঈশ্বরের মহিমাই প্রচার করেছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা

করেছেন, তাকে উপহার দিয়েছেন মন্দির মসজিদ, এমনকি তাঁর প্রথম পুত্রকে তিনি ঈশ্বরসেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন। তার কি এই পুরস্কার! ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের মধ্যে কি বিচার ব'লে কিছু আছে?

প্রতিটি হাসির আড়ালে তিনি দেখতে পান ব্যঙ্গ ও কৌতুক। করিমের এই অসুখ বেহেস্তের নিষ্ঠুরতা ভিন্ন কিছু নয়। হাইদর ঈশ্বরকে ভয় করে চলতে লাগলেন, আর ভালোবাসা রইল না তাঁর মনে।

"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাকে দান করেছি, খোদা," ক্ষোভে হাইদর বললেন, "কিন্তু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছ। আমার অর্ঘ প্রত্যাখ্যান করেছ। বেশ, তাই হোক। তবু আমি তোমাকে অনুসরণ করব, তোমাকে রুষ্ট করব না। কিন্তু আমার কাজের জন্য আমি টিপুকে ফিরিয়ে নিলাম।"

## ২৬. পথের শেষ, বিদায়

ক

"আমার কাজের জন্য আমি টিপুকে ফিরিয়ে নিলাম", বলেছিলেন হাইদর।

এইভাবে টিপু সুলতানের ধর্মীয় শিক্ষার ছেদ পড়ল, সেইদিন থেকে। এখন থেকে তাকে তৈরি করা হবে সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে—হাইদরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে।

সাশ্রু চোখে টিপুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিত টিপুর দ্বাদশ জন্মদিনে। তাঁরা এর সঙ্গে ছিলেন সাত বছর। এঁরা দুজনই হাইদরের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন ও পেনসন নিয়ে চলে গেলেন। ওবেদুল্লা এবার একটা ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন, তিনি তৈরি করবেন একটি দরগা। গোবর্ধন পণ্ডিতের বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই, যদিও প্রথমেই তিনি যেতে চান হৃষিকেশে। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলেন।

"সে ঈশ্বরেরই সন্তান হয়ে উঠবে," বললেন মৌলভি ওবেদুল্লা, গোবর্ধন পণ্ডিত বুঝলেন মৌলভি টিপুর কথাই বলছেন।

গোবর্ধন পণ্ডিত বললেন, "যথার্থ।"

প্রত্যেকে নিজ-নিজ পথ নিলেন। দুজনেই টিপুর শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা উভয়ে উভয়ের কাছ থেকেও অনেক শিখেছেন। একটা পরম সত্য তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, ঈশ্বরের রাজত্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তাঁরা আরও বুঝেছেন যে, প্রচলিত দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা নানা পন্থা গ্রহণ করলেও, তার মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ও পরস্পরবিরোধী অভিমত বা অভিপ্রায় নেই, তারা একটিমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের এক-একটি অংশ। উভয়ে শান্তিতে বিদায় নিলেন। তাঁরা এ কথা জেনে গেলেন না যে, পরবর্তী কালে দূর দেশ থেকে আগত এক শত্রুশক্তি, যারা নাকি ইতিমধ্যে ভারতের উপকূলে উপনীত, এ দেশে এসে এমন প্রচার আরম্ভ করবে যাতে হিন্দু ও মুসলমানে বিভেদ আরম্ভ হবে এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ভাই।

খ

দুই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিদায় নেবার পর গাজি খাঁ হয়ে উঠলেন টিপু সুলতানের একমাত্র শিক্ষক।

দুঃখের সংগে হাইদর বলেছিলেন, "মনে রেখো, আমার পুত্র বেশি নয়। এর যেন সাহস ও সংকল্প কম না হয়। এ'কে এক শক্তিশালী মানুষ ক'রে তোলো, এবং আমি এ'কে করে তুলব শক্তিশালী রাজা।"

গাজি খাঁ নিজের বুকে হাত রেখে বলেছিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

হাইদর তার দিকে তাকালেন, কথা বললেন না।

# খণ্ড ৪

---

## স্বপ্ন ও স্মৃতি

## ২৭. আমরা সহ্য করব

টিপ্‌ সুলতান একাই ঘোড়া দাবড়িয়ে চললেন। তার সংগীরা তার অনুগমন করতে থাকলেন একটু তফাতে থেকে। ভারি মখমলী আকাশ ভেদ করে মধ্যরাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ ভীষণভাবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। ক্রমে ক্রমে এল বর্ষণ, ভোর হয়ে আসছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল, বইতে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়া। টিপুর বুকের মধ্যে ঝঞ্চা কিন্তু তখনও তাণ্ডব করে চলেছে।

কয়েক ঘণ্টা আগে মাত্র পুরনাইয়ার কাছ থেকে বার্তাবহ এসে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছে। এক ভীষণ নিঃসংগতায় ও হতাশায় আচ্ছন্ন হয়েছে টিপু। সে তার পিতাকে ভালোবাসত, যিনি ছিলেন তার পিতারও অধিক। তিনি ছিলেন তার সংগী, তার পথপ্রদর্শক, তার রাজা এবং তার সর্বাধিনায়ক। তারা পাশাপাশি যুদ্ধ করেছে, এগিয়ে গিয়েছে; উভয়ে একত্রে ভাগাভাগি করে নিয়েছে গৌরব ও বিজয়—এবং কখনো কখনো বা হতাশা; একজন ছিল অন্যজনের আনন্দ ও অহংকার। একজন রক্ষা করত অন্য জনকে বিভিন্ন অভিযানে ও নানাপ্রকারের সামরিক উত্থান-পতনে। তার তাঁবুতে টিপু নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল—অতীতের নানা স্মৃতি মন্থন করতে লাগল। সেইসংগে তার যাত্রার প্রস্তুতিও হতে লাগল।

যখন সে তার অশ্ব দ্বিতীয়-দিলখুশের দিকে অগ্রসর হল, তখন তার চোখ থেকে নেমে এল অশ্রুধারা। এই অশ্বটি অনেক রণক্ষেত্রে তাকে নিয়ে গিয়েছে সগৌরবে। এবার সে তাকে নিয়ে যাবে এক শোকার্ত যাত্রায়। দ্বিতীয়-দিলখুশ হচ্ছে হাইদরের প্রিয় অশ্ব দিলখুশের বাচ্চা। অশ্ব এবং তার মানব উভয়ে উভয়ের বেদনা বুঝত, তাদের মধ্যে বন্ধন ছিল এমনই নিবিড়। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় টিপু তার সম্মুখে পথ দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝার পরোয়া না-করে দ্বিতীয় দিলখুশ তীব্রবেগে এগিয়ে চলল।

যে বেদনা টিপুকে আচ্ছন্ন করেছে, যে দুর্ভাবনায় সে অভিভূত, যে নিঃসঙ্গতায় সে জড়িত, তারও উর্ধ্বে ছিল তার কিংকর্তব্যবিমূঢ়-ভাব; যে প্রশ্ন

তার মনে আসছে সে তার উত্তর চায়। অদৃশ্যলোক থেকে অজানা কে যেন শব্দহীন কণ্ঠস্বরে চীৎকার করে জানাচ্ছে সেই প্রশ্ন। কথা দিয়ে এই প্রশ্ন সে সাজিয়ে নিতে পারছে না বটে, কিন্তু সে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে।

"কোথায় চলেছি, কী জন্যেই বা যাচ্ছি আমি?" নিজেকেই সে জিজ্ঞাসা করল।

তার পিতা তাঁর নিজের ও তাঁর পুত্রের গৌরবের জন্যেই সংগ্রাম করেছেন। কিছুই ছিল না এমন দশা থেকে তিনি নিজের একটা রাজ্য তৈরি করে তোলেন, তাকে বড় করে তোলেন; দুর্বৃত্তের হাত থেকে, পতনের হাত থেকে, দৌরাত্ম্যের হাত থেকে সেটা যথাসম্ভব নিরাপদ করে তোলেন। তিনি অবিরাম সংগ্রাম করেছেন, শেষের দিকে তাঁর এমনই উচ্চাভিলাষ নিয়ে লড়াই করেন যাতে তিনি তাঁর পুত্রের জন্যে এক গৌরবময় উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেন।

"কিন্তু আমি লড়াই করব কিসের জন্য?" এই প্রশ্নটাই টিপুকে অনবরত বিব্রত করে চলেছে।

"আমার পিতার রাজ্য রক্ষার জন্য?" "আমার নিজের গৌরবের জন্য?" "আমার পুত্রদের গৌরবের জন্য?" "একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য?"

না। এটা ঠিক উত্তর নয়। এটা একটা প্রশ্নও নয়। সে জানত যে, সে যা ধারণা করতে পারছে না, ভাষা দিয়ে যা সে প্রকাশ করতে পারছে না, যা সে এখনই বুঝে উঠতে পারছে না, এ সবই তাকে নিয়ে চলেছে এক অজানা অদৃষ্টের দিকে।

শিশুকালে সে ভগবানের কাছে প্রদত্ত হয়। সে সময়ে সে পুস্তকাবলীর ও স্নেহময় শিক্ষকদের মধ্যে কাটায়। তাঁরা তাকে যা শিখিয়েছেন তা হল সর্ব বিষয়ে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া, মায়াময় হওয়া ও ন্যায়বিচারে একাগ্র হওয়া। গোপনে অন্যায়ের মদত দেওয়া তার কাজ নয়, রাজসিক ক্ষমতা ও লালসাপূর্ণ উচ্চাভিলাষও তার জন্যে নয়। সেই শিশুবয়সে সে কখনো দেহে বা মনে কোনো অধিকার অত্যাচার কিংবা উদ্বেগ ভোগ করেনি। তার সুখ-দুঃখ সবই ছিল স্বাভাবিক, তার জন্যে সে কখনোই চিন্তা বা চেষ্টা করেনি। যদি কখনো সে কাঁদত তীব্রভাবে, তখন দেখা যেত আহত হয়ে একটা চড়ুই পাখি পড়েছে বাগানে, যখন তাকে সে পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলত তখন আনন্দ যেন তার ধরে না। তার পিতা যে ঝড়-ঝঞ্ঝা ভেদ করে চলেছে তার প্রভাব কখনো তার উপর পড়েনি, সে থাকত শান্তিতে—মাকে বাবাকে ছোট ভাই করিমকে ও

শিক্ষকদের ভালোবাসার মধ্য দিয়েই কাটত তার দিন। কিন্তু তার মধ্যেই এমন একজনের উপস্থিতি অনুভব করত যাকে নাকি সে ভালও বাসত খুব, সে একজন হচ্ছেন ঈশ্বর।

কিন্তু বয়স যখন তার বারো তখন তার আলো নিভে গেল। তার স্নেহশীল শিক্ষকেরা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। হাইদর তখন বুঝেছেন যে করিমের অসুখের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পুত্র টিপুকে সন্ত ও সাধুরূপে পরিণত করার শপথের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। পনেরো বছর বয়সে টিপু যুদ্ধের জন্যে শিক্ষা পেতে আরম্ভ করে এবং সর্বদা তার বাবার পাশে পাশে থাকে।

টিপুর বয়স বত্রিশ হল। সতেরো বছর ধরে টিপু তার বাবার জন্যে সংগ্রাম করেছে এবং তাঁর বিশ্বস্ততম জেনারেল হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে পরোয়া করে না এমন দুর্জয় সাহস নিয়ে সে তার পিতার রাজ্য রক্ষার জন্যে পিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, রাজ্য বিস্তৃত করেছে, শত্রুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। তার কর্তব্যকাজ হিসাবেই সে সংগ্রাম করেছে, এ'তে আনন্দও পায়নি, এ'তে আগ্রহও তার ছিল না, এ সত্ত্বেও সে ঘোরতর ভাবেই সংগ্রাম করেছে। কোনো সংগ্রামে বিজয়লাভের পর তার তাঁবুর চারদিকে যখন আনন্দ-উল্লাসের সংগে সকলে জমায়েত হত, যখন মদ্য আনীত হত, তখন সে অভিনন্দন গ্রহণ করত বিনীত ভাবে, কিন্তু মদ্য গ্রহণ করত না; তার প্রথম মনোযোগ গিয়ে পেঁছিত উভয় পক্ষের মৃতদের এবং আহতদের প্রতি। প্রথম প্রথম, যুদ্ধের বীভৎসতা, নির্দয় হত্যা ও খুন তাকে বিদ্রোহী করে তুলত। নিজের হাতে সে কী করে একটা জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে পারে যা নাকি স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তার অন্তরাত্মা এ'তে কম্পিত হয়ে উঠত। সে তার বাবার কাছে আর্জি করেছে তাকে এ কাজ থেকে রেহাই দেবার জন্যে। সে নতমস্তকে থেকেছে, কিন্তু তার বাবা যখন তাকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন তখনও সে ভীত হয়নি। তার পিতার ক্রোধের সম্মুখে এক-পা নড়েনি। সে যুদ্ধের বিরোধিতা করবে বলায় তার পিতা ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা বলে ভয় দেখানো সত্ত্বেও তার সংকল্প থেকে সে চ্যুত হয়নি। কিন্তু অবশেষে তার পিতার চোখের জলের কাছে সে পরাস্ত হয়েছে। তার পিতা তাকে বলেন মহীশূরের ভিতরে ও বাইরে কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তিনি আছেন। তাঁর ছোট ছেলেটি অসহায়, এই বিপৎকালে তিনি যদি তাঁর বড় ছেলের সমর্থন না পান তা হলে তাঁকেও কতটা অসহায় হয়ে পড়তে হবে। গাজি খাঁকে টিপু ভালোবাসে, সেও একটি

পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে বলে। ফকর-উন-নিসাকে টিপু সবার অধিক মর্যাদা দিত, টিপু যখন তাঁর কাছে গিয়ে সহানুভূতি ও সমর্থন চায় তখন তিনিও চোখের জল ফেলেন। ছেলেকে তিনি দুই হাতে বুকের মধ্যে নেন, চোখের জলে ভেজা দুই গাল তাঁর, তিনি অস্ফুট গলায় বলেন, "তোমার বাবা যা আদেশ করেন তা মান্য কর, তুমিই তাঁর একমাত্র সম্বল, আমি তাঁকে যোগ্য উপহার দিতে পারিনি ; তুমিও তেমন কোরো না।" না, এর বেশি তিনি আর বলবেন না, নিজের উক্তির ব্যাখ্যাও তিনি করতে চান না, টিপু বুঝতে পারল তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর দুঃখিত আত্মা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। হাইদর বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে এমনকি করিমের সমর্থন লাভের ব্যবস্থা করেন।

করিম একদিন তার ভ্রাতাকে বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি আর যুদ্ধে যেতে চাও না। বাবা যখন না-থাকবেন তখন আমাকে রক্ষা করবে কে ?"

করিমের গালে চিমটি কেটে টিপু বলল, "চুপ করে থাক। বাবা কখনো চলে যাবেন না।"

করিম তবু বলল, "যদি যান।"

টিপু বলল, "আমি। আমি রক্ষা করব তোমাকে।"

করিম তার ক্ষুদে হাতটি দিয়ে দাদার হাত ধরল। আর বেশি প্রতিশ্রুতি সে চায় না।

টিপুর পক্ষে প্রতিরোধ করা আর কি সম্ভব ? তার মাকে সে মনে করে আত্ম-বঞ্চনার একটি কবিতা, তিনি কখনো কিছু চাননি, কখনো কিছু আরোপ করেননি কারও উপর, তিনিই তাকে অনুনয় করে তার বাবাকে অনুসরণ করতে বলেছেন। তার অসহায় ভাইটিও একই কথা বলেছে বলা যায়।

না, এই সতেরো বছরের যুদ্ধও তার হৃদয়কে লৌহকঠোর করতে পারেনি। সে জানে আতঙ্ক ও মৃত্যুই হচ্ছে যুদ্ধের তিক্ত ফল, এও সে জানে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা নিহত হয় তারাই যুদ্ধের বলী নয়, হাজার-হাজার বিধবা ও পিতৃহীন শিশুরাও অগণিত গৃহে এর শিকার হয়ে যায়।

প্রতিটি অভিযানে সে জয়ী হয়ে এসেছে, তার খ্যাতি এমনই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে যে, কিংবদন্তীর দেবতাদের ও বীরদের নিয়ে ঘরে-ঘরে যেমন কাহিনী বর্ণিত হয়, তাকে নিয়েও তাই হচ্ছে। এ সত্ত্বেও হাসি ও আনন্দ তাকে বশীভূত করে না। নিজেকে সে নিঃসংগ মনে করে।

তার বাবা তাকে নিয়ে গর্বিত। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ তার প্রতি। হাইদর

অনেক সময়ই টিপুর বিজয়গৌরব একটু বাড়িয়ে বলতেন, নিজের গৌরব খাটো করে দেখাতেন। নিজের কৃতিত্বের চেয়ে পুত্রের কৃতিত্বই ছিল তাঁর কাছে বড়। তাঁর পুত্র কোনো অন্যায় করতে পারে না, ভুল করতে পারে না—এই ত'ার ধারণা। একদা একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক হাইদরকে বলেন, "সুলতান লড়াই করে বটে, কিন্তু তার হৃদয় যেন এ'তে লিপ্ত নয়।"

তার শক্তিশালী মুঠি দিয়ে সেই কম্যাণ্ডারের ক'াধ ধরে টেনে তুলে চে'চিয়ে বলল হাইদর, "এই বেশ্যার বাচ্চা, তোমার হৃদয়টি ঠিক্ কোনখানে বসানো তা কি তুমি জান?" ত'াব বক্তব্য আরও পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে কম্যাণ্ডারের পশ্চাৎদেশে হ'াটু দিয়ে তিনি আঘাত করলেন।

প্রত্যেকেই হাসল, যদিও সে হাসি তেমন স্বতঃস্ফূর্ত না। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে হাইদরের সংগ খুব আনন্দের হলেও, অনেক হাসিতামাশা করা গেলেও টিপুব সম্বন্ধে কোনো বক্র মন্তব্য করলে তার রেহাই নেই। হাইদরের কৃপা পেতে হলে টিপুর প্রশংসা কর অথবা চুপ করে থাক, কিন্তু তাব সমালোচনা কখনোই নয়।

টিপু যুদ্ধে লিপ্ত হয়েই রইল। তার প্রতিটি জয়ের সংগে তার পিতার গৌরব বৃদ্ধি হতে লাগল।

কিন্তু এখন সে পিতা মৃত। তাঁর সারাজীবন সে পিতাব কর্ম করে যাবে বলে সে ছিল প্রতিশ্রুত। তাঁর জীবন শেষ হয়েছে, সেইসংগে তার প্রতিশ্রুতিও হয়তো শেষ। সে এখন তার অদৃষ্টের নিয়ন্তা। সত্যিই কি তাই?

"কোথায় আমি চলেছি এবং কী জন্য?" পুনরায় টিপু নিজেকে এই প্রশ্ন করল। সে এখন বিত্তবান। তাব যা আছে তা তার নিজের, তার ভ্রাতার, মাতার, স্ত্রীর ও সন্তানদের পক্ষে যথেষ্ট। সে যুদ্ধে ক্লান্ত। সে এখন শান্তির ও স্বস্তির জন্যে লালায়িত। সে জানে যে, সে এ কাজ পরিত্যাগ করলে তার পিতার সিংহাসন লাভের জন্যে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী আছে এবং বীভৎস যুদ্ধের কেন্দ্র সেইটেই। তার বাবার কোনো সুযোগ্য সেনাপতিকে এই সিংহাসন দিয়ে বেদনার ও যুদ্ধের ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে বহুদূরে চলে যেতে পারে। তার নিজের কিছুই চাহিদা নেই, সে চায় লেখাপড়া করার ও মননের একটু সুযোগ। তার স্বজন ও প্রিয়জনদের জন্য জীবনের যাবতীয় বিলাসের ব্যবস্থা সে করে দিতে পারে। তবুও তাকে কোন্ অজ্ঞাত ও অদৃশ্য শক্তি এখানে টেনে বে'ধে রেখে দিয়েছে? এবং সেই শক্তি কী আদেশ করছে তাকে? কেন?

কেন? কেন তাকে লড়াই করতে হবে? কেন যেতে হবে যুদ্ধে?—অনবরত এই প্রশ্ন সে করে যেতে লাগল নিজেকে। কেন, আমি কি অজানা এক অদৃষ্টের হাতে বন্দী?

সারা জীবন সে সত্যের ও করুণার জন্যে প্রত্যাশী। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়নি, সে তাই বিষাদগ্রস্থ। সে যশ চায়নি, গৌরব চায়নি, ধন চায়নি, বৈভব চায়নি। এসব এসে গেছে, কিন্তু এতে সে উল্লসিত হয়ে ওঠেনি। তার পিতার কাছ থেকে সে এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এখন কেন তার হৃদয়ের মধ্যে বিঁধে যাচ্ছে লৌহশলাকা যা নাকি তাকে নির্দেশ দিচ্ছে না, তাকে আদেশ করছে—যুদ্ধ কর। কার জন্যে যুদ্ধ, কিসের জন্যে যুদ্ধ? তার গৌরবের জন্যে, ধনসম্পদের জন্যে, তার পরিবার পরিজনের জন্যে—যা নাকি করে গেছেন তার পিতা? না। তা হয় না। কিন্তু এ ছাড়া পথ কোথায়?

দ্বিতীয়-দিলখুশ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টি থেমেছে। মেঘ ভেদ করে সূর্য নিজেকে প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। টিপু সুলতান বুঝতেই প্যারেনি কখন আলো এসে গেছে, উত্তাপ এসে গেছে। তার বিক্ষিপ্ত মন ক্রমে যেন শান্ত হয়ে এসেছে। নিজেকে প্রশ্ন করা সে বন্ধ করেছে!

সে এখন বুঝেছে তার অদৃষ্ট তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কথা দিয়ে এর প্রকাশ সম্ভব নয়, কিন্তু অন্তরাত্মা দিয়ে সে স্পষ্টই তা বুঝতে পারল, অনুমান করতে পারল। ধনের জন্যে বা গৌরবের জন্যে লড়াই সে করবে না, কিন্তু সে জানে, যুদ্ধ তাকে করতেই হবে। নিজের জন্যে কিছুই সে চায় না। যে সময়ে সে তার মনস্বী পণ্ডিত ও মৌলভির পায়ের কাছে বসে থাকত সেই সুদূর অতীত থেকে ভেসে এল তার কাছে এক স্মৃতি—সেটা হচ্ছে একটি দেশের প্রতিচ্ছবি, পুরাতন সংস্কৃতি ও বর্ণাঢ্য ইতিহাসে যে দেশ শ্রীমণ্ডিত। তার মধ্যে রোমাঞ্চ এল, সে শিহরিত হয়ে উঠল। সে আর নিজেকে মূলহীন বলে মনে করল না, মূল্যহীনও নয়। সে বুঝল তার বনিয়াদ পাকা।

ভারতীয় জনগণের চলমান জীবন-নাট্যের কয়েকটি দৃশ্য তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। সে দেখতে পেল যুগযুগব্যাপ্ত সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, তাদের দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাপ্তি, সত্যের ও প্রেমের বাণী প্রচার করে সভ্যতা বিস্তারের ঘটনা। সে দেখতে পেল, সৌন্দর্যের প্রতি তাদের আগ্রহ, তাদের তেজস্বিতা, এ দেশের শিল্পকলা সাহিত্য ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রসারে তাদের

উৎসাহ। সে দেখতে পেল তাদের আত্মিক শক্তি, ভাষা জাতি বর্ণ প্রভৃতি নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও তাদের একত্ব। হিমালয় থেকে কেপ কমোরিন পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূভাগে একজাতিতত্ত্বের আদর্শ বিষয়ে সে সচেতন হয়ে উঠল, যা কিনা সারাদেশময় পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। সে দেখতে পেল এমন সংস্কৃতি যা গৌরবপূর্ণ কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ নয়, এমন সংস্কৃতি যা বাহিরের অনেক প্রভাবকে পরাভূত করেছে কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যায়নি, এমন সংস্কৃতি যা নূতন ভাব ও ভাবনাকে নিজস্ব করে নিতে পেরেছে। বহু দূরদেশ থেকে আগত বিজয়ী বীরদের সে দেখতে পেল যাঁরা এখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, এবং নিজেরাই এ দেশের সংগে মিশে গিয়েছেন, নূতন চিন্তা ধারায় এ দেশকে ঐশ্বর্যময় করেছেন, এবং চিন্তাধারায় ও জীবনধারণপ্রণালীতে এক মিশ্রণ ঘটিয়ে এ'কে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

এসব দৃশ্য দেখল টিপু সুলতান। সে আরও এক দৃশ্য দেখল। সে দেখল এক দল বণিক অভিযাত্রীকে যারা স্বার্থান্বেষী রাজপুরুষদের সংগে মিলে এই মহিমান্বিত দেশে নিজেদের জন্যে ঘাঁটি রচনা করেছে। সে দেখল দুর্নীতিপরায়ণ ও চক্রান্তকারী হীন বৃটিশদের, যারা সারা ভারতে তাদের নখদন্ত বিস্তার করছে, এ দেশের ব্যবসাবাণিজ্যকে কেবলমাত্র পর্যুদস্ত করবার জন্যেই নয়, এখানকার জনগণকে দারিদ্র্যের কবলে ফেলার জন্যে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নীতিভ্রষ্ট করার জন্যে। ব্যবসা ও বাণিজ্য করার অছিলায় তাদের নিযুক্ত একদল ডাকাত অপহরণ ও লুণ্ঠন করে চলেছে। যেখানেই তারা যায় সেখানেই ধ্বংস, সেখানেই মৃত্যু, সেখানেই দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এরা বিদেশী, এরা বরাবর বিদেশীই থেকে যাবে, ভারতীয় চিন্তাধারার এরা বিরোধী, এবং তার সর্বনাশ করাই এদের উদ্দেশ্য। এই ঘোর দুর্নীতিপরায়ণদের স্বর্ণলালসার কথা সে জানে। বৃটিশ রাজত্বের প্রথম আমলের উৎকোচগ্রহণ স্বজনপোষণ হিংসাত্মক কাজ ও অর্থলোভের বৃত্তান্ত সে জানে। মিশনারীদের কথাও জানে সে, যারা হাটে-বাজারে স্কুলে হাসপাতালে এমনকি জেলখানাতেও ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। হিন্দুধর্মের ও ইসলামের মর্মবাণীকে যারা বিদ্রূপ করে চলেছে। সে জানে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আভিজাত্যকে তারা খর্ব করার জন্য উদ্যত, নির্মূল করার জন্য ব্যস্ত।

তার মনে আরও এক ঝাঁক চিন্তা এসে উপস্থিত হল। সব দোষ ইংরাজের নয়। তারাই আমাদের এই হীন অবস্থার মধ্যে ফেলেনি। আমাদের নিজেদেরও

অনেক দোষ আছে। বাইরের আক্রমণে কোনো সভ্যতার বিনাশ হয় না, ভিতরের স্খলন তার জন্যে অনেক দায়ী। ভারতবর্ষ নিষ্ক্রিয় ও ফতুর হয়েছে অনৈক্য ও মতভেদের জন্যে। ভারতের একতার সেই যুগযুগান্তের স্বপ্ন এখন ঘুমঘোরের প্রলাপে পরিণত হয়েছে। রাজপুরুষেরা তাঁদের উন্মাদ উচ্চাশার জন্যে, তুচ্ছ দ্বন্দ্বের জন্যে এবং পারস্পরিক ঘৃণার জন্যে বিদেশী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। বণিকের মানদণ্ড নিয়েই এসেছিল বৃটিশ, তাদের বাণিজ্য রক্ষা করার জন্যই তারা তলব করে তাদের সেনাবাহিনীকে। ভারতীয় শক্তিরা নিজেদের সহস্র বিবাদে লিপ্ত. তারা মনে করে বৃটিশ সামরিক বাহিনীকে ভাড়া করা যায়। এই বিদেশী শক্তি এদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে আসেনি, তারা এসেছিল লভ্যাংশ সংগ্রহের জন্য, তারা তা সঞ্চয় করে নিয়ে বহুদূরের তাদের সেই শীতল স্বদেশে ফিরে যাবে—এই ছিল তাদের অভিপ্রায়। কিন্তু তা হবার নয়। বৃটিশদের মনে জেগে উঠল আশা আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা ও অভিপ্রায়—তারা চাইল ভারত জয় করতে। অন্য কারও হয়ে কাজ করতে তারা আসেনি। তারা এসেছে এখানে থাকতে, নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে। মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাঙনের ফলে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষীর ও দাবিদারদের উদ্ভব হল, বৃটিশের সুশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাদলকে নিজের কাজে লাগাতে চাইল সকলেই। তারাও রাজি হল, প্রতিদ্বন্দ্বীদলের হয়ে তারা কাজ করতে লাগল। তাদের এই সাহায্যের জন্যে তারা বেশ কড়া দাম আদায় করে নিল। এই ভাবে ক্রমে-ক্রমে অনেক এলাকা কুক্ষিগত হল তাদের। তাদের শক্তি বাড়ল, বেড়ে উঠল তাদের সামরিক ঘাঁটি। ভারতীয় শক্তির যখন হুঁশ হল যে, সামরিক ও রাজনৈতিক ভাবে সারা ভারতে তাদের শক্তি কায়েম করতে চায়, তখন খুবই দেরি হয়ে গিয়েছে। কেননা, ইতিমধ্যে বৃটিশ শক্ত ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। এ সত্ত্বেও, ভারতীয় রাজন্যবর্গ কি তখনও নিজেদের ঝগড়ার অবসান ঘটিয়ে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে এই শত্রুর মোকাবিলা করেছেন? না। তাঁদের জাতীয়তাবোধ কবরস্থ করে তাঁরা নিজেদের সঙ্গেই বিবাদ ও চক্রান্ত করে চললেন। চলতে লাগল ঘোর রেষারেষি, খণ্ড যুদ্ধ, এবং তাঁদের এই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিবাদে বৃটিশের সাহায্যই চাইতে লাগলেন। এই ভাবেই তাঁরা নিজেদের লজ্জাকর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

ভারত কি আবার স্বমহিমায় ফিরবে? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল টিপু। বর্তমানের এই সংকট ও দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে স্বাধীনতা ন্যায়বিচার

ও জাতীয় ঐক্যের স্বপ্নকে আবার বাস্তবে রূপ দিতে পারবে ? ভারতের পাহাড়-পর্বত নদনদী অরণ্য প্রান্তর সমভূমি এবং হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি, এখানকার নরনারী ও শিশুদের কথা মনে হল টিপুর। এদের মধ্যে আত্মত্যাগের অফুরন্ত শক্তি আছে বলে সে জানে। এরা তাদের আশা ত্যাগ করবে না, মর্যাদার হানি ঘটাবে না, আস্থা ও বিশ্বাস খর্ব করবে না।

"আমরা সহ্য করব।" টিপু মনে মনে বলল।

টিপু জানে যে ভারতবর্ষ তার অনৈক্য নিয়ে সংকটাপন্ন। বাইরে থেকে এসে কেউ তাকে জয় করে নেয়নি। যখনই বৃটিশ কোনো লড়াইয়ে জিতেছে তখনই দেখা গেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ বৃটিশবাহিনীতে যোগ দিয়েছে ও নিজেদের দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এটা একটা লজ্জাকর ঘটনা যে, বৃটিশেরা তরবারির জোরে ভারত জয় করেনি, ভারতীয়রাই তাদের দেশ জয় করে বৃটিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সে জানে যে, স্থিরমস্তিষ্কের শয়তানিই ইংরেজদের স্বীকৃত নীতি। তাদের একজনের সাহায্য নিয়ে কোনো বিরোধী পক্ষকে কাবু করার পর সেই সাহায্যকারীকে কোনো অজুহাতে গদিচ্যুত করাই ছিল তাদের কাজ। এই সব সরকারী নেকড়েরা এ রকম ঘোলাজলের অজুহাত অনায়াসেই পেয়ে যেত।

এ কথা ঠিক যে, ভারতবর্ষকে ধরা হয়েছে জাল দিয়ে পাখি ধরার মতন। কিন্তু এটা কি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য ইতিহাসের বেদনাদায়ক একটা বিরতি মাত্র, অথবা এটা কি শেষ অধ্যায়ের শেষ ছত্র রচনার মতন একটা পরিণতি ? টিপু চিন্তা করতে লাগল। পুনরায় তার মন তার দেশের লক্ষ-লক্ষ অধিবাসীর কথা ভাবতে লাগল, সে দেখতে পেল তাদের অনির্বাণ শিখা, যার অর্থ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

"আমরা সহ্য করব, আমরা টিকে যাব।" পুনরায় বলল টিপু। নিজেকে তার দেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্ম করে নিল সে। এটা হচ্ছে তার মনের নূতন আবেগ, এর আগে এ অভিজ্ঞতা তার হয়নি, এটা হচ্ছে এমন এক চেতনা যার সংজ্ঞা সে জানে না, এটা এমনই-এক শিহরণ যার সঙ্গে অগে তার পরিচয় হয়নি।

এটা হচ্ছে জাতীয়তাবোধের এক মুক্তবায়ু যা গিয়ে প্রবেশ করল টিপুর আত্মায়, টিপুর হৃদয়ে। উত্তরকালে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের বেদীতে আবির্ভূত হয়েছেন সাহস ও বিক্রম নিয়ে অনেকে। কিন্তু এ ব্যাপারে টিপুই প্রথম—প্রথম জাতীয়তাবাদী—ভারত-আত্মার সংগে নিজেকে একাত্ম করেছে টিপুই প্রথম।

## ২৮. বিশ্বাসঘাতকেরা

কখনো ঢালু হয়ে গিয়েছে পথ, কখনো সমান হয়েছে, কখনো বাঁক নিয়েছে, কখনো মুচড়ে ঘুরে গিয়েছে, কখনো বা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—নদী বন পাহাড় পড়েছে পথে। পাঁচ দিন হল গত হয়েছে হাইদর আলি। এই পাঁচ দিনে টিপু সুলতান ও তার অশ্বারোহীরা প্রায় দুশো মাইল অতিক্রম করেছে, নির্দিষ্ট-স্থানে পৌঁছতে এখনো দু দিন বাকি। টিপুকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে পুরনাইয়া। সে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে, নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন টিপু তাকে উঠতে বলে। এই শিষ্টাচারে টিপু অভিভূত। এক লহমার জন্যে তার মনে হল যে পুরনাইয়া বুঝি তামাশা করছে, তার পর টিপু বুঝল তা নয়। এটা হচ্ছে নূতন অধিপতির কাছে তার আনুগত্য।

পুরনাইয়ার চিবুকে হাত দিল টিপু, তাকে মাটি থেকে তুলল, দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করল। নীরবে তারা বসল। উভয়ে উভয়ের দুঃখে সমবেদনা জানাল। টিপু তার পিতাকে ভালোবাসত। সে জানত, পুরনাইয়াও ভালবাসত তার পিতাকে।

রাত্রির বিশ্রামের জন্যে যে তাঁবু ফেলা হয়েছিল তারা তার ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ তারা চুপ করে রইল। টিপু জিজ্ঞাসা করায় পুরনাইয়া হাইদর আলির শেষ ক'দিনের কথা বলল। কিন্তু কষ্টের ও বেদনার কথা বলল না, কেবল শান্তিতে তাঁর মৃত্যুর কথাই বলল। সে টিপুকে বলল কী অসীম মমতায় ফকর-উন নিসাকে তিনি স্মরণ করেছেন, করিমের কথা বলেছেন, এবং সর্বোপরি টিপু সুলতানের কথা। একেবারে শেষ মুহূর্তেও তিনি স্নেহপ্রীতিপূর্ণ কথাই বলে গেছেন। তিনি আদেশ করে গেছেন ফকর-উন-নিসাকে যেন পুষ্পগুচ্ছ পাঠানো হয়। তিনি জোর দিয়ে বলে গেছেন তাঁকে সেই নকশাদার কম্বল দিয়ে যেন আবৃত করা হয় যেটা তার গত জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল টিপু।

কথোপকথন চলতেই থাকল, পুরনাইয়া এবার চলে যেতে চাইল, টিপু বলল, "আমার কাছে থাকো, অনেক দিন একা আছি।" পুরনাইয়া থেকে গেল। হাইদরের মৃত্যু কী ভাবে গোপন রাখা হয়েছিল তা সে

বলল। শেখ আয়াজের বিশ্বাসঘাতকতার কথাও সে বলল। মহম্মদ আরামিন ও শামসুদ্দিন বকসী ছিল তার গোপন এজেন্ট। এজেন্টদের শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। কিন্তু আয়াজ চলে গেছে বেদনূরে, সঙ্গে নিয়ে গেছে রাজ্যের প্রচুর ধনসম্পদ, প্রায়ই তার দূতেদের পাঠাচ্ছে, রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তে ইন্ধন যোগানোর চেষ্টায়। মাত্র তিন দিন আগে রসুল খাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে যে, হাইদর আলির কয়েকজন প্রবীণ অফিসারের সঙ্গে সে শেখ আয়াজের হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

টিপু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "রসুল খাঁ। গাজি খাঁর ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

"সে বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্বীকার করল?" টিপু আশ্চর্য হয়ে গেছে, রসুল খাঁ তার বালক বয়সের বন্ধু, তার বাবা গাজি খাঁ ছিলেন টিপুর শিক্ষক।

পুরনাইয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সে স্বীকার করেছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় করেনি। অনেক প্রহারের পর সে স্বীকার করে।"

বেদনার্ত চোখে পুরনাইয়ার দিকে তাকাল টিপু, "পুরনাইয়া, কী করে তুমি রসুল খাঁর উপর পীড়ন চালালে? তুমি কি জান না, তার বাবার কাছে আমরা কতটা ঋণী? খুব কম করে বলতে গেলে আমার জীবন।" গাজি খাঁ কি ভাবে তাকে ও করিমকে উদ্ধার করেন শ্রীরঙ্গপত্তমের দুর্গচূড়া থেকে সে কথা সে মনে করল। তখন তার বয়স মাত্র দশ।

পুরনাইয়া বলল, "তার বাবা গাজি খাঁই তাকে জেরা করেন। তাঁর চাবুকেই সে স্বীকার করে।" সে আরও বলল, "রসুল বেঁচে যাবে, কিন্তু গাজি খাঁ না-বাঁচতেও পারেন। তাঁর ছেলের স্বীকারোক্তি পাবার পরই তিনি সাংঘাতিক ভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন।"

টিপু বলল, "বেচারা গাজি খাঁ, বেচারা রসুল।"

"অপদার্থ রসুল।" পুরনাইয়া বলল।

"হ্যাঁ, অপদার্থ, অপদার্থ রসুল।" সহানুভূতির সঙ্গেই বলল টিপু।

শেখ আয়াজ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকেরা যেসব কম্যান্ডার ও প্রবীণ অফিসার-দের দুর্নীতিপরায়ণ হতে ও চক্রান্তে অংশগ্রহণের জন্যে উস্কানি দিয়ে চলেছিল, তাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে মীর সাদিক, কামার-উদ-দিন ও বরহান-উদ-দিন। পুরনাইয়া সেই তালিকাটি টিপুকে দিল। তালিকাটি লম্বা। টিপু এর প্রথম পাতার নামগুলি পড়েই আঁৎকে উঠল। এরা বেশ মর্যাদাবান

মানুষ, তার পিতার প্রতি আনুগত্যের জন্যে এবং বিশ্বস্ততার জন্যে এঁদের সুনাম আছে। কারো কারো সংগে তার রক্তের সম্পর্ক আছে। অন্যান্যরা ছিল অবজ্ঞাত, হাইদরের সহৃদয়তার ও উদারতার জন্য তারা উন্নতি করেছে।

"তুমি কী চাও পুরনাইয়া?" টিপু জিজ্ঞাসা করল, "এই তালিকা আমাকে দিয়েছ আমার হৃদয় জীর্ণ করার জন্যেই কি?"

'তোমার হৃদয় জীর্ণ করার জন্য নয়, তোমার হৃদয় লৌহকঠোর করার জন্যে। তোমাকে আগে থেকে সাবধান করে দেবার জন্যে, বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি তুমি যাতে সজাগ থাকতে পার।"

টিপু জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি ইচ্ছে যে এঁদের সকলকে সোজাসুজি গুলী করে শেষ করে ফেলি?"

"মীর সাদিক, কামার-উদ-দিন ও অন্যান্যরা তাই চায় বটে।"

"এবং তুমি?" টিপু জানতে চাইল।

"না। আমার এমন ইচ্ছে নয়।" বলল পুরনাইয়া।

"তবে, তোমার পরামর্শ কী?"

"সজাগ থাকা, অনুসন্ধান ক'রে দেখা, এবং হয়তো কয়েকজনের বিচার করা।"

"যদি তারা দোষী বলে প্রমাণিত হয়?" টিপু চাপ দিয়ে জানতে চাইল।

পুরনাইয়া বলল, "সে ক্ষেত্রে আইন মেনে চলা।"

"তুমি কী বলছ তার তাৎপর্য বুঝতে পারছ তো? এরা তারাই যাদের সংগে সংগে আমি বড় হয়ে উঠেছি। কেউ কেউ আমার জ্ঞাতি। রক্তের সম্পর্কের কি কোনো মূল্য নেই?"

"সে সম্পর্ক যদি তাদের কাছে তুচ্ছ হয়, তোমার কাছে তা বড় হবে কেন? প্রসংগত বলি সুলতান, আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমার বাবার একটি অভিমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অহেতুক হবে না বলে মনে করি। তিনি বলেছিলেন একজন হত্যাকারীকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু একজন ভাবী হত্যাকারীকে কখনোই নয়।" এই কথা ব'লে পুরনাইয়া টিপুর মন তার পিতার স্মৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইল। টিপু বসে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত। পুরনাইয়া এবার চলে যেতে চাইল যাতে তারা বিশ্রাম করে সকালের মধ্যে বেশ সতেজ হয়ে নিতে পারে, তাদের তখন যাত্রা করতে হবে। সকালও আর বেশি দূরে নয়, তিন ঘণ্টা মাত্র তফাতে।

পুরনাইয়া স্থান ত্যাগ করল।

## ২৯. সন্দেহ

সে রাত্রে টিপু ঘুমল না। সকাল এল, তখনও সে চিন্তামগ্ন। যেভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে গেছে পুরনাইয়া সেইভাবেই সে বসে আছে।

পুরনাইয়ার দেওয়া তথ্য তার অন্তরাত্মা কম্পিত করে তুলেছে। ঐসব উদ্ঘাটন তার স্বপ্নকে চুরমার করেছে—তার জাতীয়তাবোধের স্বপ্ন, তার ব্যক্তিগত গৌরবের চেয়েও বড় ও মহৎ বিষয়ের জন্যে তার যুদ্ধ করার স্বপ্ন। সে এখন বুঝতে পারছে যে, তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ও আত্মরক্ষার জন্যে তাকে সংগ্রাম করতে হবে, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যারা আনুগত্য বর্জন করেছে এমন আত্মীয় ও জ্ঞাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সে ভেবেছিল সে নিরাপদে আছে, তার ধারণা ছিল তাকে ও তার বাবাকে সকলে ভালোবাসে, ভেবেছিল এই সাম্রাজ্য তারই নেতৃত্বের জন্যে অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে সে সঙ্গীহীন, সে পরাজিত, সে হতাশ।

তার মানসিক এই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। তার মনের মধ্যে এক চেতনা এল। যে শিকল তাকে বেঁধে রেখেছিল তা যেন সহসাই খুলে দেওয়া হল। আর তাকে লড়াই করতে হবে না। সে সিংহাসন পরিহার করবে, যেখানে তার ইচ্ছে সেখানে চলে যাবে, বই নিয়ে পড়াশুনা নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে যাপন করবে সহজ জীবন। তার শিশুকালের স্মৃতি জেগে উঠল তার মনে। সেই সময়কার শান্তি ও সূর্যালোক ফিরে এল তার কাছে।

সে অতীতের চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখল।

## ৩০. বাঘ, বাঘ !

ক

অতীতের মূর্তি ও চিত্রের উপর মন ঘুরে বেড়াতে লাগল টিপুর। তার স্ত্রী রাকেয়া বানুর কথা তার মনে পড়ল। তার সঙ্গে তার প্রথম-সাক্ষাতের কথাটি সে ভাবল। তখন রাকেয়ার বয়স সাত, টিপুর দশ। টিপুকে ও করিমকে শ্রীরঙ্গপত্তমের দুর্গ থেকে গাজি খাঁ যেদিন উদ্ধার করে এ ঘটনা তার পরের দিনের। নদীর পাঁচ মাইল ভাটীতে অর্ধেক আচ্ছাদিত এক নৌকোয় তাদের লুকিয়ে রাখা হয়। এই নৌকোয় আগে সলিল-সমাধি দেবার কাজ হত। শিশুর মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়াই ছিল রীতি, এই নৌকোয় করে সেই কাজ হত—শবাধার নামিয়ে দেওয়া হত জলে। নৌকোটা এখন ব্যবহার করা হয় না। তার উপর, সেটা এখন ভাঙা-চোরা। মৃতের সঙ্গে এর সংসর্গের জন্যে এর ধারে-কাছেও বিশেষ কেউ আসে না। এই নৌকোতে গাজি খাঁ শিশু-দুটিকে রেখেছে। কিন্তু তার এত ব্যবস্থা সব বানচাল হয়ে গেল। ছেলে দুটিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে যে অশ্বারোহীদের আসার কথা ছিল তারা সময়-মত এসে পেঁছিল না। সারারাত গাজি খাঁ তাদের সঙ্গে রইল, সকালবেলা ওদের জন্যে খাবার-দাবার আনবার জন্যে সে চলে গেল। নৌকো যেন তারা ছেড়ে না যায়, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে দুর্গ থেকে তাদের পলায়নের কথা রটে গেছে, ঘরে-ঘরে তল্লাশি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গাজি খাঁ তার গৃহে ফিরে বুঝল পুলিশ তার পিছু নিয়েছে। তার ভয় হল, হাইদর আলির অনুষঙ্গী হিসেবে তাকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। পুলিশ তার দরজায় ঘা দিল। চটপট সে কয়েক ছত্রে এক চিঠি লিখে ফেলল। সে জানালা খুলল। ঐ জানালার ওপারেই অন্য-এক গৃহের জানালা, সে গৃহ লালা মিঞার। তিন ফুট চওড়া রাস্তা দুই গৃহের মাঝে। গাজি খাঁ একটা লাঠি দিয়ে ঐ বাড়ির জানালায় আঘাত করল। পুলিস তখন তার দরজায় ঘা দিয়েই চলেছে। লালা মিঞার সাত বছরের মেয়ে রাকেয়া বানু জানালা খুলল। তাঁর বাবার কথা জিজ্ঞেস করল গাজি খাঁ। তিনি বাসায় নেই, একটু পরেই ফিরবেন বলে জানাল মেয়েটি। যে

ছোট চিঠিটা গাজি খাঁ লিখেছে সেটা সে তার হাতে দিল, প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে চিঠিটা সে তার বাবার হাতে দেবে। জানালা তার পর বন্ধ হয়ে গেল।

গাজি খাঁ তার বাড়ির দরজা খুলতে যাবার আগেই পুলিশ দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। দরজার শব্দ ও গোলমাল শুনে রাকেয়া তার বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে। সে দেখল পুলিশ ধরে নিয়ে চলেছে গাজি খাঁ'কে। তারা কোনো কথা বলল না, তাদের মধ্যে চোখে-চোখে কিছু বোঝাবুঝি হয়ে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাকেয়ার বাবা-মা ফিরলেন। রাকেয়া তার বাবাকে চিঠিটা দিল। বেশ উত্তেজনার সংগে সে এই গ্রেপ্তারের কথা বলল, পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে ও ভিড়ের বহর বাড়িয়ে, দরজা ভাঙার শব্দ অতিরঞ্জিত করেই সে সব বলল।

স্থির হয়ে বসে চিঠিটা পড়ল লালা মিঞা। মুখ ভারি হয়ে উঠল।

তার স্ত্রী জানতে চাইল, "কী ওটা ?"

"এটা গাজি খাঁর একটা চিঠি।"

' তা তো বুঝেছি, কিন্তু কী লিখেছে সে ?

লালা মিঞা একটু ক্রুদ্ধ হয়েছে, বলল, "এতে লেখা আছে, হাইদর আলির দুই ছেলেকে গাজি খাঁ লুকিয়ে রেখেছে সলিল সমাধি দেবার নৌকোয়, শিরনি'তে। তাদের জন্যে খাবার নিয়ে সেখানে আমাকে যেতে বলেছে, তাদের দেখাশুনা করতে বলেছে।"

"এখন কী করবে ?" তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

লালা মিঞা বলল, "কিছুই করব না। আমি ফাঁসিতে ঝুলতে চাইনে।"

তার স্ত্রী বলল, "কিন্তু শিশুদের কী গতি হবে ?"

"আমি জানিনে, জানতে চাইনে। আমার নিজেরই সন্তান আছে, তাদের নিয়েই অনেক ভাবনা আছে আমার।"

"কিন্তু গাজি খাঁ তোমার বন্ধু। হাইদর আলির অধীনে কাজ করেছ তুমি। তারা কী বলবে ?"

"শোনো। তুমি স্ত্রীলোক, সব বোঝো না। গাজি খাঁ এক বেপরোয়া লোক, তার মনিবও তাই। তুমি বলছ আমি তার নোকরি করেছি, কিন্তু ও-কাজ ততদিনই করেছি যতদিন তিনি আইনত ছিলেন সর্বেসর্বা। এখন তিনি তা নেই।"

"যদি তিনি ফিরে আসেন।" তার স্ত্রী বলল।

"যদি ফিরে আসে ? তার সম্ভাবনা কম। বলব, চিঠিটা আমাকে দিতে রাকেয়া ভুলে গেছে। আসলে সে তো একটা শিশু।" এই কথা বলে ধূর্তের মত হাসল লালা মিঞা।

এ'তে তার স্ত্রীর মন ভিজল না, সে বলল, "ওই ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্যে অন্য কাউকে কি বলতে পার না ?"

লালা মিঞা তেতে উঠে বলল, "আমার গলায় ফাঁসির ফাঁস আরও আঁটো করে লাগাবার জন্যে অন্য কোনো পরামর্শ কি তোমার নেই ?"

লালা মিঞার এ কথাও মনে হল যে, পুলিশের জেরায় গাজি খাঁ যদি কবুল করে যে, সে রাকেয়ার হাতে একটা চিঠি রেখে এসেছে। পুলিশ তখন লালা মিঞাকেই দায়ী করবে ব্যাপারটা সে পুলিশকে জানায়নি কেন।

গাজি খাঁর চিঠিটা রাকেয়ার হাতে ফেরত দিয়ে লালা মিঞা বলল, "এটা তোমার ডেস্কে রেখে দাও, এর সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে—এটা তুমি গাজি খাঁর কাছ থেকে পেয়েছ, এবং তোমার বাবা মা'কে দিতে ভুলে গেছ। বুঝলে ?"

রাকেয়া তার বাবা-মা'র আলোচনা সবই শুনেছে। সুতরাং সে সব বুঝল। চিঠিটা ডেস্কে রাখল। অনাহারে ও বিনা-তত্ত্বাবধানে ছেলে দুটি কীভাবে বোটের মধ্যে আছে এ কথা ভেবে সারাটা দিন সে বিচলিত রইল। তার হাজার রকমের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে তার মা বলল "কত বার তোমাকে বললাম রাকেয়া, ও ব্যাপারটা ভুলে যাও। ভুলে যাও। তোমার বাবা ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি ও কথা বলাবলি করলে আমরা বিপদে পড়ব।"

রাকেয়া বলল, "ও কথা আমি আর বলব না, মা।"

কিন্তু রাকেয়া বানুর অশান্তি কাটল না। ক্ষুধার্ত অসহায় একাকী দুটি ছেলে অপেক্ষায় আছে তাদের জন্যে কেউ খাবার নিয়ে আসছে—এই ভাবনায় রাকেয়া অধীর হয়ে রইল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে। রাকেয়ার বাবা-মা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেও শুয়েছিল। একটু পরে সে উঠে পড়ল, রান্নাঘরে ঢুকল। বাড়িতে বানানো অনেক রুটি বিস্কুট জ্যাম মধু ইত্যাদি সে দেখল সেখানে। সে তার বাস্কেটে অনেক মিষ্টান্ন নিয়ে নিল, পকেটেও নিল কিছু, দু-একটা মুখে পুরল। তারপর ধীরে ধীরে চুপি-চুপি সে বের হল বাড়ি থেকে।

পাঁচ মাইল রাস্তা কম রাস্তা নয়। খালি পায়ে এই পথ হাঁটা কষ্টকরই বটে।

তার উপর রাত্রিকালে এ পথ ভীতিজনকও। নিস্তব্ধ শান্ত নদীর উপরে ছায়াগুলো প্রেতের বা দৈত্যের মতন দেখায়। চোখে জল নিয়ে, মনে-মনে প্রার্থনা করতে-করতে কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে সে চলল। সে পৌঁছল নৌকোয়। কে-যেন নৌকোয় ঢুকছে দেখে টিপু ও করিম ভয় পেল। অবশেষে তারা দেখল হাতে বাস্‌কেট নিয়ে একটা ছোট মেয়ে।

বাস্‌কেটের দিকে চেয়ে টিপু জিজ্ঞেস করল, "গাজি খাঁর কাছ থেকে ?"

রাকেয়া মাথা নাড়ল। তার পা টনটন করছে, চোখে তার জল, সে ধুঁকছে। চাঁদের আলোয় টিপু তার মুখ ভালো মত দেখতে পেল না, কিন্তু সে তার ফোঁপানি শুনতে পেল। রুমাল দিয়ে বেঞ্চের ধুলো সাফ করে টিপু তাকে বসতে বলল। সে বাস্‌কেটটা টিপুর হাতে দিল।

"খাও।" সে বলল।

টিপু একটু অপেক্ষা করল। একটু ঝুঁকে নদীর জলে রুমাল ভিজিয়ে নিল। সেটা সে দিল রাকেয়াকে। রাকেয়া মুখ মুছে নিল।

"এবার খাও।" বলল রাকেয়া, "তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছি আমি।"

অনেকবার পথে নামাতে হয়েছিল তাকে। রুটি বিস্কুট জ্যাম মধু মিশে সব একাকার হয়ে গেছে।

তবুও এই খাদ্য তাদের কাছে খুবই উপাদেয় লাগল। সকাল থেকে তারা অনাহারে। তারা ক্ষুধার্ত।

ওরা খেতে আরম্ভ করল। ওদের খেতে দেখে খুব খুশি হল রাকেয়া বানু। এখন তার আর কোনো ভয় নেই। ছেলে-দুটো তাদের খাওয়া শেষ করল। সেই ভিজা রুমালটা আবার কাজে লাগল। ওটা জলে ডুবিয়ে তারা হাতমুখ ধুয়ে নিল। রাকেয়া তার পকেট থেকে শুকনো রুমালটা বের করতে গেল, অমনি তার পকেটের মিষ্টান্নগুলি পড়ে গেল। তিন জনে মিলে প্রাণের আনন্দে সেগুলি খেতে লাগল। রাকেয়ার মনে আবার ভয় ঢুকল। এই অন্ধকারের মধ্যে সে কী করে ফিরবে—এই ভাবনা হল তার। টিপু তাকে পৌঁছে দিতে চাইল। না, টিপুর বিপদই তাতে বেশি। রাকেয়া ঠিক করল রাত্রিটা সে নৌকোতেই কাটাবে।

এই নৌকোতেই লালা মিঞা সকালে তাকে পেল। যথারীতি ভোর হবার আগেই তার স্ত্রীর ঘুম ভাঙল, দেখল মেয়ে নেই। স্বামীকে সে ডেকে তুলল। সারা বাড়ি তারা খুঁজল, তারা দেখল রান্নাঘর এলোমেলো হয়ে আছে। বাস্‌কেটটা নেই। এবার তারা বুঝল।

টিপুর বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে ছিল রাকেয়া। যে রকম অগ্নিশর্মা হয়ে লালা মিঞা এসেছিল তার সেই ক্রোধ উপে গেল। তার মেয়ে যে নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে আছে তাতে তার কৃতজ্ঞতাবোধই হল। কিছুক্ষণ সে মেয়েকে ঐ ভাবে দেখল, তার পর তাকে জাগাল। সে উঠেই বাবাকে জড়িয়ে ধরল। টিপু ও করিমও জাগল।

লালা মিঞা মেয়েকে বলল, "এসো।"

রাকেয়া ঐ দুই ভাইকে বলল "এসো।"

তারা নৌকো থেকে নেমে এল। লালা মিঞা আপত্তি করল না। তার মন নরম হয়ে এসেছে. কিন্তু এই দুই ভাইকে কী করে সে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে এই হল তার ভাবনা। লোকজনে পূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে এদের সকলে চিনে ফেলতে পারে। ওদের নিয়ে সে উল্টো দিকে মাইল খানেক গেল, যেখানে পালকি বা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা পাওয়া গেল না। সেটা হোলির দিন বলে সব বন্ধ ছিল। এই দিনে সকলে আবির ছিটিয়ে বা রং ছিটিয়ে আনন্দ উৎসব করে। এটা যদিও হিন্দুদের উৎসব, কিন্তু সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে যোগ দিত। এখন যদিও মাত্র সকালবেলা, কিন্তু ইতিমধ্যেই হোলিতে মাতবার জন্যে সকলে তৈরি হচ্ছে। লালা মিঞা বেশ সংগতিসম্পন্ন মানুষ এজন্যে সে তৃপ্ত। কাছেরই একটা দোকানে সে গেল, সেখানে রং, আবির, পিচকারী, মুখোশ ইত্যাদি নানারকম জিনিস এই হোলি-উৎসবের জন্যে আছে। ছেলেমেয়েদের সংগে সে একটু হোলি খেলল। তাদের পোশাকের সংগে তাদের মুখ ও মাথার চুল রঙে রঙিন হয়ে গেল। এবার কেউ তাদের চিনতে পারবে না, বিশেষ করে রংবেরঙের মুখোশ পরার জন্যে। সত্যিই কেউ চিনতে পারল না। তারা দৌড়তে-দৌড়তে নাচতে নাচতে ধুলোর মতন এ ওর গায়ে আবির ছিটিয়ে পথচারীদের পিচকারীর তোড়ের সম্মুখীন হয়ে পেৌছল লালা মিঞার বাড়িতে। ওদের তিনজনের মধ্যে রাকেয়া বানু ও করিম এই উৎসব উপভোগ করতে লাগল, টিপুও অবশ্যই উপভোগ করছিল, কিন্তু তার মনে বিপদের আশংকাও ছিল। লালা মিঞা দরজা বন্ধ করে দেওয়া মাত্র টিপু বলল, "ধন্যবাদ, চাচা।"

লালা মিঞা বেশ গর্ব বোধ করতে লাগল। উৎসব-মুখর জনতার মধ্যে দিয়ে এদের নিরাপদে নিয়ে আসতে পেরেছে বলেই তার গর্ব। সে বলল, "গাজি খাঁ হচ্ছে একটা বোকা গাধা।" গাজি খাঁ সব ব্যাপারটা যেমন ভণ্ডুল করেছে,

এবং সে নিজে এই বিপজ্জনক কাজটা যে ভাবে সম্পন্ন করেছে তার জন্যেই তার এই মন্তব্য।

রাকেয়া এখন তার মায়ের কোলে চলে গিয়েছে, তার মা তাকে চুমোও খাচ্ছেন, সঙ্গে সংগে মারছেনও। দুরুদুরু বুক নিয়ে তার মেয়ের জন্যে অনেক ভেবেছে সে। তার স্বামীর নানারঙা দাড়ি দেখে ও উসকোখুসকো চুল দেখে তার চোখের জলের সংগে মিশে যাচ্ছে হাসি। লালা মিঞা তার সব গাম্ভীর্য রক্ষা করে স্ত্রীকে বলল, "তোমাকে এখন অতিথিদের পরিচর্যা করতে হবে। সেই কাজ কর।"

তার বিশাল বুকে টিপুকে ও করিমকে চেপে ধরে সে বললে, "জাদু আমার, জাদু আমার।"

"তুমি এদের নিয়ে এসেছ দেখে আমি খুশি," একটু হেসে বলল, "কিন্তু এভাবে তোমার যাওয়া ঠিক হয়নি।"

রাকেয়া ও করিমকে স্নানঘরে নিয়ে গিয়ে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবার পর টিপুকেও সেইরকম করতে গিয়ে সে পিছিয়ে এল। কিসে তার সংকোচ হল তা সে জানে না। টিপুর হাতে তোয়ালে ও সাবান দিল। বোধ হয় ছেলেটির গাম্ভীর্য দেখে তাকে অনেক বড় ও পরিণত বলে তার মনে হল। তার পরেই তার চিন্তা হল। এর জন্যে জামাকাপড় পাবে কোথায়। করিমের জন্যে ভাবনা নেই, রাকেয়ার পরিচ্ছদেই তার হবে। কিন্তু টিপুকে নিয়েই ভাবনা। টিপুর নিজের পরিচ্ছদ তো রঙে রঙময় হয়ে গিয়েছে। হাজার কাচলেও সে রঙ উঠবে না। এই উৎসবের দিনে রঙ মিষ্টান্ন ইত্যাদি ছাড়া সব দোকানই বন্ধ। তখনই তার মনে পড়ল কয়েকটা কুঠির ওপাশে এক মহিলার কথা, তিনি বাড়িতেই জামা তৈরি করেন। তার কাছে রেডিমেড পিরানও পাওয়া যায়। একটা বাক্স হাতে করে সেদিকে সে যাত্রা করল, রাস্তায় তার গায়ে রঙ বা আবির যদি কেউ দেয় তো দেবে। যাতে কেউ কোনোরকম জেরা না-করে সেই জন্যে বলল তার ভৃত্যের ছেলের জন্যে জামা চাই, তার সব জামাই রঙে নষ্ট হয়ে গেছে। এ'তে দাম হয়ত বেশিই নিয়েছে, অথবা ন্যায্য দামই নিয়েছে, যা'ই নিক, মাপ-মত জামাই পাওয়া গেল। বাক্সে সেই জামা-প্যান্ট ভরে নিয়ে সে বাসায় ফিরল। ইতিমধ্যে বড় তোয়ালে দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে বসে আছে টিপু, তার জামা কখন শুকাবে তার অপেক্ষা করছে, তখন সে পেয়ে গেল তার নতুন জামা প্যান্ট। এসব পরে সে বেরিয়ে এল, রাকেয়া হাততালি দিল।

"সুন্দর, সুন্দর, ভারি সুন্দর।" সে বলল।

"ধন্যবাদ।" সবিনয়ে উত্তর দিল টিপু।

"কিন্তু বাঘের মুখোশেও তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।" রাকেয়া বলল।

"বাঘের মুখোশ?" জিজ্ঞাসা করল টিপু।

"হ্যাঁ। তোমার জন্যে বাবা তাই কিনেছিল, তুমি সেইটে পরেই এসেছ সকাল-বেলা। রাস্তার সকলেই নিশ্চয় বলেছে, 'ওই দেখ, কী চমৎকার একটা বাঘ চলেছে', তারা ভয়ও নিশ্চয় পেয়েছিল, তাদের খেয়ে ফেলবে ভেবেছিল, তাই কাছে আসেনি কেউ। ওরই জন্যে আমরা রক্ষে পাই।"

টিপু বলল, "এটা বাঘেরই মুখ।"

"সত্যিই তাই।" বলল রাকেয়া, "কী আশ্চর্য, যেটা পরে সে রক্ষা পেল, সেটা কী তাই দেখেনি সে?"

রাকেয়ার মা এসে বলল, "খুব হয়েছে। এবার চুপ কর।"

লালা মিঞাকে টিপু বলল, "এটা আমি নিতে পারি, চাচা?"

"নিশ্চয়।" লালা মিঞা বলল, "কিন্তু এর চেয়ে ভালো একটা তোমাকে এনে দিতে পারি। হোলির রঙে এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

"না। এইটেই নেব যদি দাও।" টিপু বলল।

"বেশ, তাই নাও।"

"ধন্যবাদ। এর আগে কখনো মুখোশ আমার ছিল না।" টিপু বলল।

রাকেয়ার মা বলল, "এটা তুমি পাবেই। আরও অনেক পাবে।"

"না। এইটেই সবচেয়ে ভালো।"

রাকেয়া বলে উঠল, "হায় রে, এর আগে কখনো মুখোশ পায়নি। এটাকেই সবচেয়ে ভালো বলছে।" এ কথা বলে সে কী যেন ভাবল, তার কপালে একটু ভাঁজ পড়ে গেল, বলল, "বোধ হয় ঠিকই বলেছে। এ'তে ওকে যেমন সাহসী দেখিয়েছে, তেমনি ভয়ংকর। তাই না, বাপজান?"

লালা মিঞা মেয়ের গালে একটু চিমটি দিয়ে বলল, "তুমি সব সময়ই ঠিক কথা বল, বাছা।"

রাকেয়া এ'তে পুলকিত হয়ে উঠল, বলল, "দেখ, দেখ, হে বাঘ আমি ঠিকই বলেছি।"

টিপু একটু হেসে বলল, "আমি জানি ঠিকই বলেছ।"

হাত নেড়ে, রাকেয়া খুশি হয়ে বলে উঠল, "আ, ঐ সাহসী ও সুন্দর বাঘ ঐ রকমই বলে।"

রাকেয়ার মা ধমক দিল, "বোকা, নির্বোধ।"

সারাটা দিন তারা একত্রে কাটাল। রাকেয়া বার-বার টিপুকে মুখোশটা পরিয়ে ছাড়ল। সে আর করিম যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছে এমন ভান করল, দৌড়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। একজনকে ধরে ফেললে তাকে বসে থাকতে হবে, অন্য-জনকে তখন টিপু ধরবে। একজন যদি দশ বার 'হে বাঘ, সাহসী ও সুন্দর বাঘ' বলতে পারে ধরা পড়ার আগে, তবে অন্যজন যোগ দিতে পারবে খেলায়—এই ভাবে দু'জনই ধরা পড়বে। কিন্তু টিপু দেখল এ'তে সময় লাগছে অনেক, কিন্তু রাকেয়া ও করিম এ'তে বেশ খুশিই হচ্ছে।

সূর্যাস্তের অনেক আগে করিম ঘুমতে গেল। লালা মিঞা তার স্ত্রীসহ বাড়ির অন্যপ্রান্তে বসে চাপা গলায় আলোচনা করতে লাগল এর পরে কী করা যায় যাতে কেউ না টের পায় তারা কাদের আশ্রয় দিয়েছে, অর্থাৎ হাইদর আলির ছেলেদের। হোলির জন্যে বাড়ির চাকরানীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, পরদিন সেই ঝি ফিরে এলে কী অবস্থা হবে তাই ভাবনা, সে আবার এত কথা বলতে পারে! কী দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রাখা যেতে পারে?

রাকেয়া ও টিপু জানালা দিয়ে বিকেলের আকাশ দেখছিল। তারা হাত ধরাধরি করে বসে আছে, তারা জানেই না কেন। জানার মত বয়স তাদের নয়। অথবা হয়তো তারা জানে যে, তাদের জীবনে এমন দিন আর আসবে না, এমন আনন্দও আসবে না, এমন ছোটও থাকবে না তারা, এমন স্বাধীনও না।

সেই রাত্রে গাজি খাঁ এল। তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাইদর আলির ও তার ছেলেদের পলায়নের সংগে তার কোনো যোগ নেই এ কথা সে হলপ করে জানায়। সে যদি এসবের মধ্যে থাকবেই তখন কী করে সে পরম নিশ্চিন্তে তার বাড়িতে ঘুমচ্ছিল? আসলে বিশেষ কোনো ব্যাপারে সন্দেহ করে তাকে ধরা হয়নি, সাধারণভাবে প্রশ্নাদি করার জন্যে আরও পাঁচজনকে যেমন ধরা হয়েছে তেমনি তাকেও। যদি বা সে ঐ পলায়ন সম্বন্ধে কোনো তথ্য জানাতে পারে। এতজনকে প্রশ্ন করতে সময় লাগে, পরদিনই তাকেও প্রশ্ন করা হত, কিন্তু হোলির জন্যে হয়ে ওঠে না। বিকেলের দিকে তাকে প্রশ্ন করা হয়, যদি তার নজরে কিছু আসে তখনই সে সম্বন্ধে সে যেন রিপোর্ট দেয়—এই হুঁশিয়ারি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। যে পুলিশ অফিসার তাকে প্রশ্ন করে সে তার চেনা লোক, সে বলল,

"হোলির দিনে তোমাকে আটক রেখে, তোমার এক প্রস্ত পোশাক বাঁচিয়ে দিলাম গাজি খাঁ।" এ কথা শুনে গাজি খাঁ এমন ভীষণ ভাবে হেসে উঠল যেন তার জীবনে এমন রসিকতা সে আর শোনেনি। পুলিশ-অফিসারটি এতে খুশি হয়ে আর দু-একটা রসিকতা তাকে শুনিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে তাকে বাড়িতে পেঁছে দিল। তার দরজার সান্ত্রী আরও এক চমক দিল, বলল, "তোমার ঘর পাহারা দেবার জন্যেই এখানে আছি। দরজাটা মেরামত করিয়েছি, নতুন তালা লাগিয়ে দিয়েছি। এই নাও চাবি।" বকশিশ হিসাবে গাজি খাঁ তাকে কিছু দিল।

সান্ত্রী বলল, "ওর দরকার নেই। আমি রূপ সিংএর ভাই, যার তুমি ডিঙিডগুলে জান বাঁচিয়েছিলে।"

"সে এখন কেমন আছে?" গাজি খাঁ জিজ্ঞাসা করল, যদিও ঘটনাটার কথা সে মনে করতে পারল না।

"ভালো আছে। তার খামার এখন অনেক বড় হয়েছে। সে বিয়ে করেছে।"

"বা, বেশ ভালো কথা, বেশ আনন্দের কথা। তা হলে তো তুমি তার ও আমার স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করে মদ্য পান করবেই।" এই কথা বলে সান্ত্রীর হাতে টাকা গুজে দিল গাজি খাঁ।

সান্ত্রীর পদধ্বনি মিলিয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই গাজি খাঁ দরজা বন্ধ করল এবং লাল মিঞার জানালায় টোকা দিল।

জানালা খুলে লালা মিঞা দাঁড়াতেই গাজি খাঁ বলল, "আমি যাবার আগে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিলাম।"

"সেটা পেয়েছিলাম। সব ঠিক আছে।"

"ধন্যবাদ। আমি চিন্তায় ছিলাম। এখুনি নৌকোর কাছে যাচ্ছি।"

"অত হাঙ্গামা করতে হবে না। ওরা এখানে আছে।"

"কী বললে?" গাজি খাঁ এমন অবাক হয়ে গিয়েছে যে, সে বেশ শব্দ করেই বলে উঠল কথাটা।

"আস্তে বলো।" লালা মিঞা তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "যত তাড়াতাড়ি পার আমার ঘরে এস। দরজায় ঘা দিয়ো না। দরজা খোলাই থাকবে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ো। শব্দ না করে ঢুকো।" এইসব নির্দেশ দিয়ে খুব খুশি হল লালা মিঞা। যে কখনো সাবধান হতে জানে না এমন-একজনকে সে যেন এইসব উপদেশ দিল।

"আমার খোদার খোদা তুমি। আমার ধন্যবাদ জেনো।" নিজেকেই যেন

বলল গাজি খাঁ, এবং বাড়ির বাইরে গেল। রাস্তায় তখন কেউ নেই। পাশের বাড়িতে সে গেল। লালা মিঞা ও তার স্ত্রী অপেক্ষাই করছিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কোথায় ?"

পাশের ঘর দেখিয়ে দিল লালা মিঞা। একটা মস্ত বিছানায় ছেলে-দুটি পাশাপাশি শুয়ে। লণ্ঠনটা নীচে রাখা, তার আলো তাদের উপর পড়ছিল না। লণ্ঠনটি তুলে গাজি খাঁ বিছানার কাছে গেল।

আলো তাদের উপর পড়তেই লালা মিঞা বলল, "এতে কোনো ভুল নেই।"

গাজি খাঁ জিজ্ঞাসা করল, "কী ভাবে এদের আনতে পারলে ?" পথঘাটে লোকজন ও পুলিশ—একথা মনে হল গাজি খাঁর।

"ওটা তেমন জরুরি বিষয় নয়।" লালা মিঞা বলল, "কিছু ঝুঁকি অনিবার্য। অনেক রকম ব্যবস্থা করে, অনেক ভাবে সাবধান হয়ে একাজ করতে হয়েছে। কিন্তু এখন যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে এর পরে কী।"

গাজি খাঁর অনেক কৌশল জানা। লালা মিঞা তার প্রত্যেকটির কিছু-কিছু খুঁতের কথা বলল। যোদ্ধা গাজি খাঁ অবশেষে কৌশলী লালা মিঞার কাছে আত্মসমর্পণই করল, লালা মিঞা তার প্ল্যানের কথা বলতে লাগল। বলল যে, মস্ত জনতার মধ্যে ও ভিড়ের মধ্যেই হচ্ছে মস্ত সুযোগ, এতে কেউ কাউকে চিনতে পারে না। গোঁড়া মুসলমান পরিবারে মেয়েরা যেমন বোরখা পরে, টিপুকে তাই পরতে হবে। করিমকেও মেয়েদের পোশাক পরতে হবে, কিন্তু বোরখা নয়। দুজনেই পরদা-ঘেরা একটা গাড়িতে উঠবে। শেঠ দেবী দয়ালের ছেলের বিয়েতে শত শত পাল্কির ও পরদা-ঘেরা গাড়ির মিছিল যাবে। একটা বাড়তি গাড়ি কারো নজরে পড়বে না। পরদিন বিকেলে বিবাহের এই মিছিল রওনা হবে। নয় মাইল দূরে শহরের এক উপকণ্ঠের দিকে যাবে মিছিলটি, শহরের ফটকের বাইরে। আগে থেকে ঘোড়া প্রস্তুত রাখলে সেখান থেকে সেই ঘোড়ায় চাপিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া যাবে। এরকম মিছিল কোনো ফটকেই তল্লাসি করা হবে না, বিশেষ করে শেঠ দেবী দয়ালের প্রভাবপ্রতিপত্তি ও সুনাম তারা বিবেচনা করবেই। সে যাই হোক, ইতিমধ্যে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে, হাইদর আলির ছেলেরা পাচার হয়ে গেছে।

প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হল। বিয়ের মিছিল যাত্রা করার আগেই গাজি খাঁ তার নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওনা হয়ে গেছে। মিছিলের সংগেসংগে গিয়ে সে

লোকের মনে সন্দেহ জাগাতে চাইল না। যদি তখন কেউ তাকে চিনতে পারে। ছেলে-দুটির সঙ্গী হল লালা মিঞা।

তার মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল রাকেয়া।

"বিদায়।" টিপু তাকে বলল, "তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ, রাকেয়া।"

"ওরে বাঘ, ওরে বাঘ, কী কথা বলছ তুমি?" হাসল রাকেয়া, কিন্তু তার চোখে জল।

"বিদায়।" আবার বলল টিপু

"তুমি বাঘের মুখোশটা নিয়েছ তো?"

"নিশ্চয়। নিয়েছি।" মোটা কাগজের ব্যাগে করে রাকেয়ার মা তাকে তা [illegible] দিয়েছে, তার উপরে দিয়ে দিয়েছে বিস্কুট ও কেক।

[illegible]মেয়ের পোশাক পরা করিমকে নিয়ে এল রাকেয়ার মা। সবাই হাসল। তার পর লম্বা বোরখা পরিয়ে দিল টিপুকে, নিজের বোরখাটা কেটে সেলাই করে দিয়েছে সে।

রাকেয়া চ্যাঁচাতে লাগল, "তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে, পাচ্ছিনে।"

রাকেয়ার মা বলল, "চুপ কর।"

রাকেয়া অনুনয় করল, "দয়া করে দেখতে দাও তোমাকে।"

টিপু বোরখাটা একটু তুলল।

"আমি বোরখায় তোমাকে দেখতে চাইনে, আমি বাঘের রূপে তোমাকে দেখতে চাই। আমার বাঘ আমি চাই।"

টিপু বলল, "সব সময় আমি বাঘ হয়েই থাকব।" রাকেয়ার হাত ধরল সে, তার পর নামিয়ে দিল বোরখা।

লালা মিঞা করিমকে খুঁটিনাটি করে দেখল, টিপুকে দেখে নিল, তারপর তুষ্ট হল। রাস্তার ধারের কয়েকটি বাড়ির সামনে পরদা-ঘেরা গাড়ি ও তার বাহকেরা অপেক্ষা করছিল। এরা ওই বিয়ের মিছিলে যোগ দেবে। লালা মিঞা বেশ উদার ও মুক্তহস্ত মানুষ, বাহকদের পয়সা দিয়ে সে তাদের কিছু খেয়ে আসতে বলল। টিপু সুলতান ও করিম গাড়িতে ঢুকল, কেউ লক্ষ করল না। লালা মিঞা তার বাহকদের ডেকে নিজে ঢুকল গাড়িতে। চার ঘণ্টা বাদে নয় মাইল দূরে গাজি খাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল।

গাড়িটার তালে-তালে চলা ও মিছিলের সংগী বাজনদারদের বাজনা করিমকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের সজাগ ও সন্ত্রস্ত জেনারেলের মত লালা

মিএঞা নিজেকে সতর্ক রেখেছে, কখন শত্রুবাহিনী এসে যায় তার জন্যে যেন প্রস্তুত। টিপু সুলতান সেই মেয়েটির কথা মনে করতে লাগল, যার হাত সে ধরেছিল, এবং যে তাকে ডেকেছিল 'বাঘ' ব'লে !

খ

পুরনাইয়া তাকে যেখানে রেখে গেছে সেই তাঁবুতে বসে টিপুর মন বারেবারে অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে, তার প্রতিটি ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তার মন। পনেরো বছর আগেকার ঘটনার কথা তার মনে পড়ল। ঘটনাটা ১৭৬৭ সালের, রাকেয়া বানুর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সাত বছর পরের। তখন সে সতেরো বছরের বানিয়ামবাড়িতে জোসেফ স্মিথের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে তার সেই বিপুল জয়, তার পরেই গভিন ও ওয়াটসনের যুগ্ম পরিচালনায় মাঙ্গালোর আক্রমণকারী ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া। আতঙ্কগ্রস্ত ইংরেজ ব্যাটেলিয়ান পলায়ন করল. ফেলে রেখে গেল তাদের আহত ও মৃতদের, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ। ঐ দক্ষ ইংরেজ দল যুদ্ধের মুখোমুখিই হতে পারল না। টিপুর সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না, কেবলমাত্র ১৫,০০০ কিষাণ সংগ্রহ করে একটা নকল বাহিনী গড়ে তোলে, প্রত্যেকের সঙ্গে বন্দুকের মতন করে তৈরি কাঠের খেলনা গোছের তথাকথিত অস্ত্র, প্রতি পঁচিশ লোকের সঙ্গে একটি করে উড্ডীন পতাকা। এই ভাবে সে ঢুকে পড়ে মাঙ্গালোরে। শত্রুরা এই 'বিপুল সৈন্যসম্ভার' দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। টিপু অধিকার করল মাঙ্গালোর। তার পর মালাবারে তার পিতার অধিকৃত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করল ইংরেজকে। তার পিতাও সে সময়ে তার সঙ্গে যোগ দেন, দু বছর ধরে টানা লড়াই চালায় টিপু পিতার পাশে-পাশে। এই ভাবে চলে ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত, তখন এমন অদম্য অবস্থায় তারা পেঁছে যায় যে, মাদ্রাজের ফটকের সম্মুখে হাইদর শান্তির শর্ত দিতে পারেন ইংরেজদের।

এইসব জয়ের জন্য উল্লাস করেছেন হাইদর, এর কারণ এইসব জয়গৌরব লাভের জন্য তাঁর পুত্র নিজেকে একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে পেরেছে। তিনি ঘোষণা করেন তাঁর পুত্র বিশেষ একটি যুদ্ধ-পতাকা এবং একটি ব্যানার পাবার যোগ্য। টিপু সুলতান সবিনয়ে বলেছে যে, তার পিতার পতাকা ও পিতার ব্যানার তাকে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে।

উত্তরে হাইদর বলেছেন, "বেশ বলেছ। আমিও তোমার পতাকা ও ব্যানার

থেকে শক্তি ও সাহস পেতে চাই। আমারগুলো নিতেই হবে, তার সঙ্গে যেন তোমার গুলিও থাকে।"

টিপু সম্মত হয়েছে তাতে। বলেছে, "তাই হবে।"

"পতাকার উপর কী চিহ্ন দেওয়া হবে?" টিপুকে ও উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন হাইদর।

"চিহ্ন?" টিপু জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ। চিহ্ন—প্রতীক।" হাইদর বুঝিয়ে বললেন, "কী তোমার পছন্দ? তরোয়াল, বন্দুক, চাঁদ, রাজমুকুট?"

"আমি পছন্দ করব বাঘ। যদি ভালো বোঝেন, পিতা।" টিপু বলল, "আমার পছন্দে যদি আপনার সায় থাকে।" রাকেয়ার কথা তার খুব মনে পড়ল।

"বাঘ? বাঘ কেন?" জানতে চাইলেন হাইদর।

"কেন নয়, বাবা?" নম্র গলায় বলল টিপু।

"বটেই তো। কেন নয়।" খুশি মনে বললেন হাইদর, "খুব ভালো চিহ্নই হবে।" অন্য-সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর চেয়ে ভালো কিছু বল তোমরা।"

কেউ কিছু বলল না। সেই দিন থেকে টিপুর চিহ্ন ও প্রতীক হল বাঘ। এই চিহ্ন তার পতাকায় ব্যানারে বন্দুকে এবং অন্যান্য সর্বত্র অঙ্কিত হল। তার সৈন্যদের ইউনিফরমে বাঘের মূর্তি চিত্রিত হল। পোশাকে-আশাকে টিপু যদিও অনাড়ম্বর, কিন্তু কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে যেতে হলে সোনালি বস্ত্রের কোটের উপর লাল রঙের ব্যাঘ্রমূর্তি উৎকীর্ণ হওয়া তার চাই।

রাকেয়া বানুর সেই সহজ সরল উক্তি অবশেষে গুরুগম্ভীর চিন্তাবান টিপু সুলতানের প্রতীক বাঘাইয়ের এক প্রেরণা হয়ে গেল, নয় বছর আগে যার হাত সে ধারণ করেছিল। সেই অজ্ঞাত শিল্পী যে বাঘের মুখোশ অঙ্কন করেছিল, হোলির দিনে লালা মিঞা যেটা তাকে কিনে দেয়, সে জানে না যে তার আঁকা সেই চিত্রেরই নকল করা হয়েছে ব্রোঞ্জে রুপোয় সোনায়, খোদাই করা হয়েছে কাঠে, অঙ্কন করা হয়েছে সিল্কের ও তুলোর বস্ত্রে।

## ৩১. রাকেয়া, প্রিয়তমা আমার !

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে টিপুর মন অতীতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এখন সে তার স্ত্রীর ও সন্তানদের কথা ভাবতে লাগল। চব্বিশ বছর বয়সে ১৭৭৪ সালে সে বিয়ে করে রাকেয়া বানুকে।

চোদ্দ বছর আগে সে তার সংগে একটা জীর্ণ নৌকোয় কাটায়, এবং একটি রাত্রি কাটায় তাদের গৃহে। হাইদর অল্পকালের মধ্যেই বিজয় গৌরবে ফিরে আসেন ও মহীশূরের রাজ্য তাঁর অবিসংবাদিত অধিকারে নিয়ে আসেন। টিপু সুলতান ও আবদুল করিম তাদের বাবা-মা'র সংগে মিলিত হয়। টিপুকে নিয়ে হাইদর সেই নৌকোটা দেখতে গেলেন, কী ভাবে তাঁর ছেলেরা সেখানে ছিল তা দেখার কৌতূহল তাঁর ছিল। রাকেয়া যে খাবারের বাস্কেটটি নিয়ে এসেছিল সেটা নৌকোতেই ছিল। হোলির দিন সকালে লালা মিঞা যখন তাকে নিতে আসে তখন সে সেটা নিয়ে যেতে ভুলে যায়। হাইদর সেই বাস্কেটের একটি অনুরূপ স্মারক খাঁটি সোনায় তৈরি করান, এবং ফকর-উন-নিসা, টিপু, করিম ও গাজি খাঁকে নিয়ে লালা মিঞা ও তার স্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে যান তাঁদের ছেলেদের সাহায্য করার দরুন। লালা মিঞা ও তাঁর স্ত্রীকে তাঁরা প্রচুর ধন্যবাদ জানান। তিনি ছোট্ট মেয়ে রাকেয়াকে কোলে তুলে নিয়ে তার গালে ও ঠোঁটে চুমো খান। সে লজ্জা পাচ্ছিল, মায়ের কাপড় ধরে ছিল। রাজোচিত চেহারার হাইদর সাদা সাটিনের জোব্বার উপর সোনার ফুল বসানো ও রক্তরাঙা পাগড়িতে এক বিরাট সাজে সজ্জিত, তিনি রাকেয়াকে তুলে নিলেন কোলে। প্রাণ ভরে হাইদর তাদের প্রচুর উপহার দিলেন। সোনায় তৈরি বাসকেট ছাড়াও আরও অনেক-কিছু। তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, এটা উপহার নয়, প্রতিদানে টিপু যা দিতে চেয়েছে এটা তাই। হাইদরের দেওয়া উপহারগুলি ছাড়াও অন্যান্য জিনিস সবই প্রতীক স্বরূপ। ফকর-উন-নিসা রাকেয়ার মা'কে এমব্রয়ডারি করা একটা শাল, রাকেয়াকে সোনার সুতো দিয়ে তৈরি স্কার্ফ দিলেন। আধা-দামী পাথর বসিয়ে বাঁধানো একটা আয়না রাকেয়াকে দিল করিম। টিপু সুলতান তাকে দিল আইভরির উপর আঁকা ছোট আকারের একটি চিত্র। অনেকগুলি চিত্রের মধ্যে থেকে এটা সে বেছে নিয়েছে। বনের মধ্যে একটা বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই

হচ্ছে ছবিটা। খুব লাজুক কিন্তু বড়ই মধুর ভঙ্গিতে রাকেয়া এসবের জন্যে ধন্যবাদ জানাল। তার ঠোঁট দিয়ে সে একটা কথা গড়ে তুলল, কিন্তু কোনো শব্দ করল না। সম্ভবত টিপু বুঝল কথাটা।

সে সময়ে লালা মিঞা মহীশূরের সেনাবাহিনীতে একজন জুনিয়র কম্যাণ্ডার, তার পর হাইদরের পৃষ্ঠপোষকতায় তার উন্নতি হতে লাগল খুব দ্রুততালে। সামরিক দায়িত্ব তার বেড়েই চলল, এজন্যে তাকে যেতে হল নানা জেলায়। তার বিবাহের আগে পর্যন্ত চোদ্দটি বছর টিপুর দেখা হয়নি রাকেয়ার সঙ্গে। কিন্তু প্রতি বছর হোলি-উৎসবের সময়ে হাইদরের গৃহ থেকে রাকেয়ার ও তার মায়ের কাছে উপহার যেত। হাইদরের মৃত্যু পর্যন্ত এটা চলিত ছিল।

লালা মিঞা জেনারেল হয়েছিল। হাইদরের হয়ে মেলুকোটে লড়াইয়ের সময়ে ১৭৭১ সালে তার মৃত্যু হয়। হোলির দিনেই তার দুঃখকর এই মৃত্যু। লালা মিঞার পরিবারের জন্যে হাইদর প্রভূত সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন। লালা মিঞার পদ দেওয়া হয় তার পুত্র, রাকেয়ার ভ্রাতাকে। টিপু যেদিন তাদের গৃহে কাটায় সেদিন সে তার চাচার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

টিপু সুলতান রাকেয়ার মায়ের সংগে দেখা করে সমবেদনা জানায়। তখন সেখানে আরও অনেকে দেখা করতে এসেছে। রাকেয়া বাইরে আসেনি, কেননা সে তখন শোকাকুল। তাছাড়া অবিবাহিত মেয়েরা সবার সামনে বেরয় না।

এই কয় বছরের মধ্যে টিপুর বীরত্ব কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি সংগ্রামে শত্রুকে পরাভূত করে তার অগ্রগতি রয়েছে অব্যাহত। তার পিতার তেজ এখন মন্দীভূত। প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ক্রমেই তিনি তাঁর পুত্রের উপর যুদ্ধ পরিচালনার ভার ছেড়ে দিচ্ছেন। এসব সত্ত্বেও তিনি একজন শক্তি রূপেই গণ্য হয়ে আছেন, তরুণ বয়স্কদের সংগে এখনো তিনি সাহসে বিক্রমে ও বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হওয়ায় পাল্লা দিতে পারেন, কৌশলেও তিনি তেমনি অদ্বিতীয়। হাইদরের দুই পুত্র, তার একজন অক্ষম, এই জন্যেই তিনি বৃহৎ পরিবারের পক্ষপাতী। টিপুর বয়স যখন সতেরো তখনই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। যখন ইংরেজের সংগে মহীশূরের প্রথম লড়াই বাধে, এ ঘটনা তখনকার। ইংরেজের সমর্থনে তখন ছিলেন হায়দরাবাদের নিজাম। হাইদর যদিও জানতেন যে নিজাম অত্যন্ত চপলমতি, তবুও তিনি ইংরেজের পক্ষ থেকে নিজামকে আলাদা করে নেবার চেষ্টা করেন। নিজাম কখন যে দল বদল করবেন তার ঠিক ছিল না, একথা জানা সত্ত্বেও হাইদরের এ চেষ্টা

একটু ছিল। হাইদর তবুও শুভটাই বেশি প্রত্যাশা করতেন। এই সঙ্গে আর-একটা ব্যাপারও জড়িত ছিল। তিনি নিজামের ভ্রাতা মহফুজ খাঁর সুন্দরী মেয়ের কথা শুনেছেন। জ্যোতিষীরা বলেছেন এ মেয়ে টিপুর বেশ উপযোগী হবে। যদি অবশ্য 'মহফুজ খাঁ কার্ণাটিকের নবাব হতে পারেন'। এই জন্যে টিপুর নেতৃত্বে হায়দরাবাদে তিনি এক প্রতিনিধিদল পাঠান, সঙ্গে অবশ্য বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ উপদেষ্টাও দিয়ে দেন। টিপুকে এই ভাবে পাঠিয়ে হাইদর অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছে তিনি বলেছেন, "আমি ঐ চপলমতি ও নিষ্ঠুর নিজাম সম্বন্ধে একটু শঙ্কিত। সে তার ভাইকে হত্যা করেছে, আমার ছেলেকে কি পরিত্রাণ দেবে? তা ছাড়া, সে আমার ছেলেকে আটকও রেখে দিতে পারে। আমার পুত্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করার মাশুল হিসেবে সে মোটা টাকা দাবি করতে পারে, কিংবা অনেক সুবিধা আদায়ের ফিকির করতে পারে। সংক্ষেপে বলতে পারি আমি আমার ছেলেকে এক জঘন্য ব্যক্তির হাতে দিয়েও বিশ্বাস করতে পারি।" যাই হোক সব ভালোয় ভালোয় কাটল, একটা চুক্তিও হল। পাতলা অথচ সৈনিকের মতন চেহারার তরুণ রাজকুমারের মর্যাদাবান পুরুষকার দেখে নিজামের ভালো লাগল, সেজন্যে ছয়হাজার অশ্বারোহী সহ তিনি হাতি ঘোড়া ও প্রভৃত ধনসম্পদ উপহার রূপে পাঠালেন। টিপু বেশ ভালোভাবেই অভ্যর্থনা পেল। নিজাম তাকে নসিব-উদ-দৌলা (রাজ্যের সৌভাগ্য) খেতাব দিল। এবং কার্ণাটিকের নবাব পদ তার খুশিমত যাকে ইচ্ছা দিতে পারে, এই অধিকার দিল। মহফুজ খাঁর কন্যাকে টিপুর হাতে সমর্পণ করা হবে, এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল। তার উপর, নিজাম দাঁড়াবে ইংরেজের বিরুদ্ধে—এ কথাও হয়ে গেল এই ভাবে হাইদরের পরিকল্পনা ও টিপুর কূটনীতি সাফল্য লাভ করল। কেবল ইঙ্গ-হায়দরাবাদ চুক্তিই বাতিল হল না, নিজাম হাইদরের পক্ষে এলেন—অন্তত সে সময়ের জন্য।

হায়দরাবাদে কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করে টিপু বিজয়গৌরবে ফিরে এল। কিন্তু নিজাম প্রায়শই দল বদল করত। অনেকে বলত, সেই বিশেষ দিনে নিজাম কার পক্ষে আছে তা জানার জন্যে ডায়ারি দেখে নিতে হত। মহফুজ খাঁর মেয়ের সঙ্গে টিপুর বিবাহ হয়ে যাক হাইদরের এই কথায় টিপু কোনো আপত্তি জানাত না, কিন্তু জানতে চাইত অমন বিশ্বাসঘাতক পরিবারের মধ্যে পড়লে সে নিরাপদে থাকবে তো? একথায় হাইদর ব্যাপারটা আবার চিন্তা করে দেখতেন। তিনি অন্যত্রও পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু যখনই

তিনি বিশেষ একটা প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হতেন টিপু তখনই একটু গাড়িমসি করতে লাগল। হাইদরের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি টিপুর মায়ের উপর ভার দিলেন। টিপুর বিয়ে হোক এ ব্যাপারে তিনি হাইদরের মতই ব্যগ্র, কিন্তু তিনি তাঁর ছেলের উপযোগী পুত্রবধূই চান, কোনো পাত্রীর সামান্য একটু খুঁত দেখালেই তিনি তাকে নাকচ করে দিতেন। প্রথম দিকে হাইদর শক্তিশালী রাজপুরুষদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন, এতে প্রবল প্রভাব সহ প্রচুর যৌতুক আসবে। পরে অবশ্য তাঁর নিজের প্রভূত সম্পদ সঞ্চিত হওয়ায়, অনেক ভূভাগের অধিপতি হওয়ায়, শক্তিশালী ব্যক্তিদের মৈত্রীলাভের বাসনা উবে যায়। এখন তাঁর একমাত্র আকাঙ্খা তাঁর পুত্রের জন্য সুন্দরী ও সচ্চরিত্রা একটি বধূ পাওয়া—যে নাকি তাঁর নাতি লাভের আশা পূর্ণ করতে পারবে, অনেক নাতি চান তিনি।

অনেক বারই টিপুর পরামর্শে হাইদরের অনেক প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন ফকর-উন-নিসা। এ'তে হাইদর তাঁর স্ত্রীর ও পুত্রের উপর ক্ষেপে যান, বলেন, কারো সংগে পরামর্শ না-করেই এবার তিনি বধূ নির্বাচন করবেন. পিতা হিসাবে ও রাজ্যের সর্বেসর্বা হিসাবে যা তিনি করার অধিকারী তাই করবেন—নিজের অভিমত চাপিয়ে দেবেন অন্যের উপর।

হাইদর আলি একটি যোগ্য পাত্রী বাছাই করলেন সে হচ্ছে আর্কটের ইমাম সাহেব বকসীর কন্যা রোশন বেগম। তার মা আটটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন, তার ঠাকুরমা দিয়েছেন এগারোটি পুত্রের জন্ম। সগর্বে নিজের এই নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে হাইদর বললেন এই মেয়েটি "একটি প্রাচীন পরিবারের কন্যা, এ হচ্ছে সুন্দরী সচ্চরিত্রা পবিত্রা এবং—ভুলে যেয়ো না—উর্বরা।"

সেই দিন সকালেই আর-এক ঘটকের কাজ শুরু হয়ে গেছে। টিপুর সঙ্গে দেখা সেলিম নামে ছয় বছরের এক বালকের, এ হচ্ছে বুরহান-উদ্-দিনের ছেলে, রাকেয়া বানুর ভাতুষ্পুত্র। রাকেয়া বানুর সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কারো সংগে দেখা হলেই টিপু কৌতূহলের বশেই হোক বা যে কারণেই হোক জিজ্ঞাসা করে রাকেয়ার কথা। তাকে একটু আদর জানিয়ে টিপু সেলিমকে তার ঘোড়ায় তুলে নিল এবং যাতে বালকটিকে কিছু মিঠাই খাওয়াতে পারে সে জন্য তাকে প্রাসাদের দোকানে নিয়ে এলো। তারপর আরম্ভ হল তাদের কথাবার্তা। নানা বিষয়ে আলোচনা—মিষ্টান্ন খেলাধূলা ঘোড়া জন্মদিন ও নানা উৎসব। কথায় কথায় টিপু কথা তুলল রাকেয়ার, কিন্তু সেলিম তখন সার্কাসের ব্যাপার নিয়ে বিভোর,

সম্প্রতি সে দেখে এসেছে সার্কাস। টিপু তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে চাপ দিল।

"ও, রাকেয়া ফুফু? সে খুব ভালো মেয়ে।" সেলিম বলল, বলেই সে সার্কাসের হাতির কথা তুলল।

টিপু বলল, "তার নাকি শিগগিরই বিয়ে?"

সার্কাসের হাতির বিয়ে অথবা তার ফুফু রাকেয়ার বিয়ে কোন্‌টা জানতে চায় টিপু? কথাটা যখন সাফ হয়ে গেল তখন অনেক খবর বলতে লাগল সেলিম।

"রাকেয়া ফুফু? না, সে কোনো মানুষকে বিয়ে করবে না।" সেলিম বলল, "একটা বাঘ তাকে বিয়ে করবে এইজন্যে সে অপেক্ষায় আছে।"

"একটা বাঘ তাকে বিয়ে করবে?" টিপু অবিশ্বাসের হাসি হাসল, "তুমি ঠিক জান?"

"হ্যাঁ। জানি।" বলল সেলিম, "কথাটা কিন্তু গোপন। সে জানে আর আমি জানি। আর কেউ জানে না।"

"আমাকে বল-না।" টিপু আবদার করল।

সবজান্তা সেলিম গোপন কথা গোপন রাখতে জানে, কিন্তু টিপু সুলতানের মতন স্নেহশীল চাচার কাছে কিছু গোপন রাখা দায়।

সে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে চড়ুইপাখি ও কাঠবেড়ালীদের দিকে ছুড়ল। তার গোপন কথা কেউ যেন না শোনে এই জন্যেই বোধহয় তার এই সাবধানতা।

"শোনো চাচা, সে বিয়ে করতে কিছুতে রাজি না। এজন্যে নানি ও আমার বাবা তাকে যখন খুব ধমক দেয়, তখন সে আমাকে বলে—অনেক বছর আগে এক নৌকোয় এক রাজকুমারের সঙ্গে তার দেখা হয়। কী চমৎকার দেখতে সে, কী সাহসী, কী শক্তিমান! এজন্যে এক জাদুকর তাকে জাদু করে। এ'তেই সে বাঘ হয়ে যায়, এবং বনে চলে যায়, সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সেই বাঘ ফিরে আসবে বলে সে অপেক্ষা করছে। প্রায়ই সেই জাদুকর নানা বেশ ধারণ করে আসে, ও বিয়ের প্রস্তাব করে। নানী ও বাবা তাকে অনেক বোঝায়, কিন্তু সে বোঝে না, এ'তে তারা রাগ করে। কিন্তু সে অপেক্ষা করছে সেই বাঘের জন্যেই। আর কাউকে বিয়ে সে করবে না।"

সেলিমের আরও অনেক কথা বলার ছিল, অনেক বিষয়ের অনেক কথা। টিপু তাকে আদর করে চুমো খেলো। এ চুমোটা অবশ্য অন্য একজনের জন্যেই অভিপ্রেত, চৌদ্দ বছর আগে এক নৌকোয় যে মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়, এবং

যাদের বাড়িতে সে এক মোহময় রাত্রি যাপন করে, এ চুম্বন তার উদ্দেশেই নিবেদিত। সেই সাহসী ও লাবণ্যময়ী মেয়েটির মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তার স্বপ্ন যেন একটা রূপ গ্রহণ করল, সেই রাত্রির পর থেকে তার চোখের সামনে যে মোহ ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই যেন একটা চেহারা ধারণ করল। সেলিম কথাই বলে চলেছে, অবশেষে তার বাবা বুরহান-উদ্-দিন এসে তাকে নিয়ে গেল। রাকেয়ার ভাই বুরহান উদ্-দিনের সঙ্গে টিপুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এখন টিপু তাকে আলিঙ্গন করল। চমকিত হল বুরহান-উদ্-দিন।

সে বলল, "আশা করি সেলিম দুষ্টুমি করেনি ?"

"দুষ্টুমি ?" টিপু হাসল, "সে কতটা সাহায্য আমাকে করেছে এবং আমি তার কাছে কতটা কৃতজ্ঞ, তা তুমি জান না।"

বুরহান-উদ্-দিন কিছু বুঝল না, কিন্তু কোনো প্রশ্নও করল না সে। টিপু বুরহান-উদ্-দিনের কাঁধে একটা হাত রাখল।

টিপু বলল, "আমি ও আমার বাবা তোমার স্বর্গত পিতার কাছে কতটা ঋণী তা জান না। তোমার প্রতি আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব বন্ধন। বুরহান-উদ্-দিন মিঞা, আমাদের বন্ধুত্ব যদি আরও নিবিড় হয়, কিছুটা আত্মীয়তার মতন হয়ে যায়, তাতে কি তোমার কোনো আপত্তি আছে ?"

"সেটা আমাদের গৌরবই, সুলতান—আমাদের স্বপ্নের অতীত সে সম্মান।" খুব আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিল বুরহান-উদ্-দিন, কিন্তু টিপুর উক্তির পুরো অর্থটা বুঝল না।

টিপু বলল, "বেগম ফকর-উন-নিসা তোমার মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন।"

বুরহান-উদ্-দিন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

টিপু তার মায়ের কামরায় গেল। হাইদরও তখন সেখানে। তিনি তাঁর পুত্রবধূ রূপে যে মেয়েটিকে নির্বাচন করেছেন সেই রোশন বেগমের গুণগান তখন তিনি করছেন। ফকর-উন-নিসা খুব উৎসাহের সঙ্গেই এই নির্বাচনে একমত হয়েছেন, টিপু ঘরে ঢুকতেই তাকে তার বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বললেন।

"আমি ঠিক করে ফেলেছি, সুলতান।" হাইদর কঠিন কণ্ঠে বললেন, যাতে কেউ কোনো আপত্তি তুলতে না-পারে, তারপর বললেন, "এবার তুমি বিয়ে করছ!"

"আমারও সেইরকম ইচ্ছে, বাবা।" শান্তভাবে উত্তর দিল টিপু।

আনন্দে হাইদরের ভ্রূ কপালের উপর উঠে গেল। টিপুকে ফকর-উন-নিসা আরও দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। বিয়ের বিষয়ে টিপু এই সর্বপ্রথম তার সম্মতি জানাল।

হাইদরের কণ্ঠস্বরে আর দৃঢ়তা বা উত্তাপ নেই, অতি শান্ত ও তৃপ্ত সে কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, "রৌশন বেগমকে তুমি বিয়ে করছ। এ হচ্ছে ইমাম সাহেব বকসীর মেয়ে পণ্ডিচারীর নবাব গোলাম হোসেন খাঁর ভগ্নি। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি।"

"আমাকে মাপ করো, বাবা।" খুব ধীরে বলল টিপু, "কিন্তু যদি অনুমতি দাও, আমার কিছু বলার আছে।"

হাইদরের ভ্রূর উপর যেন কালো মেঘ জমে এল যখন টিপু রাকেয়া বানুকে তার বিয়ের ইচ্ছা জানাল। ফকর-উন-নিসা মাথা নেড়ে-নেড়ে তাঁর সম্মতি জানাতে লাগলেন।

হাইদর জানতেন সব ব্যাপারেই ফকর-উন-নিসার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন, সব ব্যাপারেই তাঁর প্রতি সমর্থন আছে, কেবল পুত্রের বিবাহ ব্যাপার ব্যতীত। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

হাইদর বললেন, "কিন্তু রৌশন বেগমের বাবাকে আমি যে কথা দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।"

ফকর-উন-নিসা বললেন, "কিন্তু টিপুও অন্য একজনকে কথা দিয়েছে।"

হাইদর আলি তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "শোনো, হাইদর আলি কখনো প্রতিশ্রুতি ভাঙে না—মানুষ হিসেবেও না, সম্রাট হিসেবেও না।" টিপুর দিকে ফিরে বললেন, "তুমি কি চাও তোমার বাবা তাঁর শপথ ভঙ্গ করবেন?"

"না, বাবা। তা চাইনে।" সাহসে ভর করে উত্তর দিল টিপু।

টিপু জানত এর পর হাইদরের ও ফকর-উন-নিসার মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। হাইদরের সিদ্ধান্ত বদল হবে না। টিপু যে রাকেয়া বানুকে পছন্দ করেছে এজন্যে তিনি তাঁর আশীর্বাদ দেবেন মুক্তহস্তে কিন্তু তিনি যে কথা দিয়েছেন ইমাম সাহেবকে তা রক্ষা করতেই হবে, তাঁদের গৃহে এজন্যে আনন্দোল্লাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হাইদর তাঁর স্ত্রীর চোখে আবেদনের দৃষ্টি দেখতে পেলেন, এতে তিনি উত্তপ্তও হয়ে উঠছিলেন, তাঁর মন নরমও হয়ে যাচ্ছিল। টিপু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে রইল, তার পিতার আদেশ পালনের জন্যে

তার বুক যদি পাথরও করে নিতে হয় তার জন্যে সে যেন প্রস্তুত। হাইদর একটু বশে এলেন, কিন্তু তা আংশিক ভাবে। তিনি জানালেন, একটা মীমাংসা করা হোক, টিপু হচ্ছে মুসলিম, চারটি বিয়ে সে করতে পারে। সে তবে দুটি বিয়ে করুক, তার বাবার কথা রক্ষার জন্যে রৌশন বেগমকে, তার নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্যে রাকেয়া বানুকে। রৌশন বেগমের সঙ্গে বিয়েটা হোক নামে মাত্রই, রাকেয়া তার প্রকৃত স্ত্রী হোক। যদিও রৌশন বেগম রাজকীয় মর্যাদা মান সম্মান ঐশ্বর্য সবই পাবে সমানভাবে।

অতএব ১৭৭৪ সালের বসন্তকালের এক সন্ধ্যায় দুটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল টিপুর, এর একজন রাকেয়া, চোদ্দ বছর আগে যে বালিকাটি নৌকোয় নিয়ে গিয়েছিল একটি বাস্কেট ও এতদিন যে ছিল তার স্বপ্নের নায়িকা, যখন তাদের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তখন রাকেয়া ছিল ছোটখাট ও সুন্দরী। বিয়ের সময়েও সে তাই ছিল। গভীর কূপের শীতল জলের মতই তার চোখের শান্ত দৃষ্টি।

বিবাহরাত্রে টিপু ও রাকেয়া খুবই কম কথা বলে। তাদের বাসর শয্যায় তারা শুয়ে রইল চুপচাপ। অতীতের স্বপ্নকে নিয়েই তারা বিভোর ছিল, তার পর সেই স্বপ্নলোক থেকে তারা ফিরে আসতে লাগল মৃদু আলোকিত শয্যায়। দূরে বাজতে লাগল মধুর বাজনা। রাত্রিটাকে তারা এক অখণ্ড ভালোবাসার আসরে পরিণত করতে লাগল। টিপু জানত সেই রাত্রের স্মৃতি তার চিরকালের শান্তি হয়ে থাকবে। বেশ মনে করতে পারছে সে—যখনই তারা মুখে মুখ দিয়েছে তখনই সময় থেমে গেছে, তাদের বুকের স্পন্দন হয়ে গেছে স্তব্ধ। না, কখনোই সে ভুলবে না তার এই বেদনার আনন্দের ও বিভোরতার প্রথম আর্তনাদ।

* * *

তাঁবুতে বসে সকালের অপেক্ষায় ও পুরনাইয়া এসে কখন তার সঙ্গে মিলিত হবে তার প্রতীক্ষায় থেকে টিপু ভাবতে লাগল সেই রাত্রের কথা। তার অপরূপা স্ত্রীর কথা সে চিন্তা করতে লাগল তার হাসির কথা, তার প্রবল ও প্রচুর কামনার কথা মনে পড়তে লাগল তার। কর্ণেল হাম্বার-স্টোনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে যখন সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিল তখন তার স্ত্রী তৃতীয় সন্তানসম্ভবা। তার তৃতীয় পুত্র আসন্ন তবু তার কমনীয়তা এতটুকু কমেনি। আগের থেকেও তাকে কমবয়সী ও উজ্জ্বল দেখায়, তার রূপ যেন আরো বৃদ্ধিই পেয়েছে।

বিদায়ের সময়ে রাকেয়া বানু জিজ্ঞাসা করল, "শিগগিরই ফিরে আসবে তো ?"

টিপু ধীরে তাকে চুম্বন করল, কথার উত্তর দিল না। সে জানত এটা প্রশ্ন নয়, এটা প্রার্থনা। কেননা, এ রকম অভিযান কত দিন চলবে কেউ বলতে পারে না। কি হবে এর পরিণতি তাও কেউ জানে না।

রাকেয়া বলল, "তুমি চলে গেলেই আমাকে ভুলে যাবে।"

"কখনো না।"

"আমি যখন তোমার আলিঙ্গনে আছি, তখনই এই কথা বলছ।"

"বিশ্বাস কর আমাকে," টিপু বলল, "স্বপ্নেও আমি তোমাকে যেমন দেখি, রক্তমাংসেও তাই।"

রাকেয়া তার বিদায়বেলার চোখের জল নিয়েও হাসল। সে তার বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তার দুচোখে তীক্ষ্ম ভাবে তাকাল। একটু তামাশা করার মতন করেই বলল, "সত্যি ? সত্যি ? স্বপ্নেও ভাব আমার কথা ? এই এক বৃদ্ধার কথা ?"

"আমার দিকে যখন তাকাও তখন তোমার দৃষ্টিতে আর বয়স খুঁজে পাইনে। এর জন্যে আমি খুশি হই।" এই কথা বলে টিপু তার সর্বাঙ্গ খুঁটিনাটি করে এমন ভাবে দেখতে লাগল যেন সে একটা পণ্যদ্রব্য পরীক্ষা করে দেখছে। তারপর বলল, "তাড়াহুড়ো এমন বায় দিতে চাইনে। তোমার শরীরের যাবতীয় অংশ অনুভব করে দেখি।"

সে তাকে আবার বাহুর মধ্যে নিয়ে নিল। তার পর শান্তভাবে সে পরীক্ষা করতে লাগল, চুম্বন করতে লাগল, তার কপালে হাত বুলাল, ঠোঁটে ঘাড়ে স্তনে হস্তসঞ্চালন করতে লাগল।

"হতাশ হোয়ো না, প্রিয়তমা। কিন্তু তোমার যৌবন গত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।" বলল টিপু।

রাকেয়ার চিন্তাটি কী তা সে জানে না। তার সহাস্য চোখ দুটিতে নেমে এল বিষণ্ণতা। অনেক দীর্ঘ অপেক্ষা তাকে করতে হবে—তার স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত।

কিন্তু যখন বিদায়ের লগ্নটি এল তখন তারা উভয়ে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মত মুখোমুখি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

টিপু চিরাচরিত প্রার্থনা জানিয়ে বলল, "ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।" তার পর উঠল ঘোড়ায়। দ্বিতীয়-দিলখুশের পিঠে।

রাকেয়া মৃদুগলায় বলল, "ঈশ্বরকে ও তোমাকে উভয়কেই আমার প্রয়োজন।"

টিপু শুনেছিল এ কথা।

এই ভাবে তারা বিদায় নিল। তাদের বিয়ের পর থেকে তাদের জীবনে এরকম বিদায়ের পালা লেগেই আছে। একটা অভিযানের পর আর একটা অভিযান। সর্বত্রই টিপুর উপস্থিতি দরকার। পিতা ও পুত্র উভয়েই এই ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েই আছে, তাদের রাজ্যের সীমানা রক্ষার, রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করার জন্যে এই অভিযান। এর যেন শেষ নেই।

কিন্তু এখন তার পিতা নেই; এখন ইংরেজদের লোভী দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে মহীশূরের উপর। আগের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে সে দৃষ্টি। তার কেবলই মনে হয় রাকেয়ার ও তার সন্তানদের জন্যে কতটা সময়ই বা দিতে পারবে। সে জানে যে সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তার চিন্তার দরুন সে তার পরিবারের নিবিড় নিকটে কখনোই আসতে পারবে না। তার বাবার জায়গায় সে যখন সিংহাসনে বসবে তখন তার পরিবারকে তার প্রায় বর্জনই করতে হবে। শত্রুদের উচ্চাশা পরাভূত করার জন্যে, তাদের দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে তাকে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হবে এবং তাতেই তার জীবনের প্রতিটি লহমা ব্যয় করতে হবে। সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর সময়ে রাজাদের কী কর্তব্য সে বিষয়ে টিপুর পুরোপুরি জানা আছে। সর্বময় কর্তৃত্বের জন্যে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে, কর্মক্ষম করে রাখতে হবে। কেবল যে পারিবারিক স্নেহমমতা থেকেই নিজেকে বঞ্চিত রাখবে এমন নয়, রক্তের সম্পর্ক, বিবাহের সম্বন্ধ ইত্যাদিও তাকে বর্জন করতে হবে। কিন্তু তাকে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে হবেই। অখন্ড অধিকার তাকে অর্জন করে নিতেই হবে। টিপু জানত. যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাজা বা সম্রাটেরা তা প্রয়োগ করতেন কল্যাণকাজে, কিন্তু অনেক সময়ই তা ব্যবহৃত হত দুর্নীতিপরায়ণ কাজে। নিজেদের হাতে সর্ববিধ ক্ষমতা নেওয়ার ফলে কত রাজা বা কত প্রধানেরা নৈতিক ভাবে কতটা ভ্রষ্ট হয়েছেন। শাসক যদি শাস্তি দিতে পারে, তাহলে অন্যায় ভাবেও দেওয়া হতে পারে সে দণ্ড. এবং এই ভাবেই তার অবনতি ঘটতে পারে।

টিপু চিন্তা করতে লাগল, "রাজা কি সর্বেসর্বা হয়েও নিষ্ঠুর বা নিরাসক্ত না-হয়ে পারে? সে কি হতে পারে না সৎ ও করুণাময়?" হ্যাঁ, পারে। ভারতের ইতিহাস থেকে এমন অনেক দৃষ্টান্ত সে পায়। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশের ভবিষ্যৎ চেহারা যা হচ্ছে সেখানে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর হবে। রাজাদের উচিত তাদের মন থেকে প্রতিহিংসাপরায়ণতা দূর করা, তাদের

সহানুভূতি সংযত করা, এবং একটু নিরিবিলিতে থাকার ব্যবস্থা করা।

"কিন্তু কেন, কেন আমি এ রকম দুঃসহ নিঃসংগতায় জীবন কাটাব, এমন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বন্দী কেন হব—যা নাকি আমার কাম্য নয়। মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারব না কেন। যাদের ভালোবাসি তাদের কাছে উন্মুক্ত করতে পারব না কেন হৃদয়?" নিজেকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল টিপু।

যেন এসব কথার উত্তরেই রাকেয়ার হাসির স্মৃতিটা মনে পড়ল তার এক্ষে তার অশান্ত হৃদয় সহসাই শান্ত হয়ে এল।

## ৩২. সুলতানের মনে আছে

ক

টিপু সুলতান তার দিবাস্বপ্নের মধ্যেই দিন অতিবাহিত করে চলেছে, অতীতের নানা চিত্র ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। তার দুই ধর্মশিক্ষক গোবর্ধন পণ্ডিত ও মৌলভী ওবেদুল্লার কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হল ও হাইদর আলি যখন তাঁর সংগে তাকে যুদ্ধে যেতে বললেন তখন কী রকম অসহায় ও যন্ত্রণাদায়ক দিন তার কেটেছে সে কথা তার মনে পড়ে। যে কিনা শিক্ষা পেয়েছে শান্তির স্নেহের ও সন্ন্যাসের তাকে পনেরো বছর বয়সে পেতে হল রক্তের স্বাদ এবং যুদ্ধের তাণ্ডবে মত্ত হতে হল।

কুর্গের সীমান্তে বেদনুরের দক্ষিণে এক পাহাড়ি শহর বালমে টিপু সুলতানের সর্বপ্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। শ্রীরঙ্গপত্তম এলাকায় হামলা করে বেদনুরের শাসক হাইদরকে উত্তেজিত করে। এই অভিযানে তার পিতার সহযাত্রী হবার জন্যে টিপুকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু বাহিনীর পশ্চাৎদিকে গাজি খাঁর তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে বলা হয়। হাইদর তাকে এই রকম উপদেশ দেন: "পিছনের দিকে তুমি থাকবে। যুদ্ধ কিভাবে ঘোরতর হয়ে ওঠে তা লক্ষ রাখবে দূর থেকে। আমার নিরাপত্তার কথা ভাববে না। যেখানে গুলি গোলা ছোটাছুটি করবে তার কাছে আসবে না, বেয়নেটের ঝলসানি থেকে তফাতে থাকবে। পরে আমাকে বলবে আমার অবস্থায় তুমি পড়লে তুমি কী করতে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে তফাতে থাকবে।"

দু হাজার সৈন্য নিয়ে গাজি খাঁ যেন টিপুকে ঘিরে থাকে এবং নজর রাখে যেন টিপুর কোনো ক্ষতি না-ঘটে—এ রকম আদেশ তাকে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের অগ্রগতি সম্বন্ধে টিপুকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্যে প্রতিঘণ্টায় দূত পাঠিয়ে খবর দেবেন এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হাইদর। কিন্তু তিন ঘণ্টা কেটে গেল। একজন দূতও এল না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে তখন তুমুল লড়াই চলেছে। হাইদরের পতাকা কিছুক্ষণ আগেও দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন তা গাছের আড়ালে পড়ে গিয়েছে। গাজি খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, টিপু ততোধিক। পাঁচ শ সৈন্য টিপুর কাছে রেখে দেড় হাজার সেনাই নিয়ে গাজি খাঁ

হাইদরের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে চলে গেল। আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। যুদ্ধের তাণ্ডবে এবং বালমের শাসকের প্রতিরোধের দরুন হাইদর বা গাজি খাঁ কোনো বার্তাই পাঠাতে পারলেন না। টিপু তার পাঁচ শ সৈন্যকে আদেশ করল তাকে অনুসরণ করতে। সোজা রাস্তায় না-গিয়ে সে অর্ধচন্দ্রাকারে তার সৈন্য নিয়ে জঙ্গলের একেবারে মাঝখানে পৌঁছল। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে বলে তার মনে হল একটু পিছিয়ে সেদিকে যেতেই হঠাৎ সে থমকে থেমে গেল। এমন জায়গায় সে এসে পড়েছে যেখানে বালমের শাসকদের মহিলারা তাদের সহচর সহ লুকিয়ে আছে। টিপুর এই ছোট বাহিনীটি এই গোপন জায়গায় যেভাবে এসে গেছে তাতে মেয়ে-রক্ষীদের কোনো সন্দেহ রইল না যে হাইদরের মূল বাহিনীর সঙ্গে তাদের লড়তে হবে। যারা পালাতে পারল না বা লুকিয়ে পড়তে পারল না তারা আত্মসমর্পণ করল। বালমের শাসকের পত্নী তার শিশুসন্তান, তিন কন্যা ও অন্যান্য মহিলা-সহ এগিয়ে এসে টিপুর কাছে পরিত্রাণ চাইল। ঘোড়া থেকে নামল টিপু, মাথা নত করে মহিলাদের অভিবাদন জানাল, তার পর তাদের নিরাপত্তার ও মর্যাদারক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। ছয় মাইল দূরে এই সংবাদটি পৌঁছতে সময় নিল না। সেখানে বালমের শাসক তখন হাইদরের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করায় ব্যস্ত। সহসা হাইদর চমকিত হয়ে উঠলেন, তিনি দেখলেন বালমের শিবির থেকে আত্মসমর্পণের শ্বেত পতাকা উড্ডীন হয়েছে। এটা কোনো ধাপ্পা কিনা, কোনো কৌশল কি না। না, তা নয়, বালমের শাসক স্বয়ং ঘোড়ায় চেপে তাঁরই দিকে আসছেন ব্যক্তিগতভাবে আত্মসমর্পণের জন্য। অল্পক্ষণ বাদেই সে তার মাথার পাগড়ি খুলে হাইদরের ঘোড়ার পায়ের কাছে রাখল, এবং তার পরিবারের সকলকে মুক্তি দিতে অনুরোধ জানাল। এ কথায় হাইদর আরো বিস্মিত হলেন। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে সর্বত্র। হাইদরের একজন কম্যাণ্ডার মকবুল খাঁ তার বাহিনী নিয়ে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে ছুটল। এখানে সে টিপুর মুখোমুখি হল। তার পাঁচ শত সৈন্য-সহ, মহিলাদের শিবিরের অদূরে তখন টিপু। টিপুকে অভিবাদন জানিয়েই সে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল, টেনে-বের করে আনল বালম-শাসকের স্ত্রীকে। তার অধীনস্থ সৈন্যরা তখন পাশেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে অন্যান্য অসহায় ব্যক্তিদের টেনে আনার জন্যে যাতে সকলকে নিয়ে গিয়ে হাইদরের সম্মুখে হাজির করা যায় বিজয়ের কুচকাওয়াজে, এর জন্যে হাইদর অবশ্যই খুব খুশি হবেন। মকবুলকে ডেকে টিপু তাকে ওকাজ করতে মানা করল। মকবুল প্রবীণ অফিসার, সে একটু হাসল, কিন্তু

বন্দীদের মুক্তি দিল না। ইতিমধ্যে তিনজন রাজকুমারী সহ অন্যান্য মহিলাদের টেনে বের করা হয়েছে। টিপু তার আদেশ পুনরায় উচ্চারণ করল। মকবুল তা সরাসরি অমান্য করল। টিপু তার বন্দুক তুলে গুলি ছুড়ল, মকবুলের মাথা তা ভেদ করে গেল। সৈন্যেরা মুক্ত করল মহিলাদের, তারা শিবিরে গিয়ে ঢুকল। চারদিক নিস্তব্ধ নিশ্চুপ।

একজন মানুষকে হত্যা টিপুর জীবনে এই প্রথম। মকবুল খাঁর মৃতদেহের কাছে সে গেল। সুলতানকে আসতে দেখে মকবুলের সৈন্যেরা পিছনে সরে গেল। ধুলোয় পড়ে আছে দেহটা, টিপু দেখল। প্রাণহীন ঐ মুখে তখন ভয়ংকর হাসিটা লেগে আছে। একটা চোখ বুজে গেছে রক্তে, অন্য চোখ খোলা। চোখটা যেন বিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে। মকবুলের অসাড় হাতটি টিপু নিজের হাতের মধ্যে নিল। এটা কি তার নাড়ি দেখার জন্যে অথবা বিদায় জানাবার জন্যে, কেউ তা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে মকবুলের বুকের উপর কান রাখল, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে তার সৈন্যদের উপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে সে বলল, "আমাকে ক্ষমা কোরো"। এটা কি মকবুলের উদ্দেশে বলা হল? কেউ জানে না।

একটা কম্বল চাইল টিপু। মহিলা-শিবির থেকে সেটা এল। মৃতদেহটি সে ঢেকে দিল।

এর পরে আরও অনেক বছর কেটেছে। অনেক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে টিপু, অনেক লোক নিহত হয়েছে। ইতিহাসের ধারা চলেছে, রক্তরঞ্জিত সে ধারায় চিহ্নিত হয়েছে অনেক গোরস্থান। কিন্তু তার প্রথম এই মৃতটির স্মৃতি তার মনে জাগরূক আছে, অগ্নিশিখার মত এই স্মৃতিটি টিপুর হৃদয় দগ্ধ করে জীর্ণ করে চলেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে তার সামরিক শিক্ষক গাজি খাঁ এসে উপস্থিত হল। মকবুলের দেহ সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা সে করল। অল্প বাদে হাইদরও এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে এল তাঁর মূল বাহিনী, এবং বালমের শাসক সহ সব বন্দীরা।

হাইদর তাঁর পুত্রকে অভিনন্দন জানালেন। শাসকের পরিবারস্থ সকলকে পাকড়াও করার ফলেই এই তাঁর আত্মসমর্পণ। যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে হাইদরকেও আর উৎকণ্ঠিত থাকতে হল না।

"বলো কী মূল্য তুমি চাও।" হাইদর বললেন।

"মূল্য ?" আশ্চর্য হল টিপু।

"পুরস্কার, বৎস, পুরস্কার।" হাইদর বললেন, "পাঁচটি উট বোঝাই ধনরত্নের বিনিময়ে আমি ঐ শাসককে তার সৈন্য ও তার এলাকা সহ মুক্ত করে দিতে রাজি হয়েছি। কিন্তু," মহিলা শিবিরের দিকে নির্দেশ করে হাইদর বললেন, "এরাও আমাদের বন্দী। ওদের মুক্ত করার কী মূল্য চাই তা তুমি বলবে।"

অপরাধীর মত টিপু বলল, "ওরা স্ত্রীলোক, ও শিশু, পিতা।"

"তা হলে," একটু হেসে হাইদর বললেন, "ওদের বিনামূল্যে মুক্তি দিতে হবে ?"

"হ্যাঁ বাবা তাই। যদি অনুমতি করেন ওদের মর্যাদা-সহ ওদের মুক্তি দেওয়া হোক।"

"বেশ। তাই হোক।" পুত্রের উত্তরে খুশি হয়ে হাইদর বললেন, "হাইদর আলি কখনো শিশুদের ও মহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তার পুত্রও তা করে না। তা হলে বালম," হাইদর তাঁর চিরশত্রুর প্রতি নির্দেশ করে বললেন, "এই বন্দীদের নিয়ে যাও—বিনামূল্যে, সম্মানের সঙ্গে, এ মুক্তি আমার পুত্র ও উত্তরাধিকারী টিপু সুলতানের কল্যাণে।"

বালমের শাসক এগিয়ে এসে টিপুর সম্মুখে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তোমার বাবাকে অভিবাদন করেছি ভয়ে, তোমাকে অভিবাদন করি শ্রদ্ধায়।"

উত্তরে টিপু বলল, 'শান্তিতে প্রস্থান করুন।" একটু অন্যমনস্কের মত বলল সে তার চোখে তখন মকবুলের মুখটা ভেসে উঠছে।

সেই রাত্রেই হাইদর জানতে পারলেন কী অবস্থায় মকবুলের মৃত্যু ঘটেছে।

তিনি বললেন, 'মকবুলের জন্যে আমি শোকার্ত। আমার জীবনে তার মত নির্বোধ ও তার মত প্রফুল্ল ব্যক্তি আমি পাইনি। কিন্তু আমার পুত্র যা করেছে তা ঠিক করেছে। কি বল তুমি, পুরনাইয়া ?"

'তার বন্দীদের রক্ষা করা ছিল তার মর্যাদার কাজ। আপনিও কম মর্যাদার পরিচয় দিলেন না। মকবুলের মৃত্যুই দরকার ছিল।"

"ঠিক বলেছ।" বিষাদের সঙ্গে হাইদর এ উক্তির সমর্থন করলেন।

৭

এর পরে আগে যত অভিযান ও যত যুদ্ধ হয়েছে টিপুর সে সব কথাই স্পষ্ট মনে আছে। একটার পর একটা অভিযান লেগেই ছিল। ইংরেজদের রাজকীয় মতলবের প্রতিরোধের জন্যে পিতা-পুত্র অবিরাম সংগ্রাম করে গিয়েছে। টিপু একজন দুঃসাহসী ও সফল অধিনায়ক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করে তুলেছে, কিন্তু তাঁর পুত্রের ব্যাপারে হাইদর সর্বদাই সচেতন, গাজি খাঁর উপর তাই নির্দেশ ছিল টিপুর উপর কড়া নজর যেন রাখা হয় তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে, তার ফলে 'যুদ্ধের ফল যাই হোক না কেন।' বালমের যুদ্ধে ঐ সাফল্য, এবং টিপুর জন্যে ঐ জয়োল্লাস সত্ত্বেও গাজি খাঁকে অনেক ধমক খেতে হয়েছে সুলতানকে মূল বাহিনীর সংগে মিলিত হতে দেবার জন্যে।

টিপুর বয়স যখন সতেরো তখনই সে আত্মনির্ভর একজন দক্ষ সামরিক অধিনায়ক হিসাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ১৭৬৭ সালের কথা, ঘটনাটা ইংগ-মহীশূর যুদ্ধ নিয়ে। ইংরেজরা তাদের শান্তির কথা আউড়ে অবশেষে এই যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় হাইদরের উপর, তারা হায়দরাবাদের নিজামের সংগে ও মারাঠাদের সংগে মৈত্রী করে নেয়। হঠাৎই, কোনোরকমে সতর্ক করে না-দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি হল এবং বন্দুকের গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। এই ত্রিপক্ষীয় মৈত্রীর বিরুদ্ধে হাইদর আলির যুদ্ধ করতে পারার কথা নয়। তার উপর ইংরেজরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় ও তলে-তলে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয় অতি দ্রুততার সংগে।

এ ব্যাপারে হাইদরের মন ভেঙে গেল, কিন্তু তিনি এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমেই তিনি এই মৈত্রী ভেঙে দিলেন। মারাঠারা তাঁর সংগে একমত হল—আজকে যারা বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, আগামীকাল তারাই বিশ্বাসঘাতক শত্রু হতে পারে, সুতরাং হাইদরের সংগে তারা পৃথক একটি শান্তির চুক্তি করল! নিজামের কাছে টিপুকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধি রূপে। এইটে টিপুর কূটনৈতিক যাত্রা ছিল, এ কাজ বেশ দক্ষতা ও মর্যাদার সংগে সে সম্পন্ন করে। নিজামকে প্রভাবিত করতে ও ইংরেজদের কাছ থেকে নিজামকে সরিয়ে আনতে সে সক্ষম হয়। ইংরেজরা একেবারে একা ও অসহায় হয়ে গেল, কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব তাদের সারা। তারা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেছে,

তাদের অস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। হাইদর আলি ও তাঁর পুত্র আর পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করতে পারবে না। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে একজনকে আর-একজনের সহায়তা করতে হবে।

ইংরেজদের মূল বাহিনীর সম্মুখীন হলেন হাইদর, টিপু সুলতান একটি অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে যেন ইংরেজদের নাকাল করতে থাকে ও তাদের উদ্যোগে নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তার উপর এই রকম নির্দেশ দেওয়া হল। গাজি খাঁ, মীর আলি রাজা খাঁ ও মখদুম সায়েব সহ টিপু চলল দক্ষিণদিকে। পথে তার সঙ্গে মিলিত হল স্বেচ্ছাসেবী দল যাদের লুণ্ঠন করেছে ইংরেজেরা যাদের কূপের জলে বিষ মিশিয়েছে, যাদের শস্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, যাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। টিপুর ক্ষুদ্র বাহিনী স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা পুষ্ট হয়ে বেশ বড় আকার ধারণ করেছে সেই বাহিনী পেঁছিল মাদ্রাজ্যের প্রবেশপথে। ইংরেজ সৈন্যেরা পলায়ন আরম্ভ করল, ইংরেজ গবর্নর অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। টিপুর অশ্বারোহী বাহিনী যখন পেঁছিয় তখন সমুদ্রসৈকতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অতি মনোহর বাগানবাড়িতে ছিলেন গবর্নর। গবর্নর ও তাঁর অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত 'প্রেম-কক্ষ' নামক একটি কামরায় গভর্নর তখন মদ্যপানরত এবং নর্তকীদের নিয়ে মশগুল। গবর্নর ও তার সঙ্গীসাথীরা সমুদ্রকিনারে রাখা একটি ছোট নৌকায় চেপে কোন গতিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে টিপুর কাছে এক জরুরি বার্তা এসে উপস্থিত। দক্ষিণ আরকটে তিরুভান্নামাইয়ে হাইদর পরাস্ত, তাঁকে উদ্ধার করতে যেতে হবে। টিপুর হাতে মাদ্রাজের পতন তখন আসন্ন, কিন্তু হাইদরের কাছ থেকে পাওয়া বার্তা এ ব্যাপার থেকেও জরুরি। টিপু ফিরল। হাইদরের মূলবাহিনীর কাছে টিপু যাতে দ্রুত যেতে না পারে তার জন্যে মাঝপথে কর্নেল টড ও মেজর ফিটজেরা-ল্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী ছিল মোতায়েন। টিপু কৌশলে তাদের এড়িয়ে হাইদরের সঙ্গে মিলিত হতে পারল বানিয়ামবাড়ির দশ মাইল দূরে এক জায়গায়। টিপুর পেঁছিনো মাত্র হাইদরের যেন নবজীবন লাভ হল। এখানে তিনি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ছিলেন তিরুভান্নামালাইতে তাঁর পরাজয়ে তিনি মনে-মনে আহত ও অপদস্থ। টিপুকে বীরের সম্মানে অভ্যর্থনা করা হল।

'তোমার নিরাপত্তাই আমার সুখ, তোমার জয় আমার সান্ত্বনা." টিপুকে বললেন হাইদর। তারপর পিতাপুত্র আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

হাইদর আলি গাজি খাঁকেও আলিঙ্গন করলেন, তাঁর জয়ের দিকে তার নজর রাখার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

উত্তরে গাজি খাঁ বলল, "হায়দর আলি খাঁ, ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য। আপনার পুত্র দুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে, আমি তার জীবন বাঁচাইনি।"

বেশ আনন্দের সঙ্গেই হাইদর শুনলেন দু-দুবার গাজি খাঁ কী রকম সংকটে পড়েছিল, এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় কী ভাবে টিপু তাকে রক্ষা করে। তখন হাইদর বললেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গাজি খাঁই বলবে টিপুর যাবতীয় অভিযানের সংবাদ। হাইদর বললেন, "খুব ধীরে ধীরে বল। এমন আনন্দ ছোট-ছোট চুমুকে পান করতে হবে উৎকৃষ্ট মদের মত। এক চুমুকেই গিলে ফেলা যাবে না।"

গাজি খাঁর দেওয়া বিবরণ শেষ হবার পর হাইদর বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি, যৌবনের দুর্জয় সাহস বয়সের অভিজ্ঞতার চেয়ে তেজি ও তাজা।"

গ

এর পরে পিতা-পুত্র পাশাপাশি থেকে লড়াই করেছে। তিরুপাতুরের ও বানিয়ামবাড়ির দুর্গ-দুটি অধিকার করতে হাইদরকে সাহায্য করে টিপু। এর পরে কর্নেল স্মিথের অধীনে ইংরেজবাহিনী বানিয়ামবাড়িতে হাইদরকে প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। ঠিক সময় মত টিপু সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং ইংরেজদের আক্রমণ করে পাশ থেকে, কিরমানির ভাষায় "এ যেন হরিণবাহিনীর উপর সিংহের ঝাঁপিয়ে পড়া, এবং তাদের জীবনতরী মহাকালের জলে ডুবিয়ে দেওয়া।"

বছর কাটল, হায়দরাবাদের নিজাম দল বদল করল। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তার পেশার মতন। টিপু সুলতানের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ফলে এক বছর সে ইংরেজদের থেকে তফাতে ছিল। আবার সে গেল ইংরেজের দলে, এবং ১৭৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাইদরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে তার আক্রমণ ও প্রতিরোধ চুক্তি হল। মহীশূরের সংকট ঘনীভূত। হাইদর আলি চিন্তাকুল। তিনি শান্তির জন্যেই ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি জানতেন শক্তি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতেই ইংরেজদের কাছ থেকে তিনি কিছু আদায় করতে পারবেন। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর পুত্র জয়ের পর জয় লাভ করে চলেছে। হাইদর আলি ঠিক করলেন তিনি অপেক্ষা করবেন, শান্তির কোনো প্রস্তাব তিনি পেশ করবেন না, ইতিমধ্যে একটা বা দুটো বড় রকমের জয় যদি টিপু অর্জন করতে পারে তবেই তাঁর অবস্থা অনুকূলে যাবে এবং তখনই একটা উপযুক্ত শর্ত তিনি

আরোপ করতে পারবেন। টিপু আশার অতিরিক্ত কাজ করে ফেলল। নিজামের বাহিনীকে সে প্রতিরোধ করে রাখল, বিদ্যুৎগতিতে তার অগ্রসর ও ক্রিয়াকৌশল ইংরেজদের হতভম্ব করে দিল। কর্নেল স্মিথের একটা বাহিনীকে এবং গভিন ও ওয়াটসনের অধীনস্থ বাহিনীকে সে পরাস্ত করল। ম্যাংগালোর অধিকার করল সে, মালাবার থেকে বিতাড়িত করল ইংরেজদের। এখন ক্ষেত্র প্রস্তুত, পিতা-পুত্র মিলে এবার মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হতে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই শহরের উপকণ্ঠগুলি হাইদর বাহিনীর হাতে চলে এল। সেখান থেকে হাইদর মাদ্রাজের ইংরেজ গবর্নরকে বার্তা পাঠিয়ে জানালেন প্রকৃত শান্তিচুক্তি হতে পারে তার জন্যে শান্তি-আলোচনা এবার আরম্ভ করা যেতে পারে। তাদের হয়ে আলাপ-আলোচনা কে করবে সে নামও জানান তিনি ইংরেজদের। তিনি নাম দেন ইংলিশ কাউন্সিল মেম্বার জোসিয়ান দ্যু প্রে'র। যাকে তিনি চেনেন না এমন-এক জনের নাম হাইদর দিলেন কেন এ কথা একজন জিজ্ঞাসা করায় হাইদর বলেন, 'লোকটার নাম ফরাসি ধরনের, ঐ নামের মধ্য দিয়ে সে যদি ফরাসিদের বীরত্ব ও মর্যাদাবোধ পেয়ে থাকে। যাই হোক ইংরেজি নামধারী ইংরেজদের চেয়ে এ অনেক ভালো হবে।"

১৭৬৯ সালের মার্চ মাসে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। হাইদর আলি তখন বেশ শক্তিশালী ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। মাদ্রাজ শহর তাঁর মুঠির মধ্যে, তাঁর সম্মুখে ব্যক্তিত্বহীন ইংরেজ গবর্নর ইংরেজ বাহিনী টিপুর কাছে তিনবার পরাজিত। তবুও তিনি অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত কিছু দাবি করেন নি, উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয় এমন শর্তই তাতে দেওয়া হয়। একজন ইংরেজ ব্যংগচিত্রকার সে সময়ে অল্পসময়ের জন্য মাদ্রাজে আসে, চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই সে আঁকে এক চিত্র, লোকটার রসজ্ঞান ছিল। এই চিত্রে দেখানো হয় গবর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যরা টিপুর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে, হাইদর আলি গবর্নরের নাক ধরে আছেন হাতির শুঁড়ের মত হাত দিয়ে, এবং সেই শুঁড় দিয়ে পড়ছে সোনা ও হীরের স্রোত, ইংরেজ কম্যান্ডার ইন-চিফ চুক্তিপত্রটি ধরে আছে ও তার তরবারি দু আধখানা করেছে। এই চুক্তি কী ধরনের, হবে তা ধরতে পেরেছিল ঐ ব্যঙ্গ চিত্রকার। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু আদায় করে নেবার মত শর্ত হাইদর দিতে চাননি। ইংরেজদের মতবিরোধের বীজ তিনি ছড়াতে চাননি, তিনি দীর্ঘস্থায়ী শান্তিই চেয়েছিলেন, যদিও তাঁর মনের নিভৃতে একটা সন্দেহ ছিলই যে, ইংরেজরা তাদের কথার খেলাপ করবেই যেমন নাকি তারা বরাবরই করে আসছে।

ঘ

টিপুর মনে পড়ছে যে ইংগ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তির পর তার পদোন্নতি হয় এবং সে তার নিজের যুদ্ধ-পতাকা পায় এবং পায় সেই ব্যানার যার উপর তার প্রতীক চিহ্নিত হয়—বাঘ।

তার সামরিক জীবনের চার বছরে টিপু সুলতান কয়েকটি চমকপ্রদ জয়লাভ করেছে। যে বাহিনী সে পরিচালনা করে তার প্রতিটি সেনা শপথ নেয় তার নামে। তার সাফল্যে সকলে বিস্মিত।

তারা বলে, "এ হচ্ছে ভাগ্যমন্ত।" তা না হলে অভিজ্ঞ সেনানায়কদেরও এই সামান্য বয়সে সে পরাভূত করে কী ক'রে? এর মূলসূত্র হচ্ছে এই—তার প্রবীণ উপদেষ্টাদের অভিমত সে গ্রহণ করত প্রথম দিকে। পরে সে নিজেই চিন্তা করে দেখে এবং আলাপ আলোচনা করতে দ্বিধা করে না, নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতেও না। যদিও অতি বিনয়ের ও সমীহের সঙ্গেই এ কাজ সে করত। অগ্রসর হয়ে, পিছিয়ে এসে, কৌশলে আঘাতে সেনানায়কত্ব সে শিখে নেয়, সবাইকে বুঝে নেয়। তারপর পরিচালনা করে বাহিনী।

তারা জানত তাদের অধিনায়ক—টিপু সুলতান—দুর্দিনে সাহসী, যুদ্ধে দৃঢ়, সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ, এবং মান্য। টিপুকে নিয়ে তারা গর্বিত। যে সব নতুন সেনা যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তাদের প্রতি সম্মান দেখানোয় ও তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় অনেক অভিজ্ঞ সৈনিক অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তারা বুঝত না যে তাদের অধিনায়ক তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ-প্রীতি সঞ্চালন করতে চান, বিশেষ করে ইংরেজ যাদের উচ্ছেদ করেছে। তার মধ্যে এমন ত্রুটি ছিল যার জন্যে অন্য কোনো অধিনায়ক অপ্রিয় হয়ে যেতে পারত। যে শহরের পতন ঘটেছে সেখানে লুণ্ঠন বরদাস্ত করত না টিপু। যুদ্ধাবস্থা শেষ হলে একজন মানুষকেও সাজা দেওয়া চলবে না—স্ত্রীলোক বা শিশুর উপর যারা অত্যাচার করেছে এমন কেউ ছাড়া অবশ্য। বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। টিপু জানত লোকে তাকে সহ্য করে যাচ্ছে মাত্র, এসব ব্যাপারে তার অদ্ভুত ও অর্থহীন আদেশ বলে তারা মনে করত বলেই এই সহ্যের কথা উঠছে। যে কম্যাণ্ডাররা জয়ের থেকে জয়ের

পথে তাদের নিয়ে চলেছে শান্তিস্থাপনের মূল্য হিসাবে তাদের কম দেওয়া হয়, কিন্তু আইনসংগত পুরস্কার হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ।

ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ কাগজে-কলমে শেষ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়নি। মহীশূরের উপর আবার আঘাত হানার জন্যে ইংরেজ প্রস্তুত হচ্ছে। পরে তারা মারাঠাদের ও হায়দরাবাদের নিজামকে হাইদরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে উস্কানি দেয়। এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৭৬৯ সালে, ১৭৭২এ তা থেমে আসে তার পরে আবার বেধে যায়। ইংরেজরা পার্শ্ববর্তী এলাকার শাসকদের ও কাছাকাছি অঞ্চলকে অস্ত্রসজ্জিত করতে থাকে মহীশূরে হামলা চালাতে বলে। এসব আক্রমণ সামাল দিতে হয় টিপুকে। দিনের পর দিন সে লড়াই করে এখানে ওখানে সর্বত্র। কখনো কখনো বড় ধরনের লড়াই, কখনো বিক্ষিপ্ত আক্রমণ কখনো-কখনো শত্রুবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস। সে সিরা অবরোধ করে, দীর্ঘকাল অবরোধের পর তা দখল করে। মাড্ডাগিরি, গুরাম-কোন্ডা, চেন্নারদুর্গ এবং হাসকোট জয় করে। বেলারি ও চিতরদুর্গ অধিকার করার জন্যে তার পিতার সাহায্যের জন্যে ছুটে যায়। অধিকার করে হুবলি।

এই ভাবে ১৭৭৮ সাল নাগাদ টিপু সুলতান মহীশূরে সাম্রাজ্যের জন্য তুঙ্গ-ভদ্রা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা এবং তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চল পুনরধিকার করে। এর আশে-পাশে আর ইংরেজ রইল না। মহীশূরের আশে-পাশে তারা লুঠতরাজ করত। সে সময়ে ইংরেজদের চকিত আক্রমণ ছিল একটা রেওয়াজ, মহীশূরের মানুষদের উপর উৎপাত করাই ছিল তাদের লক্ষ। মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা বিলি করত অস্ত্রশস্ত্র। কেবল যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আর-সবই তারা করেছে। হাইদরকে ও টিপু সুলতানকে অতিষ্ঠ করে তোলার জন্যে তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ত্রুটি ছিল না তাদের শত্রুদের সহায়তা করার।

৬

এমন সময় এসেছিল যখন পিতা-পুত্র উভয়ে একটু শান্তির ও একটু বিশ্রামের অবকাশ পেল। ১৭৭৮ সালের কথা বেশ আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে লাগল টিপু। মারাঠাদের সঙ্গে তাদের মিটমাট হয়ে গিয়েছে। মারাঠা তাদের কথা

রাখবে, এবং হাইদরের আশা, শান্তিচুক্তির সব শর্ত মেনে চলবে, কেননা বিশ্বাস-ঘাতকতা কখনোই মারাঠা রাজ্যের নীতি নয়। নিজামও বেশ শিক্ষা পেয়েছে। সে ছিল কাপুরুষ, নিজে থেকে কোনো সাহসিকতা দেখাতে পারত না। যার গলার জোর ছিল বেশি তার দিকেই সে ভিড়ত। যার গলা সবশেষে শুনত সেই হত তার পথপ্রদর্শক। যাই হোক, তাকে ভয় করবার কিছু ছিল না। আর যারা ইংরেজের প্ররোচনায় মহীশূর রাজ্যের পিছনে লাগল তাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সীমান্তের বাইরে।

কিন্তু পিতা ও পুত্র উভয়েই ভুল করেছিল। কোনো শান্তির সম্ভাবনা ছিল না। হাইদরের পরিবারের সম্পূর্ণ পতন ঘটাবার জন্যেই ইংরেজরা ছিল বদ্ধপরিকর। ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য বাড়াবার বা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের এইটেই ছিল মূল, কেননা তারা জানত মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে সহ-অবস্থান তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত, এ কাজে তাদের উদ্যম বেড়েছে প্রথম-ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের স্মৃতি থেকে, এই যুদ্ধে টিপু তাদের পরিপূর্ণভাবে পরাস্ত করে। তারা তাদের প্ররোচনা দ্বিগুণ করল, এবং এই ভাবে ১৭৮০ সালের দ্বিতীয়-ইংগ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

কাঞ্জিভরমে সার হেক্টর মুনরোর নেতৃত্বে এক বিপুল সেনাসমাবেশ করা হল। কর্নেল উইলিয়ম বেইলির নেতৃত্বে গুণ্টুরে সম্মিলিত সৈন্যেরা এর সঙ্গে মিলিত হবে।

২৫ অগস্টের বিকেলের দিকে বেইলি কোরতালেইয়ার নদীর উত্তর পারে পেঁছিল। শত্রুদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য সমাবেশ করতে টিপুর কিছু সময় লাগবে। ইতিমধ্যে তার তিনজন গোয়েন্দা দূর থেকে এই অবস্থার দিকে নজর রাখল। তাদের পরিষ্কার ও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া ছিল। উত্তর পার থেকে বেইলি দেখতে পেত দক্ষিণপারে ছোট ছোট আকারে আগুন জ্বলছে, এবং তা আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ওপারের কিছু চলাফেরার আভাসও পাওয়া যেত, একজন লোক যেন ছুটোছুটি করেছে, কখনো দুজন, কখনো বা তিনজন। কোনো কোনো সময় তাদের মশাল নিয়ে দৌড়তে দেখা যেত, মনে হত এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে বার্তা নিয়ে যাচ্ছে। নদী তখন প্রায় শুকনো। বেইলি সহজেই তা পার হতে পারত। কিন্তু ওপারের ওই গতিবিধিতে সে উদ্বিগ্ন ছিল। ফাঁদে পা দিতে সে রাজি না। সকালবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে সে ঠিক করল, দিনের আলোয় ব্যাপারটা

স্পষ্ট দেখে নিতে চায়। ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তর পারেই শিবির গেড়ে সে রইল।

পরদিন প্রভাত হল মেঘহীন আকাশ ও অপরূপ সূর্যোদয় নিয়ে। ওপার সম্পূর্ণ শান্ত, কোনো কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ছে না। টিপুর তিন গোয়েন্দা অদৃশ্য হয়ে গেছে, যে আগুন তারা জেলেছিল তা নিভে গেছে। কিন্তু এখানকার দৃশ্যটা বেইলির বহুদিন মনে ছিল। টিপুর প্রত্যাশা অনুসারে রাত্রিবেলা নদীতে বান এল, এবং ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেইলির সেনারা নদী পার হতে পারল না। এর মধ্যে অকুস্থলে এসে পৌছে গেছে টিপু, এবং বেইলিকে হয়রান করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সার্ হেক্টর মুনরো বেইলিকে অতিরিক্ত লোকলস্কর ও রসদ পাঠিয়েছে। আরও ১,০০০ সেনা নিয়ে কর্নেল ফ্লেচার এসে বেইলির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেইলির ৬,০০০ সৈন্য ইতিমধ্যে বেড়ে আরও বড় হয়েছে, টিপুর সামান্য ১,৫০০ সৈন্য এদের কেবলমাত্র হয়রানই করতে পারে। ৯ সেপ্টেম্বরে হাইদরের অতিরিক্ত ৩ ০০০ সৈন্য এসে পৌছল। আরও আসার কথা, কিন্তু অপেক্ষা করতে পারল না, মুনরোর সঙ্গে বেইলির যোগাযোগ যে বন্ধ করে দিতে চায়। পরদিনই—১০ সেপ্টেম্বর—সে আক্রমণ করল। তার গোয়েন্দা মারফত সে জেনে নিয়েছিল ইংরেজরা ছোট জলার আড়ালে অনেক গোলাগুলি ও রসদ মজুদ করেছে, সেদিকে সে তীক্ষ্ম নজর রাখল। টিপু তার গোলন্দাজদের আদেশ করল ঐগুলির উপর গোলা ছুঁড়তে। ইংরেজদের সেই সামরিক অস্ত্রাগার জলে উঠল। ইংরেজ সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল, মহীশূর-সৈন্যদের মধ্যে উল্লাস। বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে গেল। টিপু তখন মহীশূর অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নিল। আরম্ভ হয়ে গেল সংঘর্ষ। আহতদের ও মৃতপ্রায়দের আর্তনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত, তাদের পুঁতে দেওয়া হতে লাগল কাদার মধ্যে। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অনেক মৃতদেহের আদল বদল হয়ে গিয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রময় তারা ছড়ানো। দুই পক্ষের কেউই বুঝতে পারল না যুদ্ধ কোন্ দিকে যাচ্ছে, কারই বা পক্ষে আছে এর গতি। কিছুক্ষণ পরে এই বিশৃংখলা একটা চেহারা নিল। ইংরেজের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, তাদের অনেক সৈন্য পালাচ্ছে। কিন্তু তখনো প্রতিরোধ করে চলেছে তারা। বেইলি ও ফ্লেচার ইংরেজ সৈন্যদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টায় একান্ত। বেইলি আত্মসমর্পণ করবে না। এটা সে বুঝতে পেরেছে যে, অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মহীশূর আক্রমণ করেছে। টিপু তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পুনরায় আক্রমণ

করল। ইতিমধ্যে ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে হাইদর আলি রণক্ষেত্রে উপস্থিত। তার সেনারা এসে পড়া মাত্র ইংরেজ শিবিরে উল্লাস আরম্ভ হয়েছে তারা ভেবেছে তাদের রক্ষা করার জন্যে মুনরোর পাঠানো সৈন্য এসে গিয়েছে। পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন হাইদর কেননা ইতিমধ্যে আরও সৈন্য এসে যাচ্ছে. তাঁর অনুমান মত ইংরেজের সৈন্যসংখ্যার সঙ্গে তার সৈন্যের সংখ্যা তখন উপযুক্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু টিপু তখনই আক্রমণ করার জন্য অনুনয় জানাল কেননা ইংরেজ শিবিরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, দেরি করলে মুনরোর সৈন্যরা এসে পেঁছে যাবে। হাইদর তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে টিপু তার সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নিয়েছে, এবং নতুন করে গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এর আগে তাদের অনেক গোলাগুলি টিপু ভস্ম করে দেওয়ায় ইংরেজদের গোলাগুলিতে টান পড়ে গিয়েছে। তার উপর হাইদর আলির হঠাৎ এই আবির্ভাবে তাদের মনে আতঙ্ক এসে গেছে, তারা জানত না অল্প সংখ্যক সেনা নিয়ে তিনি এসে পেঁছে গেছেন। কর্ণেল বেইলি শান্তির পতাকা উড্ডীন করল।

সব সমেত, বেইলি-সহ ২,০০০ ইংরেজকে বন্দী করা হল। ৫,০০০ মারা গিয়েছে, বাকীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। মহীশূরের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়, তাদের ৬,০০০ সৈন্যেব মধ্যে ২,৫০০ মারা যায়। আরও অনেকের ক্ষতি হয়েছে, কারও চোখ নষ্ট হয়েছে, কারো অঙ্গের হানি ঘটেছে।

হাইদর যখন উল্লসিত, টিপু তখন বিষণ্ন মুখে সব অবস্থা দেখে নিচ্ছে। এ এক ভয়ংকর দৃশ্য। নিজের মনেই সে বলল, দুঃখ, দুর্দশা ও মৃত্যু এই হচ্ছে যুদ্ধের ফল ও ফসল।

৮

পলিলুরের যুদ্ধে, ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর তারিখে, কর্নেল বেইলির বাহিনীকে যেভাবে টিপু পর্যুদস্ত করেছে বৃটিশ তাকে 'ভারতবর্ষে ইংরেজরা যত আঘাত পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত' বলে মনে করে। স্যার্ হেক্টর মুনরোর কঠিন সমালোচনা করা হয়, কেননা, মাত্র ছয় মাইল দূরের কাঞ্জিভরমে মূল ইংরেজ বাহিনী নিয়ে সে ছিল, সেখান থেকে বেইলিকে উদ্ধার করতে কেন যে আসতে পারল না। মহীশূর বাহিনীর যাবতীয় খবর

তার গোয়েন্দারা তাকে দিয়েছিল, কিন্তু সে কী করে জানবে যে, অধিক সংখ্যক সেনা নিয়েও মহীশূরের ৬,০০০ সেনার কাছে সে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে—নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যে নিজের মনেই এ কথা বলে হেক্টর মনরো। কী করেই বা সে জানবে যে বেইলি জীবন-মৃত্যু-সমস্যার মধ্যে পড়েছে। তার গোয়েন্দারা তাকে টিপুর সৈন্যসংখ্যাই জানিয়েছে, কিন্তু কী রকম সাহস ও উদ্যোগ নিয়ে সে আক্রমণ করবে তা তো তারা বলতে পারেনি।

বেইলি আহত হয়েছিল। রণক্ষেত্রে টিপু তার আত্মসমর্পণ মেনে নিয়েছে, তার নির্ভীক প্রতিরোধের জন্যে প্রশংসা করেছে, বলেছে, তার এই পরাজয় যুদ্ধের একটা ভাগ্য মাত্র। একটা পালকি আনা হয়েছিল, বেইলিকে টিপু পালকির কাছে নিয়ে গেল। সে সময়ে ব্যাণ্ডেজ-করা বেইলির ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করল, রক্ত লাগল টিপুর জামায়। বেইলি সৌজন্যের সঙ্গে এজন্যে দুঃখ প্রকাশ করল।

"দুঃখপ্রকাশ কোরো না," সুলতান বলল, "এ হচ্ছে বীরের রক্ত"। তার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, নিজের জামার দিকে চেয়ে বলল, "এর রং আমার রক্তের রঙেরই মত।"

বেইলি চমকিত হল টিপু সুলতানের মত এমন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এমন কথা বলতেই পারে অবশ্য।

গুরুতর আহতদের জন্যে, টিপুর আদেশে, স্টেচার আনা হল। এদের মধ্যের অফিসারদের জন্যে আনা হল পালকি। ইংরেজদের ডাক্তার—ডক্টর হপকিন্স—যুদ্ধে নিহত হয়েছে। টিপুর ডাক্তারই উভয় পক্ষের আহতদের দেখাশুনা করতে লাগল। টিপু ও হাইদর আলি অনেক যুদ্ধে লড়াই করেছে, কিন্তু এত অল্প এলাকায় এতটা রক্তক্ষয় কখনো দেখেনি। হাইদর আলি সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর দুর্দশায় দৃষ্টিপাত করেন না, তিনিও এবার একটু যেন অভিভূত। যুদ্ধক্ষেত্রেই বিস্কুট ও জল বিতরণ করা হল। তারপরে সাময়িক আস্তানায় আনা হল মদ্য ও রুটি। পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে জরুরি তলব পাঠানো হল, এবং বন্দীদের জন্যে আরও অনেক দ্রব্য এসে গেল। শল্যচিকিৎসক আনতে লোক গেল।

যুদ্ধ-বন্দীদের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে উদাসীনতার অনেক কুৎসা টিপুর উপর আরোপ করা হয়েছিল—পরে জেনেছে টিপু। ইংরেজরা এমন গুজবও ছড়িয়েছে এবং প্যামফ্লেটও বের করেছে যে, টিপু নাকি বন্দীদের উপর নিষ্ঠুরতা করেছে।

এইসব আজগুবি প্রচারের কথা জেনে টিপু সে বিষয় উড়িয়ে দিয়েছে, মন দেয় নি। বেইলি পরাস্ত হওয়ায় ইংরেজদের মর্যাদা কতটা মার খেয়েছে তা সে জানে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, ইংরেজরা তাদের এই পরাজয়ের, মহীশুরের এই অপূর্ব জয়ের, দিক থেকে অনেকের মনোযোগ সরিয়ে দেবার জন্যে অবাস্তব কাহিনী প্রচার করবে। ইংরেজরা শান্তির পতাকা উড্ডীন করার পরেও মহীশুর রাজকুমার নাকি নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ইংরেজদের প্রতি। টিপু ভাবল, ইংরেজরা কি জানে যে, তাদের আহত বন্দীরা শারীরিক ভাবে যে কষ্ট পেয়েছে, টিপু সেই কষ্ট ভোগ করেছে মনে-মনে? কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর, এই প্রশ্ন মন থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের কাছেই সে প্রশ্ন করল, "এটা কী ধরনের একগুঁয়েমি যে, অন্যে কীরকম কষ্ট পেয়েছে তা বিচার করব আমি?"

সে যাই হোক, বেইলির গোলাগুলি ও রসদ প্রতীক্ষারত মুনরোর কাছে পৌঁছল না, কাঞ্জিভরমে সে অপেক্ষা করছিল। এর মধ্যে হাইদরের সেনাবাহিনী মজবুত করে তোলা হচ্ছিল। মুনরো ভয় পেয়ে গেল যে, তার পিছু নেওয়া হবে, তাই সব ভারি বন্দুক সে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না বলে কাঞ্জিভরমের দিঘিতে নিক্ষেপ ক'রে তাড়াহুড়ো করে ফিরে এল মাদ্রাজে। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে টিপুকে হাইদর তার পশ্চাদ্ধাবনে পাঠালেন। মুনরোর বাহিনীর পশ্চাৎভাগ একেবারে মুছে ফেলে টিপু মুনরোর যাবতীয় মালপত্তর হস্তগত করল। মুনরো স্বয়ং তার বেশির ভাগ সৈন্য নিয়ে নিরাপদে পৌঁছল মাদ্রাজের চার মাইল দক্ষিণে মারমালংএ। হাইদর আলি টিপুকে ডেকে পাঠালেন আরকট অধিকারের জন্যে। ছয় সপ্তাহ অবরোধ ও তুমুল যুদ্ধের পর আরকটের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করল। টিপুর কাছে পরবর্তী আত্মসমর্পণ ঘটল সাতগড়ের, প্রায় বিনা যুদ্ধেই। আমবুরে ক্যাপটেন কীটিংএর অধীনস্থ সেনাবাহিনী চার সপ্তাহ ধরে লড়াই করে পরাস্ত হল। এর পরে টিপু দখল করল টিয়াগড়—এখানে সেনাদল পরাজয় মেনে নিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আরও অনেক দুর্গের পতন ঘটল টিপুর কাছে। তার অভিযানের সময় হাজার হাজার লোক তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শালীনতার সঙ্গেই তাদের গ্রহণ করা হয়েছে, এবং আহতদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের।

তার সব বিজয়ের যাবতীয় বিলিব্যবস্থা করে টিপু তার পিতার কাছে আরকটে গেল। সেখানে বীরের সম্মান পেল। রাকেয়ার সংগে কিছুদিন কাটাবার জন্যে তাকে ছুটি দেওয়া হল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই—১৭৮২র ফেব্রুয়ারিতে—

তাকে যেতে বলা হল তাঞ্জোরে, সেখানে সে ইংরেজ অধিনায়ক কর্নেল ব্রেথওয়েটকে ভীষণভাবে পরাস্ত করল, যার তুলনা কেবল বেইলির বাহিনীর পরাজয়ের সঙ্গেই করা চলে। দুই দিন যাবত প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ব্রেথওয়েট আত্মসমর্পণ করে। বন্দীদের প্রতি টিপুর সদয় ব্যবহারের জন্যে এখানেও তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, তাদের আহার ও পরিচ্ছদের বন্দোবস্ত সে যে ব্যক্তিগত ভাবে করত কেবল তাইই নয়, তার অফিসারদের কড়া নির্দেশও দেওয়া ছিল তারা যেন ভদ্র ও বিনীত আচরণ করে।

রক্তের বন্যায় শুয়ে আছে শত্রু পক্ষের সেপাই টিপু তা দেখে। তার শরীরের মধ্যে দিয়ে শিহরণ খেলে যায়, তাদের স্টেচারে তোলা হচ্ছে দেখে টিপু বলে :

"ধীরে, ধীরে। আস্তে ওকে ওঠাও।" আহত ব্যক্তির থেকে টিপুই যেন বেশী কষ্ট পাচ্ছে, তার কথায় এরকম মনে হয়েছে।

সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেছে যে ওরা শত্রুপক্ষের সেনা। একজন মানুষ কষ্ট পাচ্ছে দেখে ওটা হচ্ছে আর-একজন মানুষের আর্তনাদ।

টিপু সুলতানের সৈন্যেরা অনেক সময় টিপুকে অভিনন্দিত করেছে। এই সময়ে সে অভিনন্দিত হয়েছে শত্রুর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে। তার হৃদয় স্পর্শ করেছে সে অভিনন্দন। অসুস্থ ও আহতদের সে মুক্তি দিয়েছে কিছু উপহার সহ। মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে আর লড়াই করবে না বলে যারা শপথ করেছে তাদেরও মুক্তি দিয়েছে সে। পরে অবশ্য অনেকে কথা রাখেনি। সে জানতে পারে এদের কেউ-কেউ বন্দীদের প্রতি টিপুর নিষ্ঠুরতার গুজব ছড়িয়েছে। এর প্রতিবাদ করতে চায়নি টিপু। এ'তে টিপুর বেশ মজা লাগত যে কেউই এমন কথা বলেনি যে স্বয়ং এই নিষ্ঠুরতা দেখেছে, সকলেই অন্যের দেখা বিষয়ের উল্লেখ করেছে মাত্র।

ছ

অনেক স্মৃতি একত্র হয়ে টিপু সুলতানের মনের মধ্যে সব মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। পুরনাইয়া চলে যাবার পর শিবিরে বসে তখন সে অপেক্ষা করছিল। রাকেয়া বানুর সঙ্গে স্বল্পকালের জন্যে ছুটি কাটানোর কথা তার মনে হল। তার উজ্জ্বল দুটি চোখে আনন্দের অশ্রু, সেই চোখে টিপুর দিকে সে চেয়ে আছে গভীর ভালো-বাসার দৃষ্টিতে। টিপু তার চমৎকার উজ্জ্বল চোখ-দুটি দেখল। ওই দৃষ্টির পিছনে কিছু-একটা মধুর ধ্বনি যেন সে শুনতে পেল। ধীরে সে তাকে নিকটে

টানল। তিন রাত্রি তারা উভয়ে উভয়ের বাহুপাশে কাটাল। তার পর এল তার অভিযানের আদেশ। রাকেয়া প্রতিজ্ঞা করেছিল বিদায়ের সময়ে আর কাঁদবে না। "তিন দিন তোমার পাশে থাকার সুযোগ আমাকে দিয়েছ, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, প্রভু। এর বেশি চাইবার সাহস আমার নেই" রাকেয়ার হৃদয় বলেছিল এই কথা। তবু চোখে জল এল, বুকে একটা বেদনা এল ফিরে।

টিপুকে যেতে বলা হয়েছিল মালাবারে, মহীশূরের সৈন্যেরা সেখানে, অসুবিধেয় পড়েছে, সেখানে আরশাদ বেগ খাঁ জংবাহাদুরকে তার সাহায্য করতে হবে—কর্নেল হাম্বারস্টোনের সৈন্যরা তাকে খুব বিব্রত করছে। ১৭৮২ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে সে সেখানে পৌঁছল, এটা হচ্ছে যুগল পশ্চাদপসরণের সেই রাত্রি—যখন সাধুরাম পুরনাইয়ার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এল যে, তার পিতা হাইদর আলির মৃত্যু হয়েছে।

এখন, সে একা হয়ে গেল। পিতা ও পুত্র মিলে বহন করেছে যে গুরুভার, এখন তা বইতে হবে তাকে একা। এর পরিণাম কি হবে? সে ভাবতে লাগল। সে জানত এর পরে যে যুদ্ধ আসছে সেগুলি হবে আরও ভয়াবহ। খুব পরিষ্কার ভাবে স্পষ্টভাবে ও ভয়ংকরভাবে তার চোখে ভেসে উঠছে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী, উন্মত্ত ঘোড়া এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করেছে, আহত সৈন্যদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ, ছোরা-মারা, আগুন-লাগানো, তার পর মৃত্যু, তার পর নিস্তব্ধতা। রণক্ষেত্রে যেসব দুঃখকষ্ট সে সৈন্যদের ভোগ করতে দেখেছে, সেই কষ্ট সে অনুভব করতে লাগল। তার পর সে কল্পনার চোখে দেখল উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সে শত্রুর বুকের রক্ত দাবি করছে। সে শিউরে উঠল। অন্য চিত্র দেখল সে। সে দেখল মোটা কম্বলে আচ্ছাদিত তার শরীর, একজন সাধুর কাছ থেকে সে অন্য সাধুর কাছে চলেছে তার মুক্তির জন্যে, শান্তির জন্যে।

"কোন্ পথে আমি যাব?" নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে। "সে পথে অবশ্যই নয় যেখানে শকুনির ছায়ায় পড়ে আছে মৃতদেহ।"

তার কেমন মনে হল তার হৃদয়ের মধ্যেই আছে এক প্রহরী, যে পথে যেতে সে নিষেধ করছে। সে প্রার্থনা করতে লাগল, 'তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম আমাকে। তোমার কী অভিপ্রায় বলো, যে পথে আমি যাব সেই পথের সন্ধান দাও, শিখিয়ে দাও কী আমার করণীয়।"

সে প্রার্থনা করতে লাগল, তার প্রার্থনার উত্তরের জন্যে তার সর্বান্তঃকরণ প্রতীক্ষা করতে লাগল।

## ৩৩. যন্ত্রণাকাতর একটি হৃদয়

দীর্ঘ রজনীর অবসান হল। কিন্তু টিপুর মনের সম্মুখে যে একটির পর একটি চিত্র ফুটে উঠছে, তার অবসান হল না। এ চিত্রাবলীর যেন শেষ নেই।

পুরনাইয়া যখন টিপুর তাঁবুতে এল তখন সকাল ছয়টা।

কম্বলে ঢাকা চেয়ারে টিপু বসা, গত রাত্রে এইখানেই তাকে বসে থাকতে দেখে গিয়েছে পুরানাইয়া। পুরনাইয়া বুঝল যে, টিপু একেবারে ঘুমোয়নি। তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে রইল পুরনাইয়া, তার মুখ দেখে সে বুঝতে চেষ্টা করল কী সে ভাবছে। বুঝতে পারল না। টিপুর মুখ শান্ত সমাহিত। চোখ-দুটো প্রশান্ত, স্বচ্ছ। কিছুক্ষণ উভয়ে কোনো কথা বলল না। এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে চাইল না কেউ।

অবশেষে পুরনাইয়া বলল, "যদি অনুমতি কর তবে তোমার প্রাতরাস তাঁবুতেই দিতে বলি। তার পর আমরা যাত্রা করব।"

টিপু উত্তরে বলল. "এস, একসংগেই খাই।"

পুরনাইয়া বেরিয়ে গেল খাবার দিতে বলার জন্যে, এবং টিপুর সাজপোশাক পরার সময় দেবার জন্যে। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরল ও উভয়ে খেতে বসল। খাবার মাঝপথে টিপু মুখ খুলল, একজন মানুষ একা-একা মনে মনে যে বোঝা বইছে সে যেন তা ব্যক্ত করতে চায়।

আশ্চর্য হয়ে শুনে গেল পুরনাইয়া। টিপুর মুখের শান্ত সমাহিত ভাব এখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, ভিতরের এক প্রবল উত্তেজনায় তার মুখের পেশী কাঁপছে। তার চোখ এখন প্রশান্ত নয়। উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর তেজী, তা যেন আদেশমুখর। কিন্তু কথাগুলো কেমন? পুরনাইয়া চমকিত হয়ে শুনছে। কথাগুলো পরিষ্কার সংলগ্ন ও ব্যাপ্ত। কিন্তু সে কি গুরুত্বপূর্ণ হবে না? হায় ঈশ্বর, না। পুরনাইয়া যেন রোদন করে উঠল, এবং নিজেকেই নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল। কী করে নিজের কাজ নিজে পরিত্যাগ করবে? একজন সম্রাট কি তার সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে পারে? একজন রাজা কি তার রাজ্যের চাবি ভীত দুর্বিনীত শত্রুর হাতে দিতে পারে?

কেন, কিন্তু কেন? গত রাত্রের যাবতীয় চিন্তার ও চিত্রের কথা টিপু যতই বলে যেতে লাগল পুরনাইয়া ততই ঐ প্রশ্ন করতে লাগল নিজেকে। টিপুর দেওয়া এই বিবরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পুরনাইয়া যেন তাকে থামতে বলার জন্য হাত তুলল। প্রতিটি কথা এক একটা আঘাতের মত। টিপু বুঝল। সে সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে পুরনাইয়ার হাত নিল। আর কোনো কথা বলল না।

তারা চুপচাপ মুখোমুখি বসে রইল। সেই নীরবতার মধ্যে পুরনাইয়া টিপুর মনের যন্ত্রণার বিষয় উপলব্ধি করতে পারল, এর আগে যা সে পারেনি। পুরনাইয়া বরাবরই জেনে এসেছে ঈশ্বরে সমর্পিত আত্মা হবার তার প্রবল বাসনার কথা। সে জানত, মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিত তাঁদের এই ছাত্রটির মনে সত্যের ও শান্তির বীজ বপন করে দিয়েছেন। তাঁরা তার মনের মধ্যে এমন স্বপ্ন ও আশা সঞ্চার করে দিয়েছেন যাতে সে মনে দুঃখ ও দীর্ঘনিশ্বাস না থাকে। টিপুকে বড় হয়ে উঠতে দেখেছে পুরনাইয়া, তার বাবা ও মা তাকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করার জন্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালনে তাঁরা ছিলেন কৃতসঙ্কল্প—এজন্যে মনে মনে উল্লাস করেছে পুরনাইয়া। তারপর তাঁদের পুত্রকে সামরিক কাজে নিযুক্ত করতে হাইদর বাধ্য হলে তাঁরা কতটা মনো-কষ্ট পেয়েছেন তাও জানে পুরনাইয়া। যুদ্ধে টিপুর অসাধারণ দক্ষতা দেখে ও জয়ের পর জয় দেখে পুরনাইয়ার মনে এতটুকু সন্দেহ কখনো হয়নি যে, টিপুর মন আসলে অন্য ব্যাপারে আকৃষ্ট। এক লহমার জন্যে পুরনাইয়ার মন আনন্দে অধীর হল। সে নিজেও একজন ব্রাহ্মণ—তার মনও সহানুভূতিপূর্ণ, ধর্ম-বিশ্বাসী; পবিত্র গাথায় ও শাস্ত্রে তারও অনুরাগ আছে, রাজার প্রতি তার সম্মান আছে, কিন্তু করুণার প্রতি আছে তার শ্রদ্ধা। এইখানে রয়েছেন এক রাজা যিনি করুণার জন্য সর্বস্বত্যাগে উন্মুখ। টিপুর প্রতি পুরনাইয়ার ভালোবাসা বরাবরই গভীর, এখন যেন তা উপছে পড়ার উপক্রম করেছে। কিন্তু না, পুরনাইয়া নিজের মনেই বলল, তরবারি খাপ থেকে বের করা হয়েছে, এখন তা আর খাপে ভরে রেখে দেওয়া যায় না।

তার বাবার কথা মনে পড়ল পুরনাইয়ার, তিনি ছিলেন সাধুপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ, কেবল ঈশ্বরকে, মানুষকে ও পুঁথি তিনি ভালবাসতেন। ইংরেজরা তার বাড়িতে জোর ক'রে ঢুকে পড়ে, বইপত্র ছেঁড়ে, বিগ্রহমূর্তি ভেঙে ফেলে, দাড়ি ধরে টানে, বুকে লাথি মারে। তারপর তারা দোর-গোড়ায় একটা গোরু হত্যা করে,

তাঁর গায়ে ওই রক্ত ছেটায়, মুখে গোমাংস পুরে দেয়। তিনদিন পরে তাঁর পিতা মারা যান, মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁর শেষ অনুরোধ জানিয়ে যান সব মানুষকে ভালোবাসতে। হ্যাঁ, পুরনাইয়া বলেছিল, সে ভালোবাসবে সব মানুষকে। কিন্তু সে জানত, ইংরেজরা মানুষ নয়। তারা পশু, তাদের দয়ামায়া নেই, ঠান্ডা মাথায় তারা হত্যা করতে পারে, অত্যাচার করতে পারে—এ কাজ তারা করে ফুর্তি হিসেবে। কোনো রকম দ্বিধা না করে তারা মেয়েদের ধর্ষণ করতে পারে, শিশুহত্যা করতে পারে, ভগবানকে অপমান করতে পারে, শস্য ও গৃহ অগ্নিদগ্ধ করতে পারে। অসহায় গৃহহীন ব্যক্তিকে ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে। না, তারা মানুষ নয়। কিন্তু তাদের প্রতি এই উত্তাপ তাকে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। তার পিতার মৃতদেহ যখন ভস্মে লীন হয়ে গিয়েছে, তখন পিতৃহীন পুরনাইয়াকে নিয়ে আসেন একজন ইংরেজ পাদ্রি, একটা বড় বাড়িতে তাকে তিনি নিয়ে যান যেখানে অনেক শিশুকে খ্রীষ্টানরূপে বড় করা হচ্ছে। পুরনাইয়াকে বস্ত্র দেওয়া হল, দেওয়া হল খাদ্য। রাত্রে সেখান থেকে সে পালাল। তার বাসায় গেল সে, তার কেমন মনে হতে লাগল যে তার বাবা এসে উপস্থিত হবেন। তার পরে অর্ধদগ্ধ একটা শাস্ত্রগ্রন্থ বুকে চেপে ধরল সে, গৃহত্যাগও করল। কয়েকটি রাত্রি ও দিন চারদিকে ঘুরে বেরিয়ে সে এসে প্রবেশ করল মহীশূরে। এখানে ইংরেজরা তখনো নাক-গলাতে পারেনি। ইংরেজ পাদ্রি তাকে যে জামা দিয়েছেন তার পকেটে সে ছোট একটা বাইবেল পেল। তার ইচ্ছে হল এ'তে থুতু দিতে, ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে, পা দিয়ে মাড়াতে। তার পিতার গ্রন্থে ইংরেজ যা করেছে সেই অপমানের শোধ নিতে ইচ্ছে হল তার। নিজেকে নিবৃত্ত করে সে বইটা পড়তে লাগল, যে ইংরেজদের ধর্ম তাদের বর্বরতা নিষ্ঠুরতা ধর্ষণ খুন লুণ্ঠন ইত্যাদি সমর্থন করে, সেই ধর্ম কেমন তা জানতে ইচ্ছে হল তার। পবে সে পড়েছে এবং তার চোখে জল এসেছে। ইংরেজদের প্রতি তার ঘৃণা থেকে গেল, কিন্তু তাদের ধর্মের প্রতি নয়। সে বুঝল ঐসব ঈশ্বরহীন ব্যক্তি তাদের ধর্ম পরিহার করেছে, যে ধর্ম সর্বমানবকে ভালোবাসার, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার ও পবিত্রতার প্রতি সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছে। সে জানত, এই মানুষরা 'চিরকালীন এক ধ্বংসের দ্বারা শাস্তি পাবে, ঈশ্বরের আশ্বাস তারা পাবে না, সর্বশক্তিমানের শক্তির আশ্রয়' থেকে তারা বঞ্চিত হবে। বাইবেল প্রেমের যে বাণী শিক্ষা দিয়েছে তাতে মুগ্ধ হল পুরনাইয়া, যে ঈশ্বর পৃথিবীর প্রতি এত করুণাময় তাঁর সম্বন্ধে বাইবেলের

উপলব্ধিতে সে অভিভূত। পরে তার অধ্যয়ন আরও ফলপ্রসূ হয় এবং হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করে। তবুও বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়ে গেছে একই রকম। পুরনাইয়া তার এই চিন্তা থেকে সরে এল। কয়েক বছরে পুরনাইয়া মহীশূরে নিজের একটা সম্মানিত আসন করে নিয়েছে। সে ছিল হাইদর আলির সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী। টিপু সুলতান তাকে ভালোবাসত। হাইদর তার উপর এই ভার চাপান যে, সে যেন ঈশ্বরের ও ন্যায়নীতির অনুশাসন মেনে রাজ্য শাসনে টিপুকে সাহায্য করে। না, সে সেই পিতা পুত্র কারো কর্তব্যেই ত্রুটি করবে না। টিপু সম্বন্ধে সে অনেক চিন্তা করল। সে বুঝল, টিপুর সহায়তায় এখন তার আসা উচিত। তার মন থেকে ভয় দূর করে তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করা তার কর্তব্য। কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে তারও দ্বিধা হল, কেননা টিপু যা বিশ্বাস করে পুরনাইয়ার মনের নিভৃত কোণেও যে সেই বিশ্বাসই বর্তমান, তা হচ্ছে সত্য শিব ও মুক্তি। সেও দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বরের মহিমায় ও মানুষের ভ্রাতৃত্বভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু একটা কর্তব্য পালনে তাকে আত্মনিয়োগ করতেই হবে, যে দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেছেন হাইদর আলি। সে নিজেকে গুছিয়ে নিল মনে মনে।

পুরনাইয়া ও টিপুর মধ্যে যুক্তি তর্ক আরম্ভ হয়ে গেল।

পুরনাইয়া জানত দেশের প্রতি টিপুর ভালোবাসা কতটা। এই দেশের মাটি ও মানুষের কথা টিপু তাকে বলত। সেই সঙ্গে মনে করে দিত এই দেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের কথা, বলত সেই সব নারী-পুরুষের কথা যারা এই দেশের জন্যে জীবনদান করেছে।

পুরনাইয়া বলল, "মনে হচ্ছে সবই ত্যাগ করতে চাও ?"

"ত্যাগ করব ? না।" জোর গলায় উত্তর দিল টিপু, তারপর ধীর গলায় বলল, "এই মাটিতে আমার জন্ম। এ আমার জন্মভূমির ধূলি, আমার অস্তিত্বের আশ্রয়। এইখানেই আমি মরব।"

পুরনাইয়া টিপুর দিকে এমনভাবে তাকাল যে মনে হল টিপুর উত্তরে সে সন্তুষ্ট নয়।

"আমাকে বলো, পুরনাইয়া," টিপু বলতে লাগল, "চিন্তা নিয়ে ও বই নিয়ে একটা শান্ত জীবন কাটানোই ভালো, কিংবা তরবারি নিয়ে ? ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধের পিছনে ধাওয়া করাই কি ভালো, যে ক্ষেত্রে আমি আমার

স্ত্রী পুত্র নিয়ে একটা শান্ত জীবন কাটাতে চাই ? প্রার্থনার ডাক থেকে কি যুদ্ধের ডাকই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ? সন্তদের তীর্থ থেকে রণক্ষেত্র কি বেশি মূল্যবান ? তুমি জান পুরনাইয়া, চিত্রাঙ্কন করতে আমি ভালোবাসি, আমাদের দেশের পাহাড়-পর্বত আমি ক্যানভাসের উপরে আঁকব না কি ? তোমার কি ইচ্ছে যে, যাদের আমি যুদ্ধে নিহত করব তাদের রক্ত দিয়েই আঁকব সেই ছবি ?"

'তুমি আঁকতে চাও, সুলতান ?" এই গুরুতর আলোচনা থেকে টিপুর মন অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্যে পুরনাইয়া একটু হেসে বলল।

"হ্যাঁ। আঁকতে আমি চাই।" টিপু বলল, "আমি আঁকতে চাই সূর্যালোক, উন্মুক্ত বাতাস, পুষ্পিত বৃক্ষ, সুনীল সমুদ্র—কিন্তু তা রক্তের রঙে নয়।"

পুরনাইয়া চুপ করে রইল, কিন্তু টিপু বলতে লাগল, "দেখ পুরনাইয়া, আমি আহতের আর্তনাদ আঁকতে চাইনে, আঁকতে চাই বিশ্বাসের ক্রন্দনধ্বনি। আমার ক্যানভাসে আমি আঁকতে চাই মানুষের স্বপ্ন ও তার সাধনা, তার মৃত্যু ও তার অধঃপতন নয়। আমি নিরাময় করতে চাই, হত্যা করতে চাইনে।"

"সে যাই হোক," পুরনাইয়া বলল, "যুদ্ধের মাঝপথে তা পরিত্যাগ করে না কোনো অধিনায়ক। তার স্বপ্নের পিছনে ধাওয়া করার জন্যে রাজা কখনো তার কর্তব্যকাজ ফেলে চলে যায় না।"

টিপু জানতে চাইল, "বিবেকের আহ্বান কি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে ?"

পুরনাইয়া বলল, "সাধারণ একজন সেপাইকে ও একজন প্রজাকে আইন তার কর্তব্য বেঁধে দিয়েছে। তাদের বিবেকের আহ্বান আছে, তারা কি তাতে সাড়া দিতে গিয়ে সব পরিত্যাগ করবে ? রাজাও কি সেই আইনের আওতায় আসে না ? একই কর্তব্যে কি সে বাঁধা নয় ? কেবল সাধারণ সেপাই দল ত্যাগের জন্যে বন্দুকধারীদের গুলির সম্মুখীন হয়, রাজা ও রাজকুমারেরা কি আইনের বিধান থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায় ? না। তোমার কাজ সমাধা করার দায়িত্ব তোমারই, তোমার দীন থেকে দীনতম প্রজার যতটা তোমারও ঠিক ততটাই কর্তব্য।"

"আমার কী কর্তব্য তুমি তা জান বলে দাবি করছ কি ?" শান্ত গলায় বলল টিপু।

"হ্যাঁ। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে ও দেশের সঙ্গে এক প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা।" বলল পুরনাইয়া।

"আমার বাবা আমার উপরে পৈত্রিক দাবি খাটিয়েছেন। কিন্তু দেশের সঙ্গে আমার তেমন চুক্তি হল কবে ?" টিপু জিজ্ঞাসা করল।

"টিপু সুলতান, আমি তোমার হৃদয়ের আবরণ ছিন্ন করে ফেলতে চাইনে, তোমার আত্মার গোপনীয়তার উপরেও হস্তক্ষেপ করতে চাইনে। কিন্তু খুলে বলো, ইংরেজরা ভারতবাসীর উপর যে হৃদয়হীনতা দেখিয়েছে, ও ঠাণ্ডা মাথায় যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার জন্যে তুমি কি চোখের জল ফেলনি? তারা যখন তাদের বন্দীদের হত্যা করেছে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে—শূকরের চামড়ায় মুসলিমদের বেঁধে ও মুখে তার মাংস দিয়ে যখন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং হিন্দুদের পবিত্রতা তাদের নিজেদের দিয়েই নষ্ট করিয়েছে। তখন কী মনে হয়েছে তোমার? বলো, যখন এই হত্যা-তাণ্ডবের কথা তুমি শুনেছ তখন কি বেদনার আর্তনাদ বেরিয়ে আসেনি তোমার হৃদয় থেকে? যখন তারা গ্রামের পর গ্রাম নষ্ট করে দিয়েছে, কূপের জল বিষাক্ত করেছে, শস্যে অগ্নিসংযোগ করেছে, শান্ত মানুষের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের দাসত্বে আবদ্ধ করেছে—তখন কী মনে হয়েছে তোমার? হ্যাঁ, সুলতান, তুমি চোখের জল ফেলেছ, সেই চোখের জল দিয়েই কি তুমি দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নও?"

"কিন্তু আমার ঈশ্বর, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান? তাদের প্রতি আমার কী কর্তব্য?" জানতে চাইল টিপু।

"তারা-সব সহাবস্থান করতে পারে।' উত্তর দিল পুরনাইয়া, "কিন্তু তুমি কি মনে কর, তেমন রাজা দিয়ে কি ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন আছে যে নিজের দেশের ও মানুষের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে?" একটু থেমে পুরনাইয়া বলল, "আমাকে বিশ্বাস কর, রাজার প্রথম কর্তব্য তার প্রজার প্রতি। পারিবারিক সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্ক এর প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সময়ের দিক থেকে, গুরুত্বের দিক থেকে প্রজার প্রতি তোমার কর্তব্য সবার আগে। রাকেয়া বানুকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও এই কথাই বলবেন। দারা শিকোর স্ত্রীর যে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন সে কথা তুমি তাঁর কাছে একবার শুনে নিয়ো। তিনি বলেছিলেন, তিনি বরঞ্চ মৃত্যু বরণ করবেন কিন্তু নিজের দেশ ত্যাগ করবেন না।"

"দারা শিকোর স্ত্রী?" টিপু জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর সম্বন্ধে রাকেয়া কী বলেছিল?"

পুরনাইয়া দেখে খুশি হল যে তাদের কথাবার্তা এখন একটা নিরাপদ পথ নিয়েছে। রাকেয়া বানু যা বলেছিলেন সে কথা সে টিপুকে বলল। রাকেয়া তাকে প্রথমে বলে শাহ জাহানের কথা, সেই মোগল সম্রাট্ যিনি অপূর্ব ও অপরূপ

ইমারত গড়ে তুলেছিলেন যেসব ছিল মোগল জাঁকজমকের দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাজমহল, মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ও জুমা মসজিদ। পুরনাইয়ার মত টিপুও ইতিহাস পাঠ করেছে, কিন্তু তার নিজের মত করে সে তা পুরনাইয়াকে বলতে দিল। পুরনাইয়া তখন শাহ জাহানের ছোটপুত্র অত্যাচারী ঔরঙ্গজেবের কথা বলল, যে তার পিতার স্বাস্থ্য যখন খারাপের দিকে তখন সিংহাসন অধিকার করে বসল। তারপর বন্দী করা হল শাহ জাহানকে। অতি সাধারণ ও সামান্য আরামও তাঁকে দেওয়া হল না। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে, তার বন্দীশালা থেকে তিনি তার অপূর্ব কীর্তি তাজমহল দেখতে পেতেন, যেখানে অবশেষে তার প্রিয়তমা মমতাজ মহলের পাশে তিনি সমাহিত হন। ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক ঔরঙ্গজেব শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সিংহাসনের আইনগত উত্তরাধিকারী দারা শিকোর বিরুদ্ধে কর্মতৎপর হয়। দারা শিকো তাঁর প্রপিতামহ আকবরের মত ধার্মিক ও সহনশীল ছিলেন। রাজপুত শাসক ও বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গেও ছিল তাঁর হৃদ্যতা। হিন্দুধর্মে তিনি অনুরাগী ছিলেন, বেদান্তের অনুশাসন তিনি মানতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি অথর্ব বেদ ও উপনিষদ পার্শীভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থেরও অনুরাগী ছিলেন। সত্যিই তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী, দয়াপরবশ ও চমৎকার লোক, কিন্তু তিনি ঔরঙ্গজেবের ন্যায় ধূর্ত ও শঠ ব্যক্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সেনাদের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য তিনি পলায়ন করলেন—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী নাদিরা বেগম। দারাকে অন্বেষণ করে বেড়াতে লাগল ঔরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী, দারা এক স্থান থেকে অন্যত্র গমন করতে লাগলেন, তাঁর স্ত্রী সব সময় রইলেন তাঁর সঙ্গে। রাজপুতনা কচ্ছ সিন্ধু সর্বত্র। কিন্তু দারা যখন ঠিক করলেন তিনি সমুদ্র পার হয়ে পারস্যে চলে যাবেন তখন তাঁর স্ত্রী অনুমতি প্রার্থনা করলেন, যে তাঁকে যেন ভারতবর্ষে থেকে যেতে দেওয়া হয়।

তিনি বলেছিলেন, "এটা আমার দেশ। এখানেই আমি চিরবিশ্রাম লাভ করবো। বিদেশে যেয়ে আমার লাভ কি ?"

দারা শিকো অশ্রুপাত করেছিলেন, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য বুঝেছিলেন তিনি। তাঁর চিকিৎসক ও সৈন্যদের একটি দল তাঁর স্ত্রীর জন্যে রেখে তিনি এগিয়ে চললেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই নাদিরা বেগম সেই চিকিৎসক ও সেনাদের নির্দেশ

দিলেন চলে যেতে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে যেতে, কেননা তাঁর স্বামীর প্রয়োজনই বেশি।

এই বলে পুরনাইয়া তার কাহিনী শেষ করল।

"কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মারা গেলেন নাদিরা, বিদেশীদের মধ্যে না, বিদেশ বিভুঁয়েও না। তিনি দেশ ত্যাগ করেন নি।"

টিপু বলল, "কাহিনীটা আমি অন্যরকম শুনেছি। নাদিরা বেগম অসুস্থ ছিলেন, তাঁর স্বামীর পলায়নে তিনি বিলম্ব ঘটাতে চাননি। তিনি জানতেন তাঁর অসুস্থতার কথা বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলে তাঁর স্বামী এক-পা এগোবেন না। তাঁর দেশ ছাড়ার অস্বীকৃতি ছিল একটা অজুহাত মাত্র। শত্রুর হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য তাঁর পলায়নে দেরি হয়ে যেতে পারে বলে নাদিরা তাঁর অসুস্থতার কথা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন।"

বিনয়ের ও সম্ভ্রমের সঙ্গে পুরনাইয়া বলল, "রাকেয়া বানু ও আমি যে কাহিনীতে বিশ্বাস রেখেছি তার চেয়ে তোমার এই কাহিনী অনেকটাই নির্ভর-যোগ্য। কিন্তু শেষ কথাটি হচ্ছে যে, নাদিরা বেগম দেশ ত্যাগ করেননি।"

টিপুর মনে তখন রাকেয়ার কথা ভাসছে।

সে বলল, "আমি দেখছি অনেক কাহিনী দিয়ে রাকেয়া তোমাকে বেশ খুশি করে রেখেছে।"

"ঠিক। অনেক কাহিনী তার জানা। যশোবন্ত সিং রাঠোরের কথাও রাকেয়া বানু বলেছেন। যশবন্ত যোধপুরে পালিয়ে যায়। তার মর্যাদাবতী স্ত্রী প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে রাখে যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যশোবন্ত পালিয়ে আসতে না পারে।"

কোনো মন্তব্য করল না টিপু, এ কাহিনীর নীতিকথা কী, তা নিয়েও কিছু বলল না, কিন্তু একটু রূঢ়ভাবে উত্তর দিল, "দেখ পুরনাইয়া, রাকেয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে অনেক বছর হল, তার সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগ আমি খুব কম পেয়েছি, যার ফলে তার কাহিনী আমাকে শুনতে হচ্ছে অন্যের মুখ থেকে। এ সত্ত্বেও কর্তব্য সম্বন্ধে আমার কাছে তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ। তুমি কি মনে কর, রাকেয়া বানু অশ্বপৃষ্ঠে-বসা স্বামীকে গৃহবাসী স্বামীর চেয়ে বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ বলে মনে করে?"

"আমিও যেমন জানি তুমিও তা তেমনি জান, সুলতান," পুরনাইয়া বলল, "রাকেয়া বানু তার স্বামীর জন্যে গর্বিত, এবং যার জন্যে তার স্বামী কাজ করে চলেছে তার জন্যেও।"

কিছু সময় চুপচাপ কাটল, পুরনাইয়া লক্ষ করল টেবিলে আহার্য যেমনকার তেমনি পড়ে আছে।

পুরনাইয়া বলল, "আমি কি সেনাবাহিনীকে অগ্রসর হবার আদেশ দেব? যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেনাবাহিনী তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

টিপু বলল, "আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও। এর বেশি কিছু চাইনে।"

"কয়েকটা দিন!" পুরনাইয়া বিভ্রান্ত হল, "কিসের জন্যে?"

উত্তরে টিপু বলল, "আমার মনের মধ্যে যে ঝড় চলেছে তা শান্ত হবার জন্যে, আমার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জমাট বেঁধেছে, তার উত্তরগুলি পেতে চাই।"

পুরনাইয়া তাকে জানাল সময় বড় কম। হাইদর গত হয়েছেন। মৃত্যু সংবাদ কেউ যাতে জানতে না-পায় তার জন্যে সব রকম কৌশল নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা অচিরেই জানতে পারবে। পঙ্গপালের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মহীশূরের উপর। শেখ আয়াজের মত বিশ্বাসঘাতকরা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দিয়েছে, তারা ঘুষ দিয়ে ও চাপ দিয়ে হাইদর আলির অনেক বিশ্বাসী অনুচরকে হাত করেছে। দিনের পর দিন অনেক অস্বাস্থকর খবর আসছে দলত্যাগের ও বিশ্বাসঘাতকতার। শেখ আয়াজকে ধরে রাখতে হবে, কেননা তার কব্জায় আছে কেবলমাত্র একটা শক্ত দুর্গই নয়, তার হাতে আছে কোষাগারের একটা মোটা অংশও।

"আমার সাক্ষি হচ্ছেন ঈশ্বর।" বলল পুরনাইয়া, "এক মুহূর্ত তোমার নষ্ট করার উপায় নেই। এই ইঁদুরের সংখ্যাবৃদ্ধির আগেই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে।"

টিপু হাসল, "আমার মনের মত কারণ তুমি দেখিয়ে দিতে পেরেছ, তুমি জান? কিছুক্ষণ আগেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে, আমাদের দেশের মানুষের প্রতি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সচেতন। এখন বলছ শত্রুর বন্যা রোধ করতে না পারলে দেশের মানুষ আমার বিরুদ্ধে যাবে। আমার প্রতি তাদের কর্তব্যটা কী?"

পুরনাইয়া কিছু বলতে গেল, টিপু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমার বাবার প্রিয়পাত্র শেখ আয়াজ আমাকে প্রতারণা করেছে, আমার ছেলেবেলার সাথি রসুল আমাকে ছেড়ে গেছে, আমাদের জ্ঞাতি মহম্মদ আরামিন আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করি সেই সামসুদ্দিন বকসি শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে। তারা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল যে, আমার অসহায় ভাইকে আমার বিরুদ্ধে যাবার জন্যে উস্কানি দিতে আরম্ভ করে। তুমি

আমাকে একটা দীর্ঘ তালিকা দেখিয়েছ যাতে বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন অজস্র লোকের নাম আছে…"

পুরনাইয়া একটু বাধা দিতে যাওয়া মাত্র টিপু তাকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, "না। তাদের উপর আমার কোনো রাগ নেই। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। তারা যে দোষ করেছে এটা বুঝতে পারাই আমার পক্ষে ভালো হয়েছে। এবার আমার পথে আমি চলতে পারব। ও সবের জন্যে আমি আঘাত অবশ্যই পেয়েছি, একটু বিভ্রান্তও হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, আমি বেশ মুক্ত, দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতিও পেয়েছি। তাদের প্রতি স্নেহমমতার দরুন যে বাধা এতদিন ছিল তা আর রইল না। তাহলেই পুরনাইয়া, তাদের সঙ্গে আমার যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে আমি আর দায়ী রইলাম না।"

পুরনাইয়া শান্ত হয়েই তার কথা শুনছিল, কিন্তু এখন সে ক্রমশ রেগে যাচ্ছে। সে নিজেকে সংযত করল, রাগতঃ ভাবে নয়, একটু বেদনার সঙ্গেই সে বলল, "টিপু সুলতান, আমার পুত্রকে যতটা ভালোবাসা উচিত, তোমাকেও তেমনি ভালোবাসি। যদি ক্ষণকালের জন্যেও তোমাকে রাজা বলে ভুলে গিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি মুখে-এক-কাজে-এক ধরনের মানুষ নও, সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণও তুমি কর না, কিন্তু আমি একথা তোমাকে বলছি কেননা তুমি নিজেকেই যেন প্রতারিত করছ এবং দেশের মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অপমান করছ—মাত্র কয়েকজন প্রতারক হন্তারক ও বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে তাদের একাকার করে যখন ফেলছ, যারা তোমার ও তোমার বাবার প্রতি ঐ ধরনের হীন আচরণ করেছে। দেশের মানুষের মর্যাদার একটা ঐতিহ্যকে কোন্ অধিকারে তুমি লক্ষ না করে মাত্র কয়েকজন প্রতারকের কার্যকলাপ দিয়ে সকলের বিচার করবে? কোন অধিকারে তুমি আমাদের দেশের মানুষের ঈশ্বর-প্রদত্ত মানবিকতাকে অসম্মান করবে, তাদের মধ্যের মাত্র কয়েকজন জনা-কয়েক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল ব'লে? একজন বা ততোধিক মীরজাফরের জন্যে দেশের সমস্ত মানুষকে কি তুমি দোষী করবে? উত্তর দাও। আমার যেন বুঝতে ভুল না হয় যে, একটা ভুলই তোমাকে পথভ্রষ্ট করছে. অথবা তুমি পলায়নের একটা অছিলা চাও।"

"পলায়ন? আমি যদি ধর্মের পথে যাই, সেটা কি পলায়ন?" টিপু বলল।

'তোমারই একটা যুক্তি তোমাকে মনে করে দেবার অনুমতি দাও।"

পুরনাইয়া বলল, "ধর্মের মূলে হচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠা প্রেম ও আত্মোৎসর্গ। এ পথ ছেড়ে যাবে কী করে?"

"আমার কর্তব্যটা কী?"

"পর-পর তবে বলি। পুনরায় বলি, সুলতান, তোমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করা, তাদের যা প্রাপ্য তাদের তার স্বাদ দেওয়া।"

টিপু তাকে বাধা দিল। "পুরনাইয়া, তুমি কি জান না প্রতিহিংসা থেকেই প্রতিহিংসা বাড়ে, ঘৃণা থেকে ঘৃণা, রক্ত থেকে রক্ত। প্রতিহিংসা থেকে কী লাভ হয়? আমি জানি, যাদের সংগেসংগে আমি বেড়ে উঠেছি তাদের প্রতি প্রতিহিংসা আমারই হৃদয় দগ্ধ করবে আগুনের মত।"

পুরনাইয়ার বিষণ্ন মুখের দিকে চেয়ে টিপু বলতে লাগল, "বুঝতে পারছি, তুমি হতাশ হয়ে পড়ছ। তুমি বুঝতেই পারছ সর্বেসর্বা হবার যোগ্যতা আমার নেই। তুমি একবার বলেছিলে রাজাদের হতে হবে নিষ্ঠুর। কিন্তু যারা আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে তাদের দৃষ্টিকোণটা দেখার চেষ্টা আরম্ভ করেছি। আমি যে উচ্চবংশে জন্মেছি, তাতে ষড়যন্ত্র করা আমার কাজ নয়, যে ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মেছি তাতে চুরি করার স্পৃহাও আমার হবার কথা নয়। কিন্তু শেখ আয়াজ ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কি এটা সম্ভব? যে দীনহীন অবস্থা থেকে সে উঠে এসেছিল, সেই দীনতা এখনো তার মর্মে লেগে আছে বলে আমি তাকে করুণা করি। কিন্তু তাকে ঘৃণা করিনে।"

টিপু চেয়ার থেকে উঠল, পুরনাইয়াও উঠে দাঁড়াল। পুরনাইয়ার পিঠের উপর হাত রাখল টিপু।

পুনরায় সে বলল, "আমি জানি, আমি তোমাকে হতাশ করেছি। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমার মন যন্ত্রণায় কাতর। নদীর বিস্তার দেখার জন্যে তার দিকে চাইতে আমি সময় চাই। মেঘের সৌন্দর্য দেখতেও সময় দরকার।"

"ইতিমধ্যে শত্রুরা প্রস্তুত হয়ে নেবে।" গম্ভীরভাবে বলল পুরনাইয়া।

"যা হবার তা হবে।" টিপু বলল, "সময় আমার দরকার। সর্বপ্রথম আমি যাব কোলারে—পিতার মৃতদেহ সেখানে শায়িত। সাতদিন বা দশ দিন সময় দাও। এর মধ্যে হৃদয় শান্ত ক'রে কোন্ পথে আমি যাব তা স্থির করে ফেলব।"

"তোমার পথ ঠিক হয়েই আছে, টিপু সুলতান।"

"তা ঠিক। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমার, পূরনাইয়া।"

"বিপন্ন একটি জাতির কাজে তুমি নিযুক্ত। তুমি তা ছেড়ে যাবে ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়।"

টিপু আবার বলল, "সময় চাই।"

পূরনাইয়ার আরও অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু আর তর্ক অবান্তর। টিপু তার মন স্থির করার জন্যে সময় চায়। সে আলোচনা করতে আরম্ভ করল টিপুর আসন্ন কাজ কী-কী। প্রথমেই তাকে যেতে হবে তার পিতার মৃতদেহের কাছে। সেখানে গোবর্ধন পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হতে পারে, পূরনাইয়া বলল। দিন-কয়েক আগে তাঁর সংগে পূরনাইয়ার দেখা হয়েছে। কয়েক বছর দেখা হয়নি, গোবর্ধন পণ্ডিত তখন দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকেই পূরনাইয়া হাইদরের মৃত্যুসংবাদ গোপনে জানায়। গোবর্ধন পণ্ডিত হাইদরের দেহ যেখানে আছে সেখানে যেতে চান। এ কথা জেনে টিপু আনন্দলাভ করে।

২৮ ডিসেম্বরে পূরনাইয়ার সংগে টিপুর দেখা হবে, এ কথা জানিয়ে সে বলে, "কোন্ পথে যাব ঐ সময়ে তা জেনে নেব।"

উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করল। পূরনাইয়ার চোখে জল দেখে অভিভূত হল টিপু।

টিপু বলতে আরম্ভ করল, "আমার প্রতি যদি তোমার ভালোবাসা থাকে—"

"এটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে।"

টিপু বলল, "আমি জানি। ঐ ভালোবাসার জন্যেই আমি তোমাকে সহায় রূপে চাই। আজ যা বলেছ তা বৃথায় যায়নি। যা বলেছ তা মনে রাখব। আশা করি ঐ কথাগুলিই আমাকে পথ বলে দেবে। আমি যা বলেছি তার কোন মূল্য নেই। আমি নানা কণ্ঠস্বর অবিরত শুনতে পাই। ঐ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আমাকে এদিকে-ওদিকে টানে।"

পূরনাইয়া তাকে বুকে চেপে ধরল। তার পর তাকে দেখল কোলারের উদ্দেশে যাত্রা করতে—যেখানে হাইদরের মৃতদেহ সাময়িকভাবে রাখা আছে। পূরনাইয়া গেল অন্যদিকে। যেখানে সেনা-অধিনায়করা অযথাই অপেক্ষা করছে টিপুর জন্যে। হাইদর বেঁচে আছেন এই কথা, এবং সব রকম ষড়যন্ত্র ও দলত্যাগ বন্ধ করার জন্য কী কী করা হয়েছে সেই কথা রাষ্ট্র করার কাজে ব্যাপৃত রইল সে। টিপুর মনে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে সে কথা পূরনাইয়া তার বিশ্বস্ততম ব্যক্তির কাছেও ব্যক্ত করছে না ইতিমধ্যে।

# ৩৪. স্বপ্নকে মরতে দিয়ো না

তার দ্বাদশ জন্মদিনের পর গোবর্ধন পণ্ডিতের সঙ্গে টিপু সুলতানের দেখা হয়নি। সেই দিন হাইদর আলি দুই ধর্মশিক্ষক মৌলভি ওবেদুল্লা ও গোবর্ধন পণ্ডিতের কাছে টিপুর শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে দেন। তাদের ছাড়াছাড়ি হয় সেই দিন।

টিপু দেখল গোবর্ধন পণ্ডিত তার বাবার কবরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। প্রার্থনারত তাঁর দুই চোখ বোজা। টিপু কবরের উপর কপাল রাখল, চুমো গেলো, তারপর গোবর্ধন পণ্ডিতের পাশে বসল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে গোবর্ধন পণ্ডিত টিপুর দিকে হাত বাড়ালেন তাকে স্পর্শ করার জন্যে। সেই মুহূর্তে টিপুর মনে হল তার বুকের বোঝা অনেক নেমে গেছে। একটানা যে অসহ্য যন্ত্রণা সে ভোগ করে এসেছে তা বুঝি দূর হয়ে গেল। দুর্গের প্রাচীরে কামান দাগা, অস্ত্রের ঝনঝনা, অত্যাচারিত নারীদের করুণ ক্রন্দন, আহতদের আর্তনাদ, মৃতপ্রায়দের হাহাকার আর যেন তার কর্ণ বিদারণ করছে না।

সন্ধ্যার দিকে দুজনের কথাবার্তা আরম্ভ হল। তাদের মিলন এমন ভাবে হল যেন বিচ্ছেদ কখনো হয়নি। নূতন এই মিলনের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা চেষ্টা দ্বিধা কিছুই হল না। টিপু সুলতানের চমৎকার জীবনটির ঘটনা গোবর্ধন পণ্ডিত যদি খুঁটিনাটি জানতেন তাহলেও তিনি বিস্মিত হতেন না। এ তো সবার জানা ব্যাপার। আশ্চর্য এই যে, গোবর্ধন পণ্ডিত টিপুর মনের চিন্তা ও যন্ত্রণার বিষয় সব বুঝে ফেলেছেন।

দেয়ালের কুলঙ্গিতে যেআগুন জ্বলছে সেই উত্তাপের মধ্যে দুজনের কথাবার্তা আরম্ভ হল। তাদের অজান্তেই নিভে গেল আগুন। সকাল হয়ে এল। উভয়ের কথোপকথন চলেছেই।

গোবর্ধন পণ্ডিতকে টিপু তার অসহ্য বেদনার কথা জানাল। সে কথা হচ্ছে সন্দেহে অবিশ্বাসে নিঃসঙ্গতায় ও বিপদে নির্যাতিত একটা মানুষের কথা। যে কিনা বাস্তব সত্যের ও স্বর্গীয় সুষমার জন্যে লালায়িত ছিল, বাধ্য হতে হচ্ছে তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে, রক্তপাত করতে, মানুষ হত্যা করতে, আঘাত দিতে

আঘাতের মোকাবিলা করতে। যে মানুষ স্বর্গীয় নীতি মেনে চলতে ও আত্মিক সুখ ভোগ করতে চেয়েছিল, এমন একজন মানুষের মর্মভেদী যন্ত্রণা এই যে সে বাধ্য হচ্ছে হিংসার পথে যেতে ও যুদ্ধে লিপ্ত হতে। শান্তিসন্ধানী সে ছিল, কিন্তু সে নিক্ষিপ্ত হল এক ভয়ংকর সংকটের মধ্যে। মানুষের স্নেহভালোবাসার জন্যে যে ছিল আগ্রহী তাকে পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হচ্ছে এক আগন্তুকের মত—এক রাজকীয় একাকীত্ব নিয়ে। সে বিশ্বাসী ছিল করুণায় ধর্মে ও সমবেদনায়, অথচ হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে তারই আদেশে, সে হৃদয়বেদনা অনুভব করেছে? এই রক্তস্নানে কার উপকার হয়? সে তা জানে না। সে কেবল জানে যে, তার হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন, সে কী করবে তা সে স্থির করতে পারছে না, এবং তার যাবতীয় চেতনা কুয়াশাচ্ছন্ন।

তার মনের অবস্থা থেকে তার ত্রাণ নেই, অস্থিরতায় সে অনড় হয়ে গিয়েছে। টিপুর কণ্ঠস্বর শান্ত। মেপে মেপে সে কথা বলছে। তবু গোবর্ধন পণ্ডিত তার মনের বিপুল যন্ত্রণা বুঝতে পারছেন।

"আমাকে বলো, টিপু সুলতান," গোবর্ধন পণ্ডিত শান্ত গলায় অথচ একটু চাপ দিয়েই প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী চাও তা কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছ? তুমি কি আত্মিক নিয়তির দিকে যেতে চাও নির্বাণের মধ্য দিয়ে, পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে যে দুঃখ অশ্রু ও রক্ত তার সঙ্গে কোন যোগ না রেখেই?"

"হ্যাঁ, সেই কথাই আমার বিবেক বলছে, কিন্তু আরও একটা বিবেকবাণী শুনি, সে বলে—ও কথা বৃথা, তাকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে, ও কথা আর শোনা চলবে না।"

"তোমার মনের এই বিদ্রোহী অংশ তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারবে?" এর উত্তর গোবর্ধন পণ্ডিতের জানা ছিল তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"উঠে দাঁড়াতে হবে, যে বিদেশী শত্রু আমাদের জাতিকে বেইজ্জৎ করছে, অসম্মান করছে তার সঙ্গে লড়তে হবে।" টিপু গোবর্ধন পণ্ডিতকে বলতে লাগল ইংরেজদের কৃত হত্যা বর্বরতা অনাচার লুণ্ঠন ইত্যাদির কথা, তাদের প্রতারণা, তাদের লোভ ও তাদের ভূমিগ্রাসের কথা, ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ, তাদের অশালীনতা ও তাদের অসম্মানজনক কাজের কথা। এ কাহিনী হচ্ছে মৃত্যু ও ধ্বংসের, বেপরোয়া নিষ্ঠুরতার, মানুষের গৃহত্যাগের, শস্যহানির ও গবাদি পশুর অনাহারের।

এসবই গোবর্ধন পণ্ডিতের জানা, তবুও তিনি টিপুকে বলতে দিলেন। তিনি জানতেন টিপু নিজেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাবে। অন্য-কেউ তার এই সংশয়ের

ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারবে না। গোবর্ধন পণ্ডিত তাকে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু তা বেশি নয়। কেননা তিনি জানেন যে, প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্যের বিধাতা নিজেই, নিজের, চেষ্টাতেই সে নিজের মুক্তি আনতে পারে, নিজে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে।

সান্ধ্যপ্রার্থনার পর আবার আলোচনা আরম্ভ হল। অনেক বিষয় ও অনেক মানুষ নিয়ে কথা হল—যে দ্বিধা সংশয় ও হতাশার মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হবে। দিনরাত্রি মানুষের মনের মধ্যে ভালোর সঙ্গে মন্দের যে যুদ্ধ চলেছে, তার শেষ সিদ্ধান্ত নেবে মানুষই স্বয়ং। নিজে জীবনের উদ্দেশ্য বোঝা পর্যন্ত চলতে থাকবে এই মানসিক সংগ্রাম। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? আত্মার পরিণতি অথবা আধ্যাত্মিক ভাগ্য? এই ভাগ্য লাভ করতে হলে উৎসব করে পূজা করা, প্রার্থনা উচ্চারণ ক'রে যাওয়া, ব্যক্তিগত নীতিজ্ঞান, আন্তরিক ভক্তি, অথবা ঈশ্বরে মতি—কোনটা দরকার? ঈশ্বরে ভক্তি রাখতে গেলে কি পৃথিবীতে মানুষের যা করণীয় কর্তব্য তা ছেড়ে দিতে হবে? যারা কেবলমাত্র ভক্তিভরে ঈশ্বরের নাম করে, কিন্তু পার্থিব কর্তব্যসাধন করে না, তারা কি ঠিক কাজ করে? ঈশ্বর স্বয়ং কি মহত্ত্বকে রক্ষা করার জন্যই নিজরূপ গ্রহণ করেননি? মানুষ কি ঈশ্বরের পন্থা থেকে অন্য পন্থা নেবে? পৃথিবীর সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, বা সে সম্বন্ধে উদাসীন থেকে মানুষ করবে কী? স্বয়ং ঈশ্বরই যখন নিজ কর্তব্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। তাহলেই মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবশ্যই পৃথিবীতে বসবাস করে তাকে রক্ষা করা। জীবন হচ্ছে কর্মের, কেবল ঈশ্বরে মতি রেখে নিজের নির্বাণই মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না।

আরও দুই দিন গোবর্ধন পণ্ডিত ও টিপু সুলতান একত্র কাটান। তাঁদের আলোচনা চলতে থাকে। বেশি সময়ে কথা বলে টিপুই। কখনো কোনো ব্যাপার পরিষ্কার করে নেবার জন্যে গোবর্ধন পণ্ডিত মাঝেমাঝে কথা বলেন অবশ্য। টিপুর উপর কোনো আধিপত্য বিস্তার করে তার উপর কোনো প্রভাব খাটাতে তিনি চান না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন।

টিপু তার হৃদয় খুলে দিয়েছে। এ'তেই দূর হয়েছে অনেক সংশয়। আর যেন তার মন বিষাদে আচ্ছন্ন নেই। এক বিক্ষুব্ধ মনে শান্তি ফিরে আসছে। তার মন এখন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে প্রস্তুত।

"কোনো মানুষের হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক না," সে বলল, "আদর্শের জন্য, সুবিচার ও সত্যের জন্য, তার দেশের মানুষের সুখশান্তির জন্য, তাকে সোজা হয়ে

দাঁড়াতে হবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সম্মুখীন হতে হবে যন্ত্রণার ও মৃত্যুর।"

যে ভয়াবহ প্রশ্ন তার মনে এসেছিল 'কেন আমি যুদ্ধ করব,' এবং যা নাকি তার আত্মিক আকাঙ্ক্ষা বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, এখন সে-প্রশ্ন তার মনে আর নেই। সেই প্রশ্নের একটা সরল উত্তরও ছিল তার তৈরি : আমি যুদ্ধ করব, কেননা এ দেশ আমার, এ আমার জন্মভূমি, মান-সম্ভ্রমের দিক থেকে, কর্তব্যের দিক থেকে এই দেশ রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

অনেক মানুষের কথা শোনা যায় যারা পৃথিবীর প্রতি উদাসীন থেকেছে নিজেদের আত্মার মুক্তির জন্য। তারা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখাতে গিয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কথাই ভুলে গিয়েছে। তার বদলে তারা যদি তাদের শক্তি সাহস ও উদ্যম নিয়ে পৃথিবীর হয়ে লড়ত তাহলে এ'কে রক্ষা করার জন্যে কিছু করতে পারত।

অন্য খাতে গিয়ে অন্য প্রশ্ন নিয়ে চলল সেই আলোচনা। জয় যখন অনিশ্চিত তখন কি যুদ্ধ করা উচিত? ইংরেজরা যে রকম শক্তিশালী সৈন্যদল জমায়েত করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে জয় কি সম্ভব? পরাজয় ও মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন কি যুদ্ধ বর্জন করা উচিত নয়?

গোবর্ধন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মনে কর সম্মানের সঙ্গে যে মৃত্যু বরণ করে, সে মৃত্যু বৃথায় যায়?"

টিপু সময় নিল উত্তর দিতে, তার চিন্তা একত্র করার জন্য অবশ্য নয়। তার মন ভবিষ্যতের দিকে চলে গিয়েছিল, তার নিজের জীবনের সময় ও সীমা পার হয়েই কেবল নয়, তার জীবনের দিগন্ত পার হয়েও।

"না।" উত্তর দিল টিপু, "এমন মৃত্যু বৃথায় যায় না। কোনো ব্যক্তি, কোনো সময়ে, কোনো খানে সেই পরিত্যক্ত মশাল তুলে নেবে, কেননা, একবার জ্বালা হলে তা কখনো নিভে যায় না।"

এখন সে শান্তি পেয়েছে। মনস্থির করেছে সে। সে যুদ্ধ করবে। জাতিকে রক্ষা করতে হবে। এর মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

টিপু সুলতান ও গোবর্ধন পণ্ডিত পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। উভয়েরই কেন-যেন মনে হ'ল আর তাঁদের দেখা হচ্ছে না। আলিঙ্গন করলেন উভয়ে উভয়কে।

"তোমার স্বপ্ন যেন মরে না যায়, টিপু।" বিদায়ের সময়ে চাপা গলায় বললেন গোবর্ধন পণ্ডিত।

# খণ্ড ৫

---

## উত্তরাধিকার

## ৩৫. রাজমুকুট

১৭৮৩ সালের ২ জানুয়ারি তারিখে টিপু সুলতান চিতুরে পেঁছিল—তার সেনাবাহিনী এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

তার পিতার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে সাধুরাম চারদিনে ১৭৮২র ৭ ডিসেম্বর তার কাছে পেঁছয়। অনেকেই অবাক হয়েছে সেই একই দূরত্ব অতিক্রম করতে টিপুর ২৬ দিন লাগল কী করে। অল্প লোকেই জানত যে তার বাবার শেষকৃত্য করতে কোলারে তাকে থাকতে হয়েছিল, কিন্তু এই কাজেই এতটা সময় লাগেনি, গোবর্ধন পন্ডিতের সঙ্গে তার একটানা দীর্ঘ আলোচনাতে এই সময় লেগে যায়।

শিবির থেকে দশ মাইল দূরে পূরনাইয়া তার সঙ্গে মিলিত হয়। মূল সেনাবাহিনীর থেকে দু মাইল দূরে টিপু সুলতানের জন্যে তাঁবু গাড়া হয়। সূর্যাস্তের পরে সে তাঁবুতে ঢুকল। তাকে জাঁকজমক করে অভ্যার্থনা করা হোক, টিপু তা চায়নি। একটা সাধারণ গালিচার উপর ব'সে সে তার প্রধান অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাদের শোকের কথা শোনে। পরে, রাত্রিকালে তার সিনিয়র অফিসার ও সেনাধ্যক্ষদের সামনে সে তার পিতার সিংহাসনে বসে, হিন্দু পুরোহিত ও মুসলমান মৌলাভিগণ তখন প্রার্থনা ধ্বনি করতে থাকেন। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও মৌলাভি হাফিজ রহমান গঙ্গার পবিত্র জলপূর্ণ পাত্রে হাত ডুবান, এবং উভয়ে একসঙ্গে কাছেরই একটা টেবিল থেকে রাজমুকুট তুলে আনেন। ধীরে ধীরে তাঁরা সিংহাসনের কাছে যান এবং টিপুর মাথায় পরিয়ে দেন সেই মুকুট।

টিপুর ঠোঁট তখন কাঁপতে দেখা গেল। সেই মুহূর্তটা স্তব্ধ হয়ে রইল চার ধার, সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝল যে, টিপু প্রার্থনা করছে। তার পাশেই ছিল পূরনাইয়া, সে শুনতে পেল :

"আজ আমি রাজমুকুট ধারণ করলাম, এর যাবতীয় দুঃখের সঙ্গে আমি আমাকে আবদ্ধ করলাম।" টিপু বলেছিল এই কথা।

## ৩৬. যিশুকে তারা কি দগ্ধ করে ?

ইতিমধ্যে হাইদর আলির মৃত্যুর খবর ফাঁস হয়ে যায়। ইংরেজরা এ সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাদের প্রধান শত্রু মৃত। তারা ভাবল এবার তারা তাঁর পুত্রের উপর ভীষণ আঘাত হানবে, অনেকগুলি যুদ্ধে যে নাকি তাদের অপদস্ত করেছে। হাইদরের অসুস্থার সময়েই এই মৃত্যুর সম্ভাবনায় তারা রাজদ্রোহিতার বীজ বপন করেছে। শেখ আয়াজ তাদের বেতনভুক ছিল, হাইদরের অনেক সহকারীও ছিল তেমনি বেতনভুক। টিপুকে শেষ করে ফেলতে পারলে এদেশে প্রতিরোধের সব বাধা দূর হয়ে যাবে। তখন ইংরেজ এমন বিপুল শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য আলপিনের মত খশে পড়বে।

১৭৮২ সালের ক্রিসমাসে হাইদরের মৃত্যুসংবাদ ফাঁস হয়, এই দিনটি সুতরাং তাদের কাছে একটা আনন্দ-উৎসবের দিন। সমস্ত গির্জার ঘণ্টা বেজে ওঠে, মহীশূর রাজ্য এবং এর সুলতান যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। সারা দেশের মধ্যে যেখানেই ইংরেজদের আধিপত্য সেখানেই মন্দির ও মসজিদ অপবিত্র করে দেওয়া হয়। শূকর, বানর ও গোরু একত্র বেঁধে মসজিদে ঢোকানো হয়। মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে ফেলা হয়, তাতে নোংরা ছিটানো হয়। যেন মস্ত খেলা—এইভাবে মায়ের বুক থেকে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হয় শিশু, বলের মত তাদের নিয়ে লোফা-লুফি করা হয়। অনেকের মাথা ভেঙে দেওয়া হয়, কেউ বোকামি করে প্রতিবাদ করতে গেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাদের পেটানো হয়, কিন্তু গণহত্যা অবশ্য করা হয় না, কেবল আনন্দের আতিশয্যে কারো নাকে ঘুষি মারা হয়, স্তন ধরে টানা হয়, দাড়ি উপড়ানো হয়। বোরখা ছিঁড়ে ফেলা হয়, এবং মেয়েদের জোর করে বিবস্ত্র করা হয়, উলংগ হয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের দখলকার সেনাবাহিনী এইভাবে ১৭৮২ সালের ক্রিসমাস উৎসব পালন করে, এবং এই দিবসের শান্তির বাণী ও বিশ্বের শুভ চিন্তা প্রচার করে এইভাবে। রাত্রিবেলা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম-পুস্তকের এক অগ্ন্যুৎসব করে। কুশপুত্তলিকা দাহ করে। বলা হয়, ওটা টিপু সুলতানের। কেউ কেউ বলে ওটা হিন্দুর দেবতার প্রতীক। না, এটা নাকি ইসলামের প্রবর্তকের—

অনেকে দাবি করে। অনেকে অগ্নির চারদিকে নেচে-নেচে উল্লাস করে, এমন কেউ ছিল না যার হাতে মদের পাত্র নেই। কুশপুত্তলিকা যখন অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন আনন্দের উল্লাসধ্বনি ওঠে।

একজন ইংরেজ তাঁর ছেলেকে নিয়ে অল্পদিনের জন্যে ভারতদর্শনে এসেছিলেন। তিনি বিষণ্ন ভাবে এই অগ্ন্যুৎসব দেখলেন। তাঁর ছেলে যখন জানতে চাইল ঐ কুশপুত্তলিকাটি কার, ইংরেজরা যেটা পোড়াচ্ছে, তিনি বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, বৎস, ওরা বুঝি যিশু খ্রীষ্টকে পুড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।"

## ৩৭. অনন্তপুরের হত্যালীলা

সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ বেশ স্বচ্ছন্দেই হল। অভ্যন্তরীণ অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল না। মহীশূরের সৈন্যবাহিনী, কিষাণ-মজদুর প্রভৃতির মনে সুলতানের এই রাজ্যাভিষেক পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হল।

মীর সাদিক ও বরহান-উদ-দিন বিশ্বাসঘাতকদের ও দলত্যাগীদের যে তালিকা তৈরি করে দিয়েছিল, সুলতান তা ছিঁড়ে ফেলল এবং প্রত্যেককে মার্জনা করে এক আদেশ জারি করল।

"আমি ইংরেজের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত, আমার দেশের লোকের সঙ্গে নয়।" সে বলল এই কথা।

মীর সাদিক ও কয়েকজন মন্ত্রী এ'তে আপত্তি জানায়। তারা বলে, এতটা অনুকম্পা দেখালে ভবিষ্যতে বিশ্বাসঘাতকতা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু টিপু অটল রইল।

শেখ আয়াজকে সে লিখল :

"তুমি তোমার সম্মানচিহ্নে ধিক্কার এনো না, আমার বাবা যে মর্যাদা তোমাকে দিয়েছেন তা ক্ষুণ্ণ কোরো না...নিকট অতীতের দুঃখময় অধ্যায় আমি ভুলে গিয়েছি, আমার বাবা তোমাকে যেভাবে আলিঙ্গনে বেঁধেছিলেন, আমিও সেইরকম রেখেছি।"

পত্রবাহক ফিরে আসেনি।

ইংরেজরা যুদ্ধের জন্যে মরীয়া হয়ে তৈরি হচ্ছে। তাদের ইচ্ছে টিপুকে তৈরি হবার জন্যে সময় দেওয়া হবে না। ইংরেজদের প্রধান সেনাপতির মতে, টিপুর পরাজয় তাদের কাছে একটা সুযোগ, কেবলমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষ নয় পূর্বাঞ্চলের যাবতীয় রাজ্য 'তাদের মাতৃভূমির চিরস্থায়ী কবলে আনতে' এ সুযোগ সাহায্য করবে।

মাদ্রাজের ইংরেজ বাহিনীর প্রধান জেনারেল জেমস্ স্টুয়ার্ট টিপুকে আক্রমণ করার জন্যে বাব্দিবাসের দিকে যাত্রা করল।

"সাহসে নির্ভর করে তাকে মাঝপথে ধরতে চাই।" টিপু বলল, এবং জেনারেল স্টুয়ার্টের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে সে যাত্রা করল। এখানকার যুদ্ধ

শেষ হল ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ তারিখে, মহীশূরের তাড়া খেয়ে ইংরেজ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল।

বম্বাইয়ের ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল ম্যাথুজ বেদনুরের দিকে গেল—সেখানে শেখ আয়াজ সেনাদলের অধিপতি, ইংরেজের সংগে তার পত্রালাপ চলছিল এবং তাদের সংগে একটা গোপন বোঝাপড়া তার হয়। একজন ইংরেজ যুদ্ধবন্দীকে—ক্যাপটেন ডোনাল্ড ক্যাম্বেল—আয়াজ ইংরেজের কাছে প্রস্তাব-সহ পাঠায়। আয়াজ ইংরেজদের তাঁবে কেবলমাত্র শহরটা নয় সমগ্র বেদনুর দুর্গই দিতে চায়, তার প্রতিদানে তাকে যেন রাখা হয় গবর্নরের পদে ও কোষাগারের অধিকার দিয়ে। ইংরেজরা শহর দখল করল, এবং শেখ আয়াজের আদেশক্রমে—যে আদেশ টিপু সুলতানের নামে জারি করা হয়—ঐ প্রদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল আত্মসমর্পণ করল।

এর ব্যতিক্রম রইল অনন্তপুর। এখানকার সেনাধ্যক্ষ—নারায়ণ রাও—শেখ আয়াজের কাছ থেকে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে চিঠি পেল, কিন্তু এ চিঠিকে সে জাল ব'লে বা বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে সন্দেহ করল। সে তখন আয়াজকে চিঠি দিল তার আদেশ ঠিক কিনা জানার জন্যে, টিপু সুলতানকেও পত্র দিল এ কথা জানতে চেয়ে যে, ঐ আদেশে তাঁর সম্মতি আছে কিনা। বেদনুরের বিপদের কথা আগেই জানতে পেরে টিপু সুলতান সেখানে তা রক্ষার জন্যে লুৎফ আলি বেগকে পাঠায়। নারায়ণ রাওয়ের দূত লুৎফ আলির বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ অনন্তপুরের দিকে যাত্রা করে এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানাতে। ঠিক সেই সময়েই আয়াজের কাছে প্রেরিত দূত ফিরে আসে, এবং তার আদেশ ঠিক আছে তা জানিয়ে নারায়ণ রাওকে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। ইংরেজ বাহিনী তখন অনন্তপুর দুর্গের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। শান্তির পতাকা উড্ডীন করে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করার জন্যে দূত পাঠায়। নারায়ণ রাও তা করতে অস্বীকার করে। সে জানত তার মৃত্যু অনিবার্য। তার সেনাদলে ৫০০ লোক। ইংরেজরা দুর্গটি ঘেরাও করল। একটা গুলি নিক্ষেপ না করেই যারা সারা বেদনুর পেয়ে গিয়েছে, তারা ছোট এই দুর্গের সামান্য এই সেনাদের অস্বীকারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। জেনারেল ম্যাথুজ অনেক সৈন্যসামন্ত এনে জড়ো করল, এবং ১৭৮৩র ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংরেজরা দুর্গ-অধিকারে সক্ষম হল। ৫০০ সেনার মধ্যে ৪৪০ জন প্রাণ হারায়। বুকে আঘাত পেয়ে আহত নারায়ণ রাও পড়ে রইল, নড়া-

চড়ায় সে অক্ষম। তাকে ফাঁসি দেবার জন্যে দুর্গপ্রাচীরের কাছে নিয়ে গেল। যাতে সে ফাঁসি থেকে রক্ষা পেল তা হচ্ছে ইংরেজদের অধ্যক্ষের মুখে থুতু দেবার মত তার শক্তি ছিল অবশিষ্ট। তখনই তাকে বেয়োনেট-বিদ্ধ করে হত্যা করা হল। আদেশ দেওয়া হল, জীবিত প্রত্যেকের রক্তপাত করা হোক। দুর্গ থেকে ইংরেজরা গেল অসামরিক সব ব্যক্তিকে হত্যা করতে। বেপরোয়া ভাবে অমানুষের মত নিষ্ঠুরতার সংগে তাদের মেরে ফেলা হল। মৃতদেহ পড়ে রইল এখানে-ওখানে, কিছু কিছু ছুড়ে ফেলা হল পুকুরে। পরে প্রকাশিত ইংরেজদের নথি থেকে জানা যায় ঐ মৃতদের মধ্যে ছিল—

চার শো সুন্দরী মহিলা, বেয়নেটের আঘাতে সবার শরীর দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে, কেউ মারা গেছে, পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ কেউ-কেউ মৃতপ্রায়। সে সময়ে সাধারণ সেপাইরা তাদের অফিসারের আদেশ অমান্য করে মহিলাদের গা থেকে রত্নালংকার খুলে নিচ্ছে, তাদের দেহের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। অনেক মেয়ে তাদের আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় মনে করে বড় দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে যায়।

অনন্তপুরের অপরাধটা কী? সমগ্র বেদনুর প্রদেশ আয়াজের আদেশে যখন আত্মসমর্পণ করেছে তখন একা এর দুর্গ তা করতে অস্বীকার করে।

এখানে জেনারেল ম্যাথুজকে এর অধিকার নিয়ে বেশিদিন টিকতে দেয়নি টিপু সুলতান। কিন্তু ইতিমধ্যে বেদনুরকে কী অত্যাচার অনাচার ধ্বংসলীলা ইত্যাদির মধ্যে কাটাতে হয়েছে ইংরেজের হাতে! এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে স্বয়ং টিপু এসে আসরে হাজির। হাইদরগড় ও কাভেলাদুরগা অধিকার ক'রে নিয়ে টিপু তার সেনাদের পাঠাল বিভিন্ন ঘাটে, সমুদ্রের সংগে ইংরেজদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যে। জেনারেল ম্যাথুজের অধীনস্থ ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হবার জন্যে টিপু বেদনুরের দিকে যাত্রা করল। ব্যক্তিগত ভাবে সে আক্রমণ করলে তার বাহিনী দিয়ে শহরের উপর। তারপর শহর অধিকার করে দুর্গ ঘেরাও করল—দুর্গের মধ্যে জেনারেল ম্যাথুজ তখন বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছে, অনেক সেনাক্ষয় হয়েছে তার। তেরোটি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে আক্রমণ করা হল দুর্গ। জেনারেল ম্যাথুজ আঠারো দিন ধরে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে। তার অনেক সৈন্য মারা যায়। দুর্গের মধ্যের অনেক আশ্রয়স্থল টিপুর গোলন্দাজরা নষ্ট করে ফেলে। ইংরেজরা তখন অসহায় ও বিপন্ন। ম্যাথুজ আত্মসমর্পণ করল।

বেদনুরের উপকণ্ঠে টিপু পৌঁছবার আগেই শেখ আয়াজ বোম্বাইতে

পালিয়েছে। বেদনুরের লাট হয়ে থাকার তার স্বপ্ন তখন চুরমার। সে একেবারে নিঃস্ব ও অসহায়। জেনারেল ম্যাথুজ তার সব ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, এমন কি তার ব্যক্তিগত অর্থও। যা সে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, তাও নিয়ে নিয়েছে। মাত্র এক শো'টি প্যাগোডা দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। জেনারেল ম্যাথুজ বলে, 'যথেষ্ট। সাধারণত, বিশ্বাসঘাতকদের আমরা গুলি করে মারি। তুমি তোমার সুলতানের বিশ্বাসের ঘাতকতা করেছ। যাই হোক, আজ সকালে আমি একটু সদয় আছি। এই এক শো প্যাগোডা নিয়ে বিদায় হও।"

২৮ এপ্রিল ১৭৮৩ তারিখে টিপু যখন দুর্গে ঢুকল, সে দেখল ধনাগার শূন্য। ম্যাথুজ নিয়ে গেছে প্রচুর অর্থ। বাকিটা ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যরা নিজেদের সংগে গোপনে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে। তাদের তল্লাস করা হল। তাদের সব ব্যাগই সোনার পাত দিয়ে ঘেরা। রুটির মধ্যে লুকানো সোনা, যখন তাল্লাস চলছিল তখন ইংরেজরা কুকুর ও মুরগি দিয়ে সেই সোনা গেলায়। তা সত্ত্বেও যা উদ্ধার করা সম্ভব হয় তা হল প্রায় ৫০,০০০ প্যাগোডা. বেদনুর দুর্গে প্রচুর অর্থ থাকত, এই অঙ্ক হচ্ছে তার মাত্র একটি ভগ্নাংশ।

সামান্য কিছুকালের অধিকারের সময়ে ইংরেজরা এই দেশবাসীর প্রতি কী দুর্বহ ব্যবহার করেছে টিপু তা প্রত্যক্ষ করেছে। অনেকের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে, অনেকের অংগ কেটে ফেলা হয়েছে. অনেকের জিভ টেনে বের ক'রে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এসব করা হয়েছে কখনো খেলার ছলে, কখনো বা ভীতি প্রদর্শনের জন্যে, কখনো অবশ্য গোপনে ধনরত্নের সন্ধান লাভের উপযুক্ত সংবাদ আদায় করার জন্য।

"আমাদের মেয়েদের বা স্ত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জিজ্ঞেসা কোরো না, যা ঘটেছে তা মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক।" অনেকে কেঁদে কেঁদে এ কথা বলেছে।

টিপু সুলতানের চোখে জল এসেছে, সে বলেছে, "ঈশ্বর বলে কী কেউ নেই, এই রকম নিদারুণ নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার মত নেই কি কেউ?"

## ৩৮. হত্যাকারী কে ?

টিপু সুলতানের সেনাদলে ইক্রামুল্লা ছিল একজন ক্যাপটেন। বেদনুরের এক মেয়েকে আঠারো মাস আগে সে বিয়ে করে। সামরিক কাজে যখন তার ডাক পড়ল তখন তার স্ত্রী ইয়াসমিন তার বাবা-মা'র সংগে থেকে গেল। তাদের এক শিশুপুত্র ছিল। শিশুটির বয়স যখন চার দিন মাত্র, তখন ইক্রামুল্লা চলে যায়। টিপু সুলতানের বাহিনী যখন বেদনুর অধিকার করে তখন প্রথম যে-দল সেই শহরে প্রবেশ করে ইক্রামুল্লা ছিল তার মধ্যে একজন। টিপু লক্ষ করল এই তরুণ ও তেজি ক্যাপটেন নির্ভীক ভাবে চলেছে শহরের দিকে, অন্যান্যরা তাকে অনুসরণ করে চলেছে। টিপু মনে মনে এই ক্যাপটেনের বীরত্বের কথা জেনে রাখল, ভবিষ্যতে তাকে মনে রাখবে ঠিক করল এবং কম্যাণ্ডিং অফিসারের সংগে পরামর্শ করে তাকে স্মারক দেবার ও প্রমোশন দেবার কথা ভাবল।

বেদনুরে প্রবেশের সময় অন্যান্য সকলের আগে-আগে যাওয়ার ইক্রামুল্লার যে উৎসাহ তা ততটা সুলতানের গৌরবের জন্য নয়। তাকে পদক এবং প্রমোশন দেওয়া হবে সে কথাও সে ভাবছিল না। তার স্ত্রীর ও পুত্রের সংগে পুনর্মিলনের কথাই সে ভাবছিল।

ইক্রামুল্লা তার স্ত্রীকে পেল। সে তখন মৃতপ্রায়। তার কাহিনী মর্মন্তুদ।

ইংরেজরা বেদনুর অধিকার করার পর, সৈন্যরা তাদের বাড়িতে ঢোকে লুঠ-তরাজের জন্যে। তাদের কেউ-কেউ তার গায়ে হাত দিতে উদ্যত হয়। তার বৃদ্ধ বাবা, তার ভাই, গৃহভৃত্যরা নীরবে দেখে যায় মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে, তারা এগিয়ে এল এখন তাকে রক্ষা করতে। গোলমাল বাধল। সৈন্যরা তার বাবাকে লাথি মারল। সেইখানেই মৃত্যু হল তাঁর। মৃতদেহটি তারা পিটতে লাগল। সেই সময় একজন ভৃত্য চীৎকার করতে-করতে বেরিয়ে গেল, প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এল। জেনারেল ম্যাথুজ তখন ইন্‌স্‌পেকশন সেরে ফিরছিল। ভৃত্যটিকে সে ধরে আনাল। সব কাহিনী শুনেই সে ছুটে গেল ইয়াসমিনের গৃহে, এবং তখনি সব ইংরেজ সেনাদের গ্রেপ্তার করল। ভৃত্যটিকে ছেড়ে দিল সে, যা-যা লুণ্ঠিত হয়েছে সব ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিল। ইয়াসমিনের মৃত পিতার দিকে সে

তাকাল, ইয়াসমিন ও শিশুটির দিকে তাকাল করুণাভরা চোখে এবং তাকে কিছু না বলে চলে এল।

ইয়াসমিনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে প্রতিবেশীরা এল, সে তখন তার শিশু-পুত্রটিকে বুকে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বিকেলের দিকে একটা পালকি এল। সঙ্গে এল সাতজন সেপাই। ইয়াসমিনকে উঠতে বলা হল পালকিতে, জেনারেল ম্যাথুজের ডেরায় যাবার জন্যে। সে যেতে চাইল না। সেপাইরা জুলুম করতে লাগল। দরকার হলে তারা বল প্রয়োগ করার জন্যে তৈরি। প্রতিবেশীরা তাকে সাহস দিল। সকালের ঘটনা ও তার পিতার হত্যা সম্বন্ধে তদন্তের জন্যেই নিশ্চয় এ তলব। একজন প্রতিবেশী সংগী হতে চাইল। সেপাইরা রাজি হল না। ইয়াসমিন তার পুত্রটিকে তুলে নিল। সেপাইরা তাদের দলপতির দিকে তাকাল। সে কাঁধ ঝাঁকি দিল মাত্র। শিশুটিকে নিয়ে ইয়াসমিন পালকিতে ঢুকল। জেনারেলের ঘরের পাশের কামরায় সেপাইরা তাকে রেখে চলে গেল। পালকিটা রয়ে গেল। জেনারেল এসে তাকে নিয়ে গেল পড়ার ঘরে। জেনারেলের পরনে তখন ইউনিফরম আছে কিন্তু তাতে মেডাল রিবন বা অন্য কোনো পদমর্যাদাসূচক প্রতীক লাগানো নেই। ইয়াসমিনের মনে হল তদন্তটাই আসল কাজ। জেনারেল তাকে সোফা দেখিয়ে দিল, সেখানে শিশুটিকে সে রাখল এবং অন্য একটা চেয়ারে নিজে বসল। জেনারেল চলে গেল, একটু পরে ফিরে এল। এখন সে পায়জামা প'রে এসেছে। পাশের ঘরে যেতে বলল ইয়াসমিনকে। সে আপত্তি করল। জেনারেল তাকে ধরে টানল, বাধা দিল ইয়াসমিন। জেনারেল তাকে জাপটে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। টেবিল থেকে কী তুলে নিল ইয়াসমিন তা সে জানে না। সেটা দিয়ে সে জেনারেলের মাথায় আঘাত করল। তাকে ছেড়ে দিল জেনারেল। ইয়াসমিন দেখল রাগে ও কামনায় জেনারেলের মুখ জ্বলছে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে ঝরছে রক্ত। দরজার কাছে দৌড়ে গেল ইয়াসমিন। দরজায় তালা লাগানো। জেনারেল তাকে তাড়া করার জন্যে ছুটতে গিয়েই থামল, শিশুটির পা ধরে তাকে ছুড়ে দিল, জানলার কাঁচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। জানলার লোহার গ্রীলে শিশুটির চূর্ণপ্রায় মাথাটি আটকে রইল। ইয়াসমিন আর্তনাদ করে উঠেই চেতনা হারাল। জেনারেল ম্যাথুজ ইয়াসমিনের পরনের জামাকাপড় খুলে ফেলল, এবং অচৈতন্য সেই স্ত্রীলোকের উপর চরিতার্থ করল তার কামনা। দুই ঘণ্টা বাদে প্রহরীদের ডেকে বিবস্ত্রা ইয়াসমিনকে তাদের হাতে সঁপে দিল।

সে তাকে নগ্ন করেছে, কিন্তু তাকে এখন সেই বস্ত্রাদি পরিয়ে দিতে পারেনি।

সেপাই জিজ্ঞাসা করল, "এ'কে আবার দরকার হবে, হুজুর?"

"না। আর না।" উত্তর দিল জেনারেল, "ওটা একটা ঠাণ্ডা মেয়ে, কোন উৎসাহ নেই, উত্তেজনা নেই ওর। যাও, যদি পার, তোমরা ওকে তাতিয়ে তোলো।"

এক ঘণ্টা পরে তার জ্ঞান ফেরে। সেনারা তাকে নিয়ে বেশ মজায় কাটায়। তাকে নিয়ে কী করা হচ্ছে সে বিষয়ে সে কিছু জানে না। দুঃখের ও বেদনার সংগে সে তার শিশুটিকে চাইতে লাগল। হ্যাঁ, ঠিকই, জেনারেল ঠিকই বলেছে বটে, এ একেবারেই ঠাণ্ডা, কোনো উত্তাপই নেই, কোনো সাড়া নেই। এ'তে সেনাদের এর প্রতি আর আকর্ষণ নেই। পালকিটা ছিলই। তাতে ওকে ওরা ওঠাল। ইয়াসমিনের বাড়িতে পেঁছে তাকে ওরা বের হতে সাহায্য করল। বাড়ির লোকেরা দরজা খুলেই অবাক। ডাক্তার ডাকা হল। প্রতিবেশীদের ড কা হল। তাকে জামাকাপড় পরানো হল। সকালবেলা আবর্জনার স্তূপে—জেনারেলের ডেরার পাশে—পাওয়া গেল এক শিশুর শব। ইয়াসমিনের কাছে তা আনা হল।

তার পর থেকে হাজার মরণে মরেছে ইয়াসমিন। কোনো রকমে সে বেঁচে ছিল, হয়তো সে প্রতীক্ষায় ছিল কবে তার স্বামী এসে তাকে মুক্ত করবে। এখন সে তার স্বামীর বাহুবন্ধনে। স্বামীর চোখের জল তার মুখে লাগল, মনে হল তার সব উদ্বেগ যেন ধুয়ে গেল ঐ জলে। বিবাহরজনীর কথা তার মনে পড়ল। সেই শুভরাত্রির আনন্দের কথা সে ভাবল। নিজেকে সে মণিমুক্তায় পুষ্পস্তবকে আবৃত দেখতে পেল—তার মন তখন গর্বে ও প্রতীক্ষায় প্রজ্বলিত। বিবাহের শপথ নেবার জন্যে যখন সে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন সে তাদের গুঞ্জন ও সপ্রশংস উক্তি শুনতে পেল। সে তখন যাচ্ছে তারই হস্ত ধারণ করতে যে কিনা হবে তার স্বামী। সে তখন লজ্জাশীলা, শয্যায় তার হৃদয় দুরুদুরু করছে, মালায় সে শয্যা আচ্ছাদিত। তার হৃদয় আনন্দের সীমা প্রায় লঙ্ঘন করছে, তার পর সে শুনতে পেল তার আনন্দের উচ্ছ্বাসধ্বনি।

যে আনন্দ চিরদিনের জন্যে চলে গেছে মুহূর্তের জন্যে তার স্বাদ গ্রহণ করে সে মারা গেল তার স্বামীর বাহুবন্ধনে।

ইক্রামুল্লা আর চোখের জল ফেলল না। কোনোরকম প্রার্থনা না-করে সে তার

পুত্রের সমাধির পাশে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে একটা কথাও বলল না, তার মনে কি-কি চিন্তা এল তাও সে বলতে পারল না। স্ত্রীর দেহ সে কবরে নামাল। অনেকে কাঁদল। ইক্রামুল্লা কাঁদল না। সৈনিকের মন শক্ত করে দেয় যুদ্ধ—এই কথা বলতে লাগল সমবেত সকলে, তার পর চলে গেল তারা। ইক্রামুল্লা গেল তার কর্তব্যসাধনে।

কয়েকদিন পরে বেদনুর দুর্গ দখল করল স্বয়ং টিপু সুলতান। জেনারেল ম্যাথুজ ও ইংরেজ বাহিনী তার কাছে আত্মসমর্পণ করল। টিপু যাদের সম্মান-চিহ্নে ভূষিত করে তাদের মধ্যে ইক্রামুল্লা একজন. বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তার সাহসিকতার জন্যে তাকে সম্মানিত করা হয়। চার দিন পরে ইক্রামুল্লা দেখল জেনারেল ম্যাথুজকে, ইংরেজ যুদ্ধবন্দীদের আগে-আগে এক আধ-খোলা পালকিতে ইউনিফরম-ভূষিত হয়ে সে চলেছে। শ্রীরঙ্গপত্তনের শিবিরে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যত দিন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত না হয় ততদিন সেখানে তাদের রাখা হবে। জেনারেল ম্যাথুজকে ও সিনিয়র অফিসারদের পালকি দেওয়া হয়েছিল, অন্যান্যরা চলেছিল পদব্রজে।

ইক্রামুল্লা দৌড়ে পালকির কাছে গেল। তার মনে কী চিন্তার উদয় হয়েছে?

'আমি ওকে বলবই", ইক্রামুল্লা মনে মনে ভাবল, 'যাকে তুমি অসম্মান করেছ আমি তার স্বামী, যাকে তুমি হত্যা করেছ আমি তার পিতা।" তার মনে কোনো রাগ ছিল না, কোনো ঘৃণাও না। হত্যাকারীর সঙ্গে নিজের দুঃখ ভাগ করে নেবার এক অজানা ও নির্বোধ আগ্রহই যেন তার মনে জাগল।

ঐ বাহিনীর আগে-আগে চলেছিল মহীশূর সৈনিকদের দল, তারা থামল। পালকিবাহকেরা কাঁধ থেকে পালকি নামাল। ক্যাপটেন ইক্রামুল্লা হয়তো টিপুর কোনো বার্তা ম্যাথুজকে দিতে চায়। জেনারেল উঠে দাঁড়াতে গেল ক্যাপটেনকে আসতে দেখে। দাঁড়াতে গিয়ে সে পালকির উপরের কাঠ ধরতে হাত তুলল। ঐ হাত দেখতে পেল ইক্রামুল্লা। আর সবই তার চোখের আড়ালে পড়ে গেছে। ঐ হাতই কি হত্যা করেছিল তার শিশুপুত্রকে? ঐ হাত দিয়েই কি সে বিবস্ত্র করেছিল তার স্ত্রীকে? তার নিজের হাত আঁকড়ে ধরল ছোরা, সেই ছোরা দিয়ে জেনারেলকে সে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। মহীশূর-সৈন্যেরা ইক্রামুল্লাকে নিরস্ত্র করার আগেই মরে গেছে জেনারেল।

এর কিছু পরে টিপু সুলতানের সামনে নিয়ে আসা হল ইক্রামুল্লাকে।

ক্রুদ্ধ হয়ে টিপু জিজ্ঞাসা করল, 'একজন যুদ্ধবন্দীকে তুমি কোন্ সাহসে হত্যা করলে, কী করে অমন কাজ করতে পারলে ?''

ইক্রামুল্লা উত্তর দিল না। টিপু সুলতান আবার জিজ্ঞাসা করল— 'সাহসিকতার জন্যে আমি তোমাকে সম্মানে ভূষিত করেছি. কিন্তু কাপুরুষতার জন্যে তুমি আমাকে লজ্জায় ফেললে। একজন অসহায় বন্দীকে মেরে ফেললে…''

টিপুর মনের যন্ত্রণা ইক্রামুল্লার মনেও সংক্রামিত হল। সে কিছু বলবে ভাবল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ''সে আমার সর্বস্ব অপহরণ করেছে, আমার মানহানি ঘটিয়াছে'', অসংলগ্ন ভাবে সে বলল। টিপু কিছুই বুঝল না, তবুও 'মানহানি' কথাটা সে শুনতে পেল, তখন বলল, 'হ্যাঁ. হ্যাঁ। তুমি আমার মানহানি ঘটিয়েছ। যাকে আমি জীবন ও নিরাপত্তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তুমি তাকে হত্যা করেছ।''

অসহায়ের মত চেয়ে রইল ইক্রামুল্লা. কোনো কথা বলল না। টিপু তার প্রহরীদের আদেশ দিল. 'এঁকে নিয়ে যাও। সামরিক আদালত এর অপরাধের বিচার করবে'', তার পর ইক্রামুল্লার দিকে অবজ্ঞার চোখে চেয়ে বলল. ''আর কখনো আমার দৃষ্টির সামনে ও যেন না-আসে।''

সে রাত্রে ইক্রামুল্লাকে সামরিক বন্দীশালায় রাখা হল। একজন সৈনিক তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাল, কেননা এখনো সে বিচারাধীন। সে একটা ছোট পত্র লিখল 'আমাকে মার্জনা করুন, সুলতান''। একজন অচেনা ও অজানা লোকের কাছে সে বলে, 'অপেক্ষা কর, আমি আসছি।'' তার ক্ষুর দিয়ে সে নিজের শিরা কেটে ফেলে। তাকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মৃত পাওয়া গেল সকালবেলা।

এইভাবে ইক্রামুল্লার বেদনা সমাপ্ত হল. কিন্তু টিপুর বেদনার শেষ হল না। টিপুকে দেওয়া হল ইক্রামুল্লার চিঠি. বলা হল আত্মহত্যার কথা জানানো হল কীভাবে তার স্ত্রী-পুত্র মারা গিয়েছে। টিপু এক অসহ্য নিঃসঙ্গতা বোধ করল। পরে তার সেক্রেটারি শিবাজিকে টিপু একটা চিঠির বয়ান বলে দিল, ইক্রামুল্লার বৃদ্ধ পিতামাতাকে লেখা হল সেই চিঠি ''রাজ্যের সম্মান ও গৌরব রক্ষার জন্যে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে ইক্রামুল্লা মারা গিয়েছে। ইংরেজ অধিকারে থাকার সময়ে তার স্ত্রীর ও পুত্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা সে নিয়েছে।'' চিঠির সঙ্গে একটি আদেশ গেল তাঁদের পেনসনের ও চিরজীবনের জন্যে তাঁদের জমিদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

পূরনাইয়াকে টিপু আদেশ দিল, "ঘোষণা করে দাও যে আমার আদেশেই জেনারেল ম্যাথুজকে মেরে ফেলা হয়েছে। ইক্রামুল্লার উপরে যেন কোন দোষ না বর্তায়।"

পূরনাইয়া চুপ করে রইল। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, যে-যুদ্ধবন্দীকে তিনি নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন তাকে হত্যা করার আদেশ দিতে পারেন এই সর্বাধিকারী। এমনি ছিল টিপুর সম্মান ও মর্যাদা। তার পরম শত্রুও এ কথা জানত, এর উপর নির্ভর করত।

পূরনাইয়া জানতই না যে ভবিষ্যতে মস্তিষ্কহীন বিবেকহীন এমন মানুষের আবির্ভাব হতে পারে যারা নিজেদের ঐতিহাসিক বলে পরিচিত করবেন।

## ৩৯. তিন আবেদনকারী

ক

বেদনুর থেকে টিপু শত্রুর মোকাবিলা করতে চারিদিকে অভিযান চালাল। সর্বত্রই সে আছে, কখনো একটা রণক্ষেত্রে, কখনো অন্যটায়। ১৮ মে, ১৭৮৩ সালে এমন-এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে, তিনজন ইংরেজ সেনানায়ক যারা শতশত মাইল দূরে দূরে আছে তারাই মাদ্রাজের হাই কমাণ্ডকে এমন বার্তা পাঠায় যে, সত্বর যেন তাদের অতিরিক্ত লোক ও রসদ পাঠানো হয়, কেননা টিপু সুলতান ব্যক্তিগতভাবে এইসব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হচ্ছে। ইংরেজ সর্বাধিনায়ক তিনটি রণক্ষেত্রেই লোকলস্করাদি পাঠায়। তার এটুকু রসবোধ ছিল যে, প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই এই সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় অন্য দুটি ক্ষেত্র থেকে পাঠানো চিঠির নকল, প্রত্যেক জায়গাতেই লিখে দেয়—"ওকে কি আমরা বিশ্বাস করব?" ব্যাপারটা হল, টিপু বিদ্যুৎগতিতে, পূর্ব থেকে পশ্চিম, প্রত্যেক রণক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল।

এর থেকে এক উপাখ্যান ছড়িয়ে গেল যে রাত্রিবেলা মেঘপুঞ্জের মত ও দিনের বেলা অগ্নিকুণ্ডের মত টিপু দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হত। প্রতিদিন সকালেই কোনো-না-কোনো রণক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হত টিপু। প্রায়ই রাত্রিকালে তার ঘোড়া দ্বিতীয়-দিলখুশ তাকে বয়ে নিয়ে যেত অন্য রণ-ভূমিতে, তখন তার সেনাবাহিনী প্রথম রণভূমিতে হয় বিশ্রাম নিত না হয় অবরোধের কাজে লিপ্ত থাকত। আক্রমণের জন্যে সময়মতই হাজির হত টিপু, আক্রমণ আরম্ভ হবার আগেও তার উপস্থিতির কথা জানানোই থাকত।

মাঙ্গালোরে ক্যাম্পবেলের অধীনস্থ ইংরেজ সেনাদলকে পর্যুদস্ত করে দেয় টিপু। তারা সরে গিয়ে দুর্গে আশ্রয় নেয়। মহীশূর-বাহিনী যখন দুর্গটি অবরোধ করে টিপু তখন তার সেনানায়ক কামার-উদ-দিনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে কুড্ডাপ্পায় রওনা হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে বিশ্বাসঘাতক সৈয়দ মহম্মদের অধীনস্থ সেনাদলকে পরাজিত করে, এবং সৈয়দ মহম্মদের সাহায্যার্থে প্রেরিত মন্টগোমারির অধীনস্থ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

যুদ্ধের শেষে টিপু সৈয়দ মহম্মদের দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাল, সে তখন

ক্ষমাভিক্ষা চাইছে। তার শান্তশিষ্ট বিচিত্র অস্ত্রসজ্জিত অবয়ব তখন অতি চমৎকার দেখাচ্ছিল। মনোযোগ দিয়ে শুনল টিপু, মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটল না। প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারল টিপুর উত্তরটি কী হতে পারে, কেননা বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়াও সৈয়দ মহম্মদ টিপুর অনুগত শতাধিক ব্যক্তিকে ঠাণ্ডামাথায় হত্যা করেছে। উত্তরে টিপু বলল, "তোমার প্রাণরক্ষা করলাম। তুমি যা করেছ তা ভুলে গেছি মনে কোরো না। কে তোমার বাবা তা স্মরণ করে দিলাম এই প্রাণভিক্ষা।" সৈয়দ মহম্মদের বাবা এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, গুলবর্গায়, গিসু দারাজ-এর সমাধির সংগে যুক্ত ছিলেন তিনি।

এই কথায় টিপুর সংগে তার বিশ্বস্ত সেনানায়ক কামার-উদ দিনের ঝগড়া লাগার উপক্রম হল। বিবাদ থামল যখন টিপু বলল :

"তুমি আমাকে রাজা বল, কিন্তু আমার প্রতিটি কাজে আপত্তি তোলো। মনে হচ্ছে, আমি যখন হত্যার জন্যে আদেশ দিই তখনই আমি রাজা, কিন্তু, ইচ্ছে করলে কাউকে জীবনদান করার অধিকার আমার যেন নেই।"

কামার-উদ-দিন মনে মনে ভাবল, এটা রাজকীয় কাজ নয়। আমরা কেবল আমাদের প্রতিপক্ষ নেকড়েদের সংখ্যাই বাড়াচ্ছি—তার বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু টিপুর ওই কথার পর এ বিষয়ে আর তর্ক করা চলে না।

খ

বেদনুরে, কুড্ডাপ্পায় ও ম্যাংগালোরে ইংরেজদের বিপর্যয় সত্ত্বেও তারা মনে-মনে আশা লালন করতে লাগল। হাইদর-আলির মৃত্যু তাদের অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে, তা তারা হাতছাড়া করতে পারে না। তার পুত্র সব গুছিয়ে নেবার আগেই তাকে দমিয়ে দিতে হবে। মহীশূর-বাহিনীকে হয়রান করার জন্যে কয়েকটি ফ্রন্টে ইংরেজরা সৈন্যসমাবেশ করতে লাগল। টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে রাজন্যবর্গ, জায়গীরদার ও প্রধানগণের কাছে বার্তা পাঠাতে লাগল। এইসব বার্তার সংগে প্রচুর জমিদানের, অভূতপূর্ব পারিতোষিকের, এমনকি রাজ্য দেবারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। অনেক পাদ্রী নিয়োগ করা হল এইসব বার্তা বিলি করার জন্যে। ওরা জানত, টিপুর সাম্রাজ্যে ধর্মীয় মানুষের কোনো রকম অপমানিত বা লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা নেই।

ওয়ান্ডিওয়াশের যুদ্ধে টিপু জেনারেল স্টুয়ার্টকে পরাজিত করে, সে এখন কুড্ডালোরে, কিন্তু এক হাজার সৈন্য খুইয়ে সে পিছু হটে গেছে। তারা যাবার

সময় একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, সেটা হল—টিপ্পুর অধীনে কাজ করত এমন একজন ফরাসি সার্জেন্টকে তারা পাকড়াও করে। সে তখন টিপ্পুর জন্যে একটা বার্তা নিয়ে যাচ্ছিল বুসির কাছ থেকে—মহীশূর-বাহিনীতে ফরাসিদের অধিনায়ক ছিল সে। এই সার্জেন্টকে টিপু সস্নেহে মনে রেখেছে। একদিন যখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সকলে পরিশ্রান্ত, তখন খবর এল টিপুর এক পুত্র হয়েছে। সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠল, এই সার্জেন্টটি তখন একগুচ্ছ ফুল সংগ্রহ করে টিপু সুলতানকে তা উপহার দিল সমগ্র সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। এখন তার বন্দী হবার খবরে টিপু এক শান্তিপতাকাবাহী দূতের মারফত চল্লিশটি প্যাগোডা পাঠিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করল। এই সার্জেন্টের নাম জাঁ ব্যাপ্তিস্তে জুলেস বার্ণাদোত্তে, পরে সে ফরাসি সেনাবাহিনীতে জেনারেল হয়, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ছেলেবেলার প্রিয়পাত্রী ডিজায়ারীকে বিয়ে করে, পরে নেপোলিয়নের বাহিনীতে মার্শাল হয়, তার পরে পন্টি কার্ভোর ডিউক পদে উন্নীত হয়, তারও পরে নির্বাচিত হয় ত্রয়োদশ চার্লস্‌-এর উত্তরাধিকারী রূপে, এবং সবশেষে চতুর্দশ রাজা চার্লস হয়ে সুইডেনের রাজমুকুট পরে মাথায়।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ তারিখে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তির এক প্রাথমিক চুক্তি ভার্সাইতে স্বাক্ষরিত হয়েছে—এই সংবাদ পৌঁছনো মাত্র, যে ফরাসি বাহিনী টিপুকে সাহায্য করছিল জুন ১৭৮৩ থেকে তারা পুরোপুরি ভাবে সাহায্য করা থেকে সরে গেল। টিপুর হাতে যে ইংরেজরা বহু জায়গায় পরাস্ত হয়েছে, এ খবরে তারা উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা আশা করল ফরাসি দল নিরপেক্ষ থাকলে তারা অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। বস্তুত পক্ষে ফরাসিদের সরে দাঁড়ানোয় টিপুর হাত আরও শক্ত হল। মহীশূরবাহিনীর সঙ্গে ফরাসিদের অনেক ক্ষেত্রে মতে বনেনি। সাহায্যের বিনিময়ে তাদের দাবি ছিল মাত্রাতিরিক্ত। যাই হোক, ভিন্ন মতের আর স্থান রইল না এখন, যা-কিছু সব এক-মনে এক-মতে। একটা যুদ্ধ চলা-কালে ফরাসিদের এই দলত্যাগে যখন কামার-উদ-দিন ও অন্যান্য মহীশূর অধিনায়করা অসন্তোষ প্রকাশ করে তখন টিপু তাদের ধমক দিয়ে বলে, "এটা আমাদের যুদ্ধ, তাদের নয়। তোমরা কি আশা কর বিদেশীরা এসে তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবে?" সে আরও বলে, "তাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের সঙ্গে থেকে তারা যুদ্ধ করেছে, নিজেদের স্বার্থেই তারা এখন আমাদের ছাড়ল। দরকার হলে, নিজেদের স্বার্থেই তারা আমাদের বিরুদ্ধেও লড়বে।"

ফরাসিরা চলে যাওয়ায় টিপুর উপরে যদি কোনো প্রভাব পড়ে থাকে তবে তা হল নিজের সামর্থ্য দ্বিগুণিত করার জন্য তার দৃঢ়সংকল্প।

বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চলেছে। ইংরেজরা প্রাণপণে লড়ছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ থেকে অতিরিক্ত লোক ও রসদ আসছে তাদের যুদ্ধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে। তাদের মতে চাপ সৃষ্টি করে যাওয়া ও একটা বা দুটো যুদ্ধে জেতা তাদের খুবই দরকার। তাদের আশা, তাহলেই মহীশূরবাহিনীর মনোবল ভাঙবে এবং তাদের অবনতি ঘটবে। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উৎসাহও অন্যান্য শক্তিবর্গের মধ্যে দেখা যাবে। কিন্তু তাদের এত আশা ও এত হিসাবনিকাশ কিছুই কাজের-কাজ কিছু করতে পারল না। মহীশূর-অশ্বারোহী বাহিনী এমন দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল যে তাদের হাতে ইংরেজ অনেক পরাজয় ও অপমান স্বীকারে বাধ্য হল।

ইংরেজরা তখন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। কোনো অভিযানই তাদের মৃত্যু ও দুর্দশা ছাড়া কিছু দিতে পারল না। তারা জানত যে, এখন যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রাণে বেঁচে, পরে অন্য সময়ে যুদ্ধ করাই তাদের দরকার। তারা শান্তির প্রস্তাব পাঠাল টিপুর কাছে. উত্তরে টিপু বলল, "শান্তি! আমি বরাবর শান্তিই চেয়ে আসছি। আমার রাজ্য ছেড়ে যাও, তবেই শান্তিতে থাকব আমরা।"

শান্তির কথাবার্তার জন্যে ইংরেজ তাদের তিনজন কমিশনার পাঠাল— অ্যান্টনি স্যাডলিয়ার, জর্জ স্টনটন ও জন হাড্‌ল্‌স্টন। তারা টিপুর দরবারে উপস্থিত হয়ে শান্তির কথা বলবে। অজস্র পরাজয়ে পরাভূত হয়ে তখন মাদ্রাজের ইংরেজ গবর্নর ম্যাকার্টনি শঙ্কিত, তার কমিশনারদের সে বলল, "শান্তি এখন কেবল অভিপ্রেত নয়, শান্তি এখন আমাদের কাম্য। আমরা কঠিন পরিস্থিতিতে আছি। এখন শান্তি লাভের জন্য সবরকম চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য।"

ইতিমধ্যে শান্তির বার্তা যখন আসছে, টিপু তখন ম্যাঙ্গালোরে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে সাময়িক শান্তিস্থাপনে সম্মত হল, মহীশূরবাহিনী এটা ভীষণ-ভাবে অবরোধ করে রেখেছিল। আট মাস প্রতিরোধ ক'রে অবশেষে ২৯ জানুয়ারি ১৭৮৪ তারিখে ইংরেজ অধিনায়ক ক্যাম্পবেল শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে। এই সেনাদলকে শর্তানুসারে টিপু খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়েছে, তবু তারা অসুখে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল। স্বয়ং ক্যাম্পবেল তখন ক্ষয়রোগে একেবারে শেষ হয়ে যাবার দশায়।

দুর্গ থেকে ক্যাম্পবেল বেরিয়ে আসতেই টিপু তাকে সামরিক অভিবাদন জানাল।

টিপু বলল, "তুমি ও তোমার সেনাদল সাহসিকতার সঙ্গে তোমাদের কর্তব্য-কাজ করেছ।"

অভিভূত হল ক্যাম্পবেল। যেসব সেনাকে এই দুর্গে বন্দী রাখা আছে তাদের মুখে টিপুর প্রতি অনেক অভিশম্পাত সে শুনেছে, সে কথা ভুলে গিয়ে সে বলল, "তোমার প্রশংসাই আমার পরম পুরস্কার, সুলতান।"

সেনাদলকে সামরিক নিয়ম অনুযায়ী যাত্রা করতে দেওয়া হল। খাবার ওষুধ ও অন্যান্য দ্রব্য সমেত টিপু তাদের জন্যে নৌকোর ব্যবস্থা করে দিল। টিপু সুলতানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখার ছিল ক্যাম্পবেলের, শান্তির চুক্তির শর্ত পালনে টিপু কতটা সততা দেখিয়েছে, তাও। ক্যাম্পবেল ভাল একজন পরাজিত ব্যক্তি এবং অসুস্থ, তার সিনিয়র অফিসারদের কাছে তার কথার তখন আর কোনো মূল্য নেই। অনেকের অনেক রূঢ় উদাসীনতা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এক মাস পরে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় তার বন্ধু ক্যাপটেন লিণ্ডসে'কে সে বলে, "আমার চারদিকের সকলের অবজ্ঞা নিয়েই আমি মরছি, কিন্তু আমার এই দুর্দশা দিয়েই আমার বিচার কোরো না। মনে রেখো আমার গৌরবের কথাও। একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি, এক শ্রেষ্ঠ সেনাধিনায়ক এবং একজন মহৎ সম্রাট আমাব সাহসের জন্যে আমাকে স্যালুট করেছে।"

১৭৮৩র নভেম্বরে ইংরেজ কমিশনাররা টিপুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে রওনা হল। ইংরেজরা প্রভূত ঘা খেয়েছে, কমিশনাররা শান্তির জন্য মরীয়া। তাদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল। যখন তারা টিপু সুলতানের কাছে যাচ্ছে তখনও তারা গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও মাদ্রাজের গবর্নর ম্যাকার্টনের কাছ থেকে বিভ্রান্তিকর নির্দেশ পাচ্ছে। বিষয়টা পরিষ্কার করে নেবার জন্যে তাদের সময় নষ্ট হল অনেক। তিন মাস সময় কেটে গেল এইভাবে এবং এর মধ্যে ইংরেজের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে ১৭৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টিপু সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হল তিন আবেদনকারী।

ম্যাঙ্গালোর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৭৮৪ সালের ১১ মার্চ। এতে ইংরেজ ও মহীশূর নিজ-নিজ এলাকা উদ্ধার করে নেবার মত শর্ত রইল। যে ইংরেজ যুদ্ধে ভয়ংকরভাবে পরাজিত হয়েছে তাদের পক্ষে এটা কূটনৈতিক জয়।

তারাও রণক্লান্ত এক রাজার সঙ্গেই এই শর্তে এসেছে, শান্তির জন্যেই যে প্রতীক্ষা করে আসছে।

ইংরেজ গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মাঙ্গালোর শান্তিচুক্তিতে মত দিয়েছিল বেশ বেদনার সঙ্গেই। এ'কে সে বলেছিল, "অপমানের চুক্তি"। যদিও সে জানত যে এছাড়া পথ ছিল না। ইংরেজরা বেশ মনে করে নিয়েছিল যে, তাকে পরিচালনার জন্যে হাইদর আলি না-থাকায় ইংরেজের শক্তির কাছে সহজেই সে পরাভূত হবে। কিন্তু তা হবার নয়। কয়েকটা মারাত্মক পরাজয়ের পর তিক্ত সত্য উদ্‌ঘাটিত হল তাদের কাছে। তারা সময় চেয়েছিল, মাঙ্গালোর-চুক্তি তাদের দিল সেই সময়। ওয়ারেন হেস্টিংসের এটা পরিষ্কার জানা ছিল না যে, যত শীঘ্র সম্ভব এই চুক্তি থেকে অপমানকর শর্ত বাদ দিয়ে নিতে হবে, সেইজন্য একে অস্থায়ী একটা ব্যবস্থা বলে সে মনে করে। টিপু সুলতানকে অপদস্ত করতেই হবে, তা না হলে ভারতবর্ষে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তারের যে পরিকল্পনা ইংরেজের আছে তা সম্ভব হবে না। ইল্লেস মনরো যা বলেচে তা ওয়ারেন হেস্টিংসের, ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ও বৃটিশ গবর্নমেণ্টেরই মনোভাব, সে বলেছে, "সম্প্রতি টিপু সুলতানের সংগে কোম্পানির যে চুক্তি হয়েছে তা একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবেই।"

যে সাফল্য ও বিক্রম নিয়ে টিপু ইংরেজদের, তাদের ঐতিহাসিকদের মতে, একটা 'দুর্বলতা হতাশা ও বিষণ্ণতা'র মধ্যে ফেলেছে তা অতুলনীয়। সেইজন্য হীনতা স্বীকার করে তাদের শান্তি কামনা করতে হয়েছে ও প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মহীশূরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা নাক গলাবে না, টিপু সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে চলবে, তার উত্তরাধিকারীর সংগেও মৈত্রী রাখবে। তারা টিপু সুলতানকে এমন প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, তার ও তার উত্তরাধিকারীকে অন্য কারও আক্রমণের সময়ে সর্বাধিক সাহায্য দেবে।

"চাঁদ চাইলে চাঁদই দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ো", ম্যাকার্টনি তার কমিশনারদের এই আদেশ দেয়, 'তারপর যা করার তা আমরা করব।" এই হচ্ছে মতলব, এই মনোভাব নিয়ে তারা মাঙ্গালোর চুক্তি করে।

শান্তিচুক্তির পরে ওয়ারেন হেস্টিংস আক্রমণের একটা প্ল্যান ছকে ফেলে। বিবেক নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায়নি। যে রোহিলাদের নির্মূল করার পরিকল্পনা করে নিজে, বেনারসে লুঠতরাজ করে, গোরখপুরে ধ্বংসলীলা চালায়, অযোধ্যার

রাজকুমারীদের উপর অত্যাচার করে, নন্দকুমারের ফাঁসি দেয়, সে ব্যক্তি টিপু সুলতানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত সম্বন্ধে এতটুকু বিচলিত নয়। ইংরেজদের কাছ থেকে যে ভূমিখণ্ড টিপু সুলতান যুদ্ধে জয় করে নিয়েছে উদারচেতা টিপুর কাছ থেকে সেই অঞ্চল ফিরে পাওয়ার মতলবেই চুক্তির বন্দোবস্ত। ওয়ারেন হেস্টিংস কিন্তু এশিক্ষা পেয়ে গেছে যে টিপু সুলতানের শক্তি ও সামর্থ্য ভবিষ্যতে যেন ছোট করে দেখা না হয়। তার সম্মুখীন হবার জন্যে সৈন্য সামন্তে অর্থে ও উপকরণে বিশাল ও বিরাট ভাবে তাদের প্রস্তুত হতে হবে। সে হিসেব করে দেখে যে, খুব কম করেও পাঁচ বছর সময় লাগবে টিপুর সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়তে, যদি মাঝখানের সময় 'আলস্যে না-কাটিয়ে উদ্যমের সঙ্গে কাটানো হয়।' তার কাছে এ-ব্যাপার আরো পরিষ্কার ছিল—ইতিমধ্যে টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র করার জন্যে উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে, যাতে 'আমাদের এক দুর্বল শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়।' মারাঠাদের, নিজামকে ও ছোট বড় অন্যান্য শক্তিকে সব রকম সাহায্য ও প্ররোচনা দিয়ে যেতে হবে।

ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে লাগল, নিজাম তাকে একটা সহজ পন্থা বাৎলালো।

নিজাম জিজ্ঞাসা করল, "টিপুকে হত্যা করতে পারলে কেমন হয়?"

টিপুকে সকলে যেমন শ্রদ্ধা করে তা যেন অনেকটা পূজা করার মতই। নিজাম জানত ভারতবাসীদের রক্তে এমন কী-যেন আছে যে তারা তাদের নেতার উপর এমন নির্ভর করে যে, নেতার মৃত্যু হলেই সব ভেঙ্গে পড়ে।

ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামের দিকে বেশ স্নেহময় দৃষ্টিতে তাকাল।

তারপরেই শ্রীরঙ্গপত্তমে কয়েকজন ভাড়া-করা হত্যাকারী এসে উপস্থিত হল। অনেকে ধরা পড়ল, তারা স্বীকারও করল। পুরনাইয়া একবার নিজামের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, তখন সে জোরালো ভাবে এসবের মধ্যে নিজামের থাকার কথা অস্বীকার করে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পুরনাইয়া বলে, "এটা আশ্চর্য, টিপুকে হত্যা করার জন্যে এতদূরে যাওয়াটা তাজ্জব, কেননা, তাকে মেরে ফেলা খুব সোজা।"

নিজামের প্রধানমন্ত্রী কান খাড়া করে বলল, 'কী রকম?"

"তুমি জান তোমার মনিবকে যে-কোনো একটা প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে দেখলেই টিপু সুলতান বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।"

হত্যাকারীরা পেরে উঠল না। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনার ফল একটু ফলল। ইংরেজরা বড় রকমের যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগল, এবং সেই সঙ্গে টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অন্যান্যদের উসকানি দিতে লাগল, এবং সেইসঙ্গে টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অন্যান্যদের উসকানি দিতে লাগল। সেই বছরই (১৭৮৪) হেস্টিংস চলে যায়। পরে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়, যাকে বলা হয় ইমপিচমেণ্ট বা অপবাদ। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনে। তার অকথ্য নিষ্ঠুরতার ও ধ্বংসলীলার এবং ব্যক্তিগতভাবে তার প্রভূত অর্থসঞ্চয়ের এই অভিযোগ। সাত বছর মামলা চলার পর সে খালাস পায়। এর কারণ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই সিদ্ধান্তে আসে যে যা-কিছু আসে যে, যা কিছু সে করেছে তা ব্রিটিশ জাতির কল্যাণের জন্যেই এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের বনিয়াদ পাকা করার জন্যেই ; সুতরাং তার এই গৌরবময় কাজের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করা হয়েছে বলে অশ্রুপাত করতে চায় না।

ওয়ারেন হেস্টিংসের জায়গায় যে এল সে তার মতই হীন, তার চেয়েও বেশি কৌশলী ও নিষ্ঠুর—সে হল অস্থায়ী গবর্নর জেনারেল সার্ জন ম্যাকফারসন। এই ব্যক্তির 'অসৎ উপায়ে অর্থ রোজগার' বিষয়ে এর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ ইংলণ্ডে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার কাছে চিঠি লিখে এর 'নির্লজ্জ মিথ্যাচার' 'এর ধূর্তামি' 'এর দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে নীচ কাজ' ইত্যাদির কথা জানায়। ইংলণ্ডে ফিরে ম্যাকফারসন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচনে জেতে, কিন্তু তাকে সেই সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় যখন জানা যায় যে ঘুষ দিয়ে, মিথ্যাচার ও অন্যান্য হীন পন্থা অবলম্বন করে সে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল।

মাঙ্গালোর চুক্তির শর্তাবলী পালনের দায় যাদের উপর পড়ল তারা এই রকম মেগদারের লোক। ওয়ারেন হেসটিংস বলেছিল, "এটা একটা চোথা কাগজ, আমাদের লজ্জা ঢাকতে আমরা এটা একদিন পুড়িয়ে ফেলব।" সার্ জন ম্যাকফারসন একে বলে, "এক মুঠো বালি, একটা দমকা বাতাসের দাপটে এসব উড়ে যাবে।"

পর পর অনেকগুলো ষড়যন্ত্র হল। একের পর এক টিপু সুলতান দেখল তার বিশ্বস্ত অনুগামীরা তাকে প্রতারণা করছে—ইংরেজরা তাদের ক্রয় করেছে সোনা দিয়ে। কাসিম আলির দলত্যাগে টিপু মর্মাহত হয়, কিন্তু যা তাকে বিশেষ

দুশ্চিন্তায় ফেলে সেটা হচ্ছে তার পিতার ও তার নিজের প্রিয় কম্যান্ডার মহম্মদ আলির প্রতারণা। তার বাবার ও তার হয়ে মহম্মদ আলি অনেক লড়াই করেছে। সে দিলখোলা স্পষ্টবাদী ও সাহসী ছিল। তার জীবনের ট্র্যাজিডি হচ্ছে এই-যে বিশ্বাসঘাতক কাশিম আলিকে সে এমন ভালবাসত একটা পুরুষ একটা নারীকে যেমন অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। কাশিম আলি যখন বিশ্বাস ভঙ্গ করল, তখন সে মহম্মদ আলিকেও সেই পথে টেনে নিল। গাজি খাঁর অধীনস্থ সেনাদল মহম্মদ আলি ও তার সেনাদলকে পরাস্ত করল, তাকে আনা হল টিপুর সম্মুখে।

"তোমাকে নিয়ে আমি কী করব?" মহম্মদ আলিকে জিজ্ঞাসা করল টিপু।

তার চিরাচরিত সাহস দেখিয়ে মহম্মদ আলি বলল, "অবশ্যই আমাকে মেরে ফেলবে।"

টিপু সুলতান তাকে মেরে ফেলল না। ছেড়ে দিল। মৃত্যুই তার দণ্ড ছিল, কিন্তু বর্তমানের কাজের উপরই নির্ভর না-করে টিপু তার অতীতের কাজও স্মরণ করল।

মহম্মদ আলির আত্মগ্লানি হল, পরদিন আত্মহত্যা করল সে। কিন্তু আর অন্যান্যদের বিষয়ে? যাদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও টিপু ক্ষমা করেছে? টিপু তাদের মার্জনাই কেবল করল না, নিজ-নিজ পদে তাদের রেখে দিল।

যারা টিপুকে ভালোবাসত তাদের অনেকেই এ'তে আপত্তি জানাল। তারা বলতে লাগল একবার যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে কখনো আর বিশ্বাস করতে নেই। এদের কৃতজ্ঞতা হচ্ছে একটা মুখোশ, বিশ্বাস ভঙ্গ করে তারা তাদের মতলব সিদ্ধ করতে না-পারায় গ্লানি ঢেকেছে মাত্র, ধরা পড়ার অপমান লুকোনো মাত্র। আবার দরকার হলে আবার দল ত্যাগ করবে ওরা। টিপুর অন্তরঙ্গজন এই রকম বলতে লাগল। নম্র ভাবে টিপু শুনল তাদের যুক্তি। সে বুঝল ভুল তার, তাদের ক্ষমা করা তার ঠিক হয়নি। পরবর্তী কোনো অপরাধীকে তার শাসনে আনা পর্যন্ত সে মনে রাখে তার ঐ মনোভাবের কথা। তার পর তার মনে অনেক স্মৃতি ভিড় করে এল।

ভিতরে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জোগানো ছাড়াও ইংরেজরা অনেক বিদ্রোহীকে টিপুর বিরুদ্ধে লাগাবার কাজে ইংরেজরা সফল হয়। টিপুর বয়স যখন পনেরো তখন সে বালমের শাসকের পরিবারকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল, সেই শাসক এখন ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই ব্যবহার সে যেন না-করে টিপুর এই অনুরোধ উপেক্ষা

করে সে। টিপু তখন বালমের অভ্যন্তরে সসৈন্যে প্রবেশ করল। শাসক পালাল। পুনরায় তার পরিবার-পরিজন টিপুর কাছে আত্মসমর্পণ করল।

টিপু বলল, "পরিবার-পরিজনকে অরক্ষিত রেখে চলে যাওয়াই একটা অভ্যাস করে ফেলেছে ও।"

শাসকের স্ত্রী বলল, "একবার তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ, আবার আমাদের রক্ষা করবে না?"

শাসককে ফিরে আনাল টিপু, তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাল যে, সে অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে, তারপর তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিল।

বালমের পরিস্থিতি শান্ত করেই টিপুকে তাড়াহুড়ো ছুটতে হল কুর্গে—তার বিরুদ্ধে ভয়ংকর বিদ্রোহ বাধিয়ে দিতে ইংরেজরা সেখানে সফলকাম হয়েছে। এরকম কাজে দক্ষ হয়ে গেছে ইংরেজরা। এজন্যে তারা অর্থ ও অস্ত্র ঢেলে দেয়, তারা দূত পাঠায় বিদ্রোহী শাসকদের কাছে, তাদের সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। যখন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল, তারা তখন এসে পৌঁছল না। কুর্গের বিদ্রোহ দমন করে ফেলল টিপু সুলতান, এজন্যে মহীশূর-সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কম হল না।

এইভাবে নিজেদের আড়ালে রেখে ইংরেজরা টিপু সুলতানকে হয়রান করতে লাগল। যাকে যেমন পায় তার কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি ছোড়ে। টিপুর উপর চাপ বহাল রেখে তাদের এই পরম শত্রুকে প্রাণে আঘাত করার জন্যে তলে-তলে তৈরী হতে লাগল ইংরেজরা। ইংরেজদের মস্ত প্রতিভা এই যে, মারাঠা ও নিজামের মধ্যে শত্রুতা বাধানো, এবং টিপুর সংগে ওদের দুজনের শত্রুতা বাধানো। কী করে এ কাজ করতে পারল তারা? নিজাম ছিল একটা ভৃত্যের মত, ইংরেজের সেন ক্রীতদাস, কিন্তু মারাঠার ছিল স্বাধীন নীতি, এবং দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী। ইংরেজদের রাজনৈতিক কৌশলের তারিফ করতে হয় এই জন্যে যে, তারা মারাঠাকে বেশ বুঝিয়ে দিতে পারল যে মারাঠার বিরুদ্ধে লাগার মতলব আছে টিপুর, অভ্যন্তরীণ গোলযোগে টিপু এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে এই সময় তাকে আঘাত করা দরকার, দেরি করলে টিপুর কাছ থেকে আসা আঘাত সামলানো কঠিন হবে।

১৭৮৬ সালের মে মাসে মারাঠা ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে প্রকৃত শত্রুতা আরম্ভ করল। দক্ষতা ও উদ্যম নিয়ে টিপু আরম্ভ করল কাজ। তাদের প্রাথমিক লাভ উপেক্ষা করে টিপু বাহিনী নিয়ে চলল আদোনির উত্তর দিকে—

এখানেই তুংগভদ্রার দক্ষিণে নিজামের শক্ত ঘাঁটি। পতন ঘটল আদোনির। তার সেনানায়কদের অভিমতের বিরুদ্ধেই তার সেনাবাহিনীকে ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকো দিয়ে ভীষণ ভয়াল তুংগভদ্রা পার করাল টিপু। অনেক সেনাকে সে ঘরছাড়া ক'রে সাওনুর ও আরও কয়েকটি শহর দখল করল। মারাঠারা এখন শান্তি প্রস্তাব শুনতে রাজি হল, কেননা নিজাম এখন একটা অপদার্থ মিত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং ইংরেজদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত কোনো সাহায্যই আসছে না। এমন না হয়ে কী আর হবে? ইংরেজরা তখন টিপুকে আঘাত হানার জন্যে নিজেরাই অস্ত্র শানাচ্ছে। তারা এখন তাদের শক্তিসামর্থ খরচ করতে চায় না। ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে দম ফুরিয়ে ফেলুক—ইংরেজদের এই বাসনা।

১৭৮৭ সালের এপ্রিল মাসে মারাঠার পেশোয়ার ও টিপু সুলতানের মধ্যে এক শান্তি চুক্তি হল। এটা এমন চুক্তি যা উভয়ের সম্মান রক্ষা করে, ও যার যার সীমানা রক্ষিত হয়। নিজাম ইতিমধ্যে এক অনাবশ্যক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে, চুক্তিতে তার উল্লেখ পর্যন্ত রইল না। মারাঠা ও নিজামের মধ্যে মৈত্রীকে টিপু সুলতান সিংহের সঙ্গে শৃগালের বন্ধুত্ব বলে মনে করত। শৃগালের সঙ্গে চুক্তি করে সে নিজেকে অপমানিত করবে কেন। এক তরফা ভাবেই অবশ্য নিজামের যে সব এলাকা সে জয় করে তা ফিরিয়ে দিয়েছিল টিপু।

অনেক যুদ্ধেই জয়ী হয় টিপু। মারাঠার কাছে আরও কঠিন শর্ত কি করতে পারত? ইংরেজরা তার কাছে দূত পাঠায়, মারাঠাকে যেন একটু দাবানো হয়। প্রায়ই আসত তারা অনেক উপচার নিয়ে, অভিনন্দন নিয়ে, এবং কী করে মারাঠাকে খর্ব করা যায় তার পরামর্শ নিয়ে। ঘৃণার চোখে তাদের দিকে তাকাত টিপু, তাদের বিদায় করে দিত।

তার নিজের যেসব অফিসার ঐরকমই মনে করত তাদের টিপু বলে "ঈশ্বর আমাদের এতটুকু শুভবুদ্ধি দিন, আমরা যেন বুঝতে পারি, আমাদের প্রকৃত শত্রু কে। নিশ্চয় মারাঠারা নয়। এই দেশের ভূমির অংশ তাদেরও, এটা তাদের জন্মগত অধিকার।"

মারাঠার সংগে যুদ্ধে যে ধ্বংস সাধিত হয়েছে টিপু তা দেখল। সে ভাবল, নতুন করে আমাদের এসব গড়ে তুলতে হবে। এই বিরাট ক্ষত নিরাময় করার জন্যে টিপু বিপুলভাবে প্রয়োজন বোধ করেছে শান্তির। সময় বেশি নেই, প্রকৃত শত্রু বেড়ার ওপারেই ওৎ পেতে আছে, আঘাত করার ও মৃত্যু ঘটানোর জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

## ৪১ ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণ

১৭৮৬ সালে লর্ড চার্লস কর্ণওয়ালিশ ইংরেজ গবর্নর-জেনারেল রূপে স্যর জন ম্যাকফারসনের কাছ থেকে কার্যভার গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেসটিংস ও ম্যাকফারসনের মত কর্ণওয়ালিস ব্যক্তিগতভাবে অসৎ ও দুর্নীতি পরায়ণ ছিল না। নিজের জন্যে ধনরত্ন জমানোর তার আগ্রহ ছিল না। টাকাপয়সার দিকে ঝোঁক ছিল তার কম, স্ত্রীলোকের প্রতি আরও কম। তার উচ্চাশা ছিল অন্য ধরণের। তাদের প্রতিই তার শ্রদ্ধা ছিল যেসব ইংরেজ পথিকৃৎ যারা গিয়েছিল আমেরিকায় কানাডায় অস্ট্রেলিয়ায়, এবং সেসব জায়গার বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করে ও খ্রীষ্টান সভ্যতার বিস্তার করে। শক্তিধরের অধিকারে বিশ্বাসী ছিল সে, সে বিশ্বাস করত যে ইংরেজ জাতি তার সততা ও প্রতিভার দরুন চিরকালের জন্যে মহত্তম স্থান অধিকার করে থাকবে। তার মতে, ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় বোধে ও ইতিহাসের নির্দয় প্রক্রিয়ায় এটাই হতে হবে। ইংলণ্ডকে সে যেমন দেখেছে সেই ইংলণ্ডকে সে ভালোবাসে—গর্বিত, মুক্ত, রাজকীয় সাজে সজ্জিত, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ন্যায়নিষ্ঠ, উদার ও সহনশীল। এই জাতির বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে সৌরজগতের নৈতিক বনিয়াদের উপর আঘাত হানার মতন অপরাধ। তার এই দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল যে, বৃটিশদের উপনিবেশ স্থাপন ও অন্য দেশ অধিকার হচ্ছে স্বাভাবিক একটা পরিণতি, এবং সভ্য জাতির অধীনে নিম্নমানের জাতির থাকাটা আরো মহৎ সত্যতার লক্ষণ। সে জানত পারসীয় গ্রীক হূন আরব তুর্কী ও মোঙ্গল ইত্যাদিরা উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তারা সকলেই মিলে মিশে গিয়েছে এখানে—কমবেশী ভাবে সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাদের রাজবংশ ভারতীয় রাজবংশ রূপেই পরিগণিত হয়, ভারতবর্ষকে তারা নিজেদের দেশ বলে মনে করে। এও জানত সে, ইংরেজরা এসেছে সমুদ্র পার হয়ে, তারা আলাদা জাতিরূপেই চিহ্নিত হবে। তারা ভারতীয়দের কাছে নিষ্প্রাণ, উদাসীন ও সুদূর। ভারতীয়দের স্মৃতিতে এমনটি কখনো আর কারও ক্ষেত্রে হয় নি। এ ছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তারের অছিলা আর কী ভাবে হতে পারে?

কর্ণওয়ালিশ কখনো ভারতবাসীর প্রতি কোনো ঘৃণা বা শত্রুতা কখনো মনে-মনে পোষণ করত না। ভারতবাসীর প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাবও তার ছিল না। কিন্তু তার মনে কেমন একটা সংশয় ছিল মানুষের গায়ের রং তার বুদ্ধির একটা স্তর বোধ হয় নিরূপণ করে দেয়। তার মনে ভারতবাসীর প্রতি সদাশয়তারও কোনো অভাব ছিল না। তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাজে ভারতবাসীকেও যুক্ত করে নেবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে ভারতবাসীর প্রতি একটু মমতা বোধও সঞ্চারিত হয়। এ হচ্ছে সেই রকম মমতা ক্রীতদাসের প্রতি প্রভুর যেমন হয়ে থাকে আর-কি। সে ছিল একজন সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ প্রশাসক ও পরে নিজেকে একজন সংস্কারকের কাজে উৎসাহী বলে প্রমাণিত করে। তার পূর্ববর্তীদের লুঠতরাজের কাজ ও কুশাসনের জন্যে সে ছিল লজ্জিত। যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা এদেশে চলছে তা বন্ধ করে এখানে শৃঙ্খলা পত্তনের জন্যে একটা পন্থা উদ্ভাবনে সে ছিল আগ্রহী। সবই ঠিক, কিন্তু এসবেরও উর্ধ্বে ছিল সেই রাজকীয় উদ্দেশ্য, সেই সাম্রাজ্য স্থাপন। ধর্মে বিশ্বাস রূপে একটা মনোভাব তার গড়ে ওঠে, তার নিজেদের দেশের জন্যেই তা প্রয়োজন, এর বিরোধিতা বরদাস্ত করতে সে নারাজ তার নিজের দেশের আরও অধিক গৌরবের জন্যে সে ভারতবর্ষকে এক যন্ত্র রূপে গণ্য করে। হ্যাঁ, সংস্কার নিশ্চয় আসবে, কিন্তু তা আসবে তার রাজকীয় মতলব সিদ্ধির পর, ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে নিতে পারার পর।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের সাংস্কৃতিক মতলব ও সাম্রাজ্যস্থাপনের দৃষ্টিকোণ ছিল এই রকম। ১৭৮৬ সালের আগস্ট মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিশ হল গবর্নর জেনারেল।

হেনরি ডানডাস এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলে—"সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, 'লর্ড কর্ণওয়ালিশ হচ্ছে একজন চৌকশ খেলোয়াড়, সাম্রাজ্যের গৌরব বাড়াবার জন্যে তার আপ্রাণ প্রয়াস আছে। ম্যাকফারসনের মত চতুরতা তার নেই, হেস্টিংসের মত লোভীও সে নয়। সে স্পষ্ট পথে চলার লোক, সাচ্চা, পক্ষপাতিত্বহীন ও সব বিষয়েই সম্মানিত। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার সময়ে তার দয়ামায়া থাকে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে অসাফল্যের জন্যে কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না, তার নাম আছে সব ব্যাপারে মীমাংসা করে ফেলার।" এই ডানডাসই লর্ড কর্ণওয়ালিশকে গবর্নর জেনারেল করার জন্যে জোর যুক্তি দেখায়।

সত্যিই, একটা নিষ্পত্তি করে ফেলার জন্যে সুনাম আছে কর্ণওয়ালিশের।

১৭৮১ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তার জীবনে একটা বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে। যেসব মার্কিন উপনিবেশবাদীরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের নিঃশেষ করে দেবার জন্যে বেশ আস্থার সংগেই তাকে পাঠানো হয়। বাছা-বাছা সেনাদের দল নিয়ে সে অগ্রসর হয়, তার উপর ক নাডার সৈন্যরাও তাকে সাহায্য করে, তা ছাড়া ছিল রেডইণ্ডিয়ানদের দলও। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমেরিকান কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জর্জ ওয়াশিংটনের শক্তি সাহস ও দূরদর্শিতার কাছে সে কিছুই করতে পারে না। বিপুল সংখ্যক আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয় কর্ণওয়ালিশকে, তার রসদ ছিল কম, তার যোগাযোগ হয় ছিন্ন। তার ডাকে কারও সাড়া পাওয়া যায় না, আমেরিকান বাহিনী ভেদ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। লজ্জার ও ক্রোধের মিশ্রিত অশ্রুতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে, সে আত্মসমর্পণ করে। ১৯ অক্টোবর ১৭৮১ তারিখে তার এই আত্মসমর্পণ আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের এক নিশ্চিত পরিণতি এনে দেয় এবং এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইংরেজ বাহিনী এক নিদারুণ সংকটে পতিত।

এই অসম্মানজনক ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটেছে। তার লজ্জার এই দুঃসময়টির কথা সে কখনো ভোলেনি। যাদের সে মনে করত তার আইনত সম্রাটের ঘোরতর শত্রু, যাদের সে মনে করত রাজদ্রোহী, তাদের কাছে এই পরাজয়ের গ্লানি সে কখনো ভোলেনি। পরে এ বিষয়ে তদন্ত হয়, তাতে এ ব্যাপারের জন্য দায়িত্বের থেকে রেহাই পেয়ে যায় সে। তার আত্মসমর্পণ ছিল স্বাভাবিক, তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তিক্ত স্মৃতিটা রয়েই গেল। তার এই ক্ষত নিরাময় হয় না, বেদনারও উপশম হয় না। তার এই দুঃখ ও বেদনার সংগেই থেকে গিয়েছিল আসন্ন সংকটের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তার পর এল ১৭৮৩ সাল। আমেরিকানরা তাদের মুক্তিসংগ্রামে জিতে গেল। এটাকে সে তার ব্যক্তিগত ও জাতিগত ট্র্যাজেডি বলে গ্রহণ করে। সে জানত, জগতে অন্য এক প্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর এক শত্রু—টিপু সুলতান—অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, এবং ইংরেজদের নত হয়ে শান্তি প্রার্থনা করতে হয়েছে, যার পরিণাম হচ্ছে মাংগালোরের শান্তিচুক্তি।

যে টিপু সুলতান ব্রিটিশ উচ্চাশার ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্ণওয়ালিশের মনে তার প্রতি ক্রোধ জমে উঠছিল। কিন্তু তার মনে অন্য চিন্তাও এসে গেল। মনে হল, "অবস্থাটা যদি বিপরীত ভাবে দেখা যায় তা হলে সে নিজে কি অন্যরকম কাজ করত ?" নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল

কর্ণওয়ালিশ। টিপুর সাহসিকতার কথা সে শুনেছে, তার মর্যাদাবোধ, যুদ্ধে তার দুর্ধর্ষতা, তার প্রবল দেশাত্মবোধ, বন্দীর ও আহতের প্রতি তার সদয় ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও সে শুনেছে অনেক। সে তার নিষ্কলুষতা, সত্যের ও সুন্দরের প্রতি তার ভালোবাসা সম্বন্ধেও শুনেছে। কর্ণওয়ালিশ নিজেও এইসব আদর্শে বিশ্বাসী, এবং সে তা মনে মনে গ্রহণ করেছে। "কী করে তাকে আমি ঘৃণা করতে পারি" নিজেই এ প্রশ্ন করে সে, "আমরারই ধাঁচের একজন বৈরি সে, তবে কি সে আমার কাছে মান্য নয়?" যেন রাগতঃ হয়েই সে মন থেকে এসব প্রশ্ন দূর করে দিল। ইতিহাসের যা গতি তাতে ব্রিটিশ একাধিপত্য অবশ্যম্ভাবী, এই গতিকে যে বাধা দিতে আসবে কোনোরকম বিচার-বিবেচনা না-করে, কোনো দয়া-মায়া না দেখিয়ে তাকে শেষ করে ফেলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ এইভাবেই কাজ করবে, অন্যথায় তা কার্যকরই হবে না। হ্যাঁ, নিজের মন থেকে এসব ভাবনা দূর করতে হবে, বিবেক বলে কিছু রাখা চলবে না। তার মনের ভাব কিন্তু রয়েই গেল, নিজেকে এজন্যে সে তিরস্কার করতে লাগল, আধো-মজা করে বলল, "আমি তাকে দমন করতে এসেছি, তার প্রশংসা করতে আসিনি।" সহসাই তার মেজাজ বদল হয়ে গেল, একটি প্রার্থনা জাগল তার মনে, "হে ঈশ্বর, আমাকে ক্রোধ দাও, নির্দয়তা দাও, আমি যাতে আমার দেশের শত্রুকে নিপাত করতে পারি। যত দিন তা দিতে না-পারছ ততদিনে আমার মনের গভীর থেকে আমার সহানুভূতি ও করুণা নিঃশেষে শুকিয়ে দাও, এবং আমাকে এমনশক্তি দাও যাতে আমি আমার মিশন ও আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি।"

এই ভাবে কর্ণওয়ালিশ এল ভারতবর্ষে। রাজকীয় মহিমা নিয়ে জাহাজ যখন মাদ্রাজের দিকে চলল তখন সে তার লক্ষ্য ও তার মতলব নিয়ে ভাবতে লাগল। এ বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার দেশের সম্রাটকে যে অমান্য করবে তার উপর প্রতিহিংসা নেবার ন্যায্য অধিকার তার আছে। সেই সাম্রাজ্যের বিশাল স্তম্ভ রক্ষা করতেই হবে, তা আরও মজবুত করে তুলতে হবে। সাদা ও কালো একটা বেড়ার দু পাশে দাঁড়াবে উন্নত ও অবনত হিসেবে। আমেরিকার গ্লানি দূর করে ফেলতে হবে ভারতবর্ষে বিজয়পতাকা তুলে। একজন জেনারেল হিসাবে তার সুনামে যে কলঙ্কচিহ্ন পড়েছে তা মুছে ফেলতে হবে।

"পাঁচটি আকাঙ্ক্ষা," নিজের আঙুলে সে গুনতে লাগল উদ্দেশ্যগুলি। "এ চাহিদা কি খুব বেশি হল?" সে চিন্তা করতে লাগল।

পুনরায় সে ভাবল। সে একটু আপস করে নিতে রাজি। মাত্র একটা

আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না হয় সে থাকবে, অতগুলি আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে সে কারও উপর চাপ দেবে না, খুব বেশি দাবিও করবে না। হ্যাঁ, একটি মাত্র বাসনা— মাত্র একটি। সে মনে মনে ঠিক করে নিল, ' টিপু সুলতানকে হত্যা, তাকে শেষ করে ফেলা। বাকিগুলি এসে যাবে সহজেই।"

তার মন এখন পরিষ্কার। এই একটি বাসনা পূরণ করতে পারলেই পাঁচটি আকাঙ্ক্ষারই পূরণ হবে যাবে। পাঁচটি বাসনার কথা সে আবার ভাবতে লাগল। হ্যাঁ সব ক'টিই তার কব্জায় এসে যাবে, যদি সে মুছে ফেলতে পারে টিপু সুলতানকে।

"তাহলে, হে প্রভু আমার ঐ ইচ্ছেটা পূরণ করে দাও," প্রার্থনা করতে লাগল সে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এই সামান্য প্রার্থনা পূরণে দ্বিধা করবেন না। এই একটি প্রার্থনা জানানোই তার কাছে মনে হল মস্ত এক জয়। কেননা, এর ফলে তার সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে।

জাহাজের রেলিঙে একটা সমুদ্রশকুন বসেছে। সে ডাকছে তার সহচরীকে। চিন্তায় বাধা পড়ল কর্ণওয়ালিশের। সে বা'র করল তার রাইফেল। তার তাক খুব ভালো। পাখিটা পড়ে গেল, ছটফট করল, মরে গেল। কর্ণওয়ালিশ নিজেকেই বলল, ' ঠিক এই ভাবেই তুমি মরবে, টিপু, সঙ্গীহীন হয়ে, তোমার ডাকে কেউ সাড়া দেবে না।"

আর একটা পাখি যদি দূরে থেকে আর্তনাদ করে উঠে থাকে, কর্ণওয়ালিশ তা শোনেনি। সে তখন নিজের গৌরব ও গরিমার চিন্তায় মগ্ন—সে তখন সাম্রাজ্যের চিন্তায় বিভোর।

কর্ণওয়ালিশের এই স্বপ্ন তার একান্ত নিজস্ব নয়। লণ্ডন থেকে তাকে সব মতলব দিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকার উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হওয়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গিয়েছে, ইংরেজের মনোবল ভেঙে পড়েছে, কোষাগারে টান পড়েছে। ব্রিটেনের পক্ষে আমেরিকার উপনিবেশ খোয়া যাওয়ার অর্থ হাডসন বে থেকে গালফ্ অব মেক্সিকো পর্যন্ত বিস্তৃত ডোমিনিয়ন ছেড়ে দেওয়া। এ'তেই অবশ্য তার সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে সব শেষ হয়ে গেল না। এখনো তার হাতে আছে কানাডার উপনিবেশ, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ। কর্ণওয়ালিশকে তার উপরওয়ালারা সাফ বলে দিয়েছিল যে, আমেরিকায় তাদের যা খোয়া গিয়েছে ভারতবর্ষে সেই ক্ষতি পূরণ করে নিতে হবে। সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিতে হবে, এ কাজের যে বাধা হয়ে আছে

সেই টিপ্‌ু সুলতানকে শেষ করে ফেলতে হবে। তার উপরওয়ালারা তার চেয়ে উপযুক্ত লোক আর পেত না—একজন দক্ষ জেনারেল, একজন অক্লান্তকর্মী, একজন প্রশাসক এবং এমনই একজন মানুষ সে যাকে নাকি তার আত্মসমর্পণের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই।

"ওরা আমাকে যাচাই করে দেখছে।" নিজেকেই বলল কর্ণওয়ালিশ, "ঈশ্বরের নামে শপথ করছি তাদের আমি নিরাশ করব না, জেমিমা।" জেমিমা হচ্ছে তার স্ত্রীর নাম। কয়েক বছর আগে সে মারা গিয়েছে, তার মনে কোনো ভাবাবেগ এলেই তাকে স্মরণ করে কর্ণওয়ালিশ।

# ৪২. মানুষের অধিকার

ক

আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব যদি ব্যক্তিগত ভাবে কর্ণওয়ালিশের উপর এবং ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপনিবেশ স্থাপনের নীতির উপর পড়ে থাকে, তাহলে একথাও বলতে হয় যে, টিপু সুলতানের উপরেও ওসবের প্রভাব কম নয়। এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে যার ফলে হাজার-হাজার মাইল দূরের যুদ্ধের প্রতিও তার ঔৎসুক্য জাগে।

টিপুর বিবাহের প্রাক্কালে, আমেরিকার যুদ্ধ বাধতে যখন দু বছর বাকি, তখন হাইদর একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার যা-কিছু আছে তার সবই তোমার, কিন্তু তবু বলো, তোমার বিবাহে আমার কাছ থেকে কী উপহার তুমি চাও?"

"আমাকে যা দিয়েছ তাই যথেষ্ট, যথেষ্টেরও বেশি।" উত্তরে টিপু বলল। কিন্তু হাইদর তবু জানতে চাইলেন। টিপু তখন বলল যে তার ইচ্ছে একটা লাইব্রেরি গড়ে তোলা।

হাইদর থ হয়ে গেলেন, বললেন, "লাইব্রেরি! তার মানে তুমি বলতে চাও বই?"

হাইদর নিজে লিখতে-পড়তে পারতেন না। তিনি অবশ্য হিসাবের খাতার গুরুত্ব বুঝতেন বিশেষ করে কর-আদায়ের খাতা, কত কর বাকি পড়ে আছে, কী আদায় করতে হবে সংক্রান্ত খাতা। কোরান গীতা বাইবেল গ্রন্থ বা জ্ঞাপ সাহেব ইত্যাদি যারা পাঠ করে তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অবশ্য ছিল। এসব বই মানুষকে অন্তত দুষ্কর্ম থেকে দূরে রাখে, তিনি ভাবতেন। যাই হোক, গোবর্ধন পণ্ডিত ও মৌলভি ওবেদুল্লা এরকম অনেক বই রেখে গিয়েছেন, সেগুলি টিপুর মস্ত পড়ার ঘরে জমা হয়ে আছে। আরও বই যদি দরকার বলে মনে করে টিপু, অবশ্যই তিনি তাঁর পুত্রকে বঞ্চিত করবেন না।

আমার "রাজ্যে যত বই আছে আজই কেনার জন্যে আমি আদেশ করব।" বললেন উদারচেতা হাইদর।

বিনীতভাবে টিপ্‌ন বলল তার যা ইচ্ছে তাতে এটা আরও বড় রকমের হোক। "আমি সব জাতির সব রকম সংস্কৃতির বই সংগ্রহ করার ইচ্ছুক।" টিপ্‌ন বলেছিল। হাইদরের বিব্রতভাব দেখে সে জানায়, "অন্যান্য জায়গায় মানুষে কিভাবে জীবনধারণ করে আমার তা জানার ইচ্ছে—কী করে তারা দুর্জনের সম্মুখীন হয়, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কী ভাবে…"

হাইদর তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "যুদ্ধ! অবশ্যই। কে বলতে পারে, পৃথিবীর লোক একদিন তোমার যুদ্ধের কথাই পড়বে।" এই চিন্তায় হাইদর খুশি হলেন। তার পর তাঁর মনে এল এক সংশয়, তিনি জানতে চাইলেন, "সারা পৃথিবীর বই। কিন্তু সেসব নিশ্চয়ই নানারকম ভাষায় লেখা?"

বিদেশী ভাষার মধ্য টিপ্‌ন অত্যন্ত ভালোভাবে জানত পারশীয় ভাষা। ইংরেজি ও ফরাসিও সে পড়েছে, কিন্তু এই দুই ভাষার উপর তার দখল আছে এমন দাবি করে না। সে অবশ্য জানে যে আরও অনেক রকম ভাষায় পৃথিবীর মানুষ তাদের মনের কথা প্রকাশ করে।

টিপ্‌ন বলল, "হ্যাঁ। এইজন্যে সেসব অনুবাদ করানো দরকার। আমি অল্পে তুষ্ট হতে জানিনে।"

"আমার কাছে যখন তুমি যা চাও তা সব সময়ই অল্প বলে আমার মনে হয়।" সস্নেহে এই কথা বলে সোৎসাহে তিনি ডাকলেন পুরনাইয়াকে।

তাকে হাইদর বললেন, "আমার পুত্র একটি গ্রন্থাগার চায়। সেটা সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হোক—পরিপূর্ণ হোক বইএ। দরকার বুঝলে নতুন একটা ইমারত গড়ে তোলো। আমার ইচ্ছা অনেক অনুবাদক নিযুক্ত হোক।" তিনি আরো খুঁটিনাটি নির্দেশ দিতে ইচ্ছে করেছিলেন, তাঁর পুত্রের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির জন্যে নিজেই সব নির্দেশ দেবেন বলে তাঁর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তিনি বললেন, "তুমি সবই বুঝতে পেরেছ, পুরনাইয়া?"

একটু হেসে পুরনাইয়া বলল, "সব বুঝেছি।" হাইদর পুরনাইয়ার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন, সে দৃষ্টির মধ্যে একটু ঈর্ষা যেন ছিল।

হাইদর বললেন, "আমার পুত্রকে তুমি কখনো-কখনো আমার চেয়ে বেশি বোঝো।"

পুরনাইয়া বলল, 'ভালোবাসাই হচ্ছে বুঝতে পারা।"

হাইদর বললেন, 'হে চতুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলতে চাও যে আমার পুত্রকে তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালোবাস?"

"বোধ হয় তাই।" স্থিরভাবে বলল পূরনাইয়া।

টেবিল থেকে একটা মোটা বই তুলে সেটা পূরনাইয়ার প্রতি ছুঁড়তে গেলেন হাইদর।

হাসতে-হাসতে পূরনাইয়া বলল, "আমি ভেবেছিলাম, আপনার পুত্র আপনাকে বই-এর প্রতি শ্রদ্ধা হয়তো শিখিয়েছে।"

হাসতে-হাসতে হাইদর বললেন, "বইএর প্রতি, হ্যাঁ। তোমার প্রতি—না।"

এইভাবে টিপুর লাইব্রেরির পরিকল্পনা হল। কয়েক বছরের মধ্যে তা পৃথিবীর অন্যতম একটি সুন্দর লাইব্রেরি হয়ে উঠল। পূরনাইয়া এখানে প্রধান লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করল নুরুল আমিনকে। তার সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ক্যাটালগ-প্রস্তুতকারক, গবেষণা-সহকারী ইত্যাদিও কয়েকটি দেশ থেকে নির্বাচন করা হল। ফরাসি জার্মান ইংরেজ গ্রীক লাটিন অনুবাদকও নিযুক্ত হল।

এই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ছাড়াও পূরনাইয়ার সহযোগিতায় টিপু তার রাজ্যের সর্বত্র ছোট ছোট লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করল। "শ্বাসপ্রশ্বাসের মত অধ্যয়নও হবে সর্বজনীন", সে বলেছিল।

ছেলেমেয়েরা উৎসাহিত হয়ে লাইব্রেরিতে আসতে লাগল, ও পড়তে লাগল বই।

পৃথিবীর সর্বত্র বইয়ের খোঁজখবর নেওয়া হতে লাগল। কখন বই এসে পৌঁছবে সেই স্বর্ণ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত টিপু। সে প্রায়ই বলত, "এইসব হচ্ছে আমার ঐশ্বর্য, পূরনাইয়া। সোনা-রূপার চেয়েও দামী—যা নাকি কেউ চুরি করতে পারবে না, নষ্ট করতে পারবে না।"

কিন্তু, তার ধারণা ছিল কত ভ্রান্ত! ইংরেজরা যখন পাকাপাকিভাবে শ্রীরংগপত্তম অধিকার করল, তখন তার লাইব্রেরিটি হল তাদের একটা বলি।

খ

টিপু সুলতানের লাইব্রেরি-সমূহের কি-কি ধরণের বই সংগ্রহ করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে পরামর্শ চেয়ে প্রায়ই পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনের কাছে বার্তা পাঠানো হত। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পিয়েরি ক্যারন দ্য বোমারশাই ( Pierre Caron de Beaumarchais ), ইনি হলেন একজন প্রবলপ্রতিভাসম্পন্ন ফরাসি, *Barber of Seville* এবং *Figaro* গ্রন্থের রচয়িতা, আমেরিকার স্বাধীনতার পক্ষে একজন দুর্ধর্ষ সমর্থক। আমেরিকাকে অস্ত্র সরবরাহের জন্যে তিনি Hortalez and

Company নামে একটা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন লিবারেল চিন্তাধারার একজন প্রবল সমর্থক, ভলটেয়ারের সমসাময়িক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। মারকুই দ্য লাফায়েতি ও অন্যান্য ফরাসি স্বেচ্ছাবাহিনীকে আতলান্তিক পার হয়ে গিয়ে আমেরিকানদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে তিনি ছিলেন অন্যতম সহায়ক।

১৭৭৬ সালের কাছাকাছি সময়ে ফরাসি বিদেশমন্ত্রী কাউণ্ট ভারগানেস বোমারশাই'কে জানান যে, হাইদর আলির তরফ থেকে পুরনাইয়া তাঁকে একটি অনুরোধ জানিয়েছে ফরাসি সাহিত্য সংস্কৃতি চিত্রকলা ও দর্শন বিষয়ে উৎকৃষ্ট কি-কি বই আছে তা জানাবার জন্যে।

কাউণ্ট ভারগানেস বলেন, "তুমি লক্ষ করবে, মঁশিয়ে বোমারশাই যে, প্রধান মন্ত্রী পুরনাইয়া এমন বই সম্বন্ধে আমাদের পরামর্শ চেয়েছেন যা অতি উৎকৃষ্ট ও তথ্যপূর্ণ। এই বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে তোমার বই বুঝি এর অন্তর্গত হচ্ছে না।"

বোমারশাই উত্তর দিয়েছিলেন, "ব্যাপারটা এর ঠিক বিপরীত। বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে আমার বই ছাড়া আর সবই এর অন্তর্গত নয়। তবুও, দয়াপরবশ হয়ে, আমি এমন একটা তালিকা তৈরি করব যাতে অন্য লোকদের বইও থাকবে।"

হাইদর আলির তরফ থেকে পাওয়া অনুরোধে বোমারশাই একটু মজা অনুভব করেন। "প্রাচ্যের এক স্বৈরাচারী ও অত্যাচারীর যে বইয়ের তৃষ্ণা আছে তা দেখে মনে হচ্ছে মানুষটা পুরোপুরি একটা অপদার্থ নয়।" ভাবেন বোমারশাই। সুতরাং তিনি কেবলমাত্র একটি তালিকা তৈরি করেই শান্ত হবেন না। তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে তিনি অনেকগুলি বই বের করেন, কিছু কেনেন, এর সবই লিবারেল চিন্তাধারা সংক্রান্ত যার সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনও যুক্ত আছে— অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার অধিকার স্বীকৃত আছে এ'তে। "স্বৈরাচারী জানুক তার শাসনে নিষ্পেষিত জনগণ কী রকম চিন্তা করে, সে যদি নিজেকে সংশোধন না করে তাহলে ভয়ে তাকে কাঁপতে হবে।" হাইদর আলির জন্য বই গোছাতে-গোছাতে ভাবতে লাগলেন বোমারশাই। কাউণ্ট ভারগানেস তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পুরনাইয়ার যে চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলেন তিনি সেই চিঠির কথা ভাবতে লাগলেন। তাতে আরও কিছু খবর জানতে চাওয়া হয়েছে—পারশীয় বা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এমন-কিছু বই। বোমারশাই এ রকম কোনো বইয়ের কথা মনে করতে পারলেন না। কিন্তু তিনি খুবই উৎসাহী পুরুষ। তিনি তাঁর বন্ধু রাজা মহুদি'র শরণাপন্ন হলেন, ইনি

একজন পারশিয়ান স্কলার, অনেক পড়াশুনা করেছেন কিন্তু লিখেছেন খুব কম, কেননা" প্যারিসের নারী, ফরাসী সুরা ও পৃথিবীর মোহিনী শক্তি আমার মন মাতিয়ে রাখে, প্রিয় পিয়েরি।" তিনি অবশ্য আমেরিকান স্বাধীনতার সনদ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করার ভার নেন।

গ

এইভাবে ১৭৭৮ সালে টিপু সুলতান অনেকগুলি বই পায়, মহীশূরের লাইব্রেরির জন্যে যা কাউন্ট ভারগেনেসকে উপহার দেন মঁশিয়ে বোমারশাই। এর মধ্যে ছিল মূল ইংরেজি সহ আমেরিকার স্বাধীনতা সনদের ফরাসি ও পারস্য অনুবাদ—১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই তারিখে ফিলাডেলফিয়ায় টমাস জেফারসন কর্তৃক রচিত এই সনদ ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

এই সনদ দেখে টিপু সুলতান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মনোনিবেশ করে সে তা পাঠ করে, তার ভাব তার ভাষায় সে মুগ্ধ হয়, এর প্রতিটি বাক্য আন্তরিকতায় পূর্ণ, সুবিচারের জন্য এর উচ্চকণ্ঠ নিনাদ, অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তির জন্য এর দাবি, অসহায় মানুষকে নির্যাতনকারীর প্রতি ক্রোধ, মানুষের অধিকার, অত্যাচারীকে উচ্ছেদ, বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি, ন্যায্য কারণে যুদ্ধ—এইসব বিষয় টিপুর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পড়তে লাগল টিপু—

"আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এইসব সত্য উক্তি সহজেই সকলের বোধগম্য হবে—সমান মানুষ সৃষ্টিকালে সকলেই সমান, সৃষ্টিকর্তা তাদের পরিপূর্ণ অধিকার দিয়ে দিয়েছেন,—এর মধ্যে হচ্ছে প্রাণধারণ স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান. এইসব অধিকার ভোগ করার জন্যেই মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় গবর্নমেন্ট. শাসিতদের অভিমত দ্বারা চালিত হয়ে এই গবর্নমেন্ট বা শাসক তার কার্য সম্পাদন করে, যখনই কোনো গবর্নমেন্ট এইসবের বিরুদ্ধে কাজ করে, তখনই মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে সেই গবর্নমেন্টকে উচ্ছেদ করার ও নূতন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায়—যে গবর্নমেন্টের বনিয়াদ ঐসব নীতির উপর স্থাপিত, সকলের নিরাপত্তার ও সুখসমৃদ্ধির জন্যে যে দায়িত্ব পালন করবে।"

টিপু সুলতান পড়ে যেতে লাগল। একটা জায়গায় সে থামল, সেখানে অপদার্থ ইংরেজ রাজা কী ভাবে ধ্বংসযজ্ঞ করেছে তার আবেগপূর্ণ বর্ণনা আছে—

"সে আমাদের সমুদ্র লুণ্ঠন করেছে, আমাদের উপকূল তছনছ করেছে, আমাদের শহর পুড়িয়েছে, আমাদের দেশের মানুষের জীবননাশ করেছে।"

"সে এখন বহু বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য এখানে পাঠাচ্ছে তাদের সেই সংহারের অত্যাচারের যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করতে, যা নাকি তারা এমন নিষ্ঠুরতার সংগে সাধন করেছে যে বর্বরতার কাজ বর্বরযুগেও হয়নি।..."

"তাদের শোষণের প্রতি স্তরে আমরা প্রতিকারের জন্যে বিনীত প্রার্থনা জানিয়েছি আমাদের প্রতিকারের প্রার্থনা নূতন আঘাত দিয়ে নাকচ করা হয়েছে। এক রাজপুরুষ যার প্রতিটি কাজই হচ্ছে অত্যাচারের, সে স্বাধীনচেতা মানুষের শাসক হবার অযোগ্য।"

তার পরে টিপু থামল সেইখানে যেখানে সংযুক্ত উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের জন্য আমেরিকার যাবতীয় জীবন, ঐশ্বর্য ও মানসম্ভ্রম সমর্থন করার শপথ করা হয়েছে।

প্রথমে সে মনে মনে তা পাঠ করে। তার পর সায়াদ সাহেব ও পুরনাইয়াকে পড়ে শোনায়। 'এ ব্যাপারে কী মনে কর?'' সে জানতে চায়।

"আমার কাছে রাজদ্রোহিতার মত মনে হচ্ছে।" সায়াদ সাহেব সাহস করে বলল। পুরনাইয়া চুপ করে রইল।

টিপু বলল, 'নিশ্চয় রাজদ্রোহিতা। কিন্তু কার দ্বারা রাজদ্রোহিতা? আমার মনে হচ্ছে প্রজার বিরুদ্ধে এ হচ্ছে রাজার রাজদ্রোহিতা।"

'এটা একটা অসম্ভব চিন্তার মত মনে হচ্ছে। তাই না" জানতে চাইল সায়াদ সাহেব।

"না।" টিপু বলল, অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এতে নতুনত্বও কিছু নেই। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক বাস্তবতা, প্রাচীন ভারতে যা ছিল এখানে, "যা আশ্চর্যজনক তাহলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই রাজা সম্বন্ধীয় ধারণা সুদূর আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তদনুযায়ী কাজও হচ্ছে সেখানে—যার ফলে উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যলোভী শক্তির নাভিশ্বাস উঠেছে।"

সে তখন সায়াদ সাহেবকে রাজা-সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার কথা বুঝিয়ে বলল, এ'তে ঈশ্বরত্ব নেই, রাজায় ও প্রজায় এখানে ছিল এক সামাজিক বন্ধন। সে সেই কাহিনী বিবৃত করল—

"মানুষ যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হল, তখন মানবজাতি অপার্থিব স্তরে বাস করত। বেচে-গেয়ে চলত হাওয়ায়-হাওয়ায়, যেন পরীর রাজ্য সেটা, খাদ্য বা পরিধেয় তাদের প্রয়োজন হত না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, পরিবার ছিল না, গবর্নমেন্ট ছিল না, আইন ছিল না। ক্রমশঃ অপার্থিব স্তরের ক্ষয় ঘটতে লাগল, মানবজাতি হয়ে গেল মৃত্তিকায় আবদ্ধ, তার প্রয়োজন

হতে লাগল অস্ত্র-বস্ত্রের। মানুষ যখন তার পুরাতন গৌরব হারাল, গোষ্ঠীচেতনা এল তাদের মনে, পরস্পরের সঙ্গে তারা রফায় এল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার-ব্যবস্থা তারা মেনে নিল। যাতে তাদের এই সম্পত্তি ও পরিবার মর্যাদা পায়, এসব রক্ষায় ব্যবস্থা হয় সেজন্যে তারা একত্র হয়ে তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেয় যে নাকি তাদের মাঠের শস্যের ভাগ পেয়ে ঐসব সংরক্ষণ করবে। তাকে বলা হত মহাসম্মত, সে খেতাব পায় রাজা, তার কারণ তার কাজই ছিল সকলকে রঞ্জন করা—রঞ্জয়তি ক্রিয়া থেকে এর উদ্ভব।"

এই হচ্ছে, টিপু বুঝিয়ে বলল, প্রাচীন ভারতে রাজা সম্বন্ধে ধারণা। এটা হচ্ছে আদিতম ব্যবস্থা, চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজ্যগঠনের সংজ্ঞা। এ'তে বোঝানো হচ্ছে গবর্নমেণ্টের প্রধান হিসেবে রাজা হচ্ছেন প্রথম সমাজসেবক, তাঁর অস্তিত্ব হচ্ছে প্রজাসাধারণের সমর্থন।

সায়াদ সাহেব ও পূরনাইয়া বিদায় নেবার পর টিপু ঐ সনদ আবার পড়তে লাগল। সে জানত প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারায় রাজা'র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নিয়োগ, তার কার্যপরিচালনা ইত্যাদি সবই জনগণের প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে আইন রক্ষা করা ও মহানুভবতার সংগে শাসন পরিচালনা করা। এ কাজে তার অক্ষমতা দেখা দিলে সে আর রাজা নয়। টিপু সুলতান অথর্ব বেদের সেই অনুচ্ছেদটি স্মরণ করল যেখানে প্রথম রাজা মনু বৈভস্বত'কে নির্বাচন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এটা প্রজার ইচ্ছা তাকে বসানো, এবং প্রজারই খুশি তাকে সরানো। রাজা-সম্বন্ধে অলীক ধারণা 'তার ঐশ্বরিক অধিকার' বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় কিছুই ছিল না। টিপু তা জানত। এও সে জানত যে গ্রীকদের থেকে আরম্ভ করে অনেক বিদেশী আক্রমণকারী এদেশে এসেছেন বিশৃংখলা সৃজনের জন্যে। অথর্ব বেদ থেকে অভিষেক মন্ত্র সে স্মরণ করল, এবং জনগণের দ্বারা রাজা মনোনয়ন বিষয়েও সে ভাবল। রাজার আসন বহাল রাখা হবে কিনা সে সম্বন্ধে ঋগ্বেদ থেকে মন্ত্রও সে মনে মনে উচ্চারণ করল, তাতে বলা হয়েছে জনগণের অনুমোদন থাকলে তবেই তা বহাল থাকবে।

টিপু তার পর ভাবতে লাগল বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় শাসকদের কথা, সেই সঙ্গে ভাবল ইংরেজ উপনিবেশবাদার হালও। তাদের বাহ্যিক রাজকীয়তা এবং ভান সে মনে করল। জনগনের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্যের মনোভাব, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের উদাসীনতার কথাও ভাবল। টিপু সুলতানের কাছে আমেরিকার এই স্বাধীনতার সনদ যেন এসে গেল মুক্তবায়ুর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে, ভারতবর্ষীয় চিন্তাকেই সেখানে কাজে পরিণত করার সংকল্প নেওয়া হয়েছে, ভারতীয় চিন্তার প্রতি টিপুর অগাধ শ্রদ্ধা।

পরে টিপু আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিষয়ে জানার চেষ্টা করতে লাগল—কি রকম অগ্রগতি হচ্ছে সেখানে। সে শুনেছে বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা, আমেরিকার মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি প্রতিনিধি হিসাবে আছেন। তিনি তাঁর সরল কথাবার্তায়, সহজ আদব কায়দায় ও ঘরে বোনা পোশাকে ফরাসি সমাজকে মোহিত করেন। তরুণ ফরাসি অভিজাত সন্তানদের কথাও সে শুনেছে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করেনি বটে, তবুও সেইসব তরুণেরা আমেরিকার মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে জর্জ ওয়াশিংটনের সংগে মিলিত হতে গিয়েছিল। ফরাসি সরকারের সহায়তার জন্য ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রভৃত চেষ্টার কথা অনেকে তাকে বলেছে; ফ্র্যাঙ্কলিনের আর্থিক অনটনের কথাও সে শুনেছে।

তার পরে মহীশূরে এল এক ব্যক্তি, রেভারেণ্ড ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডেরিক শোয়ার্টজ Schwartz হল তার নাম। প্রাশিয়ায় তার জন্ম, ভারতবর্ষে সে আসে দিনেমারদের অধিকৃত এলাকায় প্রটেস্টাণ্ট মিশনের সংগে কাজ করার জন্য। পরে সে নিজের প্রতিভা আবিষ্কার করে, কূটনীতিতে গোয়েন্দাগিরিতে ও চক্রান্ত করতে সে যে ওস্তাদ তা সে বুঝতে পারে। সে আরও বোঝে যে, ধর্মীয় কাজের চেয়ে এই কাজে মুনফা অনেক বেশি। যে তাকে অধিক মূল্য দেবে তার হয়েই কাজ করতে সে পারংগম, এবং কখনো-কখনো ডবল ভূমিকাও সে নিয়েছে। সে একজন মজাদার কথক ছিল, বিদেশের অনেক পরিচিত জনের সংগে নিয়মিত সে পত্রালাপ করত। অনেক সময় সরকারি চিঠির আগেই তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যেত। টিপু সুলতান তখনও এই লোকটার চরিত্রের এই কালো দিকটা সম্বন্ধে কিছু জানেনা, কিন্তু এর ভাবগম্ভীর মুখ দেখে এবং পৃথিবীর কোথায় কখন কী হচ্ছে সে বিষয়ে এত খবর দিতে পারে দেখে এর প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়। ফ্র্যাঙ্কলিন সম্বন্ধে সে বলে যে ফ্র্যাঙ্কলিন নাকি তার পুরণো বন্ধু। ফ্র্যাঙ্কলিনের দেশাত্মবোধ ও জ্ঞান, তাঁর দৈন্য ও অর্থকষ্ট, বিশেষ করে ফরাসিদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেতে অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে টিপুকে অনেক কথা বলে সে। পরদিন টিপু ঐ লোকটার হাতে দান হিসেবে মোটা টাকা দিল ফ্র্যাঙ্কলিনকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। লোকটা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল যে ফ্র্যাঙ্কলিনের চেয়ে তার নিজের প্রয়োজন অনেক বড় ও জরুরি। সুতরাং টাকা সে নিজের জন্যে রেখে দিল। প্যারিস থেকে লেখা একটা চিঠি পেল টিপু, তার নিচে যা সই আছে তা নাকি ফ্র্যাঙ্কলিনের। চিঠিতে টিপু সুলতানের

ও তার বাবার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে, বলা হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রতি সম্মান জানাবার ফ্র্যাঙ্কলিনের নাকি আজন্ম বাসনা। ইতিমধ্যে আরও কিছু টাকা পেলে ভালো হয়। চিঠিটা এত স্তাবকতায় ও তোষামোদে পূর্ণ যে, টিপু একেবারে হতাশ হয়ে গেল, ফ্র্যাঙ্কলিন সম্বন্ধে তার মনের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। পরে অবশ্য টিপু জানতে পারে যে, এ ব্যাপারটা হচ্ছে ঐ লোকটার চালাকি। নিজের বোকামির জন্যে টিপু হাসল, ঐ বদমায়েশটাকে সে চিনতে ভুল করে ফেলল! এর পর থেকে ঐ লোকটা টিপুর থেকে অনেক তফাতে থাকত। এবং অবিলম্বে সে হয়ে গেল ইংরেজদের পুরোপুরি এক গোয়েন্দা। নিজেকে সে বলতে লাগল ইংরেজ পাদ্রি, এবং নিজের নাম বদল করল, Schwartz থেকে হয়ে গেল Swartz তার নাম। পরে সে হাইদর আলি ও টিপু সুলতান সম্বন্ধে অনেক কেচ্ছাকাহিনী লেখে। তার সে লেখার অনেকটাই আমাদের কালেও এসে পেঁছেছে, এতে একটা ঘটনার উল্লেখ একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে, সায়াদ শাহের তাকে গ্রেপ্তার করে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়ে এসেছিল টিপুর কাছে, তখন তার প্রায় মরণদশা।

লোকটা তখন কাঁপছে, অবশ্য শীতে নয়, টিপু তাকে বলল, "এই শয়তান, আজ যেন তোমাকে নির্বাক দেখছি। যাই হোক, বলো, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে আমাদের পাঠানো টাকার কী হল? শুনলাম, তিনি নাকি তা পাননি।"

লোকটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল যে, সে ভুলে গিয়েছিল, অবিলম্বে সে ফ্র্যাংকলিনকে তা পাঠিয়ে দেবে।

"কিন্তু আমাকে একটা জাল চিঠি পাঠাবার কথা তো বেশ মনে ছিল।" টিপু তাকে মনে করে দিয়ে বলল, "বের করো, এক্ষুনি বের করো সেই টাকা।"

করুণ ভাবে সে বলল, "সায়াদ সাহেব আমার সবস্ব লুণ্ঠন করেছে।"

"বেশ," টিপু বলল, "ওটা তোমার ও সায়াদ সাহেবের ব্যাপার, তোমরা বুঝে নাও। আমাদের আমেরিকার বন্ধুর জন্যে পাঠানো টাকা কোথায়?"

"আমি তা দিলে আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?" লোকটা বলল।

মৃদু হেসে টিপু বলল, "কে জানে!"

"তাহলে আমাকে যেতে দিন, শপথ করছি সাত দিনের মধ্যে টাকা পেঁছে যাবে আপনার কাছে।" বলল লোকটা।

টিপু হেসে উঠল, "তুমি আর তোমার শপথ! সায়াদ সাহেব, একটা মৃতদেহ লটকাবার জন্যে একটা দণ্ড পোঁতার ব্যবস্থা কর। এই লোকটা জীবিতাবস্থায়

আমাদের অনেক আমোদ দিয়েছে, তার মৃত্যুর সময়েও সে আমাদের আনন্দ দিয়ে যাক।"

টিপুর এটা তামাশা. কিন্তু লোকটা তা বুঝবে কী করে। সে মার্জনা ভিক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কোনো সাড়া না-পেয়ে তার দুই ব্যাঙ্কারের কাছে দুটি নোট লিখল। নোট নিয়ে চলে গেল বার্তাবহ। লোকটা টিপুর শিবিরে আটক রয়ে গেল। তার জন্যে নতুন পোশাকের আদেশ দিল টিপু, সে যাতে ভালো খানা পায় তার দিকে নজর রাখল। দু-একদিনের মধ্যেই লোকটা নিজস্ব মন-মেজাজ ফিরে পেয়ে গেল।

টিপু তাকে আমন্ত্রণ জানানোর মতন করে বলল, "এসো, আমাদের একটু আমোদে মাতাও।"

সায়াদ সাহেব মাঝখান থেকে বলল, "জামানকে ( টিপুর নাপিত ) বলা হোক তার ক্ষুরে ধার দিতে, কোনো মিথ্যে কথা বলা মাত্র ওঁর জিভ কেটে বের করা হবে।"

এদের হাসিতে যোগ দিল লোকটা, কিন্তু তার মুখ ভয়ার্ত, কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভয় ভাব কেটে গেল, টিপুকে সে বলতে লাগল বহু দূর দেশের সব বার্তা—কখনো-কখনো তা রসাল করে তুলতে লাগল জনরব মিশিয়ে ও ব্যক্তিগত মন্তব্য জুড়ে দিয়ে। যে দু-একটা সত্যি খবর সে দিল তা টিপুর আগেই জানা। টিপুর পরামর্শ-মত পুরনাইয়া তার লাইব্রেরির জন্যে বই আর পাণ্ডুলিপিই কেবল সংগ্রহ করে না, নিয়মিত সংবাদ আনাগোনা করার জন্যে একটা ব্যবস্থাও সে গড়ে তুলেছে। তবুও লোকটা অনেক মজার-মজার বার্তা বলেই যেতে লাগল। ইয়র্কটাউনে কর্ণওয়ালিশের আত্মসমর্পণের কথা সে বলল। জেনারেল বুরগোইনের অধীনস্থ বৃটিশ বাহিনী ১৭৭৭ সালে সারাগোটায় কিভাবে আত্মসমর্পণ করে তার বিবরণ দিল, এমনভাবে বলল যেন ঘটনাটা তার চোখের সামনে ঘটে। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই আমেরিকান বিদ্রোহীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে কত বিরোধিতা করে, কিন্তু তার মতলব কিভাবে বানচাল করে দেয় তার স্ত্রী রানী মারি আন্তোনিয়েত, এবং তার প্রধানমন্ত্রী কোঁতে দা মরিপাস—যে নাকি নিজের গদি রক্ষার জন্যেই ব্যস্ত, এর জন্যে ভার্সাইয়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কত দহরম-মহরম! বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন সম্বন্ধেও অনেক কথা বলল সে, তাকে কতটা স্নেহ করে ফ্র্যাঙ্কলিন তাও বলল। লোকটা অবশ্য নিশ্চিত ছিল যে আমেরিকার অভিপ্রায় পূর্ণ হতে পারেনা, তাদের অবস্থা সঙ্গীন। টিপু

যখন মাঝখান থেকে বিপরীত আশা প্রকাশ করল, তখনই লোকটা বলতে লাগল যে আমেরিকানদের সুযোগ অবশ্যই আছে, ক্রমে সে তার দৃঢ় বিশ্বাসই প্রকাশ করে বলল যে, আমেরিকার চেষ্টা সফল হতে বাধ্য, কিন্তু তাদের মিত্র ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

লোকটা তার দুই ব্যাঙ্কারকে যে নোট পাঠায় তারা তার উত্তর দিল। দু জায়গায় সে লিখেছিল ভয়ে, যে-কোনো একজন যদি সাড়া না-দেয়, এই জন্য। ফলে এই দাঁড়াল যে, ফ্র্যাঙ্কলিনকে যে টাকা পাঠানো হয়েছিল তার ডবল টাকা এসে গেল। অর্ধেকটা টিপু দিয়ে দিল লোকটাকে। লোকটার চলে যাবার সময় হলে টিপু তাকে একটা ঘোড়া দিল এবং বাকি অর্ধেকটাও দিয়ে দিল। "তুমি তোমার গল্প শুনিয়ে আমাদের হাসিয়েছ, দান হিসেবে এসব নিয়ে যাও। ফ্র্যাঙ্ক-লিনের সঙ্গে আমি হিসাব বুঝে নেব।"

লোকটা চলে গেল। ভবিষ্যতে সে সৎ ব্যবহার করবে বলল, এমন কথা অবশ্য তাকে বলতে বলা হয়নি। "আমি আর পাপ কাজ করব না।" বলল সে। কিন্তু পাপ-কাজ সে করেই চলল। তার শয়তানি তার মধ্যে এমনই বদ্ধমূল যে কৃতজ্ঞতা-বোধ বলতেও তার কিছু নেই। যাই হোক তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র সে তপ্তভাবে বলত, ওসব কৃতজ্ঞতা-বোধ মানুষের মধ্যে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কুকুরদের মধ্যে—অবশ্যই, হাতি ঘোড়ার মধ্যে—সম্ভবত, মানুষের মধ্যে—না। এই রকম সে হয়তো বলত। ইংরেজদের জন্যে খবর সংগ্রহের জন্যে যে সারা দেশ চষে বেড়িয়েছে, মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার জন্যে স্থানীয় প্রধানদের উস্কানি দিয়ে চলেছে, ইংরেজ কমান্ডারদের উৎসাহিত করে চলেছে, বিশেষ করে উইলিয়ম ফুলারটোনকে, যাতে কয়েম্বাটোর আক্রমণ ক'রে মাঙ্গালোর চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়। তার উপর, এই হচ্ছে সেই লোক, হাইদর আলির শেষ উপদেশ—তাঁর মৃত্যুকালীন ফতোয়া—বলে একটা মিথ্যা কথার গুজব যে রটনা করে। কাহিনটা হচ্ছে এই যে, টিপুকে নাকি হাইদর একটা উপদেশ লিখে জানিয়ে যান, সে কাগজটা নাকি হাইদরের পাগড়ির মধ্যে লুকানো ছিল, তাতে নাকি লেখা ছিল, "যুদ্ধ করে আমি কিছুই লাভ করতে পারিনি—ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে। কিন্তু হায়, আমি আর বেঁচে নেই···ইংরেজরা নিশ্চয়ই যুদ্ধটা তোমার দেশের মধ্যে নিয়ে যাবে যে-কোনো শর্ত পাও তাতেই তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নেওয়াই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ···"

এই ঘোর মিথ্যার উদ্দেশ কি? এটা কি কেবল একটা কুকাজ? বাসনা অনুযায়ী একটা চিন্তা? হয়তো তাই। কিংবা এটা কি বিশ্ববাসীকে বোঝানো যে, ইংরেজরা এতই দুর্ধর্ষ ও এতই শক্তিমান যে, তাদের ভয়ংকর শত্রু হাইদর আলিকেও তা স্বীকার করতে হল? হাইদর আলি সেই মানুষ, ১৭৮৩ সালে এডমণ্ড বার্ক যাঁর সম্বন্ধে বলেন, "এটা প্রশ্নাতীত সত্য যে, তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ, এবং ভারতবর্ষে যত যোদ্ধা জন্মেছে তার মধ্যে তিনি সবার বড় ···স্বভাবে মৃদু ও ন্যায় পরায়ণ · একালের অন্যতম প্রথম রাজনীতিবিদ্।"

৫

সায়াদ সাহেব লক্ষ করল যে, সোয়াৎজ লোকটা চলে গেল। সে বলল, "একটা শয়তান। কিন্তু ফ্রান্স সম্বন্ধে আমি ওর সঙ্গে একমত। আমেরিকা সফল হোক বা না-হোক, আমার মনে হচ্ছে ফ্রান্সের হয়ে এসেছে।"

পুরনাইয়া বলল, "কি রকম?"

সায়াদ সাহেব বলল, "কোনো মনার্কি যদি কোনো অ্যানার্কি সমর্থন করে, তাহলে ইতিহাসের জোয়ার মনার্কিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

"অ্যানার্কি! মনার্কি! এরা কি কেবল শব্দ মাত্র নয়?" টিপু জিজ্ঞাসা করল, "যাকে তোমরা অ্যানার্কি বলছ আমার কাছে তো তা মুক্তির জন্য ন্যায্য আর্তরব বলেই মনে হয়। আর, মনার্কি—কেন, এ রকম রাজতন্ত্রের কথা কি তোমরা ধারণা করতে পার না, যা হবে সদাশয়, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি হবে সদয়, তাদের দাবির প্রতি হবে ন্যায়পরায়ণ?"

"কিন্তু", পুরনাইয়া মাঝখান থেকে বলল, "ফ্রেঞ্চ মনার্কি বা ফরাসি রাজতন্ত্র সম্বন্ধে যতটা জানি তা কিন্তু সেরকম নয়। আমেরিকানদের সঙ্গে মিলে তারা এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে মুক্তির ন্যায্য আর্তরবের জন্যেই নয়, তারা ইংলণ্ডের সঙ্গে পুরাতন ব্যাপারের মীমাংসার জন্যেই। ইংলণ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরেই তারা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এটা নিশ্চয় যে, ফরাসিরা কোনো একটা নীতির জন্যে এ যুদ্ধ করছে না।"

"হয়তো তাই," টিপু বলল, "কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে কী ব্যাপার? তোমার কি ধারণা যে, তাদের উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাদের লোভও মিশ্রিত আছে? তাদের ভূমি থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের পরও কি তারা তাদের পুরাতন দুর্নীতি ও অবিচারের পথ ধরেই চলবে?"

পুরনাইয়া বলল, "এর ঠিক ঠিক উত্তর আমি দিতে পারবনা, টিপু সুলতান। আমেরিকা একটা নতুন জাতি। নতুনেরা ভুলেই যায়। শক্তির ও সম্পদের মদে মত্ত হয়ে তারা মুক্ত হবার পর কী করবে তা কে বলতে পারে, কতটা বাড়াবাড়ি করবে তাই-বা বলবে কে। তার অতীতটা ভুলে যেয়ো না।"

"তার অতীত!" টিপু বলল. "অত্যাচারী ও অপদার্থ ইংরেজ রাজার দ্বারা তাদের উপরে চাপানো হয়েছে কেবলমাত্র দুর্দশা।"

"আমি অনুরোধ করি, টিপু সুলতান, অতীতের দিকে একটু গভীর ভাবে তাকাও।" বলল পুরনাইয়া।

টিপু তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

পুরনাইয়া বলল. "হ্যাঁ। আমেরিকান জাতি রেড ইণ্ডিয়ানদের বিশাল গোরস্থানের উপরেই বসে আছে। মানবজাতির ইতিহাসে এতবড় হত্যাকাণ্ডের খবর আর কি নেই? এতে আমার সন্দেহ আছে। তারা তাদের অসভ্য বর্বর বিবেচনা করে লাখে-লাখে তাদের নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলেছে যতক্ষণ-না তাদের পুরো জাতিটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পুরোজাতিটাই, আবার বলি। সেই জাতির জীবন স্বাধীনতা ও সুখসমৃদ্ধি এবং সমভাবে গণ্য হবার অধিকার গেল কোথায়। আমেরিকানরা এখন যার সন্ধানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, সেইসব তারা সেই অসহায় মানুষদের দিতে পারল না কেন। আমি আবার বলি, টিপু সুলতান, সেই রেড ইণ্ডিয়ান জাতির উদ্বেগ ব্যাপারে কি কিছুই করার নেই?"

সায়াদ সাহেব বেশ খুশি হয়েছে। এর আগে সে কখনো পুরনাইয়াকে এত কুদ্ধ দেখেনি, সে বলল, "পুরনাইয়াকে এই মেজাজে দেখাটা আনন্দের।"

পুরনাইয়া হাসল কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ নেই। সে বলল, "আমরা এমন সব ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি যার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ নেই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে আমেরিকা সম্বন্ধে। হ্যাঁ, তারা স্বাধীন হবে ব্রিটিশের কবলে আর তাদের থাকতে হবে না। তার এক অদ্ভুত জাগরণ ঘটবে, চিন্তার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার কর্মোদ্যম দেখা দেবে, আর্থিক ক্ষেত্রে লম্বা কদমে সে এগিয়ে যাবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাদের জীবন ন্যায়নীতিতে ও সম্মানে মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। কিন্তু কতকাল সেই অবস্থায় সে থাকবে? সুবিচার স্বাধীনতা ও সমতার নীতি কি চিরস্থায়ী ও অমর? আমি ঠিক জানিনে। সমস্ত মানব জাতির ক্ষেত্রেই কি এটা প্রযোজ্য? কিংবা এটা কি আত্মকেন্দ্রিক হবে, ঠিক জানিনে।"

পূরনাইয়া এ ধরণের কথা বললে তাকে টিপুর বেশ ভালো লাগে। "কিন্তু তোমার কি মনে হয়?" জানতে চাইল টিপু।

"সত্যিই, আমি ঠিক জানিনে।" পূরনাইয়া বলল, "কিন্তু এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, হিংসা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এক নিরস্ত্র ও শান্তিকামী জাতিকে নিঃশেষ করে দিয়ে একটা দেশের অধিকার যারা করায়ত্ত করে, তারা তাদের বর্বরতার নিষ্ঠুরতার ও নৃশংসতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হবেই"

আমেরিকার স্বাধীনতা-সনদের আন্তরিক ও মর্যাদাপূর্ণ কথাগুলি কানে বাজতে লাগল টিপুর। এই আমেরিকানরা যে মাননীয় ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই. তারা যে পথে যাবে তা ভবিষ্যতের গৌরবের পথ ও অতীতের জন্য প্রায়শ্চিত্তেরই সড়ক।

১৭৮৩ সালে যখন টিপুর বাহিনীর হাতে ম্যাঙ্গালোরের পতন ঘটল, যে ফরাসি বাহিনী তার সাহায্য করছিল তখন তারা সরে গেল. ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সেভেন ইয়ার্স ওয়ার অথবা সাত বছর ব্যাপী যে যুদ্ধ চলছিল ভার্সাই-চুক্তি অনুসারে তখন সে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবং আমেরিকার উপনিবেশের উপর ইংলণ্ডের শাসনক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে। এই সংবাদ পৌছনোমাত্র টিপুর প্রতি বাহিনীর সমর্থনও ফুরিয়ে গেল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখন স্বাধীন হয়ে গেল। সাত সমুদ্র পারের দেশের এই মুক্তি-উৎসবের জন্যে টিপুর আদেশে ১০৮টি তোপধ্বনি করা হল। তার দুঃখ হতে লাগল এই কথা ভেবে যে সোয়ার্টজ যে টাকা ফ্র্যাঙ্কলিনকে দেয় নি সে টাকা ফ্র্যাঙ্কলিনকে তারও পাঠানো হয়ে ওঠেনি। তার মনে হতে লাগল আমেরিকা এবং ফ্র্যাঙ্কলিন তাদের মনের শুভ ইচ্ছার কথা জানে কি না। তার আরও মনে হল এই অভিযানের সাফল্য বা বিফলতা এই শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে কিনা। ১৭৮৩ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা-সনদের বার্ষিক উৎসবের দিন মহীশূরে ১০৮টি তোপধ্বনি করা হল।

অনেকেই ভাবল অত দূর দেশের একটা ঘটনা সুলতানকে এতটা অভিভূত করল কিভাবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের মধ্যপথে ম্যাঙ্গালোরে ফরাসিরা যুদ্ধ ছেড়ে সরে পড়ল—এ ব্যাপারটা অবশ্যই আনন্দ-উৎসবের নয়। এমনকি ফরাসিরাও এ ব্যাপারে নিজেরাই বিস্মিত হয়ে ছিল। তারা বলাবলি করে, "সুলতান কি আমাদের সেই রণভূমি ত্যাগের জন্যে উৎসব করছে, আমরা

কি এতই নগণ্য ?" তারা জানত যে, ঐ ঘটনাকে ভারতীয় সেনারা ঘৃণার সঙ্গে দেখেছে, ফরাসিদের ঘুষ দিয়েছে ইংরেজ ও ইংরেজদের গোয়েন্দা সোয়ার্টজই এর মূলে—এ কথাও তারা বলাবলি করেছে। এমন উৎসব করে সুলতান কি আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে ? তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। কোনো কোনো ভারতীয় এমন কথাও বলেছে যে, ফরাসিদের মত ঝঞ্ঝাটে ব্যক্তিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় সুলতান এইভাবে নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বুসি, লালী, বোদেলত, গোরগাউদ ইত্যাদি নামের ফরাসি অফিসারদের বিদায়-সংবর্ধনা উপলক্ষে টিপু যে সভা ডাকে সেখানে সে বলে, "না।"

সে আরও বলে, "যতক্ষণ পেরেছ ততক্ষণ তোমারা আমার হয়ে কাজ করেছ। এখন তোমাদের নিজেদের জন্যে তোমাদের ডাক পড়েছে অন্যত্র। তোমাদের বিদায় জানাই। আমরা বন্ধু থেকেই আলাদা হলাম। তোমাদের জন্যে আমার সদয় কথা ও সদয় চিন্তাই রইল। আমি এমন এক ব্যাপারের জন্যে আনন্দ জানাই যার জন্যে তোমাদের উচিত আরও বেশি আনন্দ-প্রকাশ, কেননা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র, তোমাদের জাহাজ, তোমাদের সেনাদল যুদ্ধ করেছিল আমেরিকার স্বাধীনতার জন্যে।"

ভারতীয় ও ফরাসি অফিসারদের এই বিরাট সভায় টিপু সুলতান আমেরিকার স্বাধীনতা-সনদের কয়েকটি অংশ পাঠ করে শোনাল। ইংরেজদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তির জন্য অতলান্তিক মহাসাগরের পারের সেই উপনিবেশ কি ভাবে সংগ্রাম করেছে তা তার পর বলল। বলল ফ্রান্সের কথা, এই স্বাধীনতার জন্যে সেও সংগ্রাম করেছে, ক্ষমতা দখলের জন্যে নয়, একটা নীতির জন্যে। আমেরিকায় কথা বলল, যা নাকি এখন স্বাধীন, তাদের সনদের ঘোষিত নীতি অনুসারে নিজেদের উন্নত পন্থায় এগিয়ে নিয়ে যাবে। সে তাদের বলল, লক, মণ্টেকিউ, রুশো, ভলটেয়ার ও বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের ভাষার কথা ; বলল, ভারতবর্ষের উদার চিন্তার কথা যা রাজার সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র রক্ষা করে, সেই রাজা যদি জনগণের অধিকার-রক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে কিভাবে ছিন্ন হয়ে যায় সেই যোগসূত্র ; এ রকম হলে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজাকে অপসারণ করার অধিকার থাকে জনগণের। ভারতীয় রাজারা অভিষেকের সময়ে যে শপথ নেয়, সে কথাও সে বলল, সে শপথ হচ্ছে—"আমি যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করি তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে, জীবনধারণ থেকে, সন্তানসন্ততি থেকে আমি

যেন বঞ্চিত হই ; তাদের সকলের কল্যাণই আমার কল্যাণ ; আমার যা ইচ্ছে হবে তাই সবার মঙ্গলের জন্যে না-হতে পারে, কিন্তু সকলের যা ইচ্ছে তাই আমি আমার মঙ্গল রূপে জ্ঞান করব।"

টিপু সুলতান তার ভাষণ শেষ করল এই কথা ব'লে, "বন্ধুগণ, এই জন্যেই আমি ফ্রান্সের জয়ে, আমেরিকার জয়ে আনন্দ-উল্লাস করেছি, কেননা ঐ জয় হবে মানুষের অধিকার জয়ের।" সে বলে যেতে লাগল, "আমি জানি এখন সময় হয়েছে আমরা পৃথক্ হই—কেননা, তোমাদের গবর্নমেণ্টের এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। আমি তোমাদের যাত্রায় বিলম্ব ঘটাতে চাইনে। কিন্তু, তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও, যাবার সময়ে এইটুকু জেনে যাও ও এই আশা নিয়ে যাও যে, তোমরা ভারতবর্ষে এক উচ্চমান-সভ্যতার ধ্বংসচিহ্ন দেখে গেলে. কিন্তু এমন দিন আসবে যখন এই দেশ তার সেই ঐতিহ্য ফিরে পাবে। আমেরিকার মুক্তির জন্য আমেরিকানরা যত আঘাত হেনেছে, ফরাসিরা যত আঘাত হেনেছে, তা হচ্ছে সারা বিশ্বের মুক্তির জন্য আঘাত। সে ফরাসি দেশ হোক, ভারতবর্ষ হোক—বা অন্য কোনো দেশ হোক। যতদিন বর্বর অত্যাচার চলবে, ততদিন চলবে এই সংগ্রাম।"

এই সাধারণ যুদ্ধ-দগ্ধ ফরাসি সৈনিকেরা সমুদ্র পার হয়ে ভারতবর্ষে এসেছে, অনেকেই ভাগ্য-অন্বেষণে, কেউ-কেউ গৌরব অর্জনে, কেউ-কেউ অভিযানের আনন্দে। তারা কেউ স্কলার নয়, বুদ্ধিজীবী নয় ; তারা ইতিহাস বা রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেনা, তারা নিরক্ষর। টিপু সুলতান তাদের কী বলল তা কি তারা বুঝেছে ? কেউ তা বলতে পারে না। কিন্তু এর ছয় বছর পরে যখন রাজকীয় বন্দী-দুর্গ ব্যাস্টাইল আক্রান্ত হল, যখন আরম্ভ হল ফরাসি-বিপ্লব অত্যাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্যে, তখন যারা লিবার্টি ইকোয়ালিটি ও ফ্র্যাটার্নিটির পতাকা বহন করেছে তাদের মধ্যের অনেকেই টিপু সুলতানের ভাষণ সেদিন শুনেছিল। গৌরগাউদ যখন রাজার সেপাইয়ের বুলেটে আহত হয়ে প্যারিসে মুমূর্ষু অবস্থায় শুয়ে তখন সে বলে, "টিপু সুলতান যেন জানতে পারেন যে, আমি তারই দেওয়া এক স্বপ্নে সঞ্জীবিত হয়ে এই মৃত্যুবরণ করলাম।"

## ৪৩. মসকটের সেই মৌলভি

"ধন্যবাদ পুত্র, ইসলাম তোমার মত সুযোগ্য সন্তান আর পায়নি।" মৌলভি আল আমিন বলল টিপু সুলতানকে। সে এসেছে মনকট থেকে, সংগে পরিচয় পত্র নিয়ে এসেছে যা দেখে তার যোগ্যতা গুরুত্ব ও জ্ঞান সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না মনকটে যে মসজিদ তৈার সে করবে তার জন্যে টিপু সুলতান তাকে মোটা টাকা দান করে। তার উপর ১,০০০ প্যাগোডার একটি তোড়া তাকে উপহার দেয়।

এরপর মৌলভি মহীশূরের ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এক বছর পরে মসকটে ফেরার সময়ে, সে টিপু সুলতানের সংগে দেখা করে। উভয়ের সৌজন্য বিনিময়ের পর সে টিপু সুলতানের সংগে কয়েকটা বিষয় আলোচনার অনুমতি চায়।

"ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আমি ঘুরে এলাম—যেখানে হিন্দু রাজা রাজত্ব করে, ব্রিটিশরা রাজত্ব করে, এবং যেখানে ইসলামের সন্তান শাসনকাজে লিপ্ত। এদের আইন, আচার আচরণ ইত্যাদিতে অনেক পার্থক্য। কিন্তু একটা ব্যাপার সর্বত্র এক। হিন্দু রাজারা তাদের মন্দির ও তাদের দেবতা নিয়ে আছে, খ্রীষ্টানেরা তাদের গির্জা ও তাদের যিশু, মুসলমানেরা তাদের পয়গম্বর ও তাদের মসজিদ। কিন্তু এখানে, তোমার এই মহীশূর রাজ্যে তুমি কেবল ইসলামের জন্যই মুক্তহস্ত নও, মসজিদের জন্যও নও—যা নাকি তোমার কর্তব্য ও তোমার আনন্দের কথা—কিন্তু তুমি বেইমানদের ও তাদের মন্দিরের প্রতিও মুক্তহস্ত।"

টিপু বলল, "হ্যাঁ।" যেন এই কথায় তার সব উত্তর দেওয়া হয়ে গেল।

মৌলভি জানতে চাইল, "কিন্তু একটার প্রতি আনুকূল্যে অন্যটার প্রতি আনুকূল্য কি কাটাকাটি হয়ে যায় না?"

টিপু সুলতান ব্যালকনিতে চলে গেল, শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের মধ্যে স্থাপিত শ্রীরংগনাথের অপূর্ব মন্দিরের দিকে তাকাল।

"ঐ মন্দিরের ছায়ায় আমি বড় হয়েছি!" মৌলভিকে সে বলল। তার পর ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, "অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে

পাবে, পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠ শুনতে পাবে। ঐসব শোনো, তার পর বলো এ'তে ইসলামের প্রতি তোমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় কিনা। আমার বিশ্বাস ওতে নষ্ট হয় নি।"

"তুমি আমার কথা ঠিক ধরতে পারনি," মৃদু হেসে বলল মৌলভি, "আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে প্রত্যেকের উচিত এক-মন হয়ে নিজের ধর্মকে সমর্থন করা, সারা পৃথিবীর রাজারা তাই করে। তুমি যদি নিজের ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মকেও একই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, অর্থ দিয়ে লালন কর, তবে পাশাপাশি তারা একই সঙ্গে বেড়ে উঠবে, তোমার নিজের ধর্ম তাহলে অন্য ধর্মের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারবে না।"

টিপু বলল, "এ'তেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ধর্মে-ধর্মে তাহলে রেষারেষি আছে, শত্রুতা আছে।"

"শত্রুতার বা রেষারেষির কথা উঠতেই পারে না, কেননা, আমাদের ধর্মই হচ্ছে খাঁটি ও সাচ্চা ধর্ম, অন্যান্যগুলি হচ্ছে ধর্মের ভান মাত্র। আরও কথা এই যে, ইসলামের সুযোগ্য সন্তানের কখনোই অন্য ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকারকরাই উচিত নয়, তাকে সমর্থন করার কথাই ওঠে না।"

শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি এখন শোনা যাচ্ছে। মন্ত্রপাঠ আরও হয়েছে। মৌলভির দিকে তাকাল টিপু সুলতান, তার আশ্চর্য লাগতে লাগল এই মৌলভির মত একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন কথা বলতে পারল কী করে।

অনেক ক্ষণ চুপ করে থাকার পর টিপু বলল, "আমার ধারণা ভুল হলে মাফ করবেন। কোরানে কী কথা বলা হয়েছে সেটা আপনাকে মনে করে দিই, তাতে বলা হয়েছে—জ্ঞানেব বাগিচায় অনেক ফুল ফোটে, কিন্তু প্রতিটি ফুলের সৌরভপূর্ণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকে সেই মধু বা সেই অমৃত যা হচ্ছে একই অমর ভালোবাসা, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মও অবিকল সেই রূপ।"

আবার একটু থেমে টিপু জিজ্ঞাসা করল, "এ কথাও কি বলা হয় নি যে, ভালোবাসার দীপ যখন হৃদয়কে আলোকিত করে তোলে, তখন খোদা পয়গম্বরেরা সম্মানিত হন, এবং কেউ তিরস্কৃত হয় না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ নিজেই কি একথা বলেন নি—

"আল্লায় আমাদের বিশ্বাস আছে, তিনি আমাদের যা পাঠিয়েছেন তাতেও আমাদের আস্থা আছে। আব্রাহামকে যা দিয়েছেন ইশামেলকে যা দিয়েছেন, মোজেজ ও যিসাশকে যা দিয়েছেন, ও তাঁর পয়গম্বরদের যা দিয়েছেন—সবেতেই

আমাদের বিশ্বাস। এদের মধ্যে ইতরবিশেষ বলে কিছু জানিনে।' সুতরাং, এটা কি কোরানের মূল কথা নয় যে, তাদের ঈশ্বর ও আমাদের ঈশ্বর এক ?"

"বাছা," মৌলভি বলল, "ধর্মতত্ত্বে আমরা গভীর ভাবে ডুবে আছি। একদিন যদি তোমাদের সঙ্গে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাই, তবে খুশি হই। তুমি জান যে, আমি মসকটের ইমামের একজন অস্থায়ী উপদেষ্টা। অনেক দেশের রাজপুরুষ আমার উপদেশ গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছে। আমার মহান শাসক তোমার প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করেন এবং যে সম্মানের সঙ্গে আমি তোমাকে দেখি. তাতে মনে হয় আমি আমার উপদেশ দাখিল করতে পারি। আমাকে বলার অনুমতি দাও। বর্তমানে হিন্দু মন্দির ও হিন্দু ব্রাহ্মণেরা তোমার কাছ থেকে প্রচুর দান পাচ্ছে, এমনকি আমাদের মসজিদ যা পায় তার চেয়েও বেশি। হিন্দু আচার ও হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্যে তোমার রক্ষাকবচের কথা সকলেই শুনে আসছে। ভেবে দেখ, এই উদ্যম ও এই অর্থ যদি তোমার লোকেদের দেওয়া হয়, তাহলে তুমি তাদের প্রভূত আনুগত্য ও উম্মাদ সমর্থন কি পাবে না—তোমার জন্যে তারা তাদের ধন-জন-ঐশ্বর্য জীবন সবই কি দিতে রাজি হবে না? এটা ঠিক যে, উভয় সম্প্রদায়ই এখন তোমার হয়ে কাজ করছে, কিন্তু এক-মন হয়ে পুরোপুরি তোমার নিজের লোকদের জন্যে যদি কিছু কর তাহলে তাদের মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহ আসবে প্রভূত পরিমাণে, হাজার গুণ বেশি হয়ে, যে-কোনো যুদ্ধেই তুমি লিপ্ত হবে তখন তা হয়ে উঠবে ধর্মযুদ্ধ। তার উপর আজকাল সব রাজারাই যে পথে চলেছে সেই পথই হচ্ছে বুদ্ধিমানের পথ।"

বিনীত হাসি হেসে টিপু সুলতান উত্তরে বলল, "আমার কোনো সন্দেহ নেই 'যে তারা বুদ্ধির পথেই চলেছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্যে ও আমার লক্ষ্যে একটু প্রভেদ আছে। আপনি বলেছেন আমার লোকদেরই আমি সমর্থন করব। এইখানেই প্রভেদ। কারা আমার লোক?"

মৌলভী মাথা নাড়ল, কিন্তু তার কথা শেষ করেনি। সে বলল, 'আরও একটা প্রভেদ আছে। আপনি বলছেন নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে, তাহলেই বোঝা যাচ্ছে লক্ষ্যটা হচ্ছে ক্ষমতা-বাড়ানো, একতা থেকে ক্ষমতাই বড় করে দেখা হচ্ছে। তারপর, মনে হচ্ছে, আপনার পরামর্শ হচ্ছে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ উদারতা দেখানো, এবং অন্য সম্প্রদায়কে অসম্মান করা। মহাশয়, এইখানেই আমাদের অভিমতের মৌলিক পার্থক্য, লক্ষ্য ও পন্থার

ভিতরে এ'তে কোনো ভেদাভেদ নেই। কিন্তু আমার কাছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার মনে হয় যে কোনো উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি কোনো কাজের কথা নয়। সব শেষে আমি বলি, এই ভূমিতে আমার জন্ম, এই ভূমি জন্ম দিয়েছে অনেক ধর্মের, তাদের লালনও করেছে। এসব ধর্ম আমাকে কী শিখিয়েছে? শিখিয়েছে সব মানুষই ভাই-ভাই। আমার একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন, তাঁর নাম পূরনাইয়া, তিনি হিন্দু। আমার পিতা অনেক হিন্দুকে উচ্চপদে বসিয়েছিলেন, আমিও তাই করেছি। তাঁরা হিন্দু বলেই অবশ্য নয়, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যও নয়, তাঁদের যোগ্যতার জন্যেই। আমি মন্দিরে অর্থদান করেছি, ব্রাহ্মণদের দান করেছি, তাদের বিগ্রহ বসিয়েছি, আমার সারা রাজ্যে বড়-বড় মন্দির-স্থাপনে ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করেছি, এর কারণ, বিশ্বাস করুন, আমি নিশ্চিত যে রাজা হিসাবে ও একজন ভারতীয় হিসাবে আমি এসব কাজের জন্য কর্তব্যে বাঁধা ও সম্মানেও আবদ্ধ। আমি শ্রদ্ধার সংগে হিন্দুদর্শন পাঠ করেছি, পড়েছি তাদের বেদ, তাদের শাস্ত্র। এসবের মধ্যে সত্যের আসল মূল্য নিহিত আছে, সমস্ত ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, কোরানও আমাকে তাই শেখায়। বলুন কোরান বুঝতে কি আমি ভুল করেছি?"

"না। কোরান বুঝতে ভুল করনি। অনেকেই অবশ্য ভুল বুঝেছে।" বলল মৌলভি।

মৌলভি ও টিপু পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিল। আরও সাতদিন শ্রীরঙ্গপত্তমে থেকে গেল মৌলভি। মনে কী সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে সে চলে গেল তা কেউ জানে না। কিন্তু তার যাত্রার দিন শ্রীরঙ্গপত্তমের শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে ১,০০০ প্যাগোডার এক তোড়া পেল দান হিসেবে। ছোট আকারের একটি শীর্ণ লোক এসে দাঁড়ায় মন্দিরের ফটকে, মন্দিরে প্রবেশরত এক ব্যক্তিকে একটি টাকার তোড়া দেয়, বিগ্রহের সম্মুখে সেটা রাখতে অনুরোধ জানায়, এবং জরুরি কোনো কাজে যেন চলল এইভাবে দ্রুত প্রস্থান করে। লোকটার যা বিবরণ পাওয়া যায় তাতে নাকি বোঝা যায় যে, সে হচ্ছে ঐ মৌলভি, ও টাকার থলিটি হচ্ছে সেই থলি যেটা টিপু সুলতান দিয়েছিল সেই বৃদ্ধ লোকটিকে।

## ৪৪. একটি মানুষের চার বছর

নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে টিপু সুলতান যখন বন্যাপ্লাবিত তুঙ্গভদ্রা নদী পার হচ্ছে, সেই সময়ে কর্নওয়ালিশকে নিয়ে জাহাজ ঢুকল মাদ্রাজে। কয়েক সপ্তাহ কর্নওয়ালিশ মাদ্রাজে কাটাল, টিপুর সামরিক অবস্থার আঁচ নিল, তার পর চলে এল কলকাতায়।

কর্নওয়ালিশ চিন্তা করে দেখল, ছয় মাসের মধ্যে সে সামরিক অভিযান আরম্ভ করতে পারবে, আরও ছয় মাসের মধ্যে সে ঐ বাঘকে শেষ করে ফেলতে পারবে। নিজাম ও মারাঠা তার যে ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়েছে তার থেকে যেন সে আরোগ্যলাভ না-করে, ইতিমধ্যে সে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও চক্রান্তের চাপে যেন জর্জরিত হয়। হ্যাঁ, ইয়র্কটাউনে যে লজ্জা ও উদ্বেগ জমা হয়েছে তা ছয় মাসের মধ্যে দূর হয়ে যাবে, তার সামরিক মর্যাদা ফিরে আসবে, গৌরব লাভ হয়ে যাবে, অতলান্তিকের ওপারে তাদের সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ হয়ে যাবে।

কিন্তু আসলে তা হবার নয়। টিপু সুলতান জয়ী হয়েই যাচ্ছে। এমনকি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহও প্রশমিত হয়ে আসছে। একটা অসন্তোষ ছিল, অনেকের মনেই এই ধারণা ছিল যে, অন্যের চাপের দরুনই টিপু সুলতানের প্রতি তারা তাদের কর্তব্যকাজ করতে পারছিল না।

কর্নওয়ালিশ ভাবল, ওয়ারেন হেস্টিংসই ঠিক করেছিল। টিপুকে শেষ করে ফেলার জন্যে ধৈর্যের খুবই দরকার, প্রস্তুতিরও। হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে প্রস্তুতির।

টিপু সুলতান যখন ইংরেজদের উপর শান্তিচুক্তির শর্ত চাপিয়েছিল সেই ১৭৮৪ সাল থেকে ইংরেজরা রসদের ও গোলাবারুদের স্তূপ রচনা করে চলে, এবং এখন তা হয়ে ওঠে বিপুল এক ভান্ডার। এতেও কর্নওয়ালিশের মনে হল যথেষ্ট নয়। টিপু সুলতানকে যদি একেবারে মুছেই ফেলতে হয় তবে আরও অনেক-কিছু করতে হবে। ইতিমধ্যে তার মনের মধ্যে অবিলম্বে অভিযান আরম্ভ করার যে ব্যস্ততা অহরহ তাকে উস্কানি দিয়ে চলেছে তা থামাতে হবে। ইংলন্ড

থেকে অনবরতই চাপ আসছে। লণ্ডন থেকে চিঠি এলেই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠত, তারা জানতে চাইত "আমেরিকায় অপমানের শোধ তুলতে আর কত দেরি করবে? প্রাচ্যের ঐ স্বৈরাচারীটি [ টিপু ] নিজেই আক্রমণ আরম্ভ না-করা পর্যন্ত কি?" "ম্যাকফারসনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তোমার কাজ অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে, দুর্ধর্ষ ভারতীয় শক্তি মারাঠা ও নিজামকে লাগানো হয়েছে তার পিছনে, তাদের সঙ্গে সে এখন ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত, এই সময়ে তোমার কাছ থেকে একটা ধাক্কা খেলেই সে নতজানু হয়ে তোমার কৃপাপরবশ হবে। তুমি কিসের অপেক্ষায় আছ?"

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, নিজেকে সে বার-বার বোঝাতে লাগল। তোমরা যা মনে করছ টিপু তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর, নিজের মনেই সে বলল, "একটা ইয়র্কটাউনই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

পরে সে ভেবেছিল, "আমি যদি তাকে পরাস্ত করতে না-পারি তবে আমি তার সঙ্গে যোগ দেব।" সে নিশ্চিত ছিল পশ্চাৎ থেকে ছুরিকাঘাত করা তাহলে অনেক সহজ হবে। টিপুর কাছে সে দূত পাঠালো অজস্র উপহার, উপঢৌকন ও অভিনন্দন-সহ, এবং তার মারফত জানাল যে অসীম সাহসী টিপু সুলতানের সঙ্গে যদি ইংরেজ সৈন্য যোগ দেয় তাহলে তারা একত্রে মারাঠা ও নিজামকে বেশ শিক্ষা দিয়ে দিতে পারবে। বেশ সৌজন্যের সঙ্গেই টিপু সুলতান কর্ণওয়ালিশের দূতের সব বৃত্তান্ত শুনল।

তার পর টিপু তাকে বলল, "তোমার মাননীয় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে। তাকে বোলো আমি শান্তিই · না করি। বহুকাল আমি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছি, অনেক দুঃখ-দুর্দশা দেখেছি, চারদিকে মৃতদেহ দেখেছি; শান্তি ছাড়া আমি কিছু চাইনে। কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হতে আমাকে যদি বাধ্য করা হয়, আমি তার জন্যে প্রস্তুত আছি। তখন যেন আমার শত্রুরা সাবধান হয়।" এই কথা বলে সুলতান ধীরে-ধীরে বেশ তীব্র কণ্ঠে বলতে লাগল যদি বা তার আগের কথা স্পষ্টা শুনে না-থাকে, "কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, ঈশ্বর এমন দিন কখনো আনবেন না যখন ইংরেজের পাশাপাশি থেকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব।"

কর্ণওয়ালিশের দূত তার প্রভুর কাছে এই বার্তা নিয়ে গেল।

এই বার্তা কর্ণওয়ালিশ শুনল গম্ভীর ভাবে। ম্যাকার্টনি ও জেমস অ্যান্ডারসন তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।

"একগ‍ঁুয়ে বেজন্মা।" বলল অ্যান্ডারসন, "তার ধারণা সবাইকে সে খতম করতে পারবে—মারাঠা, নিজাম, কুর্গ—সব। সবই সে পারবে একা।"

কর্নওয়ালিশ জিজ্ঞাসা করল, "টিপুর জবাব শুনে তোমারও কি এই রকম ধারণাই হল?"

ম্যাকার্টনি বলল, "অনেকটা তাই। তোমার কি তাই মনে হয় না?"

কর্নওয়ালিশ বলল, "সম্ভবত। কিন্তু আমার মনে হয় যে, সে বলতে চায় আমরা আলাদা ও পৃথক জাতি।" গলার স্বর উঁচু করে তারপর বলল, "হ্যাঁ, তাই। ঈশ্বরের কৃপায় তাই—এবং আমরা সেই রকমই থাকব।"

টিপুর বিরুদ্ধে বিরাট অভিযানের জন্যে কর্নওয়ালিশ ভীষণভাবে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিল। সর্বদাই সে অদম্য শক্তির আধার, এবং সংগঠন-ক্ষমতাও তার প্রচুর, এখন মনে হল যেন একটা ধর্মীয় চেতনা তাকে পরিচালনা করছে। সৈন্যসামন্ত, অশ্ব, বিচালী, অস্ত্রশস্ত্র, ওয়াগন, বন্দুক, অবরোধ-বাহিনী, সাঁকো বানাবার মালমসলা, পল্টুন ইত্যাদি এবং এগুলি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গো-মহিষ ইত্যাদি জমায়েত করা হতে লাগল। সংখ্যার দিক থেকে, উপকরণের দিক থেকে সে বিপুলতর হয়ে উঠতে চায়, সেজন্য অনবরতই সে যাবতীয় উপকরণ জমায়েত করেই চলল। টিপুর জমি বেশ উর্বর ও শ্যামল, সে জানত। তবু, তার উপর নির্ভর না-করে, সে নিজের জন্যে চাষযোগ্য জমির ব্যবস্থা করল। তার অসংখ্য সৈন্য চাই। চাই শক্তি। চাই গতি। এমন-একটা যুদ্ধের যন্ত্র-দানব, যা বিফল হবে না।

নিজের মনে-মনেই কর্নওয়ালিশ বলল, এ ছাড়াও চাই নিজাম ও মারাঠার সঙ্গে মৈত্রী। টিপু সুলতান শেষ হয়ে গেলে নিজামের ও মারাঠার কী দশা হবে তা অনুমান করে মনে-মনেই হাসল কর্নওয়ালিশ। অতটা ভেবে দেখার জন্যে নিজেকেই সে তিরস্কার করল। এক ধাপই যথেষ্ট। বাকিটা তো অবশ্যম্ভাবী।

কর্নওয়ালিশের মনে মায়া-মমতা একটুও ছিল না, এমন নয়। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের জন্য যে বিপুল ব্যাপার সে করেছে, তার জন্যে ইংরেজের শাসনাধীন অঞ্চলের মানুষদের কত দুঃখদুর্দশা হবে তা সে জানত। কিন্তু তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য তাকে সাধন করতেই হবে, তাকে পেঁছতেই হবে একটা নিশানায়। তার উপর, সে জানত, যারা এই অভিযানে কষ্ট পাবে, বাধ্য হয়ে যাদের কাজ করতে হবে, তারা সবাই শ্বেত নয়—এই যা রক্ষে। তার গবর্নর ও প্রশাসকদের কাছে তার আদেশ ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সাফ। অগ্নিতে বা

তরবারিতে, যদি দরকার হয়, এখানকার জমি ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক। কিন্তু নিশানায় পেঁছনো চাই। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বসাও, জরিমানা করো, সব দখল করে নাও—যতটা পার সব বাড়িয়ে চলো; এবং যেমন করে হোক তা আদায় করো।

কর্নওয়ালিশ আপন-মনেই বলল, "ওরা এখন কষ্ট পাক। তাদের সব দুঃখ আমি ঘুচিয়ে দেব। আমি তাদের একটা ভালো গবর্নমেণ্ট দেব, এবং দেব সুসভ্য সংস্কার। তাদের দুঃখের স্মৃতি আমি মুছে দেব। কিন্তু আমার ও টিপুর মধ্যে আমার জয়ের মাঝখানে যেন কোনো বাধা না-আসে।"

যাদের উপরে সে শাসনকাজ পরিচালনা করছে তাদের সর্ববিধ দুঃখদুর্দশা-মোচনের অনেক পন্থার কথাই সে ভেবেছে। এর কিছুকিছু কাজ সে আরম্ভও করেছে, টিপুর বিরুদ্ধে সে ভালোভাবে সুসজ্জিত হয়ে উঠুক তখন অন্যগুলি আরম্ভ করা যাবে। তার আগের শাসকদের শক্তি ছিল, ধনরত্নও ছিল। তাদের ঝোঁক ছিল মুনফাকরার, লুণ্ঠন করার, অর্থসঞ্চয়ের, কিন্তু তাদের তাঁবে যারা ছিল তাদের কোনো উন্নতিসাধনের বা তাদের রক্ষা করার দিকে তাদের মন ছিল না। কিন্তু কর্নওয়ালিশের ছিল দূরদৃষ্টি, সে জানত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্যে ভারতবর্ষে বর্তমান অরাজক অবস্থা ও বিশৃঙ্খলার জায়গায় দিতে হবে একটা সৎ গবর্নমেণ্ট। কিন্তু তার এসব সংস্কারমূলক কাজ করা হবে তার সম্পূর্ণ বিজয়ের পর। এই ক'টা দিন সেসব একটু অপেক্ষা করে থাক্।

চার বছর কেটে গেল। তার উপকরণাদি জমায়েত হয়েই চলল।

## ৪৫. অপর জনের চার বছর

ক

"তুমি যদি আমাকে ভালোবাস তাহলে কি কোনো কোনো সময়ে আমার দুর্বলতাকে সহ্য করবে না?" জিজ্ঞাসা করল টিপু সুলতান। এ প্রশ্নটা করা হয়েছিল মীর সাদিককে, মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও রাজদ্রোহিতা করা সত্ত্বেও টিপু অনেককে মার্জনা করে দেওয়ায় মীর সাদিক টিপুর কঠোর সমালোচনা করায় টিপুর ওই প্রশ্ন।

মীর সাদিক বলেছিল, "তুমি যখন তাদের বেকসুর খালাস করে দাও তখন তোমার ক্ষমতারই তুমি অপব্যবহার কর, তোমার উদারতা যতই বিপুল হোক, তোমার বিচার হওয়া দরকার নির্মম।"

টিপু সুলতান নিজেই বুঝতে পারত না যে, একজন অপরাধীর দোষ যখন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তখনও কেন সে মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা করত। মনে-মনে সে বুঝত মীর সাদিক ঠিক কথাই বলছে—একজন রাজার যেমন পুরস্কৃত করার অধিকার আছে শাস্তিদানের অধিকারও তার আছে। তাহলে টিপুর কেন এই দুর্বলতা?

যুক্তি দেখিয়ে টিপু বলত, "তাদের অতীতের কাজের বিচারও করে ফেলি হয়তো, আমার প্রতি ও আমার বাবার প্রতি তাদের বন্ধুসুলভ ব্যবহারের কথা ভাবি।"

"বন্ধুত্ব শব্দটা এমনই যে কোনো রাজার কাছে যার কোনো অর্থ হয় না।" উত্তরে মীর সাদিক বলেছিল, "রাজাকে হতে হবে লোহের মত শক্ত। তা না হলে যাদের তুমি ছেড়ে দিয়েছ তারা তোমার হাত কামড়ে দেবে, তোমাকে বিদ্রূপ করবে। রাজার প্রতি ভীতিই হচ্ছে রাজার রাজ্যশাসনের যন্ত্র।"

"ভীতি?" টিপু বলল, "তাহলে বলছ রাজার প্রতি স্নেহমমতা রাজ্যের শক্তির উৎসই নয়?"

টিপুর দিকে তাকাল মীর সাদিক। টিপু যা বলল তার কোনো উত্তর দেওয়ারই অর্থ হয় না। তবুও, মনে হল, টিপু একটা উত্তর চায়।

"মানুষের স্নেহমমতা, ওসব ছেঁড়া কথা।" মীর সাদিক বলল, কাউকে বিশ্বাস কোরো না, টিপু সুলতান, কাউকে না। এমন কি আমাকেও না।"

টিপু বলল, "তোমাকে অবিশ্বাস করতে হবে এমন দিন যদি আসে, সেদিন যেন আমি না-থাকি।"

এটা কি ভবিষ্যদ্বাণী? কে জানে!

খ

টিপু সুলতান ও মীর সাদিকের মধ্যে এই ধরনের কথোপকথনের কারণ হচ্ছে যোলোজন প্রবীণ কম্যাণ্ডারের প্রতি মার্জনার হুকুম দেওয়া, যারা সোনার ও অন্যান্য নানারকম প্রতিশ্রুতির বশে মহীশূরের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজদের কাছে পাচার করে। টিপুর বাবার অধীনে কাজ করেছে ওদের মধ্যে এমন অনেকেও ছিল। তারা এখন ইংরেজদের সাহায্য করে চলেছে যাতে ইংরেজরা মহীশূরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এমন ভাবে মজুদ করে চলেছে অস্ত্রশস্ত্র। এই চক্রান্তের দুই মাথা হচ্ছে মীর ইব্রাহিম ও আরসাদ বেগ। হাইদর আলির মৃত্যুর সময়ে এরা দুজন বেশ প্রকাশ্যে ও নির্লজ্জভাবে ক্রন্দন করেছিল। হাইদরের জন্যে আরসাদ বেগ অনেক বারই নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। হাইদরের ঘোড়া যখন হত হয়ে যায় তখন মীর ইব্রাহিম রণক্ষেত্র থেকে হাইদরকে উদ্ধার করে আনে, শত্রুদের গুলিবৃষ্টি তখন চলেছে, নিজের শরীর দিয়ে হাইদরকে তখন আড়াল করে ইব্রাহিম। সে সময়ে গুলি লাগার দরুণ ইব্রাহিম এখনো খুঁড়িয়ে হাঁটে।

না, টিপু নিজেকেই বলে, তাদের বর্তমানের এই চক্রান্তের জন্যে সে কখনো তাদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে পারে না। মীর সাদিক তাকে কী বলেছিল সে কথা তাঁর মনে আছে, "যাদের ভয় করা হয় ভালোবাসা পায় তারাই। রাজার তরবারি উদ্রেক করে স্নেহ, নমনীয়তা নয়। সর্বোপরি রাজাব এমন হতে হবে যাতে তাকে সকলে ভয় করে।"

টিপু ভাবতে লাগল, "এসব কথা ঠিক বটে। কিন্তু আমাকে অন্য রকম কথা যে বলা হয়েছিল, সেই কণ্ঠস্বরটি ভুলি কী করে।"

গ

যারা রাজদ্রোহিতার জন্যে ধরা পড়েছে এমন অনেকের প্রতি টিপুর দাক্ষিণ্য

দেখাবার জন্য কেবলমাত্র মীর সাদিকই বিভ্রান্ত নয়. "ভাবপ্রাণতার দ্বারা রাজা নিজেকে কখনোই চালিত করবে না", তারা সকলেই বলে। কিন্তু পুরাতন কর্মীদের প্রতি একটু উদার হওয়া তবু চলে। কিন্তু আসলে টিপুর অভিপ্রায় কী, সে আদেশ দিয়ে চলেছে যে, দোষীর বিচারের জন্যে আদালত প্রতিষ্ঠিত হতে থাক, প্রতিটি বিচারের লিখিত দলিল রক্ষা করে যেতে হবে, অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষির উক্তির যাবতীয় প্রমাণ পরিষ্কার ভাবে জেনে নিতে হবে, কাউকে দোষী বলে জাহির করা চলবে না যতক্ষণ-না তার দোষ প্রমাণিত হচ্ছে, সবক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থাকা চাই, কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তার সাজা হবে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না, প্রত্যেকে আপীল করার সুযোগ পাবে, বিচার শেষ হবার ও রায় দেবার মাঝখানে অন্তত পনেরো দিন কাটা চাই যাতে বিচারক ঠাণ্ডা মাথায় সব ভেবে নিতে পারেন।

টিপুর সম্মুখে তারা বিনীত শ্রদ্ধাশীল বটে, কিন্তু তারা ভাবে এসব কী আহাম্মুকি! বিচার হবে সরলভাবে এবং দ্রুত, তারা বলে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার দোষের কথা বলা হয়েছে, তাকে প্রশাসনের সামনে আনা হয়েছে, দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, কোনো দোষের এর চেয়ে বড় আর কী প্রমাণ আছে? গবর্নর ও প্রশাসকদের যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার সংগে এইসব বিধিবিধান যুক্ত করে দেবার অর্থ কী। ঐসব বিচক্ষণ দক্ষ ও অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ লোকেরা হাইদরের ও তাঁর পুত্রের অধীনে কাজ করে আসছে, তারা লোকের মুখের দিকে চাইলেই বুঝতে পারে সে দোষী কি না।

তার বাবার মত টিপু সুলতানের বরাবরে গভর্নর কম্যাণ্ডার ও অন্যান্য সকলে আসতে পারত, তাদের মধ্যে আলোচনা হত। তফাতের মধ্যে এই যে হাইদরের ভাষা ছিল একটু কড়া, তার হাসি ছিল ভারিক্কি ধরনের, কিন্তু টিপু সুলতান মনোযোগ দিয়ে শুনত, কিছু বলত না, হাসতও কম। এমনকি খুব বিরক্ত হলেও তার বাবার মত তাঁর মুখে কোনো ক্রোধের ছায়াও পড়ত না। টিপু নিজেকে এসব ক্ষেত্রে সকলের সমান বলে জ্ঞান করত। তার পদাধিকার বলে নিজের অভিমতই সে চাপিয়ে দিতে চাইত না, যুক্তি দিয়ে সে তার মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হাইদরের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, টিপুর কথা একটু রহস্যময়। এইসব প্রবীণ ব্যক্তিরা যারা জীবন কাটিয়ে এসেছে এক ভাবে, তারা কীভাবে বুঝবে এমন এক মানুষের কথা যে নাকি মানুষের লোভ বা গৌরব বা অভিমানের পরোয়া না-করে তাদের কাছে এমন সব

কথা বলে বা মানুষের অধিকার ও মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল ? মানুষের অধিকার বলে যদি কিছু থাকে তবে তারা তা প্রয়োগ করুক, অধিকার থাকার অর্থই হচ্ছে অধিকার প্রয়োগের অধিকার। ক্ষমতাই অধিকারের উৎস ; শক্তিমানই সহৃদয় হতে পারে।

কিন্তু তারা বিপরীত কথা শুনে বিহ্বল হয়, তারা শোনে "আইন ব্যতিরেকে শক্তি আনে অরাজকতা" টিপুর এই উক্তি "আইন না-থাকলে ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত হয়, গবর্নমেণ্ট ধ্বংস হয়।"

গবর্নর, প্রশাসক ও কম্যাণ্ডারদের ভেবে দেখার জন্যে প্রাচীনকালের আইন-বিশারদ মনুর একটি কাহিনী বিবৃত করে টিপু সুলতান—

> এক চাষী শশার বীজ বপন করে। অঙ্কুর দেখা দেয় তার পর লতা হয়। লতিয়ে লতিয়ে তা চলে যায় অন্য চাষীর জমিতে। তার জমিতে শশা ফলেছে বলে দ্বিতীয় চাষী তা দাবি করে। প্রথম চাষী বলে এ শশা তার কেননা তার জমির বসেই ও গাছ জারিত। দ্বিতীয় জন বলল এ শশা তার কেননা এ তো ফলেছে তার জমিতে। মনু রায় দেয় শশা দ্বিতীয় চাষীর প্রাপ্য। মনু পরে বুঝল তার দেওয়া রায় ভুল হয়েছে। এই ভুলের জন্য সে বিচারকের পদ ত্যাগ করে, এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে বিজনবাসে চলে যায়।

টিপু জিজ্ঞাসা করল, ' মনুর মতন আইনবিশারদ যদি ভুল করতে পারেন, তাহলে কি তোমরাও তেমন ভুল করতে পার না ? তাঁর মতন তোমরাও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে ?"

রঙ্গ রাও বলে উঠল, "আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি ঐ শশার ব্যাপারের মতন বিষয়ে ভুল করব না।"

' তাই যদি হয়," টিপু বলল, "তাহলে আমি গবর্নরকে ও কম্যাণ্ডারকে আদেশ জানাব যে তারা শশার মামলার বিচার করতে পারবে। কিন্তু মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ সতর্কতা দরকার হবে।"

গবর্নর ও কম্যাণ্ডাররা মনে-মনে ভাবল যে, তারা অটল অনড় এক পাহাড়ের সঙ্গে কথা বলছে।

নিজেদের মধ্যেই তারা ক্ষুব্ধ ভাবে বলতে লাগল, "আমাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবার গেল।"

৭

"একজন পরাজিত শত্রুকে লুণ্ঠন করলে মাত্র কয়েকজন ধনী হতে পারে, কিন্তু জাতি দরিদ্র হয়, এবং যাবতীয় সেনাবাহিনীর মর্যাদার হানি ঘটে। যুদ্ধ থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অসামরিক নিরীহ ব্যক্তিদের মধ্যে তা টেনে এনো না। শত্রু পক্ষের নারীদের সম্মান কোরো, তাদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখো, তাদের শিশুদের ও পঙ্গুদের রক্ষা কোরো"—১৭৮৩ সালে টিপু সুলতানের জারি করা ডিক্রি থেকে, ১৭৮৫, ১৭৮৭ ও সম্ভবত পরে কয়েকবার এটি পুনরায় জারি হয়।

"কেমন ধরনের মানুষ সে, সব কেড়ে নেওয়াতেই যার আনন্দ।" এই ধরনের অসন্তোষ জানাতে লাগল কম্যান্ডাররা। লুটের অনেক সামগ্রীই তাদের নিজেদের ঘরে গিয়ে উঠত, সামান্য কিছু অংশ যেত কোষাগারে। তার উপর লুটের আনন্দ, লুটের উন্মাদনা—সব গেল। সৈনিকদের সেই সোল্লাস চীৎকার, কোন্ মেয়েকে বেছে কুড়িয়ে নেব তার সম্ভাবনা নিয়ে সেই আনন্দচেতনা, কোন্ ভাণ্ডার লুট করা হবে—সব এবার গেল।

মহা মির্জা খাঁ কম্যান্ডারদের এই অভিযোগে সহানুভূতি জানাল, কিন্তু এ-ব্যাপারে টিপুর সঙ্গে আলোচনা না-করতে উপদেশ দিল। "কে বলতে পারে," সে বলল "সুলতান ঐ ডিক্রির সঙ্গে আরও আদেশ জুড়ে দিতে পারে' এই কথা বলে যে, বিজয়ী সেনাবাহিনী যুদ্ধে সাফল্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে ও মসজিদে গিয়ে ঢুকবে, পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে ডাক না-পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই প্রার্থনা করতে থাকবে।"

৮

"কোনো স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে হোক বা শাস্তি হিসেবে হোক, চাবুক কষা বা পিটুনি দেওয়া মানবিক কাজ নয়, এসব যুক্তিহীনও। এ'তে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যাকে এভাবে পীড়ন করা হয় এ'তে তারই অধঃপতন ঘটে। যার নামে (তার নিজের?) এসব করা হয় তাকে অসম্মানই করা হয়ে যায়।" ১৭৮৬ সালে জারি করা টিপুর ডিক্রি।

মীর জব্বর জিজ্ঞাসা করল, "মহা মির্জা, এর পর যদি কোনো হত্যারককে পাই তবে তাকে নিয়ে কী করব?"

মহা মির্জা বলল, "সোজা ব্যাপার। ডিক্রিটা পড় নি?"

মীর জব্বর বলল, "পড়েছি। সেটা আমার চিরকালের বেদনা হয়ে রইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের যা করতে হবে না, এতে তাই বলা আছে।"

মহা মির্জা বলল, "আমার কাছে ডিক্রিটা সব দিক থেকে সম্পূর্ণ।" একটু হেসে সে বলল, "ভালোভাবে তোমরা পড়নি।"

জম্বর বলল, "বেশ বন্ধু, তবে বুঝিয়ে দাও।"

মহা মির্জা বলল, "আনন্দের সংগেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখ, এ'তে মানবিকতার কথা ও যুক্তির কথা বলা হয়েছে, তোমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে কোনো খুনীকে ধরলে মানবিকতার ও তাঁর যুক্তির কাছে আর্জি করতে হবে। যদি তাতেও কাজ না হয় তবে তাকে ঐ রাজকীয় ডিক্রি পড়ে শোনাও।"

মীর জম্বর যোগ দিল হাসিতে। রসিকতার পর সে রাগে ফুঁসতে লাগল। যেসব কম্যাণ্ডার ইংরেজদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাচার করেছে, এখন তারা হয়তো তাদের চাবুকও চালান করে দেবে—ওসবের আর কাজ নেই বলে, আর ইংরেজরা পরে ওগুলি ব্যবহার করবে মহীশূরের মানুষদের বিরুদ্ধে।

চ

"আইন-মোতাবেক ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। চিরকালের রীতির ও ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের আস্থা থাকবে। প্রত্যেকে যদি আইনের আওতা ও তার কঠোরতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, সেইসঙ্গে নিজের অধিকার, নিজের কর্তব্য, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয় তাহলে আমরা আইন তুলে নেব।...তদনুসারে প্রধানমন্ত্রী পুরনাইয়ার অধীনে মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করা হয়েছে।" ১৭৮৬ সালে টিপু সুলতানের ঘোষণাপত্র থেকে।

বয়রাম খাঁ বলল, "কাজে কাজেই তোমাদের উপহার দেওয়া হবে আইনের বই। দুঃখের বিষয়, তোমরা লিখতে পড়তে জান না। কিন্তু এ'তে ভাববার কিছু নেই। তোমার ভাড়াটেরা তোমাদের পড়ে শোনাবে, রায়ও লিখে দেবে তোমার হয়ে। সহজ ব্যাপার, তাই না?"

"খুবই সোজা। কিন্তু বলো সুলতান কি বুঝতে পারছেন না যে এ'তে জনসাধারণের প্রতি আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে?"

"সম্ভবত তিনি বোঝেন, এবং এই জন্যেই জারি করেছেন এই ঘোষণা।"

ছ

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমস্ত গৌরব ও সম্মান প্রাপ্য, যিনি একমুঠো মাটি নিয়ে তাতে প্রাণসঞ্চার করে সৃষ্টি করলেন মানুষ, যিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিলেন পদমর্যাদা, দিলেন ঐশ্বর্য, দিলেন শাসনাধিকার যাতে নাকি তারা দুর্বল অসহায় নিরাশ্রয় মানুষদের যাবতীয় কল্যাণসাধন করতে পারে।" ১৭৮৩ সালে টিপুর ঘোষণা।

"আমাদের প্রজার সঙ্গে কলহ করা হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ করার শামিল।

তারাই আমাদের ঢাল, তারাই আমাদের আত্মরক্ষার আচ্ছাদন ; তারাই আমাদের সর্ববিধ জিনিস জোগায়। আমাদের সাম্রাজ্যের যাবতীয় শক্তি সঞ্চয় করো, বিদেশী শত্রুদের প্রতিই কেবলমাত্র সে শক্তি প্রয়োগ করার জন্য।"—১৭৮৭ সালের টিপুর কোড অব ল অ্যাণ্ড কনড়াক্ট থেকে।

এই ঘোষণা স্বভাবতই কম্যাণ্ডার গবর্নর ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়। এর মধ্যে এমন কিছু মারাত্মক কথা নেই, কোনো কাজে লিপ্ত হবার কথাও নেই, কোনো কর্তব্যপালনের কথাও নেই। সুলতানের মধ্যে যে কবি আছে, এ যেন তারই উক্তি, সুতরাং তারা আদেশ দিল যে এই ঘোষণা শহরে-শহরে সরবে পড়ে শোনানো হোক, এবং প্রকাশ্য স্থানে তা প্রদর্শিত হোক।

কিন্তু সে কাজ করা হয়ে উঠল না। ঢেউএর পরে ঢেউএর মত এসে পড়তে লাগল আইনের পর আইন—খাজনা দেওয়া হয়ে থাকলে কোনো চাষী বা মজুর বা তার উত্তরাধিকারীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না ; জমিতে চাষ না-করলে জমির মালিকানা যাবে, নতুন চাষ-করা জমির তিন বছর খাজনা লাগবে না ; অস্বাভাবিক সময়ে, যখন অনাবৃষ্টি হয়, যদি সেচ-ব্যবস্থা বানচাল হয়, তখন খাজনা কমানো হবে কিংবা একেবারে মকুব করা হবে ; জমির উর্বরতা ও চাষীর স্বাচ্ছন্দ্যই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমাজের যারা মাথা তারা এসব ব্যবস্থায় সায় দেয় কী করে ? কিষাণদের ও চাষীদের জীবনে অনধিকার প্রবেশই যাদের মান্যগণ্য করে তুলেছে, তাদেরই এখন বলা হচ্ছে আইনের কাছে মাথা নত করতে ! জনগণের অধিকারই রাজকীয় ফরমানের মূল উদ্দেশ্য—তা দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে সেই সময়ে যখন ইংরেজরা সংহারের মূর্তি গ্রহণ করার জন্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র মজুদ করে চলেছে ! সম্ভব হোক অসম্ভব হোক কর্নওয়ালিশ যখন সর্বপ্রকারে ইংরেজদের কোষাগার পূর্ণ করে চলেছে মহীশূরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, সেই সময়ে খাজনা মকুবের আদেশ !

এসবের উপরে আবার এক দুর্ভাগ্য ! প্রত্যেক জেলায় নির্বাচিত প্রতিনিধি-সভা থাকবে, রাজার কাছে সরাসরি তা আর্জি করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরও রাজদরবারে আর্জি করার অধিকার থাকবে। শিবজির সেক্রেটারিবৃন্দ সেগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করবে, এবং টিপু সুলতান তার উপর আদেশ দেবে। আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউই বিশেষ ব্যবহার পেতে পারে না, প্রতিনিধি-সভায় বা কোনো ঘরোয়া বৈঠকে পেশ করা মৌখিক আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

মহীশূরে রাজ্যের রাজন্যবর্গ চাপা ক্রোধের সঙ্গে এইসব ফরমানের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল। ন্যায়বিচার ও সমতার এক উদ্ভট চিন্তা দ্বারা তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এ'তে হরণ করা হয়েছে। টিপু সুলতানের সঙ্গে মীর সাদিক এ বিষয়ে কথা বলে। সে আবেদন জানায় যে, শাসক শ্রেণীর সুযোগ সুবিধার উপর রাজার হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। এই শাসক শ্রেণীই রাজার একমাত্র উপকারী বন্ধু, তারাই খাজনা আদায় করে, তারাই সৈন্য সংগ্রহ করে, তারাই রাজ্যের জাগ্রত প্রহরী। তাদের মারফতেই জনসাধারণের দ্বারা রাজ্যের মঙ্গলসাধন করা যায়। তাদের নেতৃত্ব যদি না-থাকে তাহলে জনসাধারণকে কোন্ পথে যেতে হবে তা তারা ধরতেই পারবে না।

টিপু সুলতান এর যা উত্তর দিল তাতে কি তার উষ্মা ছিল? দরিদ্রের ও ধনীর স্বার্থ—এ উভয়ের মধ্যে একটা বৈরিভাব আছে, "যারা ঐশ্বর্যের অধিকারী তারা কি দরিদ্রের সম্পদের অছি নয়?" জিজ্ঞাসা করল সে, "রাজ্যের লক্ষ্য কি এই নয়, দুর্বলতম ব্যক্তি সবলতম ব্যক্তির মতনই সমান সুযোগ পাবে?"

মীর সাদিকের কাছে এসব কথা অর্থপূর্ণ মনে হল না। সে যখন মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে এসব জানাল তখন তার গলায় বিষাদ মাখা ছিল। সে দরিদ্রের ক্ষুধার ও দুর্দশার কথা বলেছে, ধনীদের হীরা ও সোনার আংটির কথা বলেছে, যে আইন দরিদ্রদের অপরাধে কঠোর শাস্তির সাজা দিয়ে থাকে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও সেই অপরাধ ধনীরা করলে তাদের কোনো সাজা নেই।

টিপু জানতে চাইল, "অতীত থেকে আমাদের কি কিছুই শেখার নেই? মর্যাদার ও সম্মানের ইতিহাস থেকে কিংবা এদেশের মান্যব্যক্তিদের ঐতিহ্য থেকে কিছুই কি শেখার নেই? এই মূল কথাটা কি আমাদের জেনে নেওয়া দরকার নয় যে, আসল ক্ষমতা জনগণেরই, আমরা কেবলমাত্র তাদের অছি? কোন্ অধিকারে আমরা জনগণের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারি, নিজেদের অহমিকা দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করে তুলতে পারি, আমাদের মতে মত দেবার জন্যে তাদের উপর চাপ দিতে পারি?"

"হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশ ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যাদা দিয়েছে, সামাজিক ন্যায়বিচারের আওতায় ছিল উচ্চনীচ প্রত্যেকেই। রাজারা তখন সহজে চলাফেরা করত। ক্ষমতার নেশায় তারা তাদের নৈতিক পবিত্রতা হারাল, প্রথমে তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করল, পরে তা একেবারে ধ্বংস করে ফেলল। সীমান্ত-রক্ষা করার অছিলায় তারা কর বসাতে লাগল, ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করল যাতে তারা

ও তাদের স্তাবকেরা বেশ আনন্দে ও বিলাসে জীবনযাপন করতে পারে। এর ফল কী হল? আক্রমণকারীরা এল, দুর্নীতিপরায়ণ শাসকেরা পালালো, তার জায়গায় যারা এল তারা আরও বেশি অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর; আপনারা সেই ইতিহাস পড়ে দেখুন—এই আমার অনুরোধ। তাহলেই বুঝবেন মানুষের তৈরি আইন থেকেও আরও উৎকৃষ্ট আইন আছে। নাগরিকদের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হচ্ছে একটি জাতির মৃত্যুর পরোয়ানা।

"সেই-টেই কি হবে আমাদের লক্ষ্য?" জিজ্ঞাসা করল টিপু। কেউ কোনো উত্তর দিল না।

জ

"...সামাজিক অর্থনৈতিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্য মদ্যপ্রস্তুত ও বিক্রয়ের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। কেবলমাত্র বিদেশীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য পরিমিত পরিমাণের জন্যই লাইসেন্স দেওয়া হবে।"—১৭৮৭ সালের টিপুর রেভিনিউ রেগুলেশন থেকে।

"...মদ্যচোলাই ও বিক্রয় বন্ধ করেছ, মদ্যবিক্রয় করবে না বলে তুমি বিক্রেতাদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেছ এই মর্মে পাঠানো তোমার রিপোর্ট দেখে ভালো লাগল। চোলাই-কারদের সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি করবে, তারা বিকল্প কাজ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে।"—৪ জানুয়ারি ১৭৮৭ তারিখে বাঙ্গালোরের আমিলদার গুলাম হৈদরকে লেখা টিপু সুলতানের চিঠি।

"...এটা এমন একটা ব্যাপার যা করতে আমরা আর্থিক বিষয়ের জন্যও পিছ-পা হব না। পরিপূর্ণভাবে মদ্যবর্জন করানোই আমার মনের বাসনা। এটা কেবলমাত্র ধর্মের প্রশ্নই নয়। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও জনগণের নৈতিক মান পোক্ত করার জন্যই এটা চাই। আমাদের দেশের তরুণদের চরিত্র গঠন করাও আমাদের কাজ। বর্তমানের আর্থিক ক্ষতির জন্য তোমার উদ্বেগের অর্থ বুঝি, কিন্তু আমরা কি একটু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হবার চেষ্টা করব না? আমাদের কোষাগার ভরে তোলাই কি আমাদের দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির চেয়ে বড় হবে?"—১৭৮৭ সালে মীর সাদিককে পাঠানো টিপু সুলতানের মেমোরেণ্ডাম।

মদ্যবর্জন-নীতির জন্য নিঃসন্দেহেই রাজকোষে টান পড়েছিল। যারা চোলাইয়ের কাজে বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত ছিল তারা কর্মচ্যুত হল। প্রথমে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল, পরে বিকল্প কাজ দেওয়া হল। কিন্তু সেইসব প্রভাবশালী পরিবার এই ক্ষতি সহ্য করতে পারল, যারাই নাকি ছিল মদ্য-ব্যবসায়ের নিয়ন্তা!

ঝ

১৭৮৫ সালে মালাবারের গবর্নরকে লেখা টিপু সুলতানের চিঠি—এ কথা জেনে আমি মর্মাহত

শুনেছি—মালাবারের কিছু রমণী তাদের বুক আদুল করে চলাফেরা করে বেড়ায়। এমন দৃশ্য দৃষ্টিকটু ও রুচিহীনও বটে। এটা কুরুচি ও নীতিবিগর্হিত। তুমি জানিয়েছ এইসব রমণী সেইসব আদিবাসী সমাজের যাদের রীতি হচ্ছে কোমরের উপর অংশ আবৃত না-করা। এ কথা জানার পর থেকে আমি এ বিষয়ে চিন্তা করেছি। এটা কি আবহমান কালের রীতি, অথবা এটা দারিদ্র্যের একটা চিহ্ন? যদি দারিদ্র্যের দরুণ হয়ে থাকে তাহলে আমি চাইব তাদের চাহিদা পূরণ করা হোক, যাতে তাদের রমণীরা নিজেদের সহজ ভাবে আচ্ছাদিত করতে পারে। এটা যদি যুগযুগ-ব্যাপী রীতি হয়ে থাকে, তাহলে আমি চাইব যে তুমি ধর্মীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবে এই রীতি বর্জন করা যায় কি না। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথা বলে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করবে। যে সব যুক্তি তাদের কাছে পেশ করবে সেসব অবশ্যই এই রীতির মূল কোথায় তার উপর ভিত্তি করেই খাড়া করতে হবে। কিন্তু এই কয়টি বিষয় এই সূত্রে মনে রাখতে পার—

—আদিবাসীদের রীতি অনুসারে পুরুষদের উপরেও কোনো ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছে কি না। যদি না হয়ে থাকে তাহলে রমণীদের উপর চাপানো নিয়মটা একচোখা ও একরোখা।

—দারিদ্র্যের জন্যই কি এ রীতির উদ্ভব? কিংবা কোনো রাজার দেওয়া সাজা থেকে? যাই হোক, এই রাজা এখন এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

—এই রীতি যদি দারিদ্র্য বা কোনো শাস্তির দরুন না-হয়ে থাকে, এর মূল যদি থেকে থাকে সুপ্রাচীন কালে, তাহলে ওদের সন্তানেরা কি ভাবে তাদের মায়েদের অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাখতে ও সকলের উপহাসের পাত্র হতে দেয়?"

জিয়া-উদ্দিন বলল, "এবার বল আমাকে মহা মির্জা খাঁ, শুনেছি মালয় মহিলাদের নাকি আপাদমস্তক ঢেকে দেওয়া হবে, তাহলে এবার ছুটিতে মালাবারে গেলে তোমার চোখ-দুটি কী দিয়ে ভোজ সারবে?"

"আমি যে সেখানে গিয়ে ঐ রসে বঞ্চিত হব তাতে তোমার মুখে যে খুশির আমেজ জেগে উঠেছে তা দেখেই আমার সে ক্ষতি পূরণ হয়ে গেল।"

"কিন্তু বলো তো, শত্রুরা যখন লোহার বর্মে নিজেদের সজ্জিত করায় ব্যস্ত আমাদের কি তখন উচিত কী করে মালাবার-সুন্দরীদের আচ্ছাদিত করব তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া?

মহা মির্জা খাঁ একটু হেসে বলল, "এবিষয়ে সুলতানকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে না?"

জিয়া-উদ্দিন বলল, "তোমার কথা সুলতান শোনে, এমন কথা শুনেছি।"

মহা মির্জা খাঁ ভাবল, তা বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে সুলতান আর-একটা কণ্ঠস্বরও শোনে। যে স্বর তার কাছে সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সে স্বর পেঁছিয় তার হৃদয়ে, সেই অচেনা কণ্ঠধ্বনি। যার দাম তার কাছে অনেক।

১৭৮৯ সালে মন্ত্রিসভার কাছে টিপু সুলতানের ভাষণ—"ইজিপ্টের পিরামিড তৈরি হয়েছিল ক্রীতদাসদের শ্রমে। সেই সুদীর্ঘ ও বিশাল চীনা-প্রাচীর পুরুষ ও রমণীর অস্থিতে ও রক্তে নির্মিতই বলা যায়, ক্রীতদাসদের যারা পরিচালনা করত তাদের চাবুকের ঘায়ে যারা বাধ্য হয়েছিল কাজ করতে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ হয়েছিল শৃঙ্খলিত, হাজার-হাজার মানুষ হয়েছিল রক্তরঞ্জিত, দিয়েছিল জীবন—তার ফলেই গড়ে উঠেছিল রাজকীয় রোম, ব্যাবিলন, গ্রীস ও কারথেজ। আমার মনের ইচ্ছা এই যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে হোক বা পশ্চিমাঞ্চলে হোক, যত-সব শিল্পের ও স্থাপত্যের ইমারত তৈরি হবে, তার নির্মাতাদের জন্যে নয়, যাদের শ্রমে এইসব নির্মিত হয়েছে, যাদের রক্তে ও অশ্রুতে সেসব তৈরি করা সম্ভব হয়েছে তাদের নামে নির্মিত হোক স্মৃতিস্তম্ভ।

"ইঁটে বা পাথরে তৈরি এইসব স্মৃতিসৌধ কার স্মৃতি বহন করছে? যারা পথচারী তাদের কাছে কি তার বক্তব্য? আমার মনে হয় তার বলার কথা এই যে, এরই কাছাকাছি আছে এক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ—যে সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল পীড়নে ও অত্যাচারে, তাদের গৃহ থেকে টেনে এনে তাদের ক্রীতদাস করে যাদের দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেই সাম্রাজ্য, তার সম্রাটের গৌরব অযথাই এখানে ব্যর্থ পরিসায় ধূলিধূসরিত।

"আর এই গৌরবোজ্জ্বল দেশের ঐতিহ্য কী, যাকে আমরা বলি ভারতবর্ষ? এর যাবতীয় স্থাপত্যকলা—আধুনিক তাজমহল থেকে আরম্ভ করে ২০০০ বছর আগের সাঁচী স্তূপ পর্যন্ত—গড়া হয়েছিল মুক্ত ও স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাশ্রমে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমাদের জাতির হাজার-হাজার বছর আগের ইতিহাস একবার দেখ। এখানকার একটা সৌধ, একটা ইমারত, একটা স্তম্ভ জুলুম করা শ্রমের দ্বারা নির্মিত, এমন কথা কি বলতে পার? পার না। কেননা, আমি জানি, ২০০০ বছর আগে বা প্রাগৈতিহাসিক আমলে এ দেশ কখনো জুলুম করে মানুষের কাছ থেকে শ্রম আদায় করে নেয় নি।

"এ কথা আমায় বলার কারণ এই যে, মালাবারের গবর্নরের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে বলা হয়েছে—তার প্রদেশে সুদক্ষ কারিগর সে পেয়েছে সরকারী দালান বানাবার জন্যে যাদের সে বিনা-পারিশ্রমিকে নিয়োগ করতে পেরেছে। দরিয়া প্রাসাদ আমি আরও বিস্তৃত করতে ইচ্ছা করি, আমার মনের এই বাসনা জানতে পেরে সে সেই প্রাসাদ আমাকে দিতে চেয়েছে। তাকে আমি বলতে চাই আমার পিতা যা তৈরি করতে আরম্ভ করেন, তার জন্যে বিনা-পারিশ্রমিকে কোনো শ্রমিক নিযুক্ত করা যাবে না, তাদের অতীতের কাজের জন্যও তাদের মজুরি দিতে হবে, এর পর থেকে আমার রাজ্যে বিনা-দক্ষিণায় কাউকে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

"ঐ চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে, আমি শুনতে পাচ্ছি আমিলদাররা নিজেরাই কিংবা কোনো-কোনো দপ্তরের অনুরোধে এমন শ্রমিক নিয়োগ করছে। সুতরাং আমি আপনাদের বলতে চাই যে, এক্ষুনি এমন কড়া নির্দেশ জারি করা হোক, যাতে অমন বিনা-দক্ষিণায় শ্রম ব্যবহার করা না হয়। এর মধ্যে আমি দাস-প্রথার সূচনা দেখতে পাচ্ছি।

"মানুষের শোণিতে ও অশ্রুতে আমাদের প্রাসাদ, আমাদের পথঘাট, আমাদের বাঁধ যদি সিক্ত হয় তা হলে আমাদের কর্মকাণ্ডের কোনো গৌরব হবে না..."

মীর সাদিক বলল, "তাহলে বলো পুরনাইয়া, যা-কিছু ভারতীয় তার সবই কি ভালো ?"

"কখনোই না।" পুরনাইয়া বলল, "এমন একচেটিয়া দাবী আমাদের নেই।"

মীর সাদিকের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল—"যা-কিছু পুরাতন তাই কি ভালো ?"

"কখনোই না, সেই পুরাতন আমলের মানুষদের মধ্যেও বর্বরতা ছিল। কিন্তু এত ধাঁধা কেন ?" পুরনাইয়া বলল।

"না, তেমন কিছু কারণ নেই। কেবল তোমার ভয়ংকর বুদ্ধিদীপ্ত মন'কে বিনা-পারিশ্রমিকের জুলুম-করা শ্রমের দিকে একটু টানলাম মাত্র।"

"অশেষ ধন্যবাদ।"

ট

১৭৮৮ সালে যাবতীয় আমিলদারের কাছে লেখা টিপু সুলতানের পত্র থেকে—"কৃষিই হচ্ছে জাতির জীবনের শোণিতপ্রবাহ। সুজলা সুফলা জমিতে যেই কাজ করবে সেই হবে পুরস্কৃত। দুর্ভিক্ষ বা অনটন হচ্ছে হয় আলস্য ও অজ্ঞতা অথবা দুর্নীতির ফল। এই রেভিনিউ কোডের ১২৭ ধারায় উক্ত বিষয়টি সকলকে অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। যেখানে দুঃস্থ চাষীকে নগদে অনুদান দেবার কথা আছে, সেইটে সর্ব প্রথম কার্যকর করা চাই। চাষীর লাঙ্গল কেনার, তাকে ও তার বংশধরদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা চাই। সচরাচর যে শস্য চাষ করা হয় না সেইসব শস্য চাষে উৎসাহ দিতে হবে, যারা আক পান নারকেল ইত্যাদির চাষ করতে চায় তাদের কর লাঘব করতে হবে। আম ও অনুরূপ মূল্যবান গাছ পোঁতায় বিশেষ উৎসাহ দেওয়া চাই, প্রতি গ্রামে অন্তত ২০০টি ক'রে, এবং দেশে ব্যবহারের জন্যে ও বিদেশে রপ্তানির জন্যে চন্দন ও শাল ইত্যাদি গাছের প্রভূত যত্ন নিতে হবে।

"এখানে বিস্তৃত ভাবে সব বলা হয় নি, দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু দেওয়া হয়েছে। যেমন—একজন আমিলদার ঠিক করেছেন, ছোটখাট দোষের জন্য কাউকে জরিমানা করা হলে তার জরিমানা মকুব হতে পারে যদি সে তার গ্রামে দুটি আমগাছ পোঁতে এবং তা তিন ফুট লম্বা হওয়া পর্যন্ত তার পরিচর্যাদি করতে সম্মত হয়। এ ব্যবস্থায় আমাদের সমর্থন আছে। আমিলদারেরা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা ক'রে (জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ না ক'রে) কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এমন কাজ করলে ভালোই হবে। এই ধরনের কোনো কাজ কেউ করলে তা যেন আমাদের জানানো হয় যাতে আমরা এগুলি নথিভুক্ত করতে পারি, ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমিলদারকে পুরস্কৃত করতে পারি।"

কাবেরি নদীর উপর বাঁধের টিপু কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরের উপর লিখিত, ১৭৯০—"এই বাঁধ খুদাদাদ গবর্নমেন্ট কর্তৃক কয়েক লক্ষ প্যাগোডা খরচ করে ঈশ্বরের নামে নির্মিত হচ্ছে। অনাবাদী জমিতে যে চাষ করবে, তাতে ফসল বুনবে, আনাজ ও ফল চাষ করবে তাকে এই বাঁধের জল ব্যবহারে উৎসাহ দেবে খুদাদাদ গবর্নমেন্ট, অল্পখরচেও জল যোগানো হবে। নূতন আবাদ করা জমি অবশ্য চাষীরই ও তার বংশধরদের থাকবে, তাদের কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না।..."

"বলো তো আমাদের সুলতান এত বেশি লেখে কেন।"

"আমরা যাতে বেশি পড়তে পারি।"

"চাষীরা কোন উপহার দেয় না।"

"না। তারা সেসব পেতে চায়।"

"কতদিন আমরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে যাব ?"

"যতদিন পৃথিবী ও আকাশ আছে, কেননা, আমাদের সুলতানের ইচ্ছা কোনো চাষীকে উচ্ছেদ করা হবে না।"

"আমি নিজে অতদিন বাঁচব না।"

"অনেকেই অতদিন বাঁচবে না।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।"

ঠ

টিপু সুলতানের ঘোষণা থেকে, ১৭৮৭— "...পবিত্র কোরানের মূল নীতিই হচ্ছে ধর্মীয় সহনশীলতা।

—কোরানের নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম ব্যাপারে কোনো জোর-জুলুম না করা। ঠিক সিদ্ধান্তটি ও ভ্রান্তি স্পষ্ট করে বলা আছে।

—অন্য কোনো ধর্মের প্রতি কদর্য ভাষা ব্যবহার না করতে কোরান নির্দেশ দিয়েছে, বলেছে—আল্লার কাছে যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রতি কুকথা প্রয়োগ করা হচ্ছে আল্লার প্রতিই অজ্ঞতাবশে কুকথা বলা।

—কোরান নির্দেশ দিয়েছে ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে তর্ক না করতে, অবশ্য যারা ভুল করে তাদের কথা বলা হচ্ছে না।

—কোরান আশা করে সৎকাজে প্রতিযোগিতা থাকা চাই ; বলেছে : প্রত্যেকের জন্য এক স্বর্গীয় আইন আছে এবং সুপথ আছে। আল্লা ইচ্ছা করলে তোমাকে একটা সম্প্রদায় করে দিতে পারতেন, সুতরাং সৎকাজে অপরের থেকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা কর।

—কোরান চায় তুমি মানুষের কাছে শাস্ত্রের কথা বল : আমরা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত, তোমাদের মধ্যেও প্রকাশিত, তোমার ঈশ্বর ও আমার ঈশ্বর এক, এবং তাঁর কাছেই আমরা আত্মসমর্পণ করি।

"ঈশ্বর-প্রদত্ত এই বিধান আমরা হৃদয়ের প্রিয় ধন বলে মনে করি, কেননা এর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের মর্যাদা ন্যায়নীতি ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্তির সঙ্গে আমরা হিন্দুদের বেদও পাঠ করেছি। তারা সর্বজনীন একতার উপর বিশ্বাসই ঘোষণা করেছে, এবং জেনেছে ঈশ্বর বিভিন্ন নামে উচ্চারিত হলেও তিনি এক।

"আমরা যখন দেখি যে কোনো-কোনো ব্যক্তি ধর্মের ধ্বজা ধারণ করে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করে মিথ্যা শিক্ষা দেয় ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরোধী কথা প্রচার করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঘৃণা সঞ্চার করে।

"এতদ্বারা আমরা ঘোষণা করছি আজ থেকে মহীশূর রাজ্যে ও মহীশূরের অধিবাসীদের মধ্যে যদি ধর্মের জাতির বর্ণের কোনো ভেদাভেদ করা হয় তাহলে ত বেআইনী কাজ বলে গণ্য করা হবে।"

"বাহবা, বাহবা," নূর খাঁ বলল কৃষ্ণ রাও'কে, "আমি তোমাকে ভালোবাসতাম কেননা আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, এর পর থেকে তোমাকে ভালোবাসব কেননা আইন তাই চায়।"

"শুনে সম্মানিত বোধ করছি।"

"কিন্তু, কৃষ্ণ রাও, বলো তো এ আইন কেবল মহীশূরেই প্রযোজ্য হবে কেন।"

"কেননা, সুলতানের আইন ওর চৌহদ্দির মধ্যেই প্রযোজ্য হতে পারে।"

"তাহলে এর সীমার ওপারে ইংরেজরা এর আওতায় পড়ছে না। তারা তোমার বিগ্রহ কলুষিত করে যেতেই পারে, আমাদের মসজিদও কলুষিত করতে পারে, আর, তাদের পাদ্রীরা তোমাদের ও আমাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে যেতে পারে।"

ভ

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের সভায় টিপু সুলতানের ভাষণ থেকে, ১৭৮৮—"...আমি আমাদের জনগণের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে গর্বিত। এটা তাদের গৌরব ও তাদের মহত্ব। অতীতের বা বর্তমানের কোনো রাজ্য হাজার-হাজার বছর ধরে এমন ক্রমোন্নতির দাবি করতে পারে না। তাহলে আমাদের সামাজিক জীবনে ও সরকারী ব্যবস্থায় আর কি-কি কাজ করণীয় আছে? আমার বিশ্বাস, আমাদের মূল কাজ এখন দেশের মানুষের কল্যাণব্রতে ব্রতী হওয়া—তাদের কর্মসংস্থান এবং খাদ্য বস্ত্র গৃহ শিক্ষা ন্যায়বিচার ও মানবিক অধিকার সবই নির্ভর করে অর্থনৈতিক সম্পদের উপর।

"আমাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতি অধিক উৎপাদন ও কর্মোদ্যমের উপর নির্ভরশীল। আমাদের চিরাচরিত উৎপাদনের উন্নতিবিধান করাই আমাদের একমাত্র কাজ নয়। আমাদের ভূমির উর্বরতা ও দেশের মানুষের প্রবণতার দিকে লক্ষ রেখে বিবিধ সামগ্রী উৎপাদনে আমাদের ব্যাপৃত হতে হবে।

"প্রকৃত উন্নতি হতে পারে এমন দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করি—

—মহীশূরে রেশমশিল্প বিস্তারের জন্য আমি বিস্তৃত নির্দেশ দিয়েছি। গুটিপোকা এবং গুটিপোকা রক্ষণ ও প্রতিপালন বিষয়ে দক্ষ লোক বিদেশ থেকে এসে পৌঁচেছে আমাদের লোকেদের এ ব্যাপারে শিক্ষা দেবার জন্য। এই শিল্পের উন্নতির জন্যে আঠারোটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আরও দরকার আছে। মালবেরি গাছ লাগানোর জন্যে সর্বপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের সকলে মনোযোগী হবেন, এই আশা। আমার লক্ষ্য কিন্তু পরিষ্কার—আমি চাই মহীশূর হয়ে উঠুক রেশমশিল্পের একটা শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

—মালাবারের উপকূলে মুক্তার চাষকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। বিদেশ থেকে ডুবুরি আনা হচ্ছে এই মুক্তা তোলার জন্যে। অল্পকালই তারা থাকবে, ইতিমধ্যে একাজ শিখে নিতে হবে আমাদের দেশের লোককে। বিশ্বাস করুন, মুক্তার আছে ঔজ্জ্বল্য, আছে রোমান্স—আছে মুনাফা, আছে সম্পদ। এই কাজ শেখার জন্য গবর্নমেণ্ট অনুদান দিতে প্রস্তুত। প্রথম কয়েক বছর একাজে লোকসান হলে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হবে। আপনাদের সহযোগিতা পাব, এ ভরসা কি করতে পারব?

—আমাদের অশ্ব-লালনের দিকেও আমাদের মন দিতে হবে। এজন্যে আরব দেশ থেকে উৎকৃষ্ট অশ্ব ও গর্দভ আমরা আমদানি করেছি। এসব বিক্রি করা হবে না, যারা এর লালনে পালনে উৎসাহী বলে গ্যারাণ্টি দেবে তাদের এগুলি দেওয়া হবে।

আমাদের রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের এ হচ্ছে দু-একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আরও অনেক বিষয় ভাবা যেতে পারে। আপনারা আলোচনা কালে এ রকম বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পাকা প্রস্তাব দেবেন বলে ভরসা করি। এ ব্যাপারে গবর্নমেন্টের পূর্ণ সহযোগিতা আপনারা পাবেন। আপনাদের উন্নতিতেই জাতির উন্নতি, এই রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে কাজে লাগাতে পারলে আপনাদের পরিকল্পনা খুব দ্রুত কার্যকর হতে পারবে।"

"দেখ, দেখ," লক্ষ্মণ বলল, "আমি নিশ্চিত যে, আমাদের সুলতান হচ্ছেন একজন জাতীয়তাবাদী। কিন্তু তিনি বিদেশ থেকে ঘোড়া গাধা রেশমপোকা আনছেন। কিন্তু নিজের দেশের পোকামাকড় ও পশুদের বিষয়ে তিনি কী ভাবছেন? বিদেশী পোকা ও গাধারা কি এদের উপর মুরুব্বিআনা করবে না?"

এ হাসিতে যোগ দিল পুরনাইয়া, তখন বুরহান-উদ-দীন বলল,

'চিন্তা কোরো না। শুনেছি, এই রেশমপোকারা, এমনকি বিদেশী ওই ঘোড়া ও গাধারা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ মেজাজের। তুমি তাদেরকে খুব ফূর্তিবাজ সংগী হিসেবেই পাবে, তারা তোমার তামাশার খুব তারিফও করবে।"

"ধন্যবাদ।" বলল লক্ষ্মণ, 'তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। আমি উদ্বেগের সংগে ভাবছিলাম ওইসব বিদেশী রেশমপোকা ও গাধারা আমাদের দেশের পোকা ও পশুদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।"

"তোমাকে চিন্তা করতে হবে না," পর্নাইয়া হাসল, "আমাকে কথা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের রাজকীয় কোনো মতলব নেই।"

এবার ম্লিক মহম্মদের পালা, সে একটা অর্থহীন রসিকতাকে বেশ অর্থপূর্ণ করে তুলল তার পর জানতে চাইল, "ইংরেজরা যখন প্রথম বণিকের মানদণ্ড নিয়ে ভারতবর্ষে এল তখন কি বুঝতে পারা গিয়েছিল যে রাজদণ্ড ধারণ করার পরিকল্পনা তাদের ছিল ?"

লক্ষ্মণ বলে উঠল, "ইতিহাসের এই দৃষ্টান্তটি দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, এর থেকে আমরা লাভবান হব।"

৮

"সফর কেমন হল ?" ম্লিক মহম্মদ জানতে চাইল লক্ষ্মণের কাছে, সুলতানের সঙ্গে সে গিয়েছিল দক্ষিণাঞ্চলে জেলাসমূহ ভ্রমণে।

"চমৎকার।"

ম্লিক বলল, "আমার বাবার সমাধি দেখে আসবে বলেছিলে, সে কথা কি মনে ছিল ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমার কথা-মত সেখানে ফুল দিয়েছি। তাঁর পক্ষ থেকে দেবার জন্য সুলতানও দিয়েছিল একটা পুষ্পস্তবক।"

"বা, তিনি সদাশয়।" সানন্দে বলল ম্লিক।

"আমাদের সুলতানকে তুমি জান। তোমাকে সে ভালোবাসে এবং সব সময়ই তোমার উপর সদয়। কিন্তু তোমার বাবার বিষয়ে কয়েকটি কর্কশ মন্তব্য করায় আমি দুঃখ পেয়েছি।" লক্ষ্মণ বলল।

"আমার বাবার সম্বন্ধে ? অসম্ভব। সে বাবাকে ভালোবাসত।"

"ঠিক কথা। তা জানি বলেই ব্যথিত হই, বিশেষ করে যে শহরে তিনি বাস করতেন এবং যেখানে মারা গিয়েছেন। সেখানকার প্রধানেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত, তাদের সম্মুখেই সুলতানের ঐ উক্তি।"

"কিন্তু কেন ? কি বলল সুলতান ?" ম্লিকির চোখে জল এসে গেল।

লক্ষ্মণ বলল, "শহরের প্রধানদের এক জমায়েতে সুলতান ভাষণ দেয়, সেই মুহূর্তে হয়তো সে ভাবাবেগে ভেসে গিয়েছিল।"

"কিন্তু কী বলল সুলতান ?"

"এক শিক্ষা অভিযানের উদ্বোধন হচ্ছিল." লক্ষ্মণ বলল, "সেখানে সে বলে—তার কথাই অবিকল বলি—যে ব্যক্তি তার সন্তানদের শিক্ষা না দেয় সে পিতা হিসাবে বা একজন নাগরিক হিসাবে তার কর্তব্যে অবহেলা করে।"

"তার পর ?" মুলাকি যেন তার মাথায় খাঁড়া পড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

লক্ষ্মণ বলল, "আর কিছু না। সকলেই অভিনন্দন জানাল। সকলেই বুঝল যে, কথাটা তোমার বাবাকে এবং তাঁর অশিক্ষিত পুত্র তোমাকে উদ্দেশ ক'রে বলা।"

লক্ষ্মণ যে মার খায় নি তার কারণ সে দ্রুত পালায়ন করতে পারে ও ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দিতে পারে। দরজার ফাঁক দিয়ে মুলাকি চ্যাঁচাতে লাগল, "ওরে পিতৃহীন দুর্ভাগা, কখনো যে শিখলে না লিখতে বা পড়তে। তুমি কি ভাব যে আমাকে অশিক্ষিত বলার অধিকার তোমার আছে ?"

উত্তরে লক্ষ্মণ বলল, "কেন নেই ? যুক্তি দেখাও। আমরা দুজনে কেউই লিখতে-পড়তে পারিনে। কিন্তু তোমার চারটি অশিক্ষিত পুত্র আছে, আমার আছে তিনটি। তবে বল, কে বেশি শিক্ষিত ?"

অল্পদিনের মধ্যেই 'প্রতি চার মাইল অন্তর একটি ক'রে স্কুল' টিপুর এই অভিযান পূর্ণগতিতে কার্যকর হতে লাগল। এইসব স্কুলে হাজার-হাজার যেসব ছাত্র ভরতি হতে লাগল তার মধ্যে ছিল সাত জন—মুলাকির চারজন ও লক্ষ্মণের তিনজন।

৭

"তুমি কি বলতে পার কেন আমাদের সুলতান রপ্তানি ব্যাপারে এত ঝুঁকে পড়েছে ?" জিজ্ঞাসা করল মনসুর আলি, "আমাদের দেশে চন্দনকাঠ চাল হাতির দাঁত ও বস্ত্রাদি যাতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, সেইজন্যেই কি ?"

"না হে বন্ধু," কৃষ্ণ রাও বলল। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধে ও তার খুঁটিনাটি নানাবিষয়ের কথা বলে সে বলল, "এ'তে উৎপাদন বেড়ে যায়, তার ফলে অনেক অর্থ উপার্জিত হয়, এবং আমদানি করার শক্তি বাড়ে।"

"তাহলে কি বলবে, রপ্তানি-বাণিজ্য যদি এত বিরাট ব্যাপার, শত-শত বছর ধরে আমরা এ বাণিজ্য করিনি কেন।"

"গত কয়েক শত বছর ধরে তোমার আমার মতন এমন বুদ্ধিমান লোক ছিল না বলেই।"

ত

"কেন কচ্ছ, ওরমুজ, জেড্ডা, এডেন, বসরা ও অন্যান্য যায়গায় কারখানা ও বাণিজ্যকেন্দ্র খুলে সুলতান এত টাকা খরচ করছে? বিদেশী বণিকেরা এসে কি এখানকার জিনিস কিনতে পারে না? আমাদের দেশের বণিকেরা গিয়ে কি ওসব জায়গায় কেনা-বেচা করতে পারে না?"

"নিশ্চয় পারে। সুলতান তো বলেছে যে, যে-কোনো বণিক রপ্তানি করতে চাইলে বিনা-মাশুলে বিদেশে যেতে পারবে। আমাদের কারখানা ও বাণিজ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে একসঙ্গে প্রচুর জিনিস কেনার জন্যে, তাতে আমরা ভালো দর পাব।"

কিন্তু কার্যত বাণিজ্যকেন্দ্র খোলায় অনেক সুবিধাভোগী বণিকের অনেক অসুবিধা ঘটে। প্রচুর পরিমাণে একসঙ্গে কেনায় কোনো ব্যবসায়ী দর-দাম নিয়ে খেলা করতে পারল না, তারা জিনিসপত্রের হঠাৎ অভাব সৃষ্টি করতেও পারল না।

থ

"ফ্রান্স থেকে কি কি আনলে ওসমান খাঁ?" জিজ্ঞাসা করল জামালুদ্দিন। টিপু সুলতান যে প্রতিনিধিদল ফ্রান্সে পাঠিয়েছিল ওসমান খাঁ ছিল তার নেতা।

"ষোড়শ রাজা লুই ও রানী মেরি আন্তোনিয়েতের সভায় উপস্থিত থাকার সম্মান, কঁতে দ্য আর্তয়েস ও ম্যাডাম এলিজাবেথ যেখানে ছিলেন উপস্থিত—" ওসমান খাঁ বলল।

"এই কি সব?"

"না। সব না। ফুলের বীজ ও নানা জাতের চারা আমাদের দেওয়া হবে বলে তাদের প্রতিশ্রুতি। তাছাড়া ফরাসি-রাজ অনেক কারিগর পাঠাবেন বলেছেন।"

"কিন্তু কোনো সামরিক সাহায্য?

"না। প্রতিনিধি-দলের উদ্দেশ্যই তা ছিল না। তাছাড়া ফরাসি-রাজ ও ব্যাপারে নিজেই বড় জড়িত হয়ে আছেন।"

"আমার মনে হয় কোনো ব্যাপারে অনুরোধ করলেই ফরাসিরা তা নিয়ে বিরত হয়ে আছে বলে জানায়।" ওসমানের এই হল জবাব। কিন্তু এ ব্যাপারে তার বিচার কিন্তু ঠিক হল না। কয়েক মাস মাত্র আগে ব্যাস্টাইলের পতন ঘটেছে।

"আমরা তুরস্কে পারস্যে মসকটে ও অন্যান্য জায়গায় যে দূত পাঠিয়েছি তাদের কী হল?"

"তাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বাণিজ্যিক।"

"কিন্তু সফল হওয়া গেছে কি?"

"হ্যাঁ। মনে রেখো আন্তর্জাতিক সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার ক্ষেত্রে সুলতানের এটা হচ্ছে কেবলমাত্র আরম্ভ। প্রথম পদক্ষেপ দেখে সমগ্র বিষয়ের বিচার কোরো না।"

"আমি উদার ভাবে শেষ পর্যন্ত সব দেখেই বিচার করতে চাই। অবশ্য প্যারিসের মতন চমৎকার জায়গায় আমাকে যদি পাঠানো হয়।"

"তোমার মতন এমন বুদ্ধিমান লোক পেলে প্যারিস ধন্য হয়ে যাবে।" একটু বক্রভাবে বলল ওসমান।

দ

"সংখলাজি, আমরা শিকার ও গুলিচালনার উপর এত কড়াকড়ি করেছি কেন? আমাদের গোলাগুলিতে কি টান পড়েছে?"

"না হে, মুনির খাঁ। প্রচুর আছে আমাদের।"

"তবে এমন নির্বোধ নিষেধাজ্ঞা কেন?"

"টিপু সুলতানের আদেশে।"

"মাপ কোরো। কিন্তু বলো, কেন এমন আদেশ।"

"সুলতান মনে করে পশুপাখিও ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাদের বেপরোয়া হত্যায় প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। এইজন্য অরণ্য সংরক্ষিত হবে, কয়েক প্রকার প্রাণীর হত্যা বন্ধ করা হয়েছে, অন্যান্যদের প্রজননের সময়কাল মান্য করে চলতে হবে। এসত্ত্বেও শিকার করার অনেক সুযোগ আছে। সমস্ত আদেশটা মনোযোগ দিয়ে পড়ো।"

"বন্দুকে আমি আমার তাক ঠিক রাখতে চাই। তাই পশুপাখি পেলেই মারি। কিন্তু টিপু সুলতানের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন নেই।"

"তোমার এই সংযত ব্যবহারে আমি খুশি।" বলল সংখলাজি, তার কথার মধ্যে অবশ্য একটু ব্যঙ্গ ছিল। মুনিরকে তার জানাতে ইচ্ছে হল যে, কাবেরী নদীর কিনার থেকে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা অন্যত্র সরিয়ে নেবার জন্যে সুলতান আদেশ দিয়ে দিয়েছে। কেননা কারখানার থেকে নির্গত জলে কাবেরীর মাছ মরে যাচ্ছিল। একথা শুনে মুনির খাঁর মুখ নিশ্চয় মৃত মাছের মতনই দেখতে হবে। সুতরাং কথা না-বাড়িয়ে সারা মহীশূরে অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার কাজে সে চলে গেল।

ধ

"রাস্তা-বানানোর জন্যে এমন প্রবল তাড়াহুড়ো কেন।"

"লোকের কাজের জন্য, এবং চাকা চালু রাখার জন্য।"

"চাকা?"

"হ্যাঁ। শোননি কি, সুলতান আদেশ দিয়েছে যে, সব গাড়িতে চাকা লাগাতে হবে? এ'তে চলেও সহজে, যাদের টানতে হয় সেই পশুদের ক্লেশও হয় কম।"

"পশুদের পক্ষে শুভ।"

"সকলের পক্ষেই শুভ। তুমিও বাদ না।"

"কেন। আমাকে তো মাল টানতে হয় না।"

"কিন্তু তোমাকে নিজেকে তো টেনে বেড়াতে হয়। ভালো রাস্তা হলে তা সহজ হয়। দশ মাইল অন্তর বিশ্রামালয় বানানো হবে।"

"বিশ্রামালয় কেন?"

"যাতে লোকজন ভ্রমণ করতে পারে, নিজের দেশের মহিমার ও গৌরবের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই দেশের মানুষের, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও তাদের আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।"

"খুবই তারিফ করার মত অবশ্যই। কিন্তু যে রাস্তা আমি সহজেই পার হতে পারব, শত্রুরাও তো তেমনি সহজেই পার হতে পারবে।"

"না। তোমার মতন সাহসী যোদ্ধা যদি সীমানা-প্রহরায় নিযুক্ত থাকে তবে শত্রুর পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

# ৪৬. সময় আসন্ন

"আমার মনে হচ্ছে সময় যেন আসন্ন।" মেজর জেনারেল মেডোস বলল। সে বসে ছিল কর্নওয়ালিশের পাশেই। টেবিলের চারধারে ছিল আরও সাতজন। কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক রাত পর্যন্ত তারা কাজ করছে। সব রিপোর্ট দেখছে চিঠি পত্র খুঁটিয়ে দেখছে। খাদ্যের মজুত বেশ আছে, অস্ত্রশস্ত্রও তাই। যুদ্ধের যাবতীয় ব্যবস্থা সব পাকা—টিপু সুলতানের রাজ্যের উপর মারাত্মক আঘাত হানার জন্য সব প্রস্তুত।

টেবিলের চারপাশের সকলেই মাথা নাড়ল, কেবল কর্নওয়ালিশ বাদে। যে চার বছর কেটে গিয়েছে তার কথাই সে তখন ভাবছে। অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে সে তার অফিসারদের তাড়া দিয়েছে কিভাবে, কিভাবে উত্তেজিত করেছে! গ্রামাঞ্চল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে, খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন হাজারে-হাজারে মানুষ মরেছে, নারীপুরুষ বেয়নেটের তাড়ায় হয়রান হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে; তাদের জায়গায় অন্য দল আনা হয়েছে এবং পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ চলেছে না-থেমে। মানুষের প্রতি এই রকম ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে কিনা ভেবেছে কর্নওয়ালিশ। হ্যাঁ, তা হচ্ছে—এই সিদ্ধান্তে এসেছে সে। তাদের বেঁচে থাকার জন্যে অবশ্যই তাদের একটা রফা করে নিতে হবে। এক মুঠো চালের জন্যে অন্যেরা খেটে যাবে যাতে তাদের সন্তানদের অন্ন জোটে। যাই হোক, চাবুকে কাজ হয়েছে অনেক। আশ্চর্যরকম কাজ হয়েছে। এইসব বর্বরদের এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, এইসব দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপর্যয় ঈশ্বরেরই করা, মানুষের নয়। এইজন্যেই তাদের মৃত্যু হতে লাগল, কাজ করতে করতে তারা পড়ছে ও মরছে, কিছু অন্নের জন্য অপেক্ষা করছে, তা এসে পোঁছনোর আগেই মরে যাচ্ছে। তারা মুখে কোনো অনুযোগ নিয়ে, কিংবা বুকে কোনো বিদ্রোহের ভাব নিয়ে, কিংবা মনে কোনো ক্রোধ নিয়ে কি মরছে? ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের কি কোনো নালিশ নেই, যার জন্যে তাদের এত দুর্দশা? না, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাদের শিথিল হয় নি, তারা ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা

জানিয়েছে, ঈশ্বরের স্তুতি করেছে, তাঁর গৌরব ঘোষণা করেছে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময়ও হতাশ হয়ে যায় নি, আশা রেখেছে মনের মধ্যেই জমা।

কর্নওয়ালিশ ভাবল, আমিই তাদের এই দশা করেছি, তাদের কপালে পশুর চিহ্ন এঁকেছি তাদের পিঠে ক্রীতদাসের পরিচালকের চাবুক কষিয়েছি। তাঁর মনে ক্ষমতার স্ফুলিঙ্গ যেন খেলে গেল, আমার হাতেই সব, আমার ইচ্ছার কাছে তাদের নতি স্বীকার করিয়েছি, যা আদেশ করেছি তাই করতে হয়েছে তাদের। তাদের কষ্টের দরুন যত দোষারোপ তারা করুক তা ঈশ্বরকে করুক ; কিন্তু আমি নিশ্চিত দ্বিগুণ নিশ্চিত – টিপু সুলতানের উপর জয়ের গৌরব একা আমারই প্রাপ্য, এ গৌরবের অংশ আমি তোমাকেও নিতে দেব না, হে ঈশ্বর।

তার মেজাজ বদলে গেল অন্যরকম মনোভাব এসে গেল তার মধ্যে। যেন তার হৃদয় অন্বেষণ করতে লাগল, তার ভিতরের কোনো-এক জনের জন্যে সে যেন ক্ষমা চাইতে লাগল। নিজেকে কিভাবে আমি এমন নির্মম করে তুললাম ? কিভাবে এমন নিরুত্তপ্ত হলাম ? এই দুর্দশায় লোকের আর্তনাদে কেন কান দিলাম না আমি ? পশুর মতন এই উদাসীনতা কী ক'রে আমার মধ্যে এল ? আমি কি পাপ করলাম না ? ঈশ্বরের কাছে আমার গৌরব কি ক্ষুণ্ণ হল না ? আমার নিজস্ব বিশ্বাসকে আমি কি ধূলিধূসরিত করলাম না ? না, না, না। নিজেকে শক্ত করে তোলার চেষ্টা করল সে। আমি ইতিহাসের হাতের একটি যন্ত্র মাত্র। আমার জাতিকে সর্বেশ্বর করে তোলার জন্য সহায়তা আমাকে করতেই হবে। আমার উপরওয়ালাদের ইচ্ছা-অনুসারে এবং তাদের আদেশে আমাকে কাজ করতে হবে। এজন্যে আমার নিজের এ আক্ষেপ কেন ? এসব চাপা দেবার শিক্ষা কি আমি এখনো পাইনি ? আমার সেই সাম্রাজ্য গঠনে যারা বাধা দেবে তারা কি রাজদ্রোহী নয় ?

সে সময়ে কর্নওয়ালিশ জানত না যে, আরও শতাব্দী ব্যাপী যে দুর্দশা আসার আছে, তখন, যারা মানুষকে অমানুষ করেছে, যারা সতীর্থদের প্রতি পশুর মত ব্যবহার করেছে তারা দোষী সাব্যস্ত হলে তারা ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে কৈফিয়ত দিয়ে বলবে যে তারা যা করেছে তা উপরওয়ালার আদেশেই এবং এই ভাবেই তারা তাদের কৃতকর্মের দরুন যাবতীয় অপরাধ অস্বীকার করতে চাইবে, জনহত্যা গণহত্যা ইত্যাদি সমুদয় পাপ তাদের বিবেকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস করবে।

তার চারদিকের লোকজনদের দিকে চেয়ে তার চিন্তা বাধা পেল। তার তাকানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল তাকে যা বলা হয়েছে তা তার কানে যায় নি।

জেনারেল মেডোস আবার বলল, "বলছিলাম, সময় আসন্ন। তুমি যা-যা চেয়েছ, তার বেশিই কিছু করা হয়ে গেছে।"

"তাই বুঝি?" উত্তর দিল কর্নওয়ালিশ।

জেনারেল অ্যাবারক্রমবি বলল, "আরও অনেক কম্যাণ্ডার টিপুকে ত্যাগ করছে এখন টিপু প্রায় নিঃসঙ্গ।"

'অদ্ভুত ব্যাপার!"

' না, অদ্ভুত নয়, জনগণের সঙ্গে তার যোগও নেই।"

"কি বললে? জনগণের সঙ্গে?"

"আমি সেইসব লোকের কথাই বলছি যাদের গুরুত্ব আছে—যাদের অর্থ আছে, যাদের আধিপত্য আছে, যাদের প্রভাব আছে, যাদের জমিজমা আছে। এই রাজ্যের যে লক্ষ লক্ষ লোক তাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে—তাদের কথা ভাবিনি। যুদ্ধ যদি প্রার্থনা ও শুভেচ্ছায় জয় করা যেত তাহলে তাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার দাম থাকত।"

"অন্তত এ ব্যাপারটা আশ্চর্য, তাই না? যাদের তরবারি আছে, সম্পদ আছে সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তার যোগ রাখা উচিত ছিল, হাজার-হাজার লোকের হৃদয়ের ধন হয়ে লাভ কি, যেসব লোকের কোনো মূল্যই নেই?"

"যে দেশে রাজা মনে করে যে, দুর্বল আর সবল একই সুযোগ-সুবিধে পাবে, সে দেশে এ ছাড়া আর হবে কী। সে অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মনীতি যুক্ত করে, সে চায় ধনীরা সুবিধে ত্যাগ করে চাষীকে বাঁচাক, সে কর হ্রাস করে, জমিদাররা যখন অনুযোগ করে সে তখন সামাজিক বিচারের ধুয়া তোলে, যাঁরা ধন অর্জন করেছে বা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছে তাদের সে জনগণের কল্যাণ-কাজের জন্যে বলে সেই ধনের অছি হতে। এসব হলে কেউ আশ্চর্য হবে না যে, ভিখারীদের সে ঘোড়ায় চাপতে বলবে, ক্ষমতা হাতে নিতে বলবে।"

কর্নওয়ালিশ ভাবল, এই রাজাটার কী অদ্ভুত মনের গঠন, তবুও কর্নওয়ালিশের মনে একটু যেন ঈর্ষারও আঁচ লাগল।

কর্নওয়ালিশ বলল, "হ্যাঁ। আমরা প্রস্তুত। সময় প্রায় এসে গেছে।"

"প্রায়?"

"মারাঠাদের ও নিজামকে দৃঢ় মৈত্রীতে জুড়ে দিতে হবে। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত যুদ্ধের চুক্তিতে তাদের স্বাক্ষর করতে হবে। আগামী সপ্তাহে আমি নিজামের সংগে মিলিত হচ্ছি।"

"তার সইএর কি বিশেষ দাম আছে ?"

"তাকে যা দিতে চেয়েছি তা কম না—জয়-করা টিপুর সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ।"

"অমন একজন লোককে অতটা ? যার উপর নির্ভর করা যায় না সেই শয়তানকে অত ?"

কর্ণওয়ালিশ বলল, "ভাষা সংযত কর।" একটু হাসল সে, তাতে বোঝা গেল এদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা বোঝাবুঝি আছে, কর্ণওয়ালিশ বলল, "বন্ধুকে বড়লোক করে দেওয়া ভালো। আমাদের ধার দরকার হলে তাদের কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায়।"

সকলেই হেসে উঠল, কর্ণওয়ালিশেব মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল।

কর্ণওয়ালিশ বলল, "টিপুব বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করার আগে আমাদের দরকার অজুহাত।"

"কিসের অজুহাত ?"

"তার কোনো দরকার নেই।"

"একটু আগেই তোমরা বললে টিপু সুলতান অর্থনীতিব সঙ্গে ধর্মনীতির যোগ দেয়। আমারও একটু ত্রুটি আছে। রাজনীতির সংগে আমি যোগ করি চেহারার সৌন্দর্য। যে কোনো কাজের মান বাড়াতে হলে একটা মর্যাদাপূর্ণ অজুহাত দেওয়া চাই।"

"বেশ, তা হলে আমরা বলি, টিপু সুলতান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হচ্ছে, তার চেয়েও ভালো হয়,, যদি বলি আমাদের সে আক্রমণ করেছে।"

"সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য বলে ঠেকবে ?" জিজ্ঞাসা করল কর্ণওয়ালিশ।

"তার জন্যে ভাববার কি দরকার আছে ?"

"আমার নীতি অনুসারে, দরকার আছে। শোনো বন্ধুগণ, যুদ্ধ সব সময়ই করা হয় মহৎ উদ্দেশ্যে, হীন কোনো উদ্দেশ্যে নয়, সাম্রাজ্য জয়ের জন্য নয়। একটা আদর্শ বাঁচাতে, একটা নীতি রক্ষা করতে, এক যোগ্য মিত্রকে সমর্থন করতে।..."

"আমরা যদি বলি আমাদের সুযোগ্য মিত্র নিজামকে সে আক্রমণ করেছে।"

"হায় রে, সে সুযোগ্যও নয়, এখন পর্যন্ত সে মিত্রও হয় নি। তা ছাড়া, ও কথা বললে কে বিশ্বাস করবে? না, অন্য কারো কথা ভাবা যাক—যে আরও অসহায় আরও দুর্বল। একজন দুর্বলকে বাঁচাতে আমরা যেতে পারি সাহসী যোদ্ধার মত।"

আরও চার পাঁচটি বিষয় ভাবা হল, বাতিল করে দেওয়া হল।

"ত্রিবাঙ্কুর কেমন হয়? সেখানকার শাসকের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি আছে, যদিও ইতিমধ্যে সে ডচ'দের সঙ্গে একটা মতলব আঁটছে। আমরা কি বলতে পারিনে ত্রিবাঙ্কুরের শাসক আমাদের অসহায় মিত্র, টিপু তাকে হয়রান করছে।"

কর্নওয়ালিশ বলল, "আইডিয়াটা মন্দ না।"

পরদিনই ইংরেজদের দূত ত্রিবাঙ্কুরে যাত্রা করল।

## ৪৭. আমাদের বিশ্বাসী মিত্র

ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, এবং তা সীলমোহরাঙ্কিত হল।

নিজাম চলে যাবার একটু পরেই কর্নওয়ালিশ বলল, "মনে হচ্ছে আজ আমাকে আবার স্নান করতে হবে।"

"তা ঠিক। অনেকক্ষণ ধরে কেউ তার সঙ্গে কথা বলার পর তার স্নান করারই দরকার হয়।" বলল জন কেন্নাওয়ে, নিজামের দরবারে সে ইংরেজদের রেসিডেন্ট ছিল।

কর্নওয়ালিশ বলল, "তা মানি। বলো তো, নিজাম কি কখনো সত্য কথা বলে?"

"বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি নিজাম সর্বদাই সত্যকথা বলে, এবং কেবলমাত্র তা ঘুমের ঘোরে।"

"অন্য কখনো না?"

"যদি-বা কখনো বলে তবে তা তার মিথ্যাকথার মধ্যে এমনই হারিয়ে যায় যে তা খুঁজে পাওয়াই দায়।"

"একথা বিশ্বাস করি।"

"এটা কিন্তু তার দোষ নয়। মনে হয় তার শিশুকালে কেউ তাকে শিখিয়েছে যে মানুষ ভাষার উদ্ভাবন করেছে কোনো চিন্তা প্রকাশ করার জন্যে নয়, তা চাপা দেবার জন্যে।"

## ৪৮. কুঠারের ছায়া

মারাঠা শিবিরে বৈঠক চলেছে।

পন্থ বলল, "নিজের চোখে আমি দেখেছি। ওদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। অনেক জরুরি অবস্থার ব্যবস্থা তারা করেছে। বছর বছর ধ'রে তারা তাদের সামরিক বাহিনীকে খাওয়াতে ও যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করতে পারবে। আমি বলে দিচ্ছি, ইংরেজ বাহিনী এখন অপরাজেয়।"

"তাহলে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করায় তাদের এত গরজ কেন? তারা নিজেরাই টিপু সুলতানকে সাফ করে দিচ্ছে না কেন?" জিজ্ঞাসা করল নানা ফড়নাবিস।

উত্তরে পন্থ বলল, "এই লর্ড কর্নওয়ালিস লোকটা খুব সাবধানী। সে দ্বিগুণভাবে নিশ্চিত হতে চায়। তোমার মত তার সাহসও নেই, বিক্রমও নেই।"

শ্লেষটা উপেক্ষা করে নানা সাহেব বলল, 'ইংরেজদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে তোমার উক্তি মেনে নিলাম। অনেকেই যা খবর দিয়েছে তার থেকে ঐ রকমই মনে হয়। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে—আমরা কি নিরপেক্ষ থাকতে পারি নে?"

"তা কী করে সম্ভব? যুদ্ধের বিপদ থেকে নিরপেক্ষ হয়ে থাকার বিপদ বেশি।"

"এমন সিদ্ধান্তে কী করে এলে?"

"জ্ঞানের দরুনই অবশ্য।"

"আমাকে ওই জ্ঞানের একটু ভাগ দাও।"

'আমার সঙ্গে তুমি তামাশা করছ, নানা সাহেব। কিন্তু আমাকে বলতে দাও —আমরা নিরপেক্ষ থাকলে কী হবে তা জান? যে ইংরেজ এখন আমাদের সাহায্যের উপর এত নির্ভর করছে তারা আমাদের উপর তুষ্ট থাকবে না, আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে। অপর দিকে আমাদের কাপুরুষতার জন্যে টিপু আমাদের ঘৃণা করবে। 'তাহলে এমন আস্থাহীন বন্ধুর কাছ থেকে ইংরেজরা ভবিষ্যতে কী পাবে? এমন কাপুরুষ শত্রু নিয়েই বা টিপু কী করবে? যুদ্ধ খতম হবার পর ইংরেজরা

ও টিপু সুলতান তাদের দ্বন্দ্ব যখন মিটিয়ে ফেলবে, তখন ওদের কারো ভাগ্যের সঙ্গে আমরা আমাদের ভাগ্য মিলিয়ে না-নেওয়ায়, এ যুদ্ধে যারা জয়ী হবে তারাই আমাদের দেখে নেবে। তাহলে, কোনো দ্বিধা না-করে ইংরেজদের দিকেই ভিড়ে যাওয়া ঠিক না ?"

"আর ইংরেজরা যদি হারে ?"

"সেটা সম্ভবই নয়, কিন্তু যদি ধরেই নিই যে তা সম্ভব, তাহলে কি মনে কর যে, ইংরেজদের উপর টিপু যদি জয়ী হয়, তবে কি সে জয় হবে চূড়ান্ত ? কখনোই নয়। ইংরেজরা আবার আঘাত হানার জন্যে অপেক্ষা করবে। তার পরিণাম কী হবে ? ইংরেজদের কাছে তুমি হয়ে যাবে সবশ্রেষ্ঠ মিত্র। তোমার বন্ধুত্বের কদর তারা দেবে, এবং তোমার মৈত্রী বরাবরের জন্যে বিপুল মর্যাদা পাবে। আর, টিপু সুলতান ? তোমার শুভেচ্ছা পাবার জন্যে সে স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করবে। তোমার নিরপেক্ষতার প্রতিদান সে দেবে তোমার সাহায্যের জন্য আরও অনেক কিছু।"

"ইংরেজরা জয়ী হবে তোমার এই অভিমতটা মেনে নিয়ে বলছি, তা যদি হয় তবে ইংরেজরা এমনই শক্তিশালী হবে উঠবে যে আমাদেরও ভীত করে তুলবে। আমাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হতে পারে এমন শক্তি যাতে তারা পায় তার জন্যে আমাদেরই তুমি তাদের সাহায্য করতে বল ?"

"এইখানেই তোমার হিসাবের গণ্ডগোল। ইংরেজরাই কেবল এই যুদ্ধে শক্তিমান হয়ে বেরিয়ে আসবে না—আমরাও শক্তিমান হয়ে উঠব। যতটা ভূমি ও যত সম্পদ পাওয়া যাবে তার অংশ পাব আমরা। ইংরেজদের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হব শক্তিশালী। যদি যুদ্ধে লিপ্ত আমরা না-হই তাহলে কী হবে তা ভেবেছ ? ইংরেজরা একা ল'ড়ে যদি জিতে যায় তবে ভাগাভাগির কোনো প্রশ্ন থাকবে না। তখন তারা কী পরিমাণ শক্তিধর হবে, অনুমান কর। আমাদেরকেই প্রথম শিকার করতে তারা দেরি করবে না। তারা কোনো বাধাও পাবে না। অতীতের কোনো মৈত্রীর জন্য কৃতজ্ঞতার কথাও উঠবে না।"

"অতীতের কৃতজ্ঞতা, ইংরেজদের ভবিষ্যতের মতলব সিদ্ধির পথে ওসব কোনো বাধা হবে না।"

"হয়তো নয়। কিন্তু আমাদের শক্তি যদি বাড়ে তবে সেইটেই হবে বাঁধা। টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ও সমান ভাগ পেয়ে তবেই-না বৃদ্ধি করা যাবে শক্তি ?"

নানা ফড়নাবিস চুপ করে রইল, চিন্তা করতে লাগল। পন্থ চাপ দিতেই বলল, 'ভুলে যেয়ো না, নিজাম ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

নানা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "মিথ্যার বা প্রতারণার কোনো পরোয়া করে না নিজাম। সে ওইসবের মধ্যেই ডুবে আছে।"

"নিজামকে অত তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না। তার অর্থ আছে, শক্তি আছে। বিদেশীর দ্বারা শিক্ষিত সেনাবাহিনী আছে। তার উপর তার জ্যোতিষীরা বলেছে যে, সে সবচেয়ে বেশি বিত্তশালী শাসক হয়ে বেঁচে থাকবে।"

"বাঁচুক। আমার তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু সবচেয়ে ধনী শাসকরূপেই সে মরবে।"

"এ দুয়ের মধ্যে তফাতটা কী?"

"আকাশ-পাতাল ভেদ। জীবন ও মৃত্যু।"

"আমরা কিন্তু অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করার সুযোগ আমরা যদি ফসকাই তবে সেটা হবে খুবই দুঃখের। আমাদের বাঁচতে হলে ইংরেজ বা নিজাম বা অন্য কেউ শক্তিশালী হয়ে উঠলে চলবে না। আমরা কারও শিকার হতে চাইনে।"

"ওটা বাদ দেওয়া যাক, থাক ও কথা।"

"ম্যালেট [পুনায় ইংরেজদের এজেন্ট] অধৈর্য হয়ে পড়ছে। আমাদের আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

"আমিও সময় নষ্ট করতে চাইনে। কালই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।"

"তাই হোক।"

এক সপ্তাহ পরে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির দলিলপত্র সই করার জন্য নানা ফড়নাবিসের কাছে আনা হল। তুকোজি হোলকার বিষণ্ণভাবে চেয়ে ছিল তাকে নানা সাহেব বলল, "তুমি কী মনে করছ আমি জানি। আমিও ওই রকমই ভাবছি। কিন্তু আমাদের উপায় কী? যারা জয়ী হবে তাদের সঙ্গেই যোগ দিতে হবে আমাদের, এ'তে কোনো সন্দেহ নেই। মারাঠা জাতির অস্তিত্ব এর উপরেই নির্ভর করছে।"

"আমাকে মাফ করবেন, নানা সাহেব। আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে একটা কুমিরকে একটা ভেড়া দিয়ে আজ পরিতৃপ্ত করা, আগামীকাল যে নাকি আমাদেরকেই খেয়ে বসবে।"

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। উভয়েই নিজ-নিজ চিন্তায় মগ্ন হল।

অবশেষে নানা বলল, "ঈশ্বর করুন তোমার কথা মিথ্যা হোক।"

তুকোজি হোলকার বলল, "ঈশ্বর যেন তাই করেন।"

কলম তুলে নিল নানা, চুক্তিতে স্বাক্ষর দিল। ইংরেজ এজেন্ট ম্যালেট বক্তৃতা দিল নানা সাহেবের বুদ্ধি বিচক্ষণতা ইত্যাদির তারিফ করে। হঠাৎ সভাস্থ সকলকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল নানা সাহেব। সে মনে-মনে ভাবল, এবার আমার হাত ধুতে হবে, হয়তো হাতে কালি লেগেছে, বা লাগেনি।

প্রখর সূর্যালোকে প্রাসাদের অর্ধচন্দ্রাকার খিলানের ছায়া পড়েছে প্রাঙ্গণে। শ্বেত মর্মরের উপর বিশাল কুঠারের মত মনে হচ্ছে সেটা। প্রাঙ্গণের মাঝখান থেকে মারাঠার পতাকা উড়ছে। নানা দেখল তার ছায়া ঐ কুঠারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একটু চমকাল সে। দিক পরিবর্তন করল সে। যে চিন্তা তাকে পীড়িত করল তা দূর করার চেষ্টা করল। তার ঠোঁট কাঁপল কিন্তু হাসি?... সে ঠোঁটে হাসি ছিল না।

## ৪৯. ফ্রান্সের গবর্নর জেনারেল

পূর্বাঞ্চলের ফরাসি গবর্নর-জেনারেল কোঁতে দ্য কনওয়ে বলল, "বন্ধুত্বের বন্ধন ও কৃতজ্ঞতা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু কিছুটা এগিয়ে আসার পর তা আর মানতে হবে না। যে মৈত্রী দিয়ে বিশেষ উপকার কিছু হল না তা হচ্ছে একটা ঘৃণ্য বস্তু।"

দ্য ফ্রেসনে মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা টিপু সুলতানকে যদি সমর্থন করতে না-পারি তবে কি ফ্রান্সের সুনাম নষ্ট হবে না? আমরা তাকে কথা দিয়েছি।"

"যে যুদ্ধে পরাস্ত হতেই হবে তা লড়তে যায় বোকারা। পরাজয়ের মত অন্য কোনো-কিছুতে একটি জাতির সুনাম নষ্ট হয় না। এমন একটা বিশৃঙ্খলার সময়ে এমন কোনো জিনিসের উপর আমাদের আস্থা রাখা ঠিক না যার দ্বারা আমাদের কোনো কল্যাণ হবে না।"

"টিপু সুলতান আশা করে আছে—'

"এ'তে প্রমাণিত হচ্ছে সে আরও বোকা।"

"তবে আমরা পিঠ ফেরাব এই কি তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?"

"হ্যাঁ। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার কথা বলার ভঙ্গিটা খুব ভালো নয়। কারো দিকে পিঠ ফিরিয়ো না. পিঠে ছোরা পড়ার ভয় থাকলে অন্তত।'

"লোকে যে বলে টিপু সুলতান কারো পিঠে ছোরা মারে না?"

"জানি। স্বর্গের কোনো বিশেষ উপদেশে সে চলে, কিন্তু আমরা এই পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছি।"

"বেশ। আমরা তবে কি ভাবে টিপুর সঙ্গ ত্যাগ করছি?"

"ওহে সরল বন্ধুটি আমার, সঙ্গ ত্যাগ আমরা করছি নে। যখন সে আমাদের কাছাকাছি থাকবে তখন বন্ধুত্বের কথা বলব জোরে-জোরে। যখন কাছে থাকবে না তখন বলব মৃদু গলায়, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু কোনোরকম যোগ থাকবে না আমাদের কথায় ও কাজে।"

"কী রকমের কাজ আমরা করব ?"

"অবস্থার চাপ যেমন করাবে। এই মুহূর্তে, ইংরেজরা এখন এমন শক্তিশালী যে তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না। টিপুর পক্ষে এখন যাওয়া চলে না। ইংরেজকে আমরা অল্পবিস্তর সাহায্য করতে পারি।"

"কী জন্যে ?"

"একটি কারণে, এবং একটি বিষয় বিবেচনা করেই তাদের কাজে আসা যায়। প্রথম ভাবনাটি হচ্ছে : তারা আমাদের কী উপকারে আসবে ? এই সাহায্য করাটা দাক্ষিণ্য বা বদান্যতা নয়।"

তার সঙ্গীর চোখের দৃষ্টি দেখে কনওয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল, "তুমি অমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন ?" সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমার অভিপ্রায়কে তিরস্কার করছ ?"

"না, না। এর ঠিক বিপরীত। তোমার বিচক্ষণতার তারিফই করছি।"

"ধন্যবাদ। তোমার কথায় প্রীত হলাম।"

পূর্বাঞ্চলের ফরাসী গবর্নর-জেনারেল পরে কর্নওয়ালিশকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে ফরাসীরা টিপু সুলতানকে সমর্থন জানাচ্ছে না। চিঠিতে লেখে, "হিজ ম্যাজেস্টি, দি কিং অব ফ্রান্স, তাঁর মহত্ত্ব ও সদাশয়তার নিদর্শন স্বরূপ, জানিয়েছেন যে, তিনি টিপু সুলতান কর্তৃক প্রেরিত দূতের সঙ্গে দেখা করতে স্বীকৃত কিন্তু এটা নিশ্চিত যে কোনোরকম ভাবে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবে না। ফ্রান্সের বিশ্বাস, ফ্রান্সেব মর্যাদা, সেই মহান জাতির স্বার্থ—সব দিক বিবেচনা করে নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করেছে ফ্রান্স।"

কর্নওয়ালিশ চিঠির শেষাংশের বাক্য পাঠ করে একটু হাসল, 'ফ্রান্সেব বিশ্বাস, ফ্রান্সের মর্যাদা, সেই মহান্ জাতির স্বার্থ"। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এসবই তো ক্রয় করা। যে উৎকোচ সে পাঠিয়েছে কোঁতে দ্য কনওয়েকে সে তার ফলে নিজেরই স্বার্থ দেখেছে আরও কত দরকার ? এ রকম নিরপেক্ষ থাকার থেকে সোজাসুজি আমাদের পক্ষে কার্যকর ভাবে চলে আসতে ? ভাবল কর্নওয়ালিশ। খুব বেশি না, নিজেই নিজের কথার উত্তর দিল সে। বেশ, তা দেওয়া হবে। দেওয়াও হল। এক লক্ষ টাকা 'ঋণ' হিসাবে দিলেই যথেষ্ট হবে। আরও দশ হাজার গেল দ্য ফ্রেসনের কাছে। তাতেই সে চুপ করে গেল। 'বিবেক হচ্ছে একটা যন্ত্রণাদায়ক জিনিস, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তা কেনা চায়।' ভাবল কর্নওয়ালিশ।

## ৫০. উঠে দাঁড়াও, শুনতে দাও

"যুদ্ধ এখন অবশ্যম্ভাবী।" লক্ষ্মণ বলল পুরনাইয়াকে।

"তোমার শিশু-মন এমন কঠিন প্রসঙ্গ তুলল কী করে?" জিজ্ঞাসা করল পুরনাইয়া।

"সকলেই এ কথা বলছে।"

"তাই বুঝি? আমি ভাবলাম বরাবরের মত এটাও বুঝি তোমার মৌলিক সিদ্ধান্ত।"

লক্ষ্মণ হাসল। সাধারণত সে তামাশা আরম্ভ করে, অন্যকে নিয়েই করে, নিজে তার শিকার হয় না। কিন্তু এখন সে একটু গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছে। লক্ষ্মণ বলল, "আমাদের দরবারে মিছিলের মত আসছে ইংরেজদের এজেন্ট, তারা সকলেই কর্নওয়ালিশের শান্তির মতলবের বিরুদ্ধে একজন অন্য জনের উপর টেক্কা দিয়ে কথা বলছে।"

পুরনাইয়া বলল, "তারা যা বলছে তারা হয়তো তা বিশ্বাস করে।"

"পুরনাইয়া, আমার সঙ্গে হালকা মেজাজে কথা বোলো না। সীমান্তের ওপারে তাদের বিপুল প্রস্তুতির বিষয়ে তো জান। যাদের রাত্রে ঘুম হচ্ছে না ওসব চিন্তায় তুমি তাদের মধ্যে একজন..."

"বন্ধু, ঘুম হচ্ছে যুবকদের বিলাস। যতই বয়স আমার বাড়ছে, আমি নিজেকে জাগিয়ে রাখার নানা অছিলা খুঁজছি। ঘুমের সুযোগ শীঘ্রই আসবে।"

পুরনাইয়ার কথায় তেমন কান দিল না লক্ষ্মণ, বলল, "কর্নওয়ালিশের আজকের বিবৃতির পর আর তো কোনো সন্দেহ নেই।"

"ঠিক বলেছ?" পুরনাইয়া প্রশ্ন করল। "ভেবেছিলাম বিবৃতিটা আমিই বার বার পড়েছি খুঁটিনাটি ভাবে। চমৎকার এর ভাষা। এর মধ্যে মারাত্মক কিছু নেই। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের কথা এ'তে আছে। আরও বলা আছে, সম্মুখেই একটা শান্তির সহযোগিতার শুভেচ্ছার ও পারস্পরিক মর্যাদাবোধের যুগ এসে উপস্থিত হচ্ছে মহীশূর রাজ্যের ও ইংরেজ রাজের মধ্যে। টিপু সুলতান ও ইংরেজের মধ্যে যারা বিভেদ আনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তাদের উপর কেমন তিরস্কারের বোঝা চাপানো হয়েছে, তা তো লক্ষ

করেছ। তোমাকে নিয়ে বিপদ এই, লক্ষ্মণ, তুমি পড়তে পার না, অন্যের মুখে যা শোনো তাতেই অভিভূত হও। বিবৃতিতে মুন্ধাশঙ্করের যাবতীয় গুজব অস্বীকার করা হয়েছে। এটা একটা সরকারী উক্তি।"

"একবার তুমি বলেছিলে : ইংরেজদের সেই কথাই কেবল বিশ্বাস করবে যা তারা সরকারী ভাবে অস্বীকার করে।"

পুরনাইয়া হাসল, "তোমাদের কাঁচ মনে একটা ভয়ংকর ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে ভুল করেছি।"

"পুরনাইয়া, তোমার দোহাই, আমার কথায় কান দাও।"

"এতক্ষণ তবে কি তোমার কথায় কান দিই নি? কী জানতে চাও তুমি?"

"একটি মাত্র প্রশ্ন—এই যুদ্ধে সুলতান জিততে পারবে তো?"

পুরনাইয়ার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, তার গলায় এখন ক্রুদ্ধ শব্দ, "তুমি জিজ্ঞাসা করছ—এ যুদ্ধে সুলতান জিততে পারবে তো? এটা কার যুদ্ধ? এ প্রশ্ন তোমাকে করছি আমি। এটা কি সুলতানের একার যুদ্ধ? কিংবা এটা তোমার আমার ও এদেশের সবার যুদ্ধ? তোমার প্রশ্ন ভালোভাবে করার চেষ্টা কোরো।"

"আমি কি বলতে চেয়েছি তা নিশ্চয় বুঝেছ। আমার সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই করছ কেন? সুলতানের থেকে আমরা আলাদা—এমন কি আমরা কখনো ভাবতে পারি?"

"ওভাবে ভাবতে পারে, এমন লোকও আছে।" পুরনাইয়া বলল।

পুরনাইয়ার কণ্ঠস্বরে ঠান্ডা উগ্রতা অনুভব করল লক্ষ্মণ। পুরনাইয়ার দিকে সে তাকাল। দুই চোখ রক্তবর্ণ, কিন্তু সতর্ক। সে চোখে অতিশ্রমের ক্লান্তির ছায়া। সকলেই জানত প্রধানমন্ত্রী পুরনাইয়ার চোখে ঘুম নেই। দিন-রাত্রি সে সেক্রেটারি-কম্যান্ডার-গোয়েন্দাবাহিনীর সঙ্গে কাটাচ্ছে। তারা তাড়াহুড়ো করে যাতায়াত করছে, ইংরেজদের দিক থেকে যে ভীতি আসছে তা দূর করার জন্যে তাদের ব্যস্ততা লেগেই আছে। অল্প আগে তার খোসমেজাজ যা দেখা গিয়েছে তা হচ্ছে তার মনের সেই ভাব চাপা দেবার জন্যে—মহীশূর, সুলতান ও সমগ্র জাতি এখন বিপদের মুখে, যাদের প্রতি পুরনাইয়ার ভালোবাসা সীমাহীন।

উভয়েই এখন নিশ্চুপ। কিন্তু মনে হচ্ছে নীরবে তারা উভয়ে কথা বিনিময় করে চলেছে। লক্ষ্মণ এই নীরবতা ভাঙল।

"প্রতি একজন রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্যে দশ হাজার মানুষ জীবন দিতে প্রস্তুত এই দেশের কথা ভেবে। এ কথা মনে রেখো।"

"মনে রাখব। তাদের সকলকে গণনা করব।" ধীর কণ্ঠে বলল পুরনাইরা, তার মুখে রসিকতার কোনো চিহ্ন নেই, তার হৃদয়ের মধ্যেও না। সে যা বলল, তা সে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছে।

## ৫১. দি গ্র্যাণ্ড আর্মি

ক

মহীশূর রাজ্য পরিণত হয়ে গেল এক সামরিক শিবিরে। তার চারদিকে বয়ে চলেছে প্রবল যুদ্ধের ঝড়।

কর্নওয়ালিশ সর্বাধিনায়ক রূপে নিয়োগ করল মেজর-জেনারেল উইলিয়ম মেডোসকে সেই বাহিনীর নাম দেওয়া হল গ্র্যাণ্ড আর্মি। ভারতবর্ষে এমন সশস্ত্র বাহিনী আগে কখনো নামায়নি ইংরেজ। মেডোস আগে ছিল বম্বের গবর্নর, তার পরে হয় মাদ্রাজের গবর্নর, এবং কর্নওয়ালিশের অবসর গ্রহণের পর গবর্নর-জেনারেল হবার কথা।

গ্র্যাণ্ড আর্মির সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করল মেডোস অতি আন্তরিক ভাবে। কর্নওয়ালিশ এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা, এর উপকরণাদির প্রাচুর্য, এব ইউনিফরমের ঘটা, এবং সর্বোপরি সাজসজ্জা বিষয়ে একটুও বাড়িয়ে বলেনি।

কর্নওয়ালিশ বলল, "জয়ী হয়ে ফিরে এস।"

"সেই ভাবেই আসব।" আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল মেডোস।

কর্নওয়ালিশ আবার বলল, "জয়ী হবে।"

ইংরেজদের গ্র্যাণ্ড আর্মি এগতে আরম্ভ করল। অন্য দিক থেকে এগতে লাগল মারাঠা বাহিনী। নিজাম অপেক্ষা করতে লাগল. সব দেখতে লাগল। সে দেখল ইংরেজদের এগিয়ে যেতে, অপ্রতিহত গতিতে। সে দেখল মারাঠাদের এগিয়ে যেতে, বিনা বাধায়। সে তখন তার বাহিনীকে এগতে আদেশ দিল। তিন দিক থেকে তিনটি বর্শার ফলা—সব ক'টিই টিপুর বুক লক্ষ করে এগচ্ছে। ফরাসিরা খাপে ছোরা ভরে নিয়ে হাসতে লাগল, সময় হলে এই তিন বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে। বেসরকারী ভাবে তারা তাদের সেপাইদের ছুটি দিয়েছিল এই কথা বলে যে; ঐ তিনটি বাহিনীর যে-কোনটিতে তারা যোগ দিতে পারে মজুরির বিনিময়ে। কোঁতে দ্য কনওয়ে কর্নওয়ালিশের পাঠানো সোনার মুদ্রা নিয়ে তখন খেলা করছে।

খ

গ্র্যান্ড আর্মির সর্বাধিনায়ক রূপে মেডোস তার মার্চ আরম্ভ করল ১৭৯০ সালের মে মাসে। মহীশূর-বাহিনী যে স্থানটি ছেড়ে গেছে সেই সীমান্তের ঘাঁটি করুর দখল করল মেডোস। তিরিশ জন সৈন্য পাহারায় রত ছিল এমন একটা ক্ষুদে দুর্গ অরভাকুরিচি'তে সে এগিয়ে গেল। অল্প দূরের বিপরীত দিক থেকে টিপুর দূত লক্ষ করল ইংরেজরা ঐ দুর্গের উপর কামান দাগছে। তার পেঁছিতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় সে ঐ দুর্গ ত্যাগ করে আসার ও কয়েক মাইল পিছনে এসে একটা শক্ত ঘাঁটিতে মিলিত হবার খবর দিতে পারে নি তাদের সৈন্যদের। তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সে চীৎকার করতে লাগল ঈশ্বরের দোহাই. শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দাও'—যদিও সে জানত তার গলা অত দূর পর্যন্ত পেঁছিবে না। রাত্রেও গোলাগুলি চলেছে, কিন্তু তারই মধ্যে সে গোপনে গিয়ে উপস্থিত হল দুর্গে। ত্রিশজনের মধ্যে চব্বিশ জন মারা গিয়েছে, দুজন মারাত্মক আহত হয়েছে, বাকি চারজন পালটা গুলি চালাচ্ছে। সে হচ্ছে পঞ্চম জন, এবং একমাত্র যে আহত হয় নি, যার রক্তপাত হচ্ছে না। শ্বেতপতাকার কথা সে ভুলে গেল। এত অন্ধকার যে শত্রুরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না. এই অবসরে সে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলল। সকাল হবার আগেই বন্দুকে হাত রেখে সে মারা গেল। ইংরেজ বাহিনী দুর্গে এসে ঢুকল। পালটা গুলি ছোড়ার কেউ নেই। সেখানে কেউ বাঁচল না।

মেডোস ঢুকল কয়েমবাটোরে। জায়গাটা একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লড়াই করার কেউ নেই. কারও উপর বলাৎকার করা হবে এমন কেউ নেই, কিন্তু লুঠ করার মত প্রচুর দ্রব্য আছে। সেখান থেকে সে তিন দিকে তিনটি শক্তিমান বাহিনী পাঠাল—ডিণ্ডিগুল আক্রমণের জন্যে কর্নেল জেমস স্টুয়ার্ট, ইরোডে কর্নেল ওলডহ্যাম ও মহীশূরের দিকে কর্নেল ফ্লয়েড।

ডিণ্ডিগুলের কেল্লাদার (কম্যাণ্ডান্ট) হাইদর আব্বাস খুব তেজী ও সাহসী, আত্মসমর্পণে সে অস্বীকার করল। ইংরেজদের কাছ থেকে যে বার্তা নিয়ে এসেছিল তাকে সে বলল, "তোমার সেনানায়ককে গিয়ে বলো যে ডিণ্ডিগুলের মত দুর্গ সমর্পণ করার মতন কারণ টিপু সুলতানকে বলার নেই, আমার শিরায় যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ এ কাজ হবে না। এ রকম বার্তা নিয়ে

আবার যদি কেউ আসে তাকে আমি কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেব।" কর্নেল স্টুয়ার্ট এই উত্তরটা পেল, হাইদর আব্বাসকে অভিসম্পাত করতে লাগল, তার গোলন্দাজবাহিনী আরম্ভ করল গুলিচালনা, দুই দিন ধরে এইভাবে চলা সত্ত্বেও ঐ দুর্গের উপর কোনো প্রভাবই পড়ল না। তারপর চলল কামান, এ'তে দুর্গের একটু ক্ষতি হল, তখন ইংরেজরা দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক করল। বার-বার তাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হল ঐ দুর্গের শক্ত বনিয়াদের সঙ্গে তার অধিনায়কের বিক্রম মিলিত হওয়ায়, ব্যক্তিগত ভাবে যে পরিচালনা করছিল তার বাহিনী।

"এখন আমরা কী করব ." জিজ্ঞাসা করল মেজর স্কেলী।

"আমাদের যেসব সেনা নিহত হয়েছে তাদের জন্যে চোখের জল ফেল, তার পর ধৈর্য ধরে এক কঠিন অবরোধের জন্যে তৈরি থাক।" স্টুয়ার্টের এই হল জবাব।

কিন্তু সেই রাত্রেই জেনারেল মেডোসের পাঠানো দূত এল। তার সঙ্গে এল এক বৃদ্ধ। স্টুয়ার্টের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বৃদ্ধ লোকটি একটি বার্তা ও শ্বেতপতাকা নিয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হল। তাকে দুর্গে ঢুকতে দেবার অনেক কারণ ছিল। পরদিন সকালেই আত্মসমর্পণ করল দুর্গটি।

যে বুড়ো লোকটি হাইদর আব্বাসের কাছে বার্তা নিয়ে গিয়েছিল সে তার মামা—তার মায়ের ভাই—যার সঙ্গে তার মা ও সে অনেক দিন বাস করেছিল। শা আব্বাস এখন ইংরেজদের কাছ থেকে বেতন পায়। হাইদর আব্বাস বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মামার কথা শোনে। তার লোকবলও বেশি না, তার অস্ত্রশস্ত্রও পরিমিত—নিজের মনেই সে হিসেব করে। সে ক্ষেত্রে ইংরেজদের শক্তি অনেক। এখন তাকে সোনায় মোড়া ভবিষ্যতের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। বেশ, তাই হোক। সে আত্মসমর্পণ করল। তার ভবিষ্যৎ? তার ভাইয়ের বুলেটে সে প্রাণ হারাল। তার ভাইও আত্মহত্যা করল, মরণকালে তার কথা হল, "মা, আমাকে মাফ করো,... বংশের মান বাঁচাতে এমন করলাম।...এ দেশের মাটি তাকে ও আমাকে ঢেকে দিক, ঢেকে দিক তার ও আমার পাপ'কে। ঈশ্বর ও সুলতান আমাকে মার্জনা করুক।" দুই পুত্রের মৃত্যুশোকে তাদের মা মারা গেল। হ্যাঁ, বংশের মান বজায় রইল, কিন্তু বংশটা? তা হল নিশ্চিহ্ন।

বিশ্বাসঘাতকতা! বিশ্বাসঘাতকতা! এই চলল। পালঘাটের সেনারাও স্টুয়ার্টের কাছে আত্মসমর্পণ করল—যদিও কয়েক সপ্তাহের অবরোধ তার পক্ষে

সহ্য করা কঠিনই ছিল, কয়েক মাসের কথা ওঠেই না। কর্নেল ওল্ডহ্যাম অধিকার করল ইরোড ইংরেজদের অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হল। কর্নেল ফ্লয়েড মহীশূরের পথে গজলহাটির তের মাইল দূর পর্যন্ত এসে পৌঁছল।

অবশেষে টিপু সুলতান এসে উপস্থিত হল স্বয়ং। ফ্লয়েড'কে থামতে হল। গজলহাটির গিরিপথ ইংরেজদের কাছে বন্ধ করে দেওয়া হল। মহীশূরের রাজ্য রক্ষা করার এই ব্যবস্থা হল। একটা ঝটিকার মত টিপু সুলতান চলল তার সেনাবাহিনীর আগে আগে। ইংরেজদের বিশাল বাহিনী সে আঘাত সহ্য করল। মহীশূর বাহিনী একটু থেমে আবার চার্জ করল। শত-শত লোক নিহত হল। টিপু সুলতানের পতাকা পড়ে গেল, মুজাহিদ হুসেন তা বহন করছিল, ইংরেজের গুলিতে সে মারা গেল। পতাকা দেখতে না-পেয়ে সুলতানের সেনাদলে বিভ্রান্তি দেখা দিল। সুলতানের কি পতন ঘটেছে? বুরহান-উদ্দিন তুলে নিল পতাকা। যেসব সেনাদলে বিশৃঙ্খলা এসেছিল, আবার এসে গেল তাতে শৃঙ্খলা। বুরহান উদ্দিন চীৎকার করে সকলকে শ্রেণীবদ্ধ হতে আদেশ দিল। সে চীৎকার করে বলতে লাগল, "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। ঈশ্বর সঙ্গে আছেন। সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে চল, দ্রুত বেগে।" যারা শুনতে পেল তারা অগ্রসর হতে লাগল, অন্যান্যরা শুনতে পায়নি। বুরহান-উদ্দিন ঘোড়াকে উত্তেজিত করে চার্জ করল। পতাকা ঊর্ধ্বে বাতাসে উড়তে লাগল। যেখানে শত্রুরা এসেছিল সেখানে টিপু সুলতানের পতাকা দেখতে পেল তার সেনারা। উৎসাহের উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। টিপু তার তরবারি উঁচিয়ে ধরেছে। অশ্বারোহী বাহিনী এগতে লাগল। কামান গোলাবারুদ ধোঁয়া মৃতপ্রায় ও আহতদের আর্তনাদ ভেদ করে তারা চলল। তাদের আগে-আগে টিপু। বুরহান-উদ্দিন অনেক এগিয়ে গিয়েছে, চীৎকার করে টিপু তাকে পিছিয়ে আসতে বলল। কেউ তা শুনতে পেল না। যারা পিছনে ছিল তারা ভাবল তাদের এগিয়ে যাবার জন্যে ওটা হচ্ছে আদেশ, তারা এগতে লাগল। ইংরেজদের তারা নিপাত করল, যেখানে তাদের পেল সেখানেই খতম করল তাদের। ইংরেজরা ধীরে-ধীরে ছোটনদী পার হল, পরে দ্রুত পালাতে লাগল। তারা তাদের আহত-নিহতদের, তাদের বন্দুক, তাদের গোলাবারুদ ফেলে পালাল। টিপু সুলতানের জয় হল সম্পূর্ণ।

বুরহান-উদ্দিনকে পাওয়া গেল মৃত।

বুরহান-উদ্দিনের মৃতদেহ পেল গাজি খাঁ, তাকে পতাকা দিয়ে জড়িয়ে নিল, তার বলিষ্ঠ হাতে সে বয়ে নিয়ে চলল তাকে এক শিশুর মত। "জয়" "জয়" ধ্বনিতে মহীশূরবাসী মুখরিত, সে এসে পৌঁছল টিপুর কাছে, তার সম্মুখে রাখল ওই মৃতদেহ। টিপুর মুখের পেশী সংকুচিত হয়ে উঠল, সে স্থির হয়ে নিল। সে নত হল, চুম্বন করল ঐ শীতল ললাটে। উঠে দাঁড়াল সে। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। সে বলল, "রাকেয়া বানুকে খবর দেওয়া হোক।" শান্ত ও শিষ্ট তার গলা।

হ্যাঁ, রাকেয়া বানু, টিপুর স্ত্রী সে, বুরহান-উদ্দিনের সে ভগ্নী। তাকে জানানো হোক তার ভ্রাতা মৃত। এইসব নাম, তার নিজের নামও টিপুর মনে এল চকিতে, এসব যেন অজানাব্যক্তিদের, বহুদূরে অতীতে যাদের সে একটু চিনত। গাজি খাঁ জানে শোকের নানা চেহারা আছে, যে শোকের প্রকাশ নেই তা হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিছু বলার জন্যে সে কথা খুঁজতে লাগল।

গাজি খাঁ তার বক্তব্য শেষ করল এই কথা ব'লে, "সে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে।"

টিপু শান্ত গলায় বলল, "ঠিক।" তার দৃষ্টি তখনও বুরহান-উদ্দিনের দিকে। সে চোখ ফেরাল, গাজি খাঁ'র সিক্ত চোখের দিকে তার চোখ পড়ল। টিপু বলল, "আরও অনেকে আজ শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে, অনেকে—তাই না?"

গাজি খাঁ মাথা নেড়ে সায় দিল। এখন ক্ষতটা গভীর। এটা সেরে যাবে। শোকার্ত টিপুকে একটু একা থাকতে দেবার জন্যে সে সকলকে সরে যেতে বলল। তারা সরে গেল।

গাজি খাঁ'ও যখন যেতে উদ্যত হল, টিপু বলল, "আমার সঙ্গে থাকো।"

টিপুকে আলিঙ্গনে বেঁধে গাজি খাঁ বলল, "সর্বদা আছি।" তার গলা ধরে এল।

"আমি রাকেয়াকে অনেক ভাবে বঞ্চিত করেছি। এখন আবার এইভাবে করলাম।" বলল টিপু।

গাজি খাঁ বলল, "সেলিমকে আমি তার কাছে থাকতে বলব।"

সেলিমকে স্পষ্ট মনে আছে টিপু—সেই ঘটকটি, বুরহান-উদ্দিনের ছেলে, যে টিপু সুলতানের কাছে রাকেয়ার মনের বাসনার কথাটি ফাঁস করে দেয়—সে অনেক দিন আগের কথা।

পরে গাজি খাঁ যখন সুসজ্জিত শবাধার নিয়ে এল বুরহান-উদ্দিনের দেহটি নিয়ে যাবার জন্যে তখন টিপু বলল, "বিদায়, বন্ধু, বিদায়। বিদায়, ভ্রাতা, বিদায়।"

তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, তার এ চোখের জল কেবল মৃতদের জন্যেই নয়, যারা জীবিত আছে তাদের জন্যেও।

ঘ

পরে অনেকেই বলেছে, টিপু মস্ত-একটা ভুল করেছে। ফ্লয়েডের বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করছিল। সে তখন তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ইংরেজের অভিযানের পথ একেবারে মিটিয়ে দিতে পারত। যারা এ কথা বলেছে তারা ঠিকই বলেছে। সাহসী সেনাপতি ও আপনজন ও বন্ধু বুরহান-উদ্দিনের মৃত্যুতে তার শোকের বিষয় অনেকেই জানে। কিন্তু তাতে কী? কোন্ অধিকারে একজন রাজা তার ব্যক্তিগত দুঃখ একটা জাতির প্রতিহিংসার চেয়ে বড় করে দেখতে পারে? রাজার রক্ত হবে ঠাণ্ডা; তার কাজ হবে নৃসংশ; তার হৃদয় হবে পাথর; তার মন লোহা; তার স্বপ্ন হবে ক্ষমতা। তা না হলে রাজা সর্বশক্তিমান কী করে? রাজা কি ভালোবাসতে জানে, তার কি বন্ধু থাকে, তার চোখ থেকে কি জল পড়ে? না, না, না।

ঙ

ফ্লয়েডের অধীনস্থ বাহিনী পিছিয়ে গিয়ে কয়েমবাটোরের প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিল। ইতিমধ্যে, ফ্লয়েড টিপু সুলতানকে ব্যস্ত রাখবে এই ভরসায় জেনারেল মেডোস উত্তরদিকে এগিয়ে যায় যাতে সে তার ও শ্রীরঙ্গপত্তমের মাঝখানে পেঁছিতে পারে।

মহীশূর-শিবিরে সব শান্ত। টিপু সুলতান তার পরে পিছিয়ে এসে ভবানী নদী পুনরায় পার হয়ে মেডোসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অপর পারে মহীশূর-বাহিনীর উপস্থিতি দেখে ইংরেজ জেনারেল হতবাক্ হয়ে

গেল। মহীশূর বাহিনী কেবল এই নদীর দ্বারাই সংরক্ষিত নয়, দুটি দুর্গও তাদের রক্ষী হয়ে আছে। টিপুকে ব্যস্ত রাখার আশা যার উপর ছিল, সেই ফ্লয়েড ব্যর্থ হয়েছে। শ্রীরঙ্গপত্তমে যাবার পথ বন্ধ, স্বয়ং টিপু সুলতান সেই পথে প্রহরী। মেডোস বাহাদুরি তেমন পছন্দ করে না, ফ্লয়েডের ও স্টুয়ার্টের সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হতে না-পারলে সে সুলতানের মুখোমুখি হতে চায় না। সে নিরাপদ পথ নিল। ফিরে গেল কয়েমবাটোরে। পথে ফ্লয়েড তার সঙ্গে মিলিত হল, কিছু পরে স্টুয়ার্টের বাহিনী পালঘাট থেকে এসে যুক্ত হল, এবং সব শেষে ওণ্ডহ্যামের বাহিনী। এই ভাবে পুরো গ্র্যাণ্ড আর্মি পুনর্মিলিত হল। এখন তা শ্রীরঙ্গপত্তমে যাত্রার জন্যে তৈরি। ওদের প্রথম লক্ষ হল—ভবানী নদী, টিপু যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে।

কয়েমবাটোর থেকে গ্র্যাণ্ড আর্মি বেরিয়ে যাবার আগেই টিপু তার উপর আঘাত হানল। ইরোড সে অধিকার করল, তাকে আসতে দেখেই তা আত্মসমর্পণ করল। তার পর আশ্চর্য দ্রুততায় চলল লড়াইয়ের পর লড়াই। ধরপুরমের পতন হল টিপুর কাছে, তার সঙ্গে ইংরেজের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গ। মেডোস তাব গোয়েন্দাদের কাছ থেকে জেনেছিল যে, টিপুর বাহিনীর বেশির ভাগই শ্রীরঙ্গপত্তমের রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। মহীশূর বাহিনী তখন নিজামের ও মারাঠা বাহিনীর সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত। সুলতানের সঙ্গে অল্পই সেনা আছে। সুলতানের পিছু নিয়ে তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেই তো বেশ হয়—মেডোস ভাবল। তখন শ্রীরঙ্গপত্তমের পথ অবরোধ করবে কে? যা এখন দরকার তা হল সুলতানকে গিয়ে ধরে ফেলা এবং খোলা জায়গায় তাকে যুদ্ধে লিপ্ত করা। গ্র্যাণ্ড আর্মির আক্রমণ সে সইতে পারবে না—'এ বাহিনী সংখ্যায় ও সজ্জায় সবচেয়ে সেরা।'

মেডোস যা হিসেব করে দেখেনি তা হচ্ছে তার বাহিনীর বিপুল উপকরণ ও লটবহর যা টিপুর অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে পারবে না। টিপু সুলতানের সীমিত সৈন্যদের পিছু নিল গ্র্যাণ্ড আর্মি এলোমেলো ভাবে। কিন্তু বৃথাই. তার সঙ্গে কিছুতে ছুটে পেরে উঠল না। ইংরেজরা বলে 'আমাদের এক কদমের জায়গায় ওরা নেয় তিন কদম'। টিপু দ্রুতবেগে চলল কর্নাটকের দিকে, কখনো-কখনো পিছু দৌড়ে শত্রুর নাগালের কয়েক মাইলের মধ্যে এল। তাকে ধরবার ইংরেজদের আশা সে চাগিয়ে রাখল। কিন্তু দ্রুত বেগে এগিয়ে তাদের আশা বানচাল করে দিল। ইংরেজদের লোকক্ষয় বেশি হল না, কিন্ত সারা পথে তারা

বন্দুক ও সরঞ্জাম ফেলে যেতে বাধ্য হল। এই ভাবে চলল পিছু ধাওয়া করা, ইতিমধ্যে মহীশূর আক্রমণ করার জন্যে মেডোসের পরিকল্পনা বানচাল হল। কর্নাটক আক্রমণ করতে সফল হয়েছিল টিপু।

মাসের পর মাস কাটল। বছরও কাটল। ইংরেজরা যে কাজে সফল হল তা হচ্ছে লুণ্ঠন, এবং যেসব নগর ও গ্রাম ভেদ করে তারা গিয়েছে সেসব জায়গায় অগ্নিসংযোগ।

মীর সাদিক বলল, "তারা আরও জ্বালাবে আগুন।"

"তাদের দয়ামায়া নেই।" মন্তব্য করল টিপু।

"তোমারও তেমন হওয়া দরকার।" বলল মীর সাদিক।

## ৫২. যুদ্ধের দু বছর

ক

লর্ড কর্নওয়ালিশ এতই তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছে যে, সে মেজাজ তার নিজেরই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। ছয় মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হবে তার এই একান্ত আশা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তার উপর সে আতঙ্কিতও। টিপুর দয়ার উপর নির্ভর করে আছে কর্নাটক। তাদের এই মিত্রের পরাজয়ে নিজাম ও মারাঠা প্রকাশ্যেই নিন্দা করছে।

কর্নওয়ালিশ লিখল, "আমরা সময় নষ্ট করেছি এবং আমাদের এই দুর্দশা অনেকের তারিফ পেয়েছে—যুদ্ধে এই দুটির খুবই দাম আছে।" তার আশঙ্কা এই গতিতে এগলে নিজাম ও মারাঠা আলাদাভাবে সন্ধি করে বসবে টিপুর সঙ্গে।

জেনারেল মেডোস'কে তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে। গ্র্যান্ড আর্মির কমান্ড স্বয়ং গ্রহণ করল কর্নওয়ালিশ, মেডোস হল তার অধীনস্থ।

কর্নওয়ালিশ বলেছিল, "আমি এ জায়গা ত্যাগ করব এক বিজয়ীর মত কিংবা মৃতদেহের মত।"

সে কেবল একজন সাহসী পুরুষই নয়, বুদ্ধিও সে ধারণ করে। সমস্ত ইংরেজ অধীনস্থ প্রদেশে খবর গেল। অনেক সৈন্য, অনেক উপকরণ আসতে লাগল। ভারতবর্ষে ফরাসি গবর্নর-জেনারেল কোতে দ্য কনওয়ে'র সঙ্গে তার প্রাণখোলা আলোচনা হল। সে আলোচনা সেইসব ফরাসির সম্বন্ধেও হল যারা কয়েক বছর ধরে সুলতানের অধীনে কার্জ করছে হাইদর আলির আমল থেকে।

"সুলতানের সেনাবাহিনী যাতে তারা ছাড়ে সেজন্যে আমাদের প্রভাব খাটাতে বলছ তো ?" কোঁতে দ্য কনওয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"তোমাদের প্রভাব—হ্যাঁ। টিপুর কাজ ছেড়ে দেওয়া—না।' উত্তর দিল কর্নওয়ালিশ।

এর তাৎপর্য বুঝতে মাত্র একটি মুহূর্ত লাগল কোঁতে দ্য কনওয়ের। তারপর আহ্লাদে সে হাসল।

কর্নওয়ালিশ বলল, 'মি লর্ড', তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধি। ''এর তুলনা নেই।''

মেডোস হচ্ছে একজন উদ্ধত প্রকৃতির, একগুঁয়ে স্বভাবের, লোকগর্ব ও অহংকার তার খুব, কিন্তু কর্নওয়ালিশ ধৈর্যবান, সে দক্ষ সংগঠক, সে বুঝেছিল যে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে, ও তাতে সফল হতে হলে তার মিত্রশক্তি নিজাম ও মারাঠার সঙ্গে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কাজের একটা যোগ করে নিতে হবে। কিন্তু মেডোস ও তার মিত্রদের মধ্যে এসব কিছুই হয় নি। নিজে-নিজে লড়েছে, অনেক সময় তা বিপরীত ভাবে করা হয়ে গেছে। কর্নওয়ালিশ ব্যক্তিগত ভাবে কমাণ্ডের দায়িত্ব নেওয়ায় একটা নতুন যুগের যেন সূচনা হল। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কাল কেটে গেল। মেডোসের ইচ্ছা ছিল সেই সর্ব প্রথম টিপুকে অপদস্থ করবে, মিত্রদের আগেই গিয়ে পেঁছিবে শ্রীরঙ্গপত্তমে ; কিন্তু কর্নওয়ালিশ বাস্তববুদ্ধি রাখে, সে জানত মিত্রদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করলে তবেই টিপুর বিরুদ্ধে সফল হবে। এটা যখন তর্কের বিষয় হয়ে উঠল কর্নও-য়ালিশ তখন টেবিলের উপর থলে-ভরতি সোনা রাখার জন্যে তৈরি ছিল। তার প্রভূত মর্যাদা ও অর্থবলের নিভৃতে যা ছিল তা হচ্ছে তিন মিত্রের মধ্যে পরিকল্পনা নিয়ে সংযোগ।

টিপু সুলতানের চারদিকে লোহার বেড়ি ক্রমেই আঁটো হয়ে আসতে লাগল। যুদ্ধ বাধল মহীশূরের বিপর্যস্ত এলাকায়, সুবিধায় দুর্ধর্ষতায় রক্তবন্যায় ও ধ্বংসে এমনটি কখনো হয় নি। মহীশূরের মানুষের কাছে কর্নওয়ালিশ এটা পরিষ্কার করে দেয় যে সে হবে কঠোর ও কঠিন, হবে ক্ষমাহীন, দয়াহীন, আশ্রয় দেবে না কাউকে, ধ্বংসের পর ধ্বংস করে যাবে—যদি কেউ তাকে বাধা দেয়। প্রতিরোধের সাজা হচ্ছে ধ্বংস অত্যাচার লুণ্ঠন মৃত্যু। কিন্তু যারা টিপু সুলতানের তরফ ছেড়ে আসবে—কেউ কেউ ছেড়েছিল—তাদের স্বপ্নের অতীত উদারতা দেখাবে কর্নওয়ালিশ।

খ

লক্ষ্মণ বেশ একটা জোরালো বক্তৃতা দিল, বক্তৃতায় সে বলল, ''তার দেশের মানুষ ছাড়া সুলতানের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের হাসি ও বেদনা তারই হাসি ও বেদনা। তার স্বপ্ন তোমাদেরই স্বপ্ন। তার দেশের লোকের গৌরব সম্মান গর্ব তারই। তবে এসো, তার পতাকার নীচে জমায়েত হও, এ বিষয়ে নিশ্চিত

থেকো যা থেকে সে বঞ্চিত হবে, তা থেকে বঞ্চিত হবে তোমরাও। যা সে পাবে তা দেওয়া হবে তোমাদেরও। সেইজন্যে তোমাদের উদ্দেশে আমি এই কথা বলি এই রাজ্য সাফ করা হোক রাজদ্রোহিতা ও প্রতারণা থেকে। সমগ্র জাতি এক হয়ে ঐ বিষাক্ত শত্রুকে ভিতর ও বাহির থেকে উচ্ছেদ করুক। আমাদের মর্যাদাবোধ ও আমাদের সাহসিকতা নিয়ে আমরা রুখে দাঁড়াব ন্যায় বিচারের প্রতি আমাদের আস্থা ও দেশের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের সহায়; আমাদের ক্ষত আমরা যেন গর্বের সঙ্গে ও সম্মানের সঙ্গে দেখাতে পারি আমাদের স্বাধীনতা খর্ব হবার চেয়ে আমরা বরঞ্চ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে রাজি চারদিকের হর্ষধ্বনির মধ্যে লক্ষ্মণ তার ভাষণ শেষ করল।

পুরনাইয়া তাকে বলল, "আজ সকালে তুমি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছ।"

"তুমি শুনেছ কি?" বেশ উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করল লক্ষ্মণ।

"অনেকে শুনেছে। শুনলাম, তারা অভিভূত।" বলল পুরনাইয়া।

"তা হবে। তেমন-তেমন উপলক্ষে আমার ভিতরে বেশ মহৎ ভাব এসে যায়। এটা আমার দুর্ভাগ্য যে যাদের সঙ্গে আমি প্রায়ই মিশি," বলে সে একটু থামল ও মুলোক মহম্মদের দিকে তাকাল, "তারাই আমার বদনাম করে ও আমার মুখে হালকা কথা জুড়ে দেয়।"

"তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি— তোমার ও মুলোক মহম্মদের মধ্যে একটু দূরত্ব এনে দিতে পারি।"

"তা কী করে হবে? আমরা একই রেজিমেন্টে আছি। আগামী শুক্রবারেই আমাদের ডাক পড়বে।"

"না। তোমার উপর যে আদেশ এসেছে তা রদ করে দেওয়া হচ্ছে। এখনই শুরু সর্বত্র তোমাকে ঘুরতে হবে—সুন্দর-সুন্দর বক্তৃতা দেবে, লোকের দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবে, বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেবে, তারা যেন একতাবদ্ধ থাকে হৃদয়ে ও মনে, আক্রমণকারীকে যেন সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করতে পারে।"

"পুরনাইয়াজি, আমি একজন সোনক অশ্বারোহী বাহিনীর একজন কম্যান্ডার। তরবারি হাতে আমার সেপাইদের আগে-আগে আমি চলি, চার্জ করি। বুঝলে? আর তুমি কি না আমাকে চমৎকার চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে বলছ— শ্রীরঙ্গপত্তনে ঝোঁকের মাথায় একটা-দুটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছিলাম মাত্র।"

মুলাকি মহম্মদ মাঝখান থেকে বলে উঠল, "আমার কাছে যদি জানতে চাও তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলতে পারি ওর বক্তৃতায় আমি কিছুই পাইনে, এবং ওর যুদ্ধকৌশলে যা পাই তা হচ্ছে এর চেয়েও কম। এইজন্যে এই সিদ্ধান্তটা খুবই ভালো মনে হচ্ছে।"

লক্ষ্মণ বলে উঠল, "চুপ করো। তোমার মত কেউ জানতে চায়নি।"

পুরনাইয়া ওসব কথায় কর্ণপাত করল না, লক্ষ্মণকে সে কেবল দলত্যাগ ও অনৈক্যের কথা বলল। মহীশূরের এখন কী দুঃখময় দশা হয়েছে, এখন এখানে মানুষের মনে জাতীয়-স্মৃতি পুনর্জীবিত করার কতটা দরকার সে কথা মনে করিয়ে দিল। তিনটি বড়-বড় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মহীশূর যাতে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তার জন্যে উদ্যোগ দরকার

লক্ষ্মণের সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে বলল, 'আদেশ হচ্ছে আদেশ।" এর বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের আর-কিছু বলার নেই। পুরনাইয়া তাকে আশ্বস্ত করে জানাল যে, তার এই নূতন কাজটি তিন-চার মাসের জন্য মাত্র।

"তিন-চার মাস? লক্ষ্মণ বিস্মিত হয়ে উঠল ' এর মধ্যে যুদ্ধ তো শেষ হয়ে যাবে।" এ কথা বলে সে এক পরিহাস আরম্ভ করল। বলল, 'ইংরেজদের এখন পরিচালনা করছে কর্নওয়ালিশ। তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে, সে বিনয়ের এক অবতার। ইংলণ্ড থেকে তার আমেরিকায় যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ইয়র্কটাউনে গিয়ে আত্মসমর্পণ। এখানে সে এসেছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ। তাহলে তরবারি ধারণ করার সুযোগ মিলবে কখন?"

পুরনাইয়া বলল, 'পাবে। পাবে। শত্রুকে কখনো কমজোরী মনে করবে না। আমাদের বিরুদ্ধে মারাঠা আছে, নিজাম আছে, আরো অনেকে আছে, আর, কর্নওয়ালিশ পরিচালনা করছে মস্ত এক বাহিনী, সে নিজেও এক মস্ত জেনারেল।"

"লড়াইয়ে সে যা-কিছু লাভ করেছে, তাহলে তা গোপন রাখা হয়েছে। আমি এমন একজনও পাইনি যে কিনা কখনো কর্নওয়ালিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরাজিতের তরফে ছিল। তাদের সকলকে কি তবে মেরে ফেলা হয়েছে? আমার বুলেটের চেয়ে আমার বক্তৃতা কি বেশি কাজের হবে বলে মনে কর?"

মুলাকি মহম্মদ হেসে উঠল, বলল, "অবশ্যই অবশ্যই। যখন তুমি বক্তৃতা কর তখন তোমার দম নষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু যখন তুমি বুলেট ছাড়ো তখন তুমি নষ্ট

কর গোলাবারুদ, তোমার হাতের তাক এমনিই। গোলাবারুদে আমাদের একটু ঘাটতি আছে, জানো?"

লক্ষ্মণ এর জবাবে বলে উঠল, "একটা জিনিস নিশ্চিত। বন্ধু লোকের ঘাটতি নেই আমাদের।"

পুরনাইয়া ওদের বক্তব্য অগ্রাহ্য করল। সে বলল, 'স্বাধীনচিত্ত যাকে বলে, আমাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে তা রোদন করছে। আমাদের বিরুদ্ধে তিনটি বড় শক্তি এক হয়েছে। তবুও তারা সফল হতে পারবে না, যদি আমাদের দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, ইতিহাসে তাদের স্থান সম্বন্ধে তারা সচেতন থাকে অদৃষ্টে যদি তারা বিশ্বাসী হয়। এসব কথা কী করে জানবে দেশের লোক? প্রেরণা থেকে? স্বপ্নের মধ্য দিয়ে? না, লক্ষ্মণ, এসব কথা তাদের বলতে হবে। এইটেই হোক তোমার মিশন। তরবারি দ্বারা নয় মানুষের মন আলোড়িত হয় আদর্শে।"

"আমার তরবারি কাজে লাগাবার আগেই ঐ জেনারেল আত্মসমর্পণ করে বসবে। ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যাবে আমার বক্তৃতাও।"

কিন্তু আত্মসমর্পণে অভিলাষ ছিল না কর্নওয়ালিশের, লক্ষ্মণও পেয়েছিল তারবারি ধারণ করার সুযোগ। সে সময়ে বাঙ্গালোরের দিকে এগিয়ে চলেছে কর্নওয়ালিশ। প্রবল যুদ্ধের পর শহরের পতন ঘটল। মহীশূরীরা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। বিনা-বাধায় ইংরেজরা লুণ্ঠন ধর্ষণ ও অত্যাচারের সুযোগ পেয়ে গেল।

বাঙ্গালোর থেকে পালিয়ে এসেছে এমন অনেক শরণার্থীকে দেখতে পেল লক্ষ্মণ। তাদের রোমহর্ষক কাহিনী সে শুনল। 'অস্ত্র ধারণ কর" কিষাণদের আহ্বান জানাতে লাগল লক্ষ্মণ। তার পর অ-শিক্ষিত লোকজনের এক দল গঠন করে নিল, সামান্যই অস্ত্র তাদের দেওয়া হল। তাদের নিয়ে সে চলল বাঙ্গালোরের দিকে। এই শহরের পতনের ফলে মহীশূরের মানুষের মনোবল ভেঙে গিয়েছে, সে জানত। এই সময়ে পুরনাইয়ার অভিপ্রায় অনুসারে ফাঁকা রাজনৈতিক বক্তৃতায় কিছু হবে না। না এখন দরকার বিবেকের আদেশে কার্যে অবতরণ করা। এখন রণক্ষেত্রে সে কম্যাণ্ডারের ভূমিকা নেবে, যেখানে তার সাহায্যের দরকার সেখানে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, এই সময়ে সুলতানের সঙ্গে মিলিত হওয়া দরকার, বাঙ্গালোর উদ্ধারের জন্য সুলতানও নিশ্চয় ছুটে গিয়েছে।

অল্প দূরেই অপেক্ষা করছিল টিপু সুলতান। মহীশূরীরা বাঙ্গালোরের দুর্ভেদ্য দুর্গে তখন অবস্থান করছে। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, প্রবল আক্রমণ

প্রতিরোধ তা করতে পারবে। কয়েক মাস ধরে প্রতিরোধের উপযুক্ত রসদ ও উপকরণ সেখানে আছে। বাঙ্গালোরের পতন একটা বড়-রকমের আঘাত বটেই, কিন্তু এর একটা সুবিধেও আছে। ইংরেজরা এখান থেকে গোলার আঘাত ও টিপু সুলতানের বাহিনীর আঘাত যুগপৎ পাবে।

কিন্তু তা হল না। টিপুর বেতনভোগী যে সব ফরাসি সেনা ঐ দুর্গে ছিল তারা ইংরেজদের একটা ঘোরালো পথ দেখিয়ে দিল। ফরাসিদের প্রহরায় ছিল এমন এক উচ্চভূমি রাত্রিবেলায় পার হল ইংরেজরা। সকাল হলে ইংরেজ ফরাসি মিলিত হয়ে আক্রমণ আরম্ভ করল। সাহসী কম্যাণ্ডাণ্ট বাহাদুর খাঁ ছিল তাদের প্রথম লক্ষ। ওরা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। সে তা অস্বীকার করে তরবারি নিয়ে অগ্রসর হল। তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলা হল। ইংরেজ সেনাদের দুর্গে প্রবেশে সুবিধার জন্য দাগা হল কামান।

সেই রাত্রেই লক্ষ্মণ দুর্গের সন্নিকটে উপনীত হল। সকালের আগেই অতি-সন্তর্পণে দুর্গে প্রবেশ করে, এই দুঃখময় ঘটনা সে চাক্ষুষ দেখল—ভিতর থেকে ভাঙা হয়েছে দুর্গের প্রাচীর, ইংরেজের পতাকা ওড়ানো হয়েছে, ঐ ভগ্ন স্থান দিয়ে কাতারে কাতারে প্রবেশ করছে ইংরেজ সেনা। সে লোকজনদের দুর্গে যেতে আদেশ করল। তারা অশ্বের মতনই গেল। ভগ্ন প্রাচীরের গায়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের হাতাহাতি লড়াই হল। তাদের পরিচ্ছদ দেখেই তাদের চেনা যায় তারা কিষাণ। ইংরেজদের হাত থেকে যা ছিনিয়ে নিতে পেরেছে তাই তাদের অস্ত্রের সম্বল। তাদের নৃশংস ভাবে নিধন করা হল। লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েকজন দুর্গে প্রবেশ করতে পারল। সেখানে নিহত হল তারা। নিজের ভগ্ন তরবারি ফেলে বাহাদুর খাঁর পরিত্যক্ত তরবারি কুড়িয়ে নিল লক্ষ্মণ। তরবারি দিয়ে পর-পর দুজন ইংরেজকে, তারপর তৃতীয়জনকে সে বিদ্ধ করল। একটা পিস্তলের গুলি এসে লাগল তার বুকে। সে পড়ে গেল। উপরে ঘন মেঘ। সে বলল, "সুলতানের জন্যে কিছুই করতে পারলাম না আমি। পুরনাইয়া কি আমার কথা ভাববে?" সে জিজ্ঞাসা করল ঐ মেঘদলকে।

মারা গেল লক্ষ্মণ।

গ

বাঙ্গালোর-অধিকার ইংরেজদের পক্ষে এক মস্ত লাভ। তাদের আত্ম-বিশ্বাস ও তাদের মিত্র মারাঠা ও নিজামের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে উঠল। টিপুর

পক্ষে এ একটা বিরাট ক্ষত ও ক্ষতি। আরও কত আঘাত আসবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। এল সে আঘাত। কিন্তু পরাস্ত হল না টিপু সুলতান, তার যত সহায়-সম্বল আছে একত্র করে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে কৃতসংকল্প হল।

সারা মহীশূর জুড়ে তীব্র সংগ্রাম চলেছে। রক্তে, কর্দমে, যুদ্ধের তাণ্ডবে অতীষ্ঠ হয়েও মহীশূরবাসীরা জানান দিল যে, তারা শত ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শক্তি ধারণ করে। তারা যুদ্ধ করেই চলল, প্রতিটি সংঘর্ষে হাজার-হাজার সৈন্য, জেনারেল, অফিসার ও অন্যান্য লোক মৃত্যুবরণ করে চলল। বেপরোয়া হয়ে তবু চালাল এই ঘোরতর যুদ্ধ। ইংরেজদের প্রতিটি জয়ের সঙ্গে চলল অসামরিক লোকের হত্যা বন্দীদের উপর অত্যাচার। যা-কিছু হরণ করা গেল না, অগ্নিসংযোগ করা হতে লাগল তাতে। শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা হল তাদের খেলা। নারীদের করা হল ধর্ষণ। দানবের মতন তারা তাণ্ডব করে যেতে লাগল, পবিত্র স্থান সমূহ করে যেতে লাগল কলুষিত।

ইংরেজ ও নিজাম যে নিষ্ঠুরতা করে চলেছে নানা ফড়নাবিস তা দেখল। এই সে প্রথম বুঝতে পারল যে, ওদের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। শক্তির মত্ততা আছে ওদের, কোনো নিয়মনীতি ওরা মানে না। তার কথা শুনল কর্নওয়ালিশ বিনীত ভাবে, নিজাম শুনল গম্ভীরভাবে। নানা ফড়নাবিসের আর কিছু করার ছিল না, কেবল নিজের বাহিনীকে বলে দিল যে, তারা যেন মারাঠা ঐতিহ্য মেনে চলে—দয়াশীলতা সাহসিকতা ও বীরত্ব, এই হল তাদের ঐতিহ্য।

* * *

এই হচ্ছে মহীশূরের হৃদয়বিদারক ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়, কাবেরী নদীর স্রোত তা লিখে রেখেছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক যাঁরা ছিলেন সূর্যের রশ্মির প্রতিফলনে তাদের চোখ গেছে ধাঁধিয়ে, কলম হয়েছে শুষ্ক অনেক পরে আসেন অন্য ইতিহাসকারেরা। খুব উদার ভাবেই ইংরেজরা তাদের হাতে দেয় তাদের লেখা বই ও ডায়েরি তাঁদের পড়ে দেখার জন্যে

"যথেষ্ট", একজন ঐতিহাসিক ইংরেজদের দেওয়া বই থেকে টুকতে টুকতে বললেন।

"ঠিক। যথেষ্ট।" একজন সয়ে এসে যেতে লাগলেন ইতিহাসকারেরা।
বয়ে চলল কাবেরী।

৭

"ওরা পরাস্ত হয়েছিল," বললে অ্যাবারক্রমাব, মহীশূর-বাহিনীর কথাই বলল সে।

কর্ণওয়ালিশ বলল, "তা ঠিক। কিন্তু ওরা তা জানে না।"

"তারা কি পাগল? তারা সবাই মরবে।"

"কোনো-কোনো সময় মানুষ মরতেই চায়।" বলল কর্ণওয়ালিশ

অ্যাবারক্রমবি বলল, "এ কথার মানে?"

"আমি নিজেও ঠিক জানিনে।"

অ্যাবারক্রমবি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল "তাদের আত্মসমর্পণ করাই উচিত।"

"তাই তো উচিত. কিন্তু তারা কি করবে?"

না। আত্মসমর্পণ করেনি মহীশূর। টিপু সুলতান যুদ্ধ করেই চলেছে তীব্রভাবে। সব সময়ই সে ছিল ইংরেজদের পাল্লার মধ্যে। তাদের হয়রান করে চলেছে, তাদের মালপত্র ধ্বংস করে চলেছে তাদের অনেক লোকক্ষয় করে চলেছে। তার অশ্বারোহী বাহিনী ইংরেজদের দম ফাটিয়ে ফেলছিল। তার অনেক জেনারেলকে ঐ ভাবেই পরাস্ত করা হয়েছে। কাতা হাইদর শত্রুসেনাদের ধ্বংস করে গুরুকোণ্ডা অধিকার করে। আমার উদ্দিন পুনরাধিকার করে কয়েমবাটোর। টিপু সুলতানের দুর্ধর্ষ আক্রমণে, শ্রীরঙ্গপত্তমের ওপারে কর্নওয়ালিশ সরে গেল।

সারা দেশে যত যুদ্ধ এর আগে হয়েছে তাতে এত হত্যা, এত লুণ্ঠন, এত অভিযান, এত সংখ্যক লড়াই কখনো হয় নি।

মহীশূরীরা সুলতানের উপর আস্থা রেখে যুদ্ধ করে চলল।

ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রান্তরের দিকে ক্লান্তভাবে চেয়ে রইল কর্ণওয়ালিশ। বারোটি মাস সে স্বয়ং আছে রণক্ষেত্রে। মহীশূরীদের কথা ভেবে তাকে বলতে শোনা গেছে, "আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের গতি কি"— অন্যথায় তারা সবাই মরবে রক্তপাতে, শকুনেরা তাদের খাবে, তাদের কবর দেওয়া হবে অথবা অন্যভাবে তাদের সমাধি দেওয়া হবে তা তারা ঠিক করতে পারবে না!"

লিচফিল্ড ও কভেণ্ট্রির বিশপকে কর্ণওয়ালিশ লিখেছিল, "আমার উদ্দে

ফুরিয়ে এসেছে, অল্পদিনের মধ্যে যদি টিপুকে কাবু করতে না-পারি, তাহলে এই যুদ্ধের যাবতীয় গ্লানিতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাব।"

এই ভাবে যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর—১৭৯১—কেটে গেল। কিন্তু যে জাতি যুদ্ধে প্রায় পরাস্ত হয়েও তা স্বীকার করে না, এবং বিক্রমের সঙ্গেই লড়াই করে চলে তাকে নিয়ে কী করা !

## ৫৩. এই ভাবে মরল একটি ঘোড়া

"ওকে আমি ঘৃণা করি", টিপু সুলতানের প্রিয় ঘোড়া দ্বিতীয়-দিলখুশের গায়ের উপর হাত রেখে বলল রাকেয়া বানু, "আমার কাছ থেকে সর্বদা তোমাকে ও দূরে নিয়ে যায়।"

টিপু সুলতান তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসল, বলল, "কিন্তু ও'ই তো আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।"

দিলখুশের গায়ে আদর ক'রে হাত বুলিয়ে রাকেয়া বলল, "তা আনে অবশ্য, কিন্তু আমার সঙ্গে যতটা সময় কাটাও তার চেয়ে বেশি কাটাও ওর সঙ্গে।'

"তোমার আপত্তি জেনে রাখা গেল।" বলল টিপু।

"না, তা নয়।" রাকেয়া বলে উঠল, "ঠিক কখন আপত্তি করতে হবে তা ঠিক করব আমি একা। আর, প্রতিবাদের পদ্ধতিও ঠিক করব আমি।"

"কখন তা ঠিক হবে?" জানতে চাইল টিপু।

রাকেয়া উত্তরে বলল, "বিদেশীরা যখন আমাদের ফটকের বাইরে চলে যাবে।"

টিপু চারদিকে তাকালে. কাছে-ভিতে কেউ তো নেই। এ জায়গাটা এমন যেখানে গৃহের মহিলারা ও টিপু কেবল আসতে পারে। পরেই সে অবশ্য বুঝল। রাকেয়া ঐ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর কথা বলছে। খুব আস্তে টিপু রাকেয়ার কপালে একটা চুমো খেল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখল দ্বিতীয়-দিলখুশ তার চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে তার স্বামীকে বহন করে।

চারদিক থেকে শত্রুসেনা টিপু সুলতানকে এখন নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে ধরেছে। মহীশূরের অশ্বারোহী ছোট বাহিনীটির আগে-আগে চলেছে টিপু, কর্নওয়ালিশের শিবিরের একটা বড় অংশ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে। অকস্মাৎ টিপুকে লক্ষ-করা একটা কামানের গোলা এসে পড়ল। সুলতানের দেখার আগে দ্বিতীয়-দিলখুশ কি তা দেখেছিল? কোনো রকমে সতর্ক না-করে দিয়ে, কান খাড়া করল ঘোড়াটি, তার সামনের দুই পা তুলল ঊর্ধ্বে। টিপু পড়ে গেল মাটিতে। দ্বিতীয়-দিলখুশের গায়ে এসে লাগল কামানের গোলা। সে মারা গেল, কিন্তু

তার আগে সে দেখে গেল দ্বিতীয় একটি ঘোড়ার সাহায্য নিয়েছে টিপু।
মিলখ্য়ুশের দুঃখ কিছুটা লাঘব হল। সে তার চোখ বুজল।

তার আরোহী তার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সে তার ন্যায্য প্রতিদান দিয়েছে।

## ৫৪. বিদায় রাকেয়া

ফেব্রুয়ারি ১৭৯২। শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ আরম্ভ হল। পুরান চাঁদের ডায়েরি থেকে :

ফেব্রুয়ারি ৯, ১৭৯২

—ইংরেজ বাহিনী এবং তাদের মিত্রেরা শ্রীরঙ্গপত্তমের দুর্গের উপর প্রবলভাবে কামান দেগে চলেছে। চারদিকে গোলাবৃষ্টি হচ্ছে।

—শত্রুদের কয়েকটি দল দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করে। তাদের পরাজিত করা হয়, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

—আজ এরকম শোনা যাচ্ছে যে, আরও ৫০ জন ইউরোপীয় যারা টিপুর চাকরি করত তারা ইংরেজ-দলে যোগ দিয়েছে। এদের দুজনকে সাফিসক ভাবে চিনি—মঁশিয়ে ব্রেভেত ও মঁশিয়ে লেফোন—সুলতানের প্রয়াত পিতার আমল থেকে এরা মহীশূর রাজ্যের চাকুরে ছিল।

—গভীর রাত্রে শত্রুদের একটা গোলা এসে পড়ল সুলতানের প্রিয় ভার্যা রাকেয়া বানু তখন নিহত সেনাদের স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। শোনা যাচ্ছে সে আহত হয়েছে। হে ঈশ্বর, তুমি কি তাকে রক্ষা করবে না?

রাকেয়া মারা গেল। তার স্বামী তার হাত ধ'রে তার উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে। যে পোশাক প'রে সে বিবাহিত হয় সেই পোশাকে সজ্জিত করে তাকে যেন সমাধ দেওয়া হয় এই ছিল তার শেষ ইচ্ছা। তার শেষ কাজ হল—তার স্বামীর হাতে চুম্বন। তার চিরদিনের চোখের ঔজ্জ্বল্য আর নেই। টিপু সুলতান মনে করতে লাগল কবে তারা শেষ উভয়ে উভয়ের হাত ধরেছিল। তারা হাসাহাসি করেছিল, বিনাকারণেই দুজনে অনেক কথা বলেছিল, তারা মনে করেছিল তাদের মধ্যের এতবারের যাবতীয় বিচ্ছেদের সব দুঃখ এ-তে দূর হবে গেল। সেই সুখ কত স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হল! এখন চলে গেল সে। তার চিঠির কথা মনে হল টিপুর, খসখস করে দ্রুত লেখা, দাঁড়ি-কমার বালাই নেই, কিন্তু অনেক হাসির খোরাকে তা পূর্ণ। হাল্কা মেজাজে কীভাবে সে হাসত, হাস্যময়ী ছিল সে, তার স্বামীর সব ক্লান্তি সে দূর করে দিত—অর্ধেক যেন ছিল নারী, অর্ধেক ছিল শিশু। তার দুই হাত দিয়ে টিপুর গলা জড়িয়ে ধ'রে অনর্গল কথা বলত, টিপু তা শুনতো মনোযোগ দিয়ে। টিপু জানত মনে-মনে তার স্ত্রী

কত উদ্বেগ তার হৃদয়ে ধারণ করছে, তার মাতা ফকর-উন-নিসার সঙ্গে সে এই উদ্বেগ ভাগাভাগি করে নিত। কিন্তু টিপু কাছে থাকলে তার আনন্দ যেন ধরে না। ভালোবাসা তার মনের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল ছিল যে, তখন কোনো আশঙ্কাই তার কাছে আর আশঙ্কা নয়। টিপু একটু মন মরা হয়ে থাকলে আনন্দের গান একের পর এক গেয়ে যেত সে। যতক্ষণ-না টিপুর মুখে হাসি ফোটে ততক্ষণ চলত এই রকম। টিপুর মেজাজ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যেত তখন সে যেন নিয়ে আসত একটি আলোকোজ্জ্বল দীপ। ভালোবাসার সংজ্ঞা দিয়েছিল সে একবার, টিপুর তা মনে আছে, সে বলেছিল—একদিকে পৃথিবী একদিকে ভালোবাসার জন, এ দুই বসালে পৃথিবী অনেক হালকা হয়ে যায়।

রাকেয়ার গলার চার পাশে চুম্বন এঁকে-এঁকে টিপু যেন একটা নেকলেস পরিয়ে দিল তার গলায়। যে জানালায় দাঁড়িয়ে সে টিপুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা করত, সে জানালাটা তার পর বন্ধ করে দিল টিপু। এখানে দাঁড়িয়ে দিলখুশের ক্ষুরের শব্দ সে শুনত। টিপু এলে তার সঙ্গে কথা বলার আগে কথা বলত দিলখুশের সঙ্গে, বলত, "আসতে এত দেরি হল কেন দিলখুশ?" দিলখুশ মাথা নোয়াত, যেন সব দোষ তার। তার গা'য় হাত পড়তেই সে মাথা তুলত, যেন বুঝত যে তার দোষ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। এই অশ্বটির ও রাকেয়ার মধ্যে এই এইটুকু বোঝাবুঝি। তার মনিবের বিলম্বের দোষ সে মাথা পেতে নিত।

এখন দুজনেই গত প্রথমে দিলখুশ, পরে রাকেয়া।

ঘরে এসে ঢুকল ফকর-উন-নিসা। এই বেদনাময় মুহূর্তে সে তার পুত্রকে দেখল শান্ত, অবিচলিত। সে ফুঁপিয়ে উঠল, বলল, "তোমার মায়ের কাছে এস, পুত্র। আমরা দুজনেই কাঁদব"

তার বাহুর ডোরে এখন যেন টিপু সুলতান নয়, মহীশূরের সেই রাজা নয়, তার বাহুতে তার সেই শিশুটি—যে হয়েছিল সচল ফকিরের—সেই সন্ত টিপু মাস্তান আউলিয়ার—আশীর্বাদপুষ্ট।

## ৫৫. আমার লোকজনেরা কোথায় ?

সেদিন হচ্ছে রুকেয়ার মৃত্যুর পরের দিন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রীরংগপত্তম শহরের প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করেছে পুরনাইয়া। টিপুর প্রবল জ্বর। পাশে ফকর-উন-নিসা বসা। টিপুর সংগে রাজ্য-বিষয়ে আলোচনার জন্যে সেখানে কারও প্রবেশ করা সে বন্ধ করে দিয়েছে।

সমারপীঠের মিনারটিই ইংরেজদের প্রধান লক্ষ। শ্রীরংগপত্তমের সংরক্ষণের এইটিই চাবিকাঠি বলা যায়। কর্নওয়ালিশের আদেশে, দ্বিতীয় অধিনায়ক জেনারেল মেডোস এই মিনারে প্রবল ভাবে হানা দিয়ে চলল। মিনারের অধিনায়ক সৈয়দ গফ্ফর প্রবলভাবে বাধা দিয়ে চলল। অনেক লোকক্ষয় হল মেডোসের, তাকে পিছু হঠতে হল। কিন্তু অল্পক্ষণ বাদেই সে ফিরে এল, নিজামের ও মারাঠার সাহায্যে তার এটা সম্ভব হল। সৈয়দ গফ্ফর আত্মরক্ষার জন্যে বেশ ভালো অবস্থায় ছিল, কিন্তু তিনমুখো আক্রমণের বিরুদ্ধে তার পেরে ওঠার কথা নয়। বিপদ এসে গেল। মেডোসের বিরাট জয় আসন্ন হয়ে এল, এবং দুই বছর ধরে যে জাতি সংগ্রাম করে এসেছে তাদের শেষমুহূর্তও বুঝি এসে গেল। শত্রুর আক্রমণের পর আক্রমণে গফ্ফরের বাহিনী থতমত খেয়ে গেল। কোনো সাহায্যের ভরসা সে করে না। কর্নওয়ালিশ স্বয়ং যে বাহিনী পরিচালনা করছে মধ্যরণাঙ্গনে পুরনাইয়া তার মোকাবিলা করায় ব্যস্ত। সাহায্য যদি আসেই তাহলে যে খোলা ময়দানে ইংরেজরা কামান-দাগা অভ্যাস করেছে সেই পথ দিয়েই আসবে। পুরনাইয়া তার বার্তা পেল: "সব গেছে। লড়তে-লড়তে আমি মরব। আমার মৃতদেহ যদি অবিকৃত অবস্থায় থাকে তাহলে সুলতানের পায়ের কাছে যেন তা রাখা হয়। তা সম্ভব না হলে তাকে অন্তত বোলো যে, আমি যোদ্ধার মতনই মরেছি। আমার হয়ে আমার পুত্রদের কি তুমি আলিংগন করবে? ময়েনকে বোলো বড়ে মিঞাকে দাবা খেলায় হারিয়ে দিতে আমি চললাম। (ময়েন হচ্ছে সৈয়দ গফ্ফরের ছোট ছেলে ও বড়ে মিঞা গফ্ফরের বাবা—সম্প্রতি যার মৃত্যু হয়েছে, ময়েনের নৈতিক সমর্থন-সত্ত্বেও গফ্ফর দাবা খেলায় হেরে যেত)।

হঠাৎই পুরনাইয়া এসে হাজির, সৈয়দ গফ্ফরের জীবন রক্ষা করতে নয়, ঐ মিনারটি বাঁচাতে, ইংরেজদের কাছে যার পতনের আশংকা ঘটেছে। খোলা

ময়দান পার হয়ে সে চলে এল, তার সৈন্যেরা মারাত্মক ভাবে কামান দাগতে লাগল, এবং পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করল শত্রুসেনাকে। আক্রমণের তীব্রতায় তত নয় যতটা আশঙ্কায় মেডোসের মনোবল ক্ষুন্ন হল। তার সেনাদের সে পিছু হঠতে আদেশ দিল, সেখান থেকে এই নতুন আঘাত সামাল দিতে বলল, কিন্তু চারিদিকে বিভ্রান্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। নিজাম ও মারাঠা বাহিনীর মনে হল ইংরেজরা সরে পড়ছে। পিছন দিকে বন্দুকের শব্দ তারা পছন্দ করল না। তারা ফিরল, তারা গফুরের কামানের পাল্লার মধ্যে এসে গেল। তখন থেকে সব শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অবসান ঘটল। নিজামের ও মারাঠার সেনারা সম্মুখ-যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেছে। ইংরেজরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল। তার মিত্র বাহিনীদ্বয় এদিকে-ওদিকে পালাতে লাগল, ইংরেজবাহিনী আটকা পড়ে গেল পুরনাইয়ার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে। মহীশূরীদেরও আঘাত করে ফেলতে পারে—এসম্ভাবনা সত্ত্বেও গফুর কামান দেগে চলল। তার তখন একমাত্র চিন্তা - রাত্রি এলে সে মিনারের যা ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করে নেবে তার কয়েকটি অকেজো বন্দুক নেবে সারিয়ে। এ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তার এখন নেই।

মেডোস তার বাহিনীকে আদেশ দিয়েছিল দৃঢ়তার সঙ্গে অটল থাকতে কিন্তু অনেক সেনাই তাদের মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করেছে। পুরনাইয়ার সঙ্গে যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। দুর্গের কামান ইংরেজদের বিপন্ন করে তুলল। মিনার দখলের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মেডোস আদেশ দিল সরে আসবার।

সেখন গফুরের কাছে এটা এক অসম্ভব কাণ্ড। সে চীৎকার করতে লাগল, "হে খোদা, হে খোদা, তোমার দোয়ায় যদি কখনো সন্দেহ করে থাকি তবে আমার মৃত্যু হোক, আমার চোখ অন্ধ হয়ে যাক আমার আত্মীয়-স্বজন-আপনজনের সান্নিধ্য যেন না-পাই।'

আর, পুরনাইয়া? সে কিছু বলল না। বুলেটের আঘাতে তখন সে সংজ্ঞাহীন। তার কাঁধ ভেদ করে গিয়েছে বুলেট। রক্তপাতে বেদনায় সে অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিল। মুলকি মহম্মদ ছিল তার পাশে। ইংরেজরা পিছু হঠে যাচ্ছে সে দেখল, তার পরই সে মুলকি মহম্মদের বাহুডোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

বেঁচে গেল মিনারটি।

কর্নওয়ালিশ পরিচালিত বাহিনীর মোকাবিলার জন্য গাজি খাঁর উপর তার নিয়ে পুরনাইয়া সৈয়দ গফরের সাহায্যের জন্য গিয়েছিল।

কর্নওয়ালিশ যদি জানত তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে তখনই সে আক্রমণ করত। গাজি খাঁর কৃতিত্বই বলতে হবে যার জন্যে কর্নওয়ালিশ বিভ্রান্ত হয়। দুর্গের প্রাচীরের আড়াল থেকে গাজি খাঁ তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এমন ত্বরিতে আক্রমণ চালায় যেন তার প্রচুর লোকবল আছে এবং সে অনেক ক্ষয়ক্ষতির জন্যে প্রস্তুত। গাজি খাঁ খোলা জায়গায় এসে পুনরায় বহাল তবিয়তে ফিরে গেল, এমন ভাব দেখাল যে সে বিশেষ কাউকে কেয়ার করে না, কেবল একটা বড় রকমের আক্রমণের আগে সৈন্যরা কি ভাবে কোথায় আছে কেবল তা-ই দেখতে এসেছে। কিন্তু খোলা জায়গায় আক্রমণ হোক এটাই ছিল কর্নওয়ালিশের অভিপ্রেত। সে তার সেনাদের নতুনভাবে দলবদ্ধ হতে হুকুম দিল, এবং বন্দুক ঠিক ভাবে তাক্ করে নিতে বলল। দুর্গের সব কামান গর্জে উঠল, ভয়ংকর একটা আক্রমণ আসন্ন এটা হল তার নিশ্চিত লক্ষণ। দুর্গের দেয়ালের আড়ালে পতাকাগুলি খুব নড়াচড়া করল, যুদ্ধে ঝাঁপ দেবার আগে সৈন্যদের প্রতিটি ডিভিশন তৈরি হচ্ছে বলে মনে হল। ইংরেজ-দলে তখন নিস্তব্ধ ভাব। তারা অপেক্ষা করতে লাগল, নজর রাখতে লাগল।

ইতিমধ্যে উরুতে বুলেটের আঘাতে গাজি খাঁ তখন শায়িত। সে বাইরে গিয়েছিল সব দেখে আসতে তখনই গুলিটা এসে লাগে, বেদনায় সে বিহ্বল হয় নি, তার কমরেডরা বা শত্রুপক্ষের কেউ তা দেখেই নি। গাজি খাঁ ঘোড়ায় উঠে পড়ে, সে তার ডান হাত তোলে, দুর্গে ফেরার সময় যেন সে বিরোধী পক্ষকে আদাব জানল—এই রকম তার ভঙ্গি।

ডাক্তার এসে যখন চিকিৎসার চেষ্টা করছে গাজি খাঁ তখন তাকে ধমক দিল। মীর সাদিক তা দেখতে লাগল।

মীর সাদিক বলল, "ওটা কিন্তু বুদ্ধির কাজ হল না।"

"কী করে বুঝলে?" গাজি খাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ভুল বুঝে বলল। "ইংরেজরা আমাকে লক্ষ করে গুলি করেছে।"

"আমি কী বললাম বোঝনি। খোলা জায়গায় অমন ভাবে চলে যাবার কথা বলছিলাম। ওটা বোকামি হয়েছে।" একটু তপ্ত হয়ে বলল মীর সাদিক।

"আমি তো বোকাই।" গাজি খাঁ বলল খোশমেজাজে, তার পর ডাক্তারের ঔষধ প্রয়োগের দরুন একটু কাৎরে উঠল।

"হ্যাঁ। ওই বুলেটেই তার প্রমাণ।"

"না। আমার বোকামির প্রমাণ এটা নয়।" বলল গাজি খাঁ।

"তবে, কী প্রমাণ করে এটা?"

"বুলেট কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, আমি মোটা। শুনেছি, মোটা মানুষকেই বেশ তাক করা যায়।" গাজি খাঁ একটু হাসল, তার পর বেদনায় একটু বিচলিত হয়ে বলল, "কিন্তু দেখ, মোটা মানুষকে যারা অনুসরণ করে তাদের রক্ষাও করে সে—একটা দেওয়ালের মত। আমার লোকক্ষয় হয় নি।"

মীর সাদিক তাকে মনে করে দিল, বলল, "পনেরোজন মরেছে।"

গাজি খাঁ বলে উঠল; "যাতে হাজার-হাজার লোক প্রাণে বাঁচে।" বলেই ডাক্তারকে বলল, "করছ কি, করছ কি, করছ কি?" ডাক্তার কিন্তু তখন বেশ খুশি, বুলেটটা সে পেয়েছে, যেন সে একহাতে সমস্ত যুদ্ধটাই জয় করে ফেলেছে —এমনই তার আনন্দ। মীর সাদিক এগিয়ে গেল।

কর্নওয়ালিশ তখনও অপেক্ষা করছে ও নজর রাখছে। তার পরই তার কাছে খবর এল মেডোসের বিপর্যয়ের। একটা জয়ের ব্যাপারকে যে এমন ভণ্ডুল করে দিতে পারে, এমন ইডিয়টকে কি বিশ্বাস করতে আছে—ভাবল কর্নওয়ালিশ, এর পর নিজাম ও মারাঠা কী করে তা দেখতে হবে? তাদের সঙ্গে আরো আলাপ আলোচনা না-করে উপায় নেই। বিউগল-বাদকদের সে আদেশ দিল— সরে আসার বাঁশি বাজাও।

মীর সাদিক পা-টিপে পা-টিপে টিপু সুলতানের ঘরে এসে ঢুকল। তার জ্বর ছাড়তে কয়েকদিন লাগবে—ডাক্তাররা বলেছে। মীর সাদিক দেখল অজ্ঞান অবস্থায় পুরেনাইয়াকে নিয়ে আসা হল। এখন বাহিনী-পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব এসে পড়ল তার উপর। সেই রাত্রেই সে মন্ত্রিসভার সদস্যদের ও প্রবীণ অধিনায়কদের মন্ত্রিমণ্ডলীর সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পাঠাল।

কর্নওয়ালিশের চোখে জেনারেল মেডোসের তিনটি মহৎগুণ লক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, ভারতীয়দের সে ভীষণভাবে অপছন্দ করে—কর্নওয়ালিশ এ ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত না-হলেও সে জানে সাম্রাজ্য গঠনের জন্যে এটা খুব দরকার; দ্বিতীয়ত, মেডোস টিপু সুলতানকে সহ্য করতে পারে না, কেননা সে'ই হচ্ছে সাম্রাজ্যের বড় শত্রু, এইজন্যেই সে লোকবল ও ধনবল বৃদ্ধি করে গ্র্যান্ড আর্মি

গঠনের জন্যে অন্তরাত্মা দিয়ে কাজ করেছিল; তৃতীয়ত, সে একজন অপদার্থ জেনারেল, এ'তে করে কর্নওয়ালিশের সাফল্যই সর্বতোভাবে স্বীকৃত হবে।
এইসব গুণের জন্যেই মেডোস'কে কর্নওয়ালিশের এত পছন্দ। মেডোসের স্থান এখন দ্বিতীয়, কর্নওয়ালিশ অবসর নেওয়ার পর মেডোস হবে গবর্নর-জেনারেল। পৃথিবীর হালচাল কর্নওয়ালিশের জানা, তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে তার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। কিন্তু মেডোসের যা মেগদার তাতে তার পক্ষ থেকে কর্নওয়ালিশের কোনো ভয় নেই। মেডোসকে সুযোগ দেবার জন্যে কর্নওয়ালিশকে কেউ আগে-ভাগেই অবসর নিতে বলবে না। তার উপর কথা আছে, কর্নওয়ালিশের প্রতি মেডোসের আনুগত্য অনেকটা কুকুরের মত। এইজন্যেই তার প্রতি কর্নওয়ালিশের এত ভালোবাসা।

মেডোস আত্মহত্যা'র চেষ্টা করেছে—এই সংবাদ কর্নওয়ালিশের কাছে তাই দুঃখজনক। অল্পসংখ্যক মহীশূরী সৈন্যের কাছে তার পরাজয় মেডোস সহ্য করতে পারে নি। নিজাম ও মারাঠাদের বাহিনীর সহায়তা সহ বিপুল বাহিনী নিয়ে সে অবতীর্ণ হয়েছিল সংগ্রামে। সমারপীঠের মিনারের পতন হবেই—এটা সে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু বিজয়ী হয়ে ফিরে আসা দূরের কথা, সে মুখোমুখি যুদ্ধে পরাস্ত ও অপদস্ত হয়ে ফিরে এসেছে। সে তার নিজের মাথা উড়িয়ে দিতে চাইল গুলিতে। কিন্তু তার যেমন হয়ে থাকে, পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে গেল আগেই, কেবল তাকে আহত করল তার 'বুকের পাঁজর ও পেটের মাঝখানটায় গুলি লেগে'। কর্নেল ম্যালকম শব্দ শুনেই শিবিরে ঢুকল, তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল, দ্বিতীয় বার আর গুলি করতে পাবল না মেডোস। তার জখমটা মারাত্মক হয় নি।

আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ, নিজাম ও মারাঠা বাহিনী বুঝল ইংরেজদের মনোবল কতটা ভেঙে গেছে, তাদের জেনারেল আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

ইংরেজরা অপদস্ত। ভারতীয় শক্তিদের সঙ্গে সকলেই তাদের সহজ বিজয়ের আশা দিয়েছিল। দুই বছর তারা কর্দমে ও জঞ্জালে কাটিয়েছে, কাটিয়েছে রক্তপাতের মধ্যে, বহু ভয়াবহতার মধ্যে। তার ফল কী হল? তাদের মহান্ জেনারেল এখন হতাশায় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সব ব্যাপারটা কর্নওয়ালিশ দেখতে লাগল উদ্বেগের সঙ্গে। তার নিজের সহকারীরা বুঝতে পারল টিপু সুলতানকে পরাস্ত করতে না-পারলে তাদের

সম্মুখে রয়েছে দীর্ঘকালের অবরুদ্ধ অবস্থা। মারাঠা ও নিজামের বাহিনী টিপু সুলতানের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্যে প্রস্তুত। আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে তারা এখনকার মত যুদ্ধ থেকে সরে গিয়ে আগামী বছরে আরও শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে ফিরে আসতে চায়।

এটা বুদ্ধিমত্তার পথ, কর্নওয়ালিশেরও এ'তে সায় আছে। এই পশ্চাৎ-অপসরণে কিছুটা লাভ আছে। সারা দেশ সে লুণ্ঠন করতে চায়।

"এই রাত্রিটা আমরা ভেবে দেখি, আগামীকাল দুপুরে মিলিত হয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।" তার মিত্রদের—নিজাম ও মারাঠাদের বলল কর্নওয়ালিশ।

মাঝরাতে সুলতানের ঘুম ভাঙল। রাকেয়া বানুর মৃত্যুর পর চব্বিশ ঘণ্টা গত হল। সে মাথা উঁচু করে চারদিকে তাকাল। তার যেন মনে হতে লাগল যে, সে ছায়া দেখছে। জপমালা হাতে নিয়ে ফকর-উন-নিসা এখানে কী করছে, কী-বা করছে ডাক্তার? তার পর তার মনে পড়ল। তার মুখমণ্ডলের উপর কত যেন ভাব খেলে গেল। শান্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করল সময় কত, ক'টা বাজে? উত্তর পেয়েই সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল ডাক্তার। কিন্তু পারল না। ফকর-উন-নিসা চেয়ে রইল, কিছু বলল না। সে হচ্ছে রাজার ভার্যা, সে হচ্ছে রাজ-মাতা। তার কিছু একটা করণীয় আছে, তা সে জানে।

টিপুর পা ঠিক মত পড়ছিল না। সকলে তাকে সাহায্য করল অল্পক্ষণের জন্যে। সে সাহায্য সে গ্রহণ না-করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কাউন্সিল চেম্বারের দিকে—যেখানে মন্ত্রিমণ্ডলীর বৈঠক। মীর সাদিকের সভাপতিত্বে আলোচনা তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীদের সামান্য আগে জানানো হয়েছিল যে, টিপু সুলতান সভায় আসতে পারে, তারা সকলে এখন চুপচাপ। টিপু প্রবেশ করল সেখানে, তার চেহারা বিবর্ণ ও রুক্ষ। তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সকলে উঠে দাঁড়াল। রাকেয়ার মৃত্যুর জন্যে সমবেদনা জানিয়ে তারা কিছু বলার চেষ্টা করতেই টিপু তাদের থামতে নির্দেশ দিল। তার বলার কথা তখন এই যে, সে এখানে এসেছে একজন রাজা হিসেবে—একজন প্রেমিক বা একজন স্বামী হিসেবে নয়।

"বলে যাও।" বলল সে। মীর সাদিক সব বিবরণ দিয়ে যেতে লাগল।

টিপ্ন সুলতান ম্যাপের দিকে চোখ রাখল. সেদিনের জন্যে যে চার্ট তৈরি করা হয়েছে তাতে সব দেখানো আছে —অবরোধ কোথায় করা হয়েছে, কামান বসানো আছে কোথায়-কোথায়, মৃত্যুর সংখ্যা কত শত্রুদের অবস্থান কোন্‌ কোন্‌ জায়গায়, তাদের শক্তি কতটা, ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়। সে একটু বাধা দিল সাদিককে।

মীর সাদিক মহীশূরদের পরাজয়ের একটা চিত্র ধরে তুলেছিল, 'সাদিক" টিপ্ন সুলতান বলল, "অবস্থা তো অতটা নিরাশ নয়।"

একটু থেমে টিপ্ন বলল, "চার্টগুলো কি খুঁটিয়ে দেখেছ ?"

"আমি নিজেই ওগুলি তৈরি করিয়েছি, সুলতান।" কথাটা সত্যি। কেননা পুরনাইয়ার আদেশে এসব তৈরি করত হরি রাও। আজ আদেশ গিয়েছিল. মীর সাদিকের কাছ থেকে, এ'তে সইও আছে মীর সাদিকের, পুরনাইয়ার নয়।

অযথাই টিপ্ন জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেমন বুঝছ ?"

"তোমার বিচারেই আমার আস্থা, আমাদের সকলের আস্থা, সুলতান।"

"তোমরা কি বুঝছ তাই আমার জানার ইচ্ছে।"

মীর সাদিক সব বলতে লাগল। প্রথম দিকে সে একটু সাবধানেই বলে। এইযুদ্ধে মহীশূরীদের ত্যাগের কথা সে বলল। সুলতানের প্রতি তাদের ভালোবাসার কথাও বলল, সুলতানের জন্য তাদের অনুরাগের কথাও বলল. টিপ্ন বাধা দিল।

"আমার প্রতি অনুরাগের কথা বলো না। আমার জন্যে আমি কিছুই চাইনে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সংগ্রাম, তার প্রতি অনুরাগ থাকলেই যথেষ্ট। মনে রেখো —সে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার চেয়ে অনেক বড়, আমাদের সকলের চেয়েই বড়।"

"এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, সুলতান। কিন্তু তুমি আমাদের কাছে প্রিয়, ঐ উদ্দেশ্যটিও প্রিয়। এ দু'য়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে। দুয়ের কথা এক নিশ্বাসে বলছি বলে মাফ কোরো। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, তা হচ্ছে—"

মীর সাদিক বলে যেতে লাগল। এই রাজ্য মহীশূরীদের আরও ত্যাগ স্বীকার যেন না-করায়। মহীশূর এখন প্রায় মৃত্যুর কবলে, তার পরাজয়ে, তার দল থেকে অনদলে অনেকের চলে যাওয়ায়, তার চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায়। তিনটি শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে মহীশূর বাহিনীর অবশিষ্টাংশ

যে সংগ্রাম করেছে তার তুলনা হয় না, কিন্তু এখন তা নিঃশেষ হবার মুখে।
অসামরিক ব্যক্তিদের অভূতপূর্ব কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। শ্রীরঙ্গপত্তম
শহর অবরুদ্ধ অবস্থায়. এ'তে সমগ্র জাতিরই নাভিশ্বাস উঠেছে। এই জাতিকে
নিশ্বাস নেবার একটু অবকাশ না-দিলে এ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার জেগে
উঠতে পারবে না। যুদ্ধ শেষ করতে হবে। যে ক্ষত হয়েছে তার থেকে
নিরাময়ের জন্যে শান্তি দরকার আবার যুদ্ধ করার জন্যে শক্তি সঞ্চয় দরকার।
অন্যথায় তার যা পতন হবে তার থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

মীর সাদিকের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল টিপু। মাঝেমাঝে সে
অন্যান্যদের দিকে তাকাচ্ছিল। তারা টিপুর দিকে সরাসরি তাকাতে চাইল না.
কিন্তু বোঝা গেল মীর সাদিকের বক্তব্যের সঙ্গে তারা একমত।

শান্ত কণ্ঠে টিপু বলল "বলো মীর সাদিক. কখন আমি শান্তির জন্য প্রস্তুত
না ছিলাম? ইংরেজরা যখন আমাদের উপর হামলা করতে আসে, সেই দিনই
আমি শান্তি প্রস্তাব দিই। মাঝেমাঝেই এই অনুরোধ জানিয়ে যাই। প্রত্যুত্তরে
কী পাই? তরবারি, বন্দুক, আমার রাজ্যের উপর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব।"

মীর সাদিক তখনই উত্তর দিতে পারল না। সে কি বলবে ভাবতে লাগল,
তার পর বলল "উভয়েরই অপরের এলাকা থেকে সরে এলেই হত শান্তি।
ইংরেজ ও তার মিত্রেরা এখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে, তারা কিন্তু দাম
চাইবে। তাদের যেমন লোকবল তেমনি তাদের উপকরণ, আর আমরা
নিঃশেষিত।"

টিপু সুলতান জিজ্ঞাসা করল, "লক্ষ্মণের বিগ্রেডের খবর কী। আমাদের
সৈন্যদের শক্তি বাড়াবার জন্যে তারা নাকি আসছে?"

"তারা কিষাণ—বেশির ভাগই। অস্ত্রহীন। হ্যাঁ, তারা আসছে প্রচুর
সংখ্যায়। এখন আসছে অল্প-অল্প সংখ্যায়। লক্ষ্মণকে কোথাও পাওয়া
যাচ্ছে না।"

"কোথায় গেল সে?" জিজ্ঞাসা করল টিপু।

"কেউ জানে না। কেউ-কেউ বলছে সে মারা গিয়েছে।" বলল মীর সাদিক,
"অন্যরা বলছে সে দলত্যাগ করেছে।"

"না। অমন কথা কেউ বলেনি।" বলে উঠল মুলকি মহম্মদ, দূরে এক
চেয়ারে বসে ছিল সে, উঠে এল "অমন কথা কেউ বলে থাকলে তার জিভ কেটে
ফেলা উচিত।"

টিপু কিছু বলল না।

মীর সাদিক বলল, "আমার মনের কথাই তুমি বলেছ, মুলাকি মহম্মদ। কিন্তু সুলতানের সব কথা জানা দরকার, এমন কি গুজবও।"

"লক্ষ্মণ যদি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে তাহলে তার ব্রিগেডের লোকজন এসে পৌঁছচ্ছে কী করে?" জিজ্ঞাসা করল টিপু সুলতান, "এমনও হতে পারে যে আমরা জানিনে এ রাজ্যের এমনই এক দূর প্রান্তে সে যুদ্ধে লিপ্ত।"

"না, সুলতান," মীর সাদিক উত্তর দিল, "যতটা সম্ভব অনুসন্ধান করেছি আমরা। সত্যিই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার ব্রিগেডের লোকদের সে আগেই বলে দিয়েছিল চর্তুর্দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে তোমার বার্তা চারদিকে প্রচার করতে। তোমার প্রতি স্নেহপ্রীতির দরুন তারা ঐ কাজ করেছে। লক্ষ্মণকে পাওয়া না-গেলেও তারা লক্ষ্মণ-বাহিনীর লোক বলে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।"

টিপু সুলতান একটু চুপ করে রইল, তারপর তাকাল মুলাকি মহম্মদের দিকে। মুলাকি বুঝতে পারল এমন-এক সমাবেশে সে তার বক্তব্য না-জানালেই পারত। মীর সাদিক তাকে ক্ষমা করবে না, কিন্তু তার জন্যে সে চিন্তিত নয়, সুলতান হয়তো একটু আহত বোধ করেছে, এই চিন্তাই তাকে বিষণ্ন করে তুলল।

টিপু বলতে লাগল, "মুলাকি মহম্মদ, এটা নিশ্চিত জেনো, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, লক্ষ্মণ যদি বেঁচে থাকে তবে সে মর্যাদার সঙ্গেই বেঁচে আছে; যদি মরে গিয়ে থাকে মর্যাদার সঙ্গেই মরেছে। অন্যরকম কথা বিশ্বাস করব না, কাউকে বিশ্বাস করতেও দেব না।"

মীর সাদিকের দিকে চেয়ে টিপু বলল, "তোমার শেষ পরামর্শ কী?"

"আমার কথা হচ্ছে ইংরেজ ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত নগদে তাদের কিছু দেওয়া যেতে পারে, যে ভয়ংকর বিপদ এসে গেছে, তা যাতে দূর হয়।"

"তোমার কি ধারণা, নগদ পেলেই তারা তুষ্ট হবে, তারা আমাদের জমি চাইবে না?" টিপু জিজ্ঞাসা করল।

মীর সাদিক বলল, "আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমাদের বিরুদ্ধে আছে তিনটি শক্তি। এটাই আমাদের সুবিধে।"

"আমার যেন মনে হচ্ছে একটু আগে তুমি বলেছ সেইটেই আমাদের অসুবিধে?"

"যুদ্ধাবস্থাতে অসুবিধেই। কিন্তু শান্তি আলোচনায় আমরা ওদের মধ্যে বিভেদ এনে দিতে পারি। প্রত্যেকেই একটু সুবিধে চাইবে, অন্যের জন্যে কিছু ছেড়ে দিতেও চাইবে।"

টিপু জিজ্ঞাসা করল, "শান্তি-আলোচনায় সময় তাহলে তিনটি লোভী শৃগাল একটা শৃগালের চেয়ে কম ভয়ের?"

"হ্যাঁ। তুমি যদিও কথাটাকে বেশ রং দিয়ে মনোরম করে বলতে পেরেছ।" একটু হেসে বলল মীর সাদিক।

টিপু সুলতান হাসল না। সে সকলের মুখের দিকে চাইল। সব মুখই গম্ভীর। তারা চোখ নত করে রাখল যেন তারা মীর সাদিকের সঙ্গে একমত, কিন্তু তাদের যুক্তি দেখিয়ে সুলতানকে তারা আর বেদনার্ত করতে চায় না।

"আমি পুরনাইয়ার সঙ্গেও পরামর্শ করব। সে কোথায়?" টিপু জানতে চাইল, পুরনাইয়ার খালি চেয়ার সে দেখেছে। এতে সে বিস্মিত হয় নি। অনেক কাজের চাপের দরুন অনেক সময়ই সে এরকমের সভায় উপস্থিত থাকতে পারে না।

মীর সাদিক প্রথমে চুপ করে ছিল। পরে ধীরে-ধীরে বলল, "সে আহত। সে অচৈতন্য।"

"হা খোদা।" নিজের মনেই বলল টিপু, কিন্তু সকলে তা শুনতে পেল।

মীর সাদিক বলল, "ডাক্তাররা তার জীবনের আশা ছেড়ে দেয় নি।"

টিপু তখন সব-ক'টি শূন্য চেয়ারের দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, "গাজি খাঁ?"

মীর সাদিক একটু মাথা নাড়ল, "গাজি খাঁও আহত। একটা বুলেট তাঁকে বিঁধেছে। কিন্তু পুরনাইয়ার মত অত খারাপ অবস্থা তাঁর নয়।"

টিপু জিজ্ঞাসা করল, "আর কেউ?"

মীর সাদিক বলল, "এখানে অনেক চেয়ারই শূন্য আছে, সুলতান।" সোজা-সুজি উত্তর সে এড়িয়ে গেল। বলল, "দুটো দিন ও দুটো রাত্রি বেশ বেদনা-দায়ক কাটল।" এ'তে রাকেয়ার কথা মনে পড়ল টিপুর। মীর সাদিক বলতে লাগল, "আমি খোলাখুলি ভাবে কিন্তু বড়ই বেদনা নিয়ে কথাগুলি বললাম। আমার প্রীতি তোমার ভালোবাসার দরুনই তোমার কাছে অকপট হতে পারলাম।

ঈশ্বরের দয়া পেলে এসব কথা বলার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাম্য ছিল—এক নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর সঙ্গে আলোচনার কথাও আমি বলেছি। শূন্য চেয়ারগুলি তোমার মত আমিও দেখছি—মহীশূরের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে আমাদের নিহত বন্ধুদের রক্ত বিফলে যাবে, যদি-না আমরা একটু দম নেবার জন্যে থামি এবং ক্রয় করে নিই শান্তি, যাতে নাকি ফের যুদ্ধ করার জন্যে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারি। তোমার সিদ্ধান্ত যাই হোক, সুলতান, আমার পরামর্শে গুরুত্ব দাও বা না দাও আমি যদি মাত্রার বেশি কিছু বলে থাকি-আমাকে ক্ষমা কোরো। আমাকে দোষ দিয়ো না, দোষী কোরো তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাকে।" মীর সাদিকের গলা ধরে এল, তার চোখে এল জল।

চেয়ার থেকে উঠে টিপু বাহুডোরে বাঁধল মীর সাদিককে।

টিপুসুলতান বলল, "তোমার পরামর্শ আমি মূল্যবান বলে মানি, মীর সাদিক। তোমার স্নেহও আমার কাছে তেমনি মূল্যবান।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কাটল। টিপু সুলতান তাকাল পুরনাইয়ার চেয়ারের দিকে, তার পর গাজি খাঁ'র, তার পর অন্যান্যদের।

আবেগ-কম্পিত গলায় টিপু বলল, "আরম্ভ হোক আলোচনা।" নিজেকে একটু সামলে নিয়ে টিপু বলল, "তুমি এর দায়িত্ব নাও, মীর সাদিক।"

মাথা নত করে অভিবাদন করল মীর সাদিক, তার যেন মনে হল একটা হাতুড়ির আঘাত এসে লেগেছে তার মুখে, কিন্তু তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল আনন্দে।

## ৫৬ শান্তির প্রস্তুতি

ক

কর্নওয়ালিশের যেন খুশিতে কান্না এল। কয়েক বছর ধ'রে তার এই বেপরোয়া অভিযান, এই শ্রম এই ক্লান্তি। হ্যাঁ উদ্বেগের দীর্ঘ রজনী অতিক্রান্ত, মেঘ কেটেছে এবার রোদও উঠেছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর গভীর রাত্রে মীর সাদিক তার সঙ্গে দেখা করেছে। সে শত্রুর সীমানায় ঢুকেছে মাত্র দুজন সঙ্গী নিয়ে, একজনের হাতে লণ্ঠন, অন্যজনের হাতে শ্বেত পতাকা। তাকে চ্যালেঞ্জ করা হলে সে আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করে নিয়ে যাওয়া হয় কর্নওয়ালিশের কাছে। টিপু সুলতানের এমন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি এভাবে আসতে পারে এ'তে সবাই বিস্মিত, তাদের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে যে নিয়ে গেল, তার বিস্ময়ও কম নয়।

কর্নওয়ালিশের ও মীর সাদিকের দেখা এই প্রথম। কিন্তু উভয়কে সম্যক ভাবে বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হল না। ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনের চেয়ে সম্মিলিত অপরাধ ও গোপনীয়তার ভাগীদার হওয়া হচ্ছে বেশি শক্ত বাঁধন।

মীর সাদিক চলে গেছে। কর্নওয়ালিশের মনে হল, যে প্রশ্নটা এতদিন তার কাছে ছিল ধাঁধার মতন আজ যেন সে পেয়ে গেল তার সমাধান। ভাগ্যই হচ্ছে পৃথিবীর প্রধান সম্বল। সাহস বলো, আদর্শ বলো, বুদ্ধি আশা আশ্বাস যা'ই বলো না—ওসবের কোনো মূল্যই নেই। টিপুর তরফ থেকে বাধা আর এক দিনের জন্যে এলেই তাদের মিত্রদের মধ্যে বিভেদ ঘটে যেত, তারা সব সরে পড়ত। কর্নওয়ালিশ সেই ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণের কারণটা কিছুতে বুঝতে পারে নি, কিন্তু ঘটে গিয়েছিল সেই অঘটন। তার পর এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব, স্বয়ং সুলতানের কাছ থেকে শান্তির কথা ঈশ্বরের দানের মতন ; যখন নাকি ইংরেজরা ও তাদের মিত্রেরা জয়ের সব আশা পরিত্যাগ করেছে।

অকস্মাৎই সুলতানের সূর্য অস্তমিত হল।

খ

যেটা নাকি কর্নওয়ালিশের ও তার মিত্রদের মধ্যে দুঃখজনক আলোচনা-সভা হবার কথা ছিল, তাই হয়ে উঠল আনন্দের এক সুন্দর বৈঠক।

প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কর্নওয়ালিশ ঘোষণা করল, মহীশূরীরা একেবারে বিপর্যয়ের কিনারে এসে পেঁছেছে, সুলতান কাবু হয়ে পড়েছে, শীঘ্রই তারা শান্তির শর্ত ঠিক করার জন্যে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে।

মারাঠা অধিনায়ক হরি সিংহ জানাল যে সরে আসবার জন্যে যে প্রস্তুতি আরম্ভ করেছিল তা সে থামিয়ে দিচ্ছে।

নিজাম দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল যে ইংরেজ ও মারাঠারা যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালেও সে একাকী যুদ্ধ করে যাবে ও সুলতানকে খতম করে দেবে। তার পর সে বলল যে তার সাহস ও বিক্রমের চোটে সুলতান যখন শান্তির জন্য চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়েছে তখন তার একটু পরামর্শ আছে, তা হচ্ছে তিন মিত্র বাহিনীর জন্যে স্থায়ী কিছু সুযোগ-সুবিধা করে নেওয়া।

কর্নওয়ালিশ হাসল। মারাঠারা হাসল। নিজাম যেন দেখতে পেল টিপু সুলতানের কাছ থেকে সরকারী আলোচকরা এসে পেঁছল।

গ

"ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ক্ষমতা সঞ্চয় করা দরকার? সে ক্ষমতা জাহির করা দরকার সব সময় নজর রাখা শত্রুপক্ষ যেন তা দেখতে পায়! তাদের মনে যেন তা ভীতিসঞ্চার করে। তাহলে তারা শর্তে আসতে রাজি হবে—আমাদের শর্তে।"

তার মিত্রপক্ষের কাছে এই হল কর্নওয়ালিশের উপদেশ। "যুদ্ধে আমাদের জয় হত কি পরাজয় হত, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে পারতাম অথবা সরে আসতে বাধ্য হতাম—এসব চিন্তা আর যেন আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন না-করে। এখন আমাদের যা করার তা হচ্ছে শান্তির এই আলোচনায় জয় লাভ করা।"

ইংরেজদের অধিকৃত প্রদেশসমূহে বার্তা গেল, মারাঠা রাজধানীতে ও নিজামের এলাকায় বার্তা গেল। "আলোচনা-বৈঠক চলেছে, কিন্তু আরও সৈন্য

পাঠাও, আরও অস্ত্র। এই জয়ের আনন্দের অংশ তারাও পাক। তারা বিদ্যাবাখার শ্রীরঙ্গপত্তমে মার্চ করে যাবে।"

মীর সাদিক লক্ষ্মণের বিগ্রহ ভেঙে দিল। "তোমাদের ক্ষেতে চলে যাও—তোমরা—এ রাজ্যের অধিক সম্পদ সেখানে।" তাদের বলল সে। বলল, "শান্তি আসছে। মর্যাদা-সহ শান্তি। যাও, এই কথা ছড়িয়ে দাও যে, তোমাদের অভিপ্রায়ে, তোমাদের ত্যাগস্বীকারে ভয়ংকর যুদ্ধের অবসান সম্ভব হল। তোমাদের প্রিয়জনদের কাছে যাও, তারা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সুলতান তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে বলছে যে, এই জাতি এখন ক্ষুধার্ত, তার খাদ্য দরকার, তোমাদের পরিত্যক্ত জমি এখন চায় তোমাদের একাগ্র মনোযোগ।"

তারা চলে গেল।

অনেক কম্যান্ডারকেও তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের গৃহে প্রেরণ করা হল। "শান্তি আসছে। মর্যাদা-সহ শান্তি।" মীর সাদিক পুনরায় বলল। "তোমাদের করণীয় কাজ অন্যত্র আছে। তোমাদের অধিনায়কত্বের এলাকায় যাও। আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে ব্রতী হও। দেখো যেন কিষাণেরা ভূমি কর্ষণে উৎসাহিত হয়। লক্ষ রেখো যেন শত্রুসৈন্যেরা লুণ্ঠন করতে না-পারে। রাজ্যের কল্যাণের প্রতি প্রহরী হও।"

মীর সাদিক আদেশ করল, "আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিরা যেন প্রয়োজনীয় উপকার পায়।" শ্রীরঙ্গপত্তম ও আশপাশ থেকে সে সবাইকে সরিয়ে দুর্গে আনল, রাজসভার চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করাল।

"কী সাহসী মানুষ ও।" মীর সাদিক সম্বন্ধে অনেকে বলল, তারা জানত সে কর্নওয়ালিশের কাছে গিয়েছিল, অবশ্য সুলতানের নির্দেশে, একেবারে একা, কোনো সহকারী ছাড়াই, যদিও সেই যুদ্ধরত এলাকায় তখন বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চলেছে।

অন্যেরা বলল, 'কী অপূর্ব কূটনীতিবিদ্!" যুদ্ধ তখনও চলছে। মীর সাদিক ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ রেখেছে, শান্তির জন্যে তৈরি হয়েছে বেশ আগেভাগেই—সেই শান্তি অর্থবহ করতে সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে।

"কতটা মানবিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ।" যেসব অসুস্থ ও আহতকে দুর্গে নিয়ে এসেছে, সেই জনগণের অনেকে বলল এই কথা।

মহীশূরীরা কিন্তু বেশ আগেই তাদের শান্তির কণ্ঠধ্বনি করেছে। তাদের সম্মুখে ইংল্যান্ডের নিরেট প্রাচীর। শত্রুর বাহিনী ও উপকরণ বেড়েই চলেছে। আর মহীশূরীরা? তারা শান্তিকালীন কর্তব্যে তখন রত। মহীশূরের শান্তি-আলোচকেরা তখন বিহ্বল ভাবে শুনে যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান দাবি। শত্রুর আচরণ কঠিন হয়ে আসছে। কর্নওয়ালিশ বেশ শীতল হিংস্রতার সংগে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। আলোচকেরা যে হাসি ও সৌজন্যের সংগে কথা আরম্ভ করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। সে দাবি জানিয়ে যেতে লাগল, নূতন-নূতন দাবি, অসম্ভব দাবি। ইতিমধ্যে তার সৈন্যসংখ্যাও বেড়ে চ'ল।

সারা মহীশূরে আনন্দের যে ধ্বনি বেজে উঠেছিল তা স্তব্ধ হল। তার জায়গায় এসে গেল ভয়। যারা শ্রীরঙ্গপত্তম ত্যাগ করে গিয়েছিল, কোনো আদেশের অপেক্ষা না-করেই তারা ফিরে এল। অনেকে অনেক আদেশের অপেক্ষায় ছিল, যে আদেশ আর এল না। কেউ-কেউ ফিরে গেল তাদের গৃহে, তাদের জমিতে, তাদের পরিবারের মধ্যে। তাদের আশা তারা হয়তো একাকী থাকতে পারবে। কী ঘটে চলেছে তা বুঝতে পারল না। ভগ্ন মনোবল কি আবার জোড়া লাগে? মর্যাদা-সহ শান্তি ঘোষণার পর কী করে যুদ্ধের জন্যে, প্রতিরোধের জন্যে, আত্মত্যাগের জন্যে আহ্বান জানানো যায়? যুদ্ধক্লান্ত একটা জাতিকে কী করে আবার সংঘবদ্ধ করা যায়? তাদের ব্রিগেড ও কম্যান্ডারদের ভেঙে দিয়ে তক্ষুনি কী করে তাদের ডাকা যায়?

টিপু সুলতান উদ্বেগের সংগে দেখতে লাগল। শত্রুদের তৎপরতা ভীষণ ভাবে বেড়ে চলেছে—অনেক সরবরাহ এসে যাচ্ছে। বেশ উদ্যমে ও উৎসাহে তাদের সৈন্য শ্রীরঙ্গপত্তমে ঢুকছে দ্রুতবেগে। প্রথমে ধীরে-ধীরে, তার পরে বেশ দ্রুত মহীশূর বাহিনী কমে যাচ্ছে।

"এত লোক আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে কেন, মীর সাদিক?" জিজ্ঞাসা করল টিপু সুলতান।

মাথা নীচু হল মীর সাদিকের। সে উত্তর দিল না। তার মনে যে বিষণ্ণতা জড়ো হয়েছে মুখে সে তা প্রকাশ করতে পারল না।

টিপু মন্তব্য করল, "দুর্গে এত আহত ও অসুস্থ লোক আছে এবং এত বেশী মারা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, বাইরে আরও অগণ্য লোক আছে।" বলল মীর সাদিক।

টিপু বলল, "অবিলম্বে শান্তি দরকার। তুমি ঠিকই বলেছ।"

"না। আমি ভুল করেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।"

"কথা ?" টিপু জানতে চাইল।

মীর সাদিক বলল, "শান্তি-আলোচনা বন্ধ করেছি। ইংরেজ ও তার মিত্ররা আজ যে মূল্য দাবি করছে—তাতে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলার আগে আমার জিভ কেটে ফেলতে চাই।"

"আবার নতুন দাবি ? কী তারা এখন চায় ?"

"কী তারা চায় ?" মীর সাদিক বলল, "সব—সমস্ত। তোমার জীবনটা ও দেহটা তারা স্বীকার করে মাত্র। এ যদি অর্থের, সোনার বা রূপার প্রশ্ন হত, তাহলে একটু উদার হবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারা আমাদের এলাকা চায়—চায় আমাদের শহর, চায় আমাদের দুর্গ—এসব আমরা যেন তাদের হাতে তুলে দিই।"

টিপু সুলতান উত্তর দিল না। মীর সাদিক বলে যেতে লাগল, "সুলতান, এ যুদ্ধ থামেনি। মনে হচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ সংগ্রাম ভয়ংকর হবে, আমি জানি। আমাদের বাঁচার আশা কম, তাও আমি জানি। কিন্তু এর কোনো বিকল্প কী আছে ? স্বেচ্ছায় আমাদের ভূমি ছেড়ে দিয়ে বলব শান্তি এল। সামান্য কয়-দিনের যুদ্ধবিরত অবস্থা আমাদের ভাববার সময় দিয়েছে। যে দিন আমরা আলোচনা আরম্ভ করি তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় এখন আমরা নেই।"

বিষন্নভাবে সুলতান বলল, "হ্যাঁ। তারপরে অনেকে কিন্তু আমাদের ছেড়ে গেছে।"

"তা ঠিক। কিন্তু যুদ্ধ যদি চলতে থাকত তখন তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে কিছু কম ব্যবহার কি পাওয়া যেত ? আরও দুর্বহ মনে হত তাদের আচরণ।"

"এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখতে হবে। পুরবাইয়া এখনও অসহায়, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভায় এ বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক।"

ঘ

সন্ধ্যার মন্ত্রিসভার বৈঠকে মীর সাদিক রিপোর্ট পেশ করল। প্রথমেই সে মোটামুটি খবর জানাল, দুর্গে অসুস্থ ও আহতদের কত জন গত সপ্তাহে মারা গিয়েছে, দলত্যাগের ঊর্ধ্বগতি—এটা বন্ধ করার জন্যে গ্রেপ্তার প্রভৃতি, ও ঘাঁটি শক্ত করার জন্য কি কি করা হয়েছে। তার পর ইংরেজদের ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা। মহীশূরের ও টিপু সুলতানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না-হয়, এমন

দাবি সে মেনে নিয়েছে। সে-ই, মীর সাদিকই শান্তি-আলোচনার প্রস্তাব দেয়, শত্রু পক্ষ এমন আচরণ করবে তা সে বোঝে নি, দেশের ক্ষতি মেরামত করে নেবার জন্যে শান্তির দরকার বলেই সে মনে করেছিল। কিন্তু শত্রুদের দাবির বহর দেখে সে এখন বুঝেছে এ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া চলে না। সে এই বলে শেষ করল যে, এরকম লজ্জাজনক শর্ত মেনে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

প্রত্যেকে নীরবে সব কথা শুনল। গাজি খাঁ এখন সেরে উঠেছে, সেই এই নীরবতা ভাঙল।

"সব কথাই অবশ্য ঠিক। কিন্তু সামরিক অবস্থা কেমন?"

গাজি খাঁর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল মীর সাদিক। নীরবতা তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে তার শ্রোতারা তার কথা মেনে নিচ্ছে, এবং এমন শর্তে শান্তির আলোচনা ভেঙে দেওয়াই ভালো, তা স্বীকার করছে।

"গাজি খাঁ, তোমার প্রশ্ন যুক্তিসংগত," বলল মীর সাদিক, "আমি সামরিক বিশেষজ্ঞ নই, আমি তোমার ও সুলতানের বিজ্ঞ বিবেচনার কাছে মাথা নোয়াই। তুমি জখম হওয়ায় কিছুদিন আমাদের মধ্যে থাকতে পারনি। তা না হলে তুমি নিজেই সব বুঝতে। বিভিন্ন কম্যান্ডার যেসব খবর দিয়েছে তার সারমর্মই আমি জানাচ্ছি···এর পর সে মহীশূর বাহিনীর সব খবর দিল, এবং খুঁটিনাটি করে জানাল শত্রুপক্ষের বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কথা।

মীর সাদিক সব সংখ্যা মুখে-মুখেই বলে গেল। সবই তার জানা। সে এক শোচনীয় অবস্থা। এই সব সংখ্যা ঠিক হলে মহীশূরের কোনো ভরসাই নেই। উপস্থিত সকলেই তা জানত। তার কথার শেষ দিকে একটু ভাবাবেগ এসে যায়, মীর সাদিক বলে, "আমি যেমন বুঝেছি সামরিক অবস্থার কথা সেই-রকম বললাম। কিন্তু একটা কথা এই যে, আমরা এ যুদ্ধে লিপ্ত হই আক্রমণ-কারীদের একেবারে তাড়িয়ে দেবার জন্যেই। তাদের শর্তে রাজি হলে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হত না, তবে কী লাভ হত আমাদের?"

গাজি খাঁ আবার বলল, "আমাদের এরকম শোচনীয় অবস্থা হলো কী করে?"

উত্তর দিতে মীর সাদিক একটু সময় নিল। গাজি খাঁর দিকে সে সোজা-সুজি তাকাল। তার পাশে বসা সামরিক অধিনায়কদের দিকে সে তাকাল। যখন সে বলতে আরম্ভ করল তখন তার গলায় এতটুকু উষ্মা নেই। প্রশ্নটা অবান্তর মনে হওয়ায় সে একটু বিচলিত মাত্র। সে বলল, "এই প্রশ্নের উত্তর

রক্ষার জন্যে আমি তোমার উপর ও সামরিক অধিনায়কদের উপর নির্ভর করব। কাউকে দোষী করতে আমি চাইনে। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—কার উপরে দোষ চাপাব তাই-ই কি আমরা এখন খুঁজব? কিংবা ভবিষ্যতের সম্মুখীন হব আমরা? আমি তোমাকে বলছি—অনেক যুদ্ধে সুলতান আমাদের পরিচালিত করেছে, অধিকসংখ্যক সেনার বিরুদ্ধে, অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, তবুও জয় আমাদের হয়েছে। তাহলে এখন এই হতাশা কেন? ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে অন্ধকার বোধ হবে কেন? আমরা নিরাশ হব কেন? কেন? আমি সামরিক বিশেষজ্ঞ নই বটে, তবু এই আমার প্রশ্ন। কিন্তু…"

মীর সাদিক তার কথা শেষ না করলেও কী কথা সে বলতে চায় তা সকলেই বুঝল। সামরিক নেতৃত্বের প্রতি কোনো কটাক্ষ করা তার অভিপ্রেত নয় তবুও সে যা বলতে চায় তা সকলের কাছে পরিষ্কার।

বৈঠক চলতে লাগল। মীর সাদিক নির্লিপ্তভাবে বসে রইল। তার আর কোনো কথা বলার নেই। তাদের সামরিক দুর্বল অবস্থা ও শত্রুপক্ষের শক্তিমত্তা সম্পর্কে সে যা বলেছে তা নির্ভুল দলত্যাগকারীদের বিষয়ে সে হয়তো একটু বাড়িয়ে বলেছে, কিন্তু সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তুলল না। দুর্গের আহত ও অসুস্থদের বিষয়ে সে যা বলেছে তা সকলে যাচাই করে দেখতে পারে, ইচ্ছে করলে। শান্তি আলোচনায় মীর সাদিক যে অন্যায্য দাবি প্রতিরোধ করেছে, তাও সবার কাছে পরিষ্কার। এই আলোচনা স্বয়ং সুলতানের আদেশেই আরম্ভ হয়। তার নিজের সাহসের পরিচয়ও পেয়ে গিয়েছে সকলে। এই হচ্ছে সেই মানুষটি যে নাকি শত্রুর প্রবল বিক্রম সত্ত্বেও সহজ পন্থা গ্রহণ না-করে তার সংগীসাথীদের উজ্জীবিত করে নতুন ভাবে প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত করেছিল।

বৈঠক চলতে লাগল। কী সিদ্ধান্ত এখানে হবে তা সবার জানা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কথা দিয়ে সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাই ছিল কঠিন। মীর সাদিকের সাহসিকতা সত্ত্বেও এখন এটা পরিষ্কার যে, মহীশূর এখন প্রবলভাবে প্রতিরোধে অক্ষম। সুতরাং এটা বিশেষ জরুরি যে, আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আক্রমণকারীকে হটিয়ে দেবার জন্যে শেষ শক্তি প্রয়োগ করা সকলেরই উচিত বটে, কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ সর্বনাশের জন্যে এভাবে ঝাঁপ দেওয়া ঠিক কিনা, তাও ভাববার কথা। প্রশ্ন হচ্ছে—মহীশূরের জনগণ যে ভালোবাসা যে-প্রচেষ্টা ও যে কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যকে রক্ষা করে আসছে, তাদের উপর এখন অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপানো কি ঠিক?

তাদের কি আরও ত্যাগস্বীকার করানো সংগত? কিসের উদ্দেশ্যে, কী পরিণামের জন্য? জাতির শোণিতপ্রবাহ কি শুষ্ক করে তোলা উচিত হবে? একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবার চেয়ে একটা শর্তে আসা কি ঠিক না? কেন, এর আগে সুলতান কি ইংরেজদের উপর শর্ত আরোপ করে নি, তারা কি এখন আবার যুদ্ধ করছে না? অবস্থার বদল এমন হতেই পারে। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ আশা। কিন্তু তার জন্যে বেঁচে থাকা চাই।

৬

শান্তি-আলোচনা বিলম্বিত করা নিয়ে কর্নওয়ালিশ বেশ মজায় আছে। ইতিমধ্যে ইংরেজদের শক্তি আরও বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে। টিপু সুলতানকে চিরতরে শেষ করে ফেলার এ হচ্ছে একটা মস্ত সুযোগ। মারাঠার সামরিক অধিনায়ক হরি পন্থ বিপরীত কথা বলল। হরি পন্থ বলল, "বাঘকে বেশি সময় দেওয়া ঠিক না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।" নানা ফড়নাবিসও কর্নওয়ালিশকে চিঠি লিখে জানাল. এ ব্যাপারটা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত হয়ে যেতে পারে, তাতে মারাঠা শক্তি যোগ না-দিতেও পারে, সে সরে আসতেও পারে। কর্নওয়ালিশ জানত যে, মারাঠার সমর্থন না-পেলে ইংরেজরা অগ্রসর হতেই পারবে না, টিপু সুলতানকে পরাস্ত করা দূরের কথা। গত দু'বছর ধরে মহীশূরীরা তিনটি বাহিনীর সম্মিলিত বিক্রমের বিরুদ্ধে যে ভাবে ঘোরতর সংগ্রাম করেছে. তা ভেবে কর্নওয়ালিশ একটু হতাশায় আক্রান্ত হল। সে তার পরিপূর্ণ বিজয়ের আশাটা একটু যেন পাশে সরিয়ে রাখল। সে বুঝল এটা ছিল তার একটা স্বপ্নই মাত্র। একটা চরম সংগ্রামের জন্য টিপু সুলতান কী রকম বিক্রমের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তা সে বুঝতে পারছিল। ঠিক এই মুহূর্তে ঐ ব্যাঘ্রটি তার নিজের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তেমন যেন নিজেই জানে না। সে যদি তা জানতে পারে···না, রণক্ষেত্রে ইংরেজের জয়ের সম্ভাবনার চেয়ে মীর সাদিকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এ সম্ভাবনা বেশি। আরও আতঙ্কের কথা এই যে, পুরনাইয়ার অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর জ্ঞান নাকি ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। অচিরেই সে সোৎসাহে নেমে পড়বে। সুলতানের তরফ থেকে পুরনাইয়া শান্তি আলোচনার ভার পাওয়াটা কর্নওয়ালিশের বিশেষ পছন্দসই নয়। মীর সাদিকের প্রতি তার একটু যেন টান হয়ে গেছে।

## ৫৭. আমার পুত্রেরা যাক

ক

শ্রীরঙ্গপত্তম শান্তিচুক্তির খসড়া সই হয় ১৭৯২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। চুক্তির ধারা অনুসারে তার রাজ্যের অর্ধেকটা টিপু সুলতানকে দিতে হবে ইংরেজদের ও তাদের মিত্রদের, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিতে হবে ত্রিশ লক্ষ টাকা নগদে —এর অর্ধেকটা এক্ষুনি, বাকিটা বারো মাসের মধ্যে। এর উপর আছে আরও, তাকে জামিন-স্বরূপ দিতে হবে তার দুই পুত্র—আট বছরের আবদুল খালিক ও পাঁচ বছরের মুইজ-উদ-দিন চুক্তি ধারা যাতে প্রতিপালিত হয় তার জন্যেই এই জামিন। মূল খসড়ায় ছিল 'গ্রহণযোগ্য গ্যারান্টি'—মীর সাদিক সুলতানের কাছে যা পেশ করেছিল। পরে সেই জায়গায় পরিবর্তন করে লেখা হয় 'চুক্তি যাতে ঠিক-মত মান্য করা হয় সেজন্য গ্রহণযোগ্য জামিন'। অবশেষে দাবি করা হয় টিপুর দুই পুত্রই কেবলমাত্র ইংরেজদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

মীর সাদিক ছুটে আসে টিপু সুলতানের কাছে ইংরেজদের এই অসম্ভব দাবির কথা বলতে। প্রথমে সে ভালো করে বলতে পারল না, পরে স্পষ্টভাবে বলল।

শান্তভাবে টিপু বলল, "জামিন হিসেবে আমার ছেলেদের চায়, এতটা ভাবতে পারি নি।"

"আমিও না।" বলল মীর সাদিক, 'যা ঘটার ঘটুক, আমরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করব।"

"ওরা জামিন হিসাবে কি চাইবে বলে প্রথমে ঠিক করেছিল?" টিপু জিজ্ঞাসা করল।

মীর সাদিক বলল, "নিশ্চয়ই তোমার ছেলেদের নয়। ভেবেছিলাম, আমাদের কোনো অফিসার বা গবর্নরদের, এমনকি আমাকে বা পুরনাইয়াকে চাইতে পারে। কিন্তু তোমার ছেলেদের? অসম্ভব।"

টিপু বলল, "এটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।"

"কী ভেবে দেখতে হবে?" হতভম্ব সাদিক জিজ্ঞাসা করল।

"সন্ধ্যায় আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।" উত্তর দিল টিপু।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রবীণ কম্যাণ্ডার ও মন্ত্রিদের সমাবেশে টিপু এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসল। তারা শুনে চমকিত হল, এক্ষুনি তা প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিল। কিন্তু টিপু সুলতানের কিছু বলার ছিল। মীর সাদিককে লক্ষ করে সে কথা আরম্ভ করল।

"তোমার আগের ধারণার কথা বলেছিলে, তোমাকে বা পুরনাইয়াকে তারা জামিন রূপে চাইতে পারে। তোমাকে বা পুরনাইয়াকে আমি যদি ছাড়তে পারি, তাহলে আমার পুত্রদের ছাড়তে দ্বিধা করব কেন?"

মীর সাদিক বলল, "ওটা অসম্ভব। তোমার ছেলেদেরই ওরা চায়। আট বছরের আবদুল খালিক ও পাঁচ বছরের মুইজ-উদ-দিন।"

এর পর চারদিক নিশ্চুপ হয়ে গেল। টিপু যা বলতে চাইল তা সকলের কাছে অবাস্তব মনে হল। টিপু বলল, "নাগ-রাজ দান-হিসেবে এক হাজার গোরু দিয়েছিলেন- কিন্তু ওর মধ্যে একটা তাঁর নিজের ছিল না, এজন্যে তিনি দাতার পূর্ণ মর্যাদা পেলেন না। শিবিরাজ উশীনর একটা কবুতরকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর নিজের শরীরের মাংস দিয়েছিলেন একটা বাজপাখিকে, তিনি স্বর্গে আসন পেয়েছেন।"

টিপু একটু থেমে বলল, "ওই রকমই তবে হোক, আমার পুত্রদেরই দেওয়া হোক জামিন-রূপে।"

চুক্তির খসড়া এবার চূড়ান্ত করা হল। টিপুর দুই ছেলেকে তুলে দেওয়া হল ইংরেজদের হাতে। ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়া হল, বাকিটা তিন কিস্তিতে বারো মাসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে বলে স্বীকার করে নেওয়া হল।

খ

প্রাথমিক চুক্তির পর পাকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৭৯২ সালের ১৯ মার্চ। এই দুয়ের মাঝখানের সময়ে কর্নওয়ালিশ তার তেজ খুব দেখিয়েছে। জামিন জামিনই। পাকা চুক্তি হবার সময় যখন একটু অসুবিধে ঘটে তখন সুলতানের পুত্রদের সে যুদ্ধবন্দীরূপে পরিণত করে।

তাদের প্রতি কোনো সৌজন্য দেখানো বন্ধ হয়। তাদের মহীশূরী প্রহরীদের নিরস্ত্র করা হয়, বন্দী করা হয়। শিশু-দুটিকে পাঠানো হয় কর্নাটকের দিকে। তাদের পালকিতে চাপিয়ে বাঙ্গালোর সড়ক দিয়ে কিছুদূরে নিয়ে যাওয়া হয়—ক্যাপটেন ওয়েলচ'-এর তদারকীতে। ওদের বাবার কাছ থেকে যাতে উত্তর আসে তার জন্য অপেক্ষা করা হয়। খবরটা টিপুর কাছে চলে যায় যে, তার পুত্রদের বন্দী করা হয়েছে, আরও কঠিন ব্যবহার তাদের প্রতি করার সম্ভাবনা। যদিও প্রাথমিক চুক্তিতে বলা ছিল যে আলোচনা ভেঙে গেলে জামিনদের ছেড়ে দেওয়া হবে—এ'তে সম্মতি ছিল কর্নওয়ালিশের। এখন কর্নওয়ালিশের অন্য মেজাজ। ওদের বাবা নরম না হলে তার ছেলেদের সে ছাড়বে না। টিপু সুলতান তেত্রিশ লক্ষ টাকা নগদে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে স্বীকৃত হয়েছে। এর অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকিটাও দেওয়া হবে। কিন্তু কলহ বাধল তার ভূমির যে অংশ দিয়ে দেওয়া হবে তার সীমানা নিয়ে। কথা ছিল ইংরেজদের এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলই দেওয়া হবে, কিন্তু এখন তারা কুর্গ সমেত বিভিন্ন এলাকা দাবি করছে।

টিপু সংগতভাবেই অনুযোগ করে—ইংরেজ ইতিহাসকাররাও তা স্বীকার করেছেন—যে, টিপুর কাছ থেকে সেই ভূমি দাবি করা যা তার রাজধানীতে যাবার পথ, যা ইংরেজ বা তাদের মিত্রদের এলাকার সংলগ্ন নয়, তা হচ্ছে প্রাথমিক চুক্তির ধারার লঙ্ঘন'। কোনো খানেই কুর্গের উল্লেখ নেই, প্রাথমিক চুক্তিতেও নয়, শান্তিবৈঠকের আলোচনাতেও না।

টিপু জানতে চাইল, "ইংরেজদের কোন্ অঞ্চলের সংলগ্ন হচ্ছে কুর্গ? তারা শ্রীরঙ্গপত্তমে ঢোকার চাবিকাঠিও এখন দাবি করতে পারে। তারা জানে যে, এমন দাবি আগে জানালে আমি মৃত্যুবরণ করতাম কিন্তু তাদের প্রস্তাবে সায় দিতাম না। এখন তারা আমার পুত্রদের তাদের কব্জার মধ্যে পেয়ে ও আমার টাকাকড়ি হস্তগত করে এইসব নতুন দাবি নিয়ে আসছে।"

টিপু কিন্তু জানত তার পুত্রেরা এখন কি বিপদের মধ্যে আছে। ইংরেজরা জানিয়েছে প্রাথমিক চুক্তিতে যা-ই থাক্-না কেন, তারা ঐ ছেলেদেরও ফেরত দিচ্ছে না, টাকা-কড়িও না। তার পুত্রদের উপর অনেক রকম অত্যাচার হবারও সম্ভাবনা এমনকি অন্য ধর্মে তাদের দীক্ষিত করাও। টিপু সুলতান কুর্গ দিয়ে দিতে স্বীকৃত হল, শ্রীরঙ্গপত্তমের চূড়ান্ত চুক্তিতে পড়ল তার সীলমোহর।

প

চুক্তির যাবতীয় শর্ত নিখুঁতভাবে মেনে চলল টিপু সুলতান বারো মাস পার হবার আগেই ক্ষতিপূরণের বাকি টাকা সে দিয়ে দিতে পেরেছিল। দুই বছরের মধ্যে তার পুত্রদের ফিরিয়ে দেওয়া হল না। ১৭৯৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি টিপু সুলতানের জন্মস্থান দেবনহাল্লিতে ঘটল পুনর্মিলন। নীরবে দুই পুত্র মাথা নীচু করে তাদের পিতার পায়ে হাত দিল। টিপু তাদের থুৎনি ধরে তাদের দাঁড় করাল। তাদের কপালে চুম্বন করল। তার পর সে তার পুত্রদের মুখে মুখ দিল—চোখের জলে ভিজে গেল তাদের মুখমণ্ডল।

## ৫৮. তোমার শত্রু কে ?

চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় কর্নওয়ালিশ টিপুর একটি ছেলেকে জামিন হিসেবে দিতে চেয়েছিল মারাঠাদের। তার এ উদ্দেশ্য স্বার্থহীন ছিল না। নিজামের বর্বরতা নিয়ে যেমন চিন্তিত ছিল কর্নওয়ালিশ, সমান ভাবেই সে চিন্তান্বিত ছিল মারাঠাদের সম্মানবোধ ও সাহসের জন্যে। ইতিহাসের বিচারের কাছে শিশুকে জামিন হিসেবে রাখার জন্যে মারাঠারাও যুক্ত হয়ে থাক্ এই ছিল তার মতলব। কিন্তু মারাঠাদের সর্বাধিনায়ক হরি পন্থ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

কর্নওয়ালিশ চাপ দিতেই লাগল, বলল, "এটাই হবে টিপুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তোমাদের কাছে একটা রক্ষা কবচ।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু একটা শিশুকে ওভাবে ব্যবহার করতে আমরা চাইনে।"

"ভেবে দেখ। যদি মনে কর, নানা ফড়নাবিসের সংগে পরামর্শ কর।"

"এ ব্যাপারে আমি নানা'র মন জানি। যেমন জানি আমার।"

কর্নওয়ালিশ তার বিরক্তি চাপা দিল একটু হেসে। কিছু বলল না।

পরে, হরি পন্থ একটা ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাল টিপু সুলতানের কাছে, তাতে জানাল যে, নানা ফড়নাবিসও এ বিষয়ে একমত যে, সুলতানের সন্তানদের জামিন করে রাখা সংক্রান্ত চুক্তিতে তারাও যুক্ত হয়ে আছে এজন্যে তারা দুঃখিত : কিন্তু মিত্রপক্ষের চাপে এ ছাড়া উপায় ছিল না। এই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে টিপু সুলতান।

হরি পন্থ চলে যাবার আগে টিপু সুলতান তার সংগে দেখা করে। হরি পন্থ তখন আরও জোরালো ভাবে জানায় যে, শিশুদের এভাবে রাখাটা হচ্ছে একটা যুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করা। সে বলে, "আমি নিজেকে সমান দোষী বলে মনে করি। শান্তিচুক্তির আলোচনায় কর্নওয়ালিশকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলেই এ দোষ অস্বীকার করতে পারিনে।" তারা বেশ হৃদ্যতার সংগেই কথা বলে।

টিপু সুলতানকে হরি পন্থ বলে, "যুদ্ধক্ষেত্রে বহুকাল তুমি আমাদের শত্রু। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার ও সমগ্র মারাঠা জাতির যে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আছে —এ কথা জেনে রেখো।''

টিপু সুলতান তাকে বলল, ''এটা জেনে রেখো, আমি তোমার বিন্দুমাত্র শত্রু নই। তোমাদের প্রকৃত শত্রু হচ্ছে ইংরেজরা, তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থেকো।''

## ৫৯. খানার পরে মিষ্টান্ন

যুদ্ধ আরম্ভ করে ইংরেজরা। ত্রিবাঙ্কুরের শাসককে টিপু সুলতান আক্রমণ করেছে এই অজুহাতে তারা যুদ্ধ বাধায়। এটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে কোনো সরকারী দলিলে ত্রিবাঙ্কুরের উল্লেখ নেই, চুক্তিপত্রেও নেই।

চুক্তিতে ত্রিবাঙ্কুরের উল্লেখ রাখা হোক, অ্যাবাবক্রমবি একথা কর্নওয়ালিশকে মনে করে দিয়েছিল।

' কি জন্যে ?" জিজ্ঞাসা করেছিল কর্নওয়ালিশ।

"ত্রিবাঙ্কুরের কল্যাণ করার জন্যেই আমরা যুদ্ধে মেতেছি।"

"তাদের কল্যাণের জন্যে আমরা যুদ্ধ থামাচ্ছিনে।"

"না। আমাদের কাগজপত্র ঠিক রাখার জন্যই বলছিলাম।"

"ও, কাগজপত্র? বেশ, যুদ্ধের খরচ ত্রিবাঙ্কুরের কাছে দাবি করতে পারি। এর সংগে চুক্তি মিশিয়ে ফেলছ কেন। এটা কি তোমার ইচ্ছে যে, কাগজপত্র ঠিক রাখতে গিয়ে আমরা টিপু সুলতানের কাছ থেকে যতটা লাভ করব তার অংশ পাঠিয়ে দেব ত্রিবাঙ্কুরকে ?"

অ্যাবারক্রমবি একটু হেসে বলল, "এমন কি ভাবতে পারি ?"

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। চুক্তিতে ত্রিবাঙ্কুরের উল্লেখ না-থাকলেও যুদ্ধের ব্যয়-বাবদ ইংরেজদের আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল ত্রিবাঙ্কুরের—টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ওজর তাদের কাছ থেকে পাবার এটা মাশুল।

পরে, ত্রিবাঙ্কুরের শাসকের তীব্র অনুযোগ আসে কর্নওয়ালিশের কানে, "আমাদের বহুকালের বন্ধু ইংরেজরা টিপু সুলতানের কাছ থেকে এমন প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি পেয়ে তা থেকে আমাদের এমন বঞ্চিত করল কী ক'রে ?'

কর্নওয়ালিশ বলল, "তাকে বলো, যত উপকারী ও স্বাস্থ্যকর খানাই হোক, তার পরে আমি একটা মিষ্টান্ন পেলে খুশি হই।"

ত্রিবাঙ্কুরের শাসক তাকে হতাশ করে নি। সাহস পায় নি সে।

## ৬০. আগামীকালের জন্য আলোকবর্তিকা

তার মনের নিভৃতে হতাশার ক্রন্দন বেজে চলেছে, টিপু সুলতান তা থামাতে পারছে না। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সে দেখল সব অন্ধকার। মহীশূরের ভাগ্যকে আচ্ছন্ন করেছে কালো মেঘ। কখনো বজ্রগর্জন হচ্ছে, কখনো বিদ্যুৎ-চমক। তার মনে হতে লাগল, সব দোষ তার। সে ভাবল, কেন আমি মর্যাদা ও বিক্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়াই নি? ন্যায় বিচারের জন্য ও দেশের জন্য কেন আমি নিজেকে উৎসর্গ না-করে শান্তিচুক্তি করলাম? আমি কি জাতির প্রতি ও দেশের মানুষের প্রতি প্রতারণার কাজ করি নি? দেশের যে মানুষেরা তাদের ধনরত্ন সন্তানাদি দিয়ে, অশেষ ত্যাগ স্বীকার করে এই জাতিকে রক্ষা করে এসেছে! আমার জীবনের বিনিময়ে কেন আমি শেষ আঘাত হানলাম না? অগুন্তি মৃতদেহের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি, যারা প্রাণ দিয়েছে আমারই আহ্বানে। আমার জন্যেই এতজন মরেছে, আর আমি আছি বেঁচে।

এর উত্তর তার কিছুটা জানা আছে। দুই বছর ধরে যারা লড়াই করে চলেছে অকথ্য বর্বরতার বিরুদ্ধে, তাদের দম নেবার অবকাশের জন্যই সে শান্তি চেয়েছিল। নিদারুণ বর্বরতা দেখতে-দেখতে সে লক্ষ করেছে ইংরেজরা বর্বরতার এটা নতুন মান প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত যা থেকে নারী শিশু কেউই পরিত্রাণ পাবে না। তাদের এই অত্যাচারের কাছে তৈমুর ও নাদির শা ম্লান হয়ে গিয়েছে। ইংরেজরা নিঃসঙ্গ ছিল না, মারাঠারা সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু নিজাম ছিল বিশ্বস্ত অনুচর। এরা উভয়ে মিলে চালিয়ে গিয়েছে পাইকারী হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ। টিপু সুলতান শান্তি চেয়েছিল এসব ক্ষত ও ক্ষতি মেরামত করে নেবার জন্যে। কিন্তু এটা কিসের শান্তি? কবরের? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে। এই শান্তি তার রাজ্যকে গ্রাস করেছে, এর অর্ধেকটা ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারদের দখলে গিয়ে দাসত্বে পরিণত হয়েছে। এই শান্তির দরুন যেসব জায়গা তাদের দিতে হয়েছে সেখানে ইংরেজরা কী করবে টিপু সুলতান তা আন্দাজ করতে পারছে। ইতিমধ্যেই তাদের নিষ্ঠুরতার পালা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সব মানবিকতা পরিহার করা হয়েছে। সে তার

দেশের মানুষের প্রতি যথোপযুক্ত কর্তব্য করতে পারে নি বলে বেদনা বোধ করছে। তার এই ব্যর্থতার বোঝা গিয়ে পড়েছে জীর্ণ মানুষের স্কন্ধে—ইংরেজদের সমর্পণ করা হয়েছে যে ভূভাগ সেখানকার মানুষের উপর। তারা এখন ক্রীতদাসে পরিণত। ওরাই একদিন তার উপর ভরসা রেখে সুদিনের স্বপ্ন দেখেছিল। তারই নির্দেশে কাজ করেছিল ওরা, ওদেরই মনে কল্পনার অগ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছিল সে। তবে এ শান্তিতে লাভ হল কী? একটা জাতির অর্ধেক স্বাধীন, অর্ধেক ক্রীতদাস। এর আগে মহীশূরের সঙ্গে চুক্তি তিনবার লঙ্ঘন করেছে ইংরেজ। আবারও কি তারা লঙ্ঘন করবে না? তারা লুণ্ঠন করে ইতিমধ্যে ধনশালী হয়ে গিয়েছে। টিপু ভাবল, শেষ মুহূর্তে আমি দ্বিধা করেছিলাম কেন? আমি সর্বস্ব বিসর্জন দিতে উদ্যত হলাম না কেন? সে কি কেবল আমার জীবনরক্ষার জন্য? এ শান্তি থেকে কী পাব ভবিষ্যতে?

টিপু সুলতান জানত আরো বলীয়ান হয়ে, আর দক্ষ অধিনায়কত্বে ইংরেজরা আবার আসবে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল দ্রুত এগিয়ে আসছে বিপর্যয়, মহীশূর ও সমগ্র ভারতবর্ষ অসহায় ভাবে পড়ে আছে। তার চারদিকে সে যেন দেখতে পাচ্ছে একটা গৌরবমণ্ডিত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে জঞ্জালের স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। যা সে প্রতিরোধ করতে পারবে না, সেই অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় এগিয়ে আসছে—সে অনুভব করতে পারল। আমার জীবন বিসর্জন দেবার জন্যে আমার শেষ বাহিনী নিয়ে আমি কেন ঝাঁপ দিলাম না? বার-বার এই প্রশ্নই সে নিজেকে করতে লাগল।

মীর সাদিক একদা তাকে যে কথা বলেছিল তা তার মনে পড়ল, "মৃত্যুই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অনিষ্টকর জিনিস, যতক্ষণ সম্ভব তা বিলম্বিত করতে হবে।" না, টিপু মনে করে, তার দেশের লোকের মুক্তিহীনতা, তাদের দাসত্ব—এমন জীবন হচ্ছে আরো বড় অনিষ্টকারী। স্বাধীনতা বিহীন দেশ হচ্ছে আত্মাহীন দেশ। স্বাধীনতা না-থাকলে ধন শক্তি জ্ঞান যশ সংস্কৃতি এমনকি জীবনও অর্থহীন। এই শান্তির অর্থ যদি এই হয় যে, সব উচ্চাশা, সব হৃদয়াবেগ, সব বাসনা ও আদর্শ—সবেরই ইতি হয়ে গেল, তাহলে কি নতুন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই ঠিক না?

তার বুকে যে তীর বিঁধছে তার কথা বলার মত বেশি লোক নেই। সকলের সঙ্গেই হৃদ্যতার সঙ্গে মিশলেও সহজে সে কাউকে বন্ধু করে নিতে পারত না। তার শিশুকাল থেকেই সে গম্ভীর, চিন্তশীল ও চাপা-স্বভাবের। কিন্তু সে তার

দুর্ঘাক্লান্ত হৃদয়ের নিভৃতে এটা ঠিকই অনুভব করত যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে এই দুঃসহ বেদনা বহন করে যেতে হবে।

পুরেনাইয়া ও মীর সাদিক সুলতানের মনের অবস্থা জানত। তাদের সে তার মনের অবস্থার কথা বলেছে। পুরেনাইয়া সব বুঝেছে, মীর সাদিক কিছু বোঝেনি।

পরে মীর সাদিক পুরেনাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে, "শেষ চেষ্টা করতে গেলে তার জীবন দেওয়া ছাড়া সুলতান আর কী করতে পারত? তুমি যখন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে শুয়ে আছ, আমি তখনই সব বুঝতে পারছিলাম। অবস্থা ছিল একেবারে নিরাশ। কতটা নিরাশ অবস্থা ভাগ্যক্রমে ইংরেজরা তা বুঝতে পারে নি। তা না হলে আরও কঠিন শর্ত তারা আরোপ করত। কিন্তু, সুলতানের মৃত্যু হলে আমাদের লাভ হত কতটা? তাহলে মহীশূরের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি ওদের দ্বারা পদদলিত হত। হত না?"

পুরেনাইয়া উত্তর দিল না, সাদিক বলে যেতে লাগল, "আমাদের বড়-বড় ঘাঁটির পতন হচ্ছিল ইংরেজদের কাছে। তাদের হটিয়ে দেবার মত সৈন্যবল আমাদের ছিল না। প্রত্যহ আমাদের সেনারা দল ছেড়ে যাচ্ছিল, তাদের বাধা দেওয়া যাচ্ছিল না। তবে বলো, সুলতান যদি তার নিজের রক্ত সমর্পণ করত, কী লাভ হত আমাদের?"

পুরেনাইয়া উত্তর দিল না দেখে মীর সাদিক পুনরায় ঐ প্রশ্নই করল। "বলো পুরেনাইয়া," মীর সাদিক উত্যক্ত স্বরে বলল, "তোমরা যারা সুলতানের সামান্য কথাতেও স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা দেখতে পাও, বলো, কি ভাবে তার মৃত্যু তার কার্যসিদ্ধির সহায়ক হত?"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পুরেনাইয়া। নির্লিপ্তভাবে সে বলল, "একটা অদৃশ্য শক্তি আছে মীর সাদিক। এটাকে বলে সেনাবাহিনীর মনোবল। কোনো প্রশ্ন না-করে ওরই বলে সেনাবাহিনী ছুটে চলে। এরই প্রভাবে মানুষমাত্রই অনুভব করে যে, তাদের নিজেদের থেকে আরও কিছু বড় আছে, মহৎ আছে। নেতা যদি জীবন-পণ করে তবে যতই শ্রান্তক্লান্ত হোক বা হতাশ হোক, তার পরিচালিত মানুষের মনে সাহস আসে, সান্ত্বনা আসে। এমন সময় আসে যখন এর দরকার হয়। সুলতানের ও তার বাহিনীর মধ্যে এক রহস্যজনক অবর্ণনীয় বন্ধন আছে। টিপু সুলতানের মনের মধ্যে যে গভীর বোধ আছে, সেই বোধ আছে প্রতিটি ভারতবাসীর মনে। তারা প্রকাশ করে বলতে

না-পারলেও তারা জানে কিসের জন্যে যুদ্ধ করছে ইংরেজ। সেই জন্যেই, মীর সাদিক, কতজন মারা গেল বা কতগুলো ঘাঁটি বেদখল হল সে বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য হচ্ছে মানসিক শক্তি ও সহনশীলতা, যা নিয়ে নেতা ও তার সৈন্যেরা সংগ্রাম করে।"

মীর সাদিক বেশ তপ্ত হয়ে বলল, "এটা প্রাসঙ্গিক বলে তুমি মনে কর? আমাদের সমস্ত সামরিক বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে সুলতানকে আর যুদ্ধ না-করার পরামর্শ দেয়। সবাই বুঝেছিল আমাদের কোনো আশা নেই যুদ্ধ চালিয়ে গেলে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না।"

"তোমার কথা হয়তো ঠিক।' পুরনাইয়া বলল, "হয়তো ওটা প্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুত আমি মনে করি না এরই জন্যে সুলতানের মনের অবস্থা এরকম।"

"তবে কিসের জন্যে ?"

"সে মনে করে এই সংগ্রামে তার নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত ছিল।"

"কেন? তাতে কী লাভ হত?"

"আমার সন্দেহ, মীর সাদিক, তুমি তা বুঝবে কি না জানি না। আমি নিজেও সবটা ধরতে পারছি নে।"

মীর সাদিক একটু হেসে বলল, "আমার বুদ্ধিটা একটু যাচাই কর।"

পুরনাইয়া হাসল না। সে বলল, "এটা আমার বিশ্বাস, সুলতান অবশ্য কিছু বলে নি, এটা আমারই বিশ্বাস যে, সুলতান মনে করে তার দেশের স্বাধীনতার জন্যে তার জীবন দেওয়া উচিত ছিল। তার মৃত্যু ভারতবর্ষের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত বর্তমান কালেরই কেবল নয়, অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও।"

"একটা অদ্ভুত চিন্তা তাই না?"

"হয়তো নয়। যে দেশ ছিল আর্থিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবে গরীয়ান, তার এই অপদস্থ অবস্থা এখন। বর্তমানে কী ঘটছে? আমাদের দেশের ভ্রাতারা ভয়ে-ভয়ে ইংরেজের হাতে চুম্বন করছে যে ইংরেজ তাদের রেখেছে ক্রীতদাস করে। ছোট বড় সব ভারতীয় শাসক--টিপু সুলতান বাদে—কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংগে যোগ দিয়েছে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে। এখনও দুই ভারতীয় শক্তি—নিজাম ও মারাঠা—ইংরেজদের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। যখনই ভারতীয়দের পিশে ফেলার জন্য ইংরেজরা যুদ্ধযাত্রা করে, তখনই তাদের সংগী হয় ভারতীয়রাই। ইংরেজদের অগ্রগমন দেখে

ভারতীয় শাসকেরা কী করে ? তারা মার্জনা ভিক্ষা করে, বশ্যতা স্বীকার করে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে একজন ভারতীয় শাসকও জীবন দিয়েছে, বলো ? না। সেইসব শাসকের মনে কখনো জাতীয় উচ্চাশার কথা, মানসম্ভ্রমের কথা, তাদের ভূমির অখণ্ডতার কথা একবারও উদয় হয় নি। এসবের জন্যে যুদ্ধ করবে, দরকার হলে মৃত্যুবরণ করবে—এমন কথাও তার ভাবে নি। তাদের জীবন বাঁচলেই তারা খুশি। তাদের পরিবারের মহিলাদের মর্যাদাহানি না-হলে, তাদের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের ক্ষতি না-হলেই তারা তুষ্ট। নিজের দেশের জন্যে জীবনদান করা শাসকদের রেওয়াজ নয়। ও কাজটা করবে সাধারণ লোক, ভাড়াটে সেপাই। ভারতবর্ষ কি বরাবর এমন ছিল ? তাহলে এমন দশা কেন হল ? তাদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা কি দরকার নয় ? আমার মনে হয় সুলতানের মনে এই চিন্তাই ঢুকেছে। সে যদি যুদ্ধ করে জীবন দিত তাহলে সেই আত্মত্যাগ একটা শুদ্ধির কাজ করত। এক নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর পক্ষে বড় বাধা এর দ্বারা সৃষ্ট হতে পারত। জনগণ কি তবে বলত না, এই দেখ এক রাজা যে নাকি তার বিশ্বাসে অটল থেকে জীবন দিয়েছে, অন্যেরা অনুসরণ করবে এমন-একটা দৃষ্টান্ত কি হত না তার দ্বারা ? অন্য শাসকদের কি তা উদ্বুদ্ধ করে তুলত না ? তাদের পূর্বপুরুষদের গৌরব তাদের মনে কি চেতনা এনে দিত না ? এত দিন ধরে হীন অবস্থা চলেছে তার জন্যে কি তারা লজ্জিত হত না ? এই দেশের যাবতীয় ক্রীতদাস কি জেগে উঠত না পশুর মতন আচরণকারী এই আক্রমকদের বিরুদ্ধে যারা এখানে এসেছে এদেশের সব ঐতিহ্য নষ্ট করে দিতে ও দেশের মানুষকে ক্রীতদাস করতে ? সাহসিকতার দৃষ্টান্ত না-পেলে দেশের লোক কিভাবে জেগে উঠবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ? এরকম হলে তবেই সমগ্র জাতি জেগে উঠবে, ক্ষুধাকে ডরাবে না, তরবারি অগ্নি বা মৃত্যু—কিছুরই পরোয়া না-করে পঙ্গপালের মতন এই উপদ্রব তাড়িয়ে দিতে পারবে। এই জাতি একদা যে রকম গৌরবান্বিত স্বাধীন সত্যদর্শী সৎ ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বাসনির্ভর ছিল তাকে আবার সেই মহিমায় পুনপ্রতিষ্ঠ করার জন্যে টিপু সুলতান তার জীবনদানকে একটা কাজ বলেই মনে করেছে।"

মীর সাদিক বলল, "তা হলে বলছ সুলতানের জীবনদান করাই উচিত ছিল। অন্য শাসকরা তাহলে ছুটে আসত সেই মশাল তুলে নেবার জন্যে তৎক্ষণাৎ। এই কথাই কি তুমি বলতে চাও ?"

"আমি কী বলতে চাই সেটা বড় কথা নয়। আমার মনে হয়, সুলতানের

মনে এই চিন্তাই আছে। তুমি যখন বললে 'তৎক্ষণাৎ', তখন মনে রেখো একটা জাতির হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসে তৎক্ষণাৎটা কখন? যেমন বললাম, আমার বিশ্বাস, সুলতানের মনে এই রকম আত্মত্যাগ কেবল মাত্র বর্তমান কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার মন, আমার মনে হয়, ভবিষ্যৎ কালের দিকেও প্রসারিত, তার জীবদ্দশা পেরিয়ে নতুন যুগের দিকে।"

"তবে বলো, পুরনাইয়া, সুলতান কি এই ভাবে তার চিন্তার কথা তোমার কাছে প্রকাশ করেছে?"

"না। অকপটে বলি—না, সে তা করে নি। তোমাকেও যেমন বলেছে আমাকেও তেমনি বলেছে তার উদ্বেগের কথা। সেই উদ্বেগের কথা এ ভাবে আমিই প্রকাশ করলাম।"

পুরনাইয়া যা বলল তা তার নিজেরই কথা, সুলতানের নয়, তবে তার কথার একটু সমালোচনা করা যেতে পারে মনে করে মীর সাদিক বলল, "তুমি জান পুরনাইয়া, আমার মতন তোমার ভক্ত আর-কেউ নেই, কিন্তু তোমার এত অভিজ্ঞতা থাকা ও বয়স হওয়া সত্ত্বেও কোনো-কোনো ব্যাপারে তোমার মন শিশুর মত। আশা করি সুলতানের সঙ্গে এভাবে কথা বল না। তোমাকে বলে রাখি, সুলতানের জীবনদানে কিছুই লাভ হত না। একটি জাতি এক গভীর অতলতার পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ভারতবর্ষের পরিণাম শোচনীয়। তাদের লোভ, তাদের অনৈক্য, তাদের তুচ্ছতুচ্ছ উচ্চাশা নিয়ে শাসকেরা এমনভাবে চলেছে যে, এই শোচনীয় অবস্থা থেকে ফেরা অসম্ভব। এই দুঃসময়ে তারা যদি একতাবদ্ধ হতে না-পারে, এখনও পরস্পরের গলা কাটায় লিপ্ত থাকে, তবে কি মনে কর, কোনো সময়ে তারা একতাবদ্ধ হতে পারবে? দুষ্টতা বাড়তেই থাকে, কমে না। বন্যার মতন বেড়ে ওঠে। ইংরেজরা যদি এদেশের ঘাঁটি ছেড়ে যায়, শান্তিতেই ফিরে যায় তাহলে কি ভারতবর্ষ আমাদের স্বপ্নের সেই ভূমিতে পরিণত হবে? না। শাসকরা নতুন করে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাবে, তাদের সাহায্যের জন্যে নতুন বিদেশীকে ডাকবে। মনে রেখো কুষ্ঠরোগী কখনো তার শরীরের দাগ মুছে ফেলতে পারে না, মৃত লোক কখনো বেঁচে ওঠে না।"

"ন্যায়ের জয় কি তুমি মান না?"

"আমি মানি। যদি তার পিছনে থাকে বড়-বড় ও ভালো-ভালো বন্দুক। মন্দের বিরুদ্ধে ভালো'র যদি জয় হয় তবে বুঝবে ভালোর পিছনে অধিক শক্তিশালী বিক্রম আছে।"

পুরনাইয়া বলল, "ইতিহাসের রায় কী ?"

"বিজয়ী যা চায় ইতিহাস সেইভাবে লেখা হয়। এটা বিজয়ীর অভিপ্রায় অনুসারে লিখিত উপাখ্যান মাত্র। মূর্তি স্থাপন করা হয় বিজয়ীর, বিজিতের নয়। কার খরচে জান ? বিজিত জাতির খরচে। ইতিহাস কি জানে কি-কি কুকার্য করে রাজা হাতে নেয় ক্ষমতা, ক্ষমতা রক্ষা করে কি-কি দুষ্কর্ম করে ? না। ঐতিহাসিকেরা হচ্ছে পয়সার দাস, যে কোনো ব্যবসায়ীর মত, যে নাকি সবচেয়ে উঁচু দর পেলেই পণ্য বেচে।"

"তবে তুমি মনে করছ ত্যাগের কোনো দাম নেই ?"

"কি ধরনের ত্যাগের কথা বলছ তার উপর নির্ভর করে। কেউ যদি নিজেকে পুড়িয়ে মারতে চায়, সে তা পারে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই আত্মত্যাগের কোনো দাম নেই। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক কথা হয়ে গেছে, পুরনাইয়া। ধর্ম-আলোচনায় সত্য ন্যায় ইত্যাদি বড়-বড় কথা মানায়, কিন্তু জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ওসব কথার কোনো অর্থ হবে না। কপটতা, খলতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি ছাড়া ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব। ক্ষমতার উৎসই ওখানে। তোমাকে কেউ সম্মান করবে তোমার পিছনে সৈন্যশক্তি কতটা তা জেনে, তোমার ন্যায়নিষ্ঠতার জন্যে নয়। যারা যুদ্ধে জয়ী হয় তারাই ন্যায়নিষ্ঠ, বিপরীত পক্ষ বিপরীত।"

"তুমি কতটা ভ্রান্ত, মীর সাদিক।" পুরনাইয়া শান্ত গলায় বলল "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না। সত্য, এই মুহূর্তে আমরা শক্তির দাপটে ছোট হয়ে গিয়েছি। আমরা অবনমিত, আমরা পরাজিত। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন হৃত ঐতিহ্য এদেশ ফিরে পাবে। আমার বা তোমার জীবদ্দশায় তা না-হতে পারে কিন্তু তা হবেই। পৃথিবী তখন মনে করবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক লজ্জাজনক কালে টিপু সুলতান নামে এক রাজা ছিল, যে একাই ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এইটেই এক চিরকালীন স্মৃতি যার চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাবে টিপু সুলতান সুদূর ভবিষ্যৎকালের জন্য।"

## ৬১. তার মনিবদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

মেজর জেনারেল মেডোস কর্নওয়ালিশের পর ভারতে গবর্নর-জেনারেল হবে, এই রকম কথা ছিল। কিন্তু টিপু সুলতানের বাহিনীর কাছে তার প্রবল ঘা খাওয়ার দরুন ঐ পদে তার বহালের কথা আর বিবেচিত হল না। শ্রীরঙ্গপত্তমে পরাজয়ের পর তার আত্মহত্যার চেষ্টা তার বদনাম আরও বাড়ায়। ইংরেজরা তাকে বেশ মুখরোচক অভিনন্দন জানায় এই ব'লে "তার সম্মানবোধ খুবই পরিচ্ছন্ন, সাধারণ ভুলভ্রান্তি তেমন করে না।" তার পরিবর্তে গবর্নর-জেনারেল রূপে বসানো হল সার্ জন শোর'কে।

সার্ জন শোর ওয়ারেন হেস্টিংসের উপযুক্ত শিষ্য ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ইত্যাদি করার দিক থেকে। এডমণ্ড বার্কের কথায় "বাস্তবিক ভাবে সে'ই ছিল প্রধান নায়ক, হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে তার মধ্যে তার ভূমিকাও কম নয়।" তবুও সে টিপু সুলতানকে একা ছেড়ে দেয়। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ এক সময় ইংরেজদের খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কেটেছে। নূতন ভাবে আক্রমণের ও জয়ের জন্যে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার পরিকল্পনার জন্যে তাদেব দরকার হয়েছিল শান্তি স্থাপনের। সার্ জন এজন্যে তার প্রিয় কাজ—অর্থাৎ ষড়যন্ত্র—করায় মনোযোগ দিল। মহদাজি সিন্ধিয়ার মৃত্যুর মধ্যে তার হাত ছিল, বাজি রাওএর হাত দিয়ে নানা ফড়নাবিশের পতন ঘটানো, রোহিলখন্দ অধিকার, এসব তারই কাজ। এমনকি তার এলাকায় ইংরেজ সৈন রাখায় নিজামের সম্মতি লাভ, সে তখন ইংরেজদের মিত্র, অবশেষে নিজাম হয়ে গেল ইংরেজের অনুগত ভৃত্য। কিন্তু সার্ জন টিপু সুলতানের কাছ থেকে সরে থাকল—এখানে চক্রান্ত চলবে না, সে জানত, এখানে দরকার হবে যুদ্ধ।

তার পর এল রিচার্ড ওয়েলেসলি, মরনিংটনের আর্ল। সে একজন কঠোর সাম্রাজ্যবাদী, আক্রমণের নীতিতে বিশ্বাসী, বেশ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ও প্রধানমন্ত্রী পিট'এর কাছ থেকে বিস্তৃত পরিকল্পনা জেনে নিয়ে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সাম্রাজ্য পত্তনের প্ল্যান নিয়ে সে এল। ওয়েলেসলি তার মিশন এই ভাবে বর্ণনা

করেছে ঃ

লেডি অ্যানি বার্নার্ডকে সে লেখে, "আমি রাজ্যের পর রাজ্য স্তূপীকৃত করে তুলব, জয়ের পর জয়, রাজস্বের পর রাজস্ব ; আমি গৌরব ধন ও ক্ষমতা জমা করে তুলব, যতক্ষণ এই উচ্চাশার বহর দেখে ও ধনলিপ্সা দেখে আমার মনিবরাও কৃপা প্রদর্শনের জন্যে চ্যাচামেচি আরম্ভ না-করেন।"

কিন্তু ওয়েলেসলি বুঝতে পারল দুর্গ, শহর ও নগর জয় করাই যথেষ্ট নয়। একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে জনগণের চতুর্দিকে আরও শক্ত শৃঙ্খল রচনা করতে হবে। সে অবিলম্বে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করল। সমস্ত ইংরেজ-অধিকৃত এলাকায় রবিবার ছুটির দিন বলে পালন করা আরম্ভ হল। সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হল বাইবেল। যে সব স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ পঠনের আবশ্যিক ব্যবস্থা পাঠ্যসূচীতে নেই, বন্ধ করে দেওয়া হল সেসব স্কুল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে আসতে আরম্ভ করল। হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মকে কলুষিত করা ও বিদ্রূপ করা আরম্ভ হল রীতিমত ভাবে।

## ৬২. রাজতন্ত্র ও জনগণ

ওয়েলেসলি জানত যে টিপু সুলতানকে তার শেষ করে ফেলতে হবে কর্নওয়ালিশ ভুল বুঝেছিল, সে ভেবেছিল তার উপর যে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ চাপানো হয়েছে তার থেকে টিপু আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কর্নওয়ালিশ এমনও ভেবেছিল যে, ক্ষতিপূরণের সব টাকা টিপু দিতেও পারবে না, কেননা যে এলাকা এখন তার কাছে আছে তা যুদ্ধক্ষত, সেখান থেকে রাজস্ব কিছুই পাবে না। সেই অজুহাতে সমগ্র ভূভাগটাই অধিকার করে নেওয়া যাবে। কিন্তু তা হবার নয়। ক্ষতিপূরণের টাকা তোলার জন্যে টিপু সুলতানের তরফ থেকে মোটা কর ধার্যের প্রস্তাবের খসড়া যখন মীর সাদিক করে চলেছে, তখন পুরো টাকাটাই এসে গেছে টিপু সুলতানের হাতে। সারা রাজ্যের যাবতীয় প্রান্ত থেকে স্বেচ্ছায় দান পাঠিয়েছে সকলে। কিষাণ, তাঁতী, সৈন্য, কারিগর, বণিক, এমনকি দরিদ্র থেকেও দরিদ্রতর লোক এই দান নিয়ে এসে হাজির। যুদ্ধ তাদের উদ্বাস্তু করেছে, তাদের বাড়িঘর পুড়ে গেছে, তাদের জমিতে আগুন লাগানো হয়েছে, তাদের গবাদি পশু কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছে, কিন্তু সকলেই এখানে-ওখানে লুকানো দু-এক টাকা পেয়ে গেছে। মেয়েরা তাদের অলংকার খুলে দিয়েছে, পুরুষরা তাদের আংটি। তারা জানত যে, সুলতানের দুই পুত্র ইংরেজের হেফাজতে, সব টাকা দেওয়া না-হলে তারা তাদের ছাড়বে না। প্রত্যেক পরিবারই মনে করেছে যেন তাদের সন্তানরাই এভাবে পরহস্তগত। প্রত্যেক গ্রামই, কেউ কারো সঙ্গে পরামর্শ না-করেই, সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে অবিরত ধারার মত সেইসব দান এসে জমা হয় টিপুর ধনশালায়। এই জন্যে ঠিক দিনে ঠিক সময়ে টিপু ক্ষতিপূরণ বাবদ সব টাকা দিয়ে দিতে পারে।

টিপুর হাতে যখন সর্বপ্রথম এল দান, তখন তার চোখে জল এসে গেল। এইসব গরিব লোক, যারা এত কষ্ট ভোগ করেছে, তারা তাদের শেষ কপর্দকও দিচ্ছে এইভাবে। এইভাবে দান যখন এসে যেতে লাগল তখন তার মনে

যে আবেগ হল তার বর্ণনা সে করতে পারবে না। এটা কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা নয়। এই কথা ভেবে তার আনন্দ যে তার দেশের মানুষ তার ভালোবাসার জবাব দিচ্ছে এই ভাবে। দেশের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা কখনো কথায় প্রকাশ হয়নি, হয়েছে কাজে। এখন, তারাও কোনো কথা বলছে না, তাদের কাজ দিয়ে তাদের ভালোবাসার প্রমাণ দাখিল করছে। রাজতন্ত্র ও জনগণ, অর্থাৎ রাজায় ও প্রজায় টিপু কখনো কোনো ভেদ দেখেনি। তার প্রতিটি কাজ তার দেশের মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখেই করা।

দেশের লোকের দুঃখদুর্দশার দৃশ্য সে দেখছে—অন্নাভাব, আশ্রয়ের অভাব। জীর্ণশীর্ণ শিশুর দল. সে মনে বেদনাবোধ করত, কিন্তু বেদনাবোধই যথেষ্ট নয়—সে জানত। তার কাজ তাকে করতে হবে। চাকায় দিতে হবে কাঁধ, আশা ও আনন্দ আনতে হবে সকলের মনে, তার দেশকে করে তুলতে হবে মান্য ও মর্যাদাসম্পন্ন।

টিপু সুলতান নিজেকে জাগ্রত করে তুলল। তার দুর্ভাগ্যের জন্য ম্রিয়মাণ হয়ে না-থেকে যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার জন্যে সে উঠে-পড়ে লাগল। তার প্রথম কাজই হল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে দক্ষতা আনা, কৃষিজমি উদ্ধার. শিল্পকলা ও চারুকলার উন্নতিবিধান, যেসব কলকারখানা যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে তার পুনরুদ্ধার। খুব দ্রুত এইসব কাজ করার ফলে তার গবর্নমেণ্ট অল্পদিনের মধ্যেই মজবুত ও সুচারু হয়ে উঠল। কিষাণদের জন্য রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা হল, মজুরদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা হল। দরবার থেকে সে বিলাসিতা ও অপচয় দূর করল। সাধারণ বিছানায় সে শুতে লাগল, পরতে লাগল সাধারণ পোশাক। যারা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কাছ থেকে ধীরে-ধীরে কর আদায়ের নির্দেশ দিল তার মন্ত্রীদের ও আমিলদারদের। যারা তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতি পূরণ করার জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হল। কোনো কর রদ করা যায় কি না তা দেখার কথা বলল, যদি সম্ভব হয় কর লাঘব করার ব্যবস্থাও করতে হবে। কর-আদায়ের পদ্ধতি ও করের অঙ্কও পরিবর্তন করতে হবে। তার অফিসারদের উপর তার কড়া নির্দেশ হল এই যে, তারা যদি কোনো অন্যায় কাজ করে, যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে অবহেলা দেখায় তাহলে কঠিন শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। কেউ যদি বলতে চায় যে, অমুক অন্যায্য কাজটা করা হয়েছে সুলতানের জন্যে, রাজ্যের কল্যাণের জন্যে, তাহলে সেই কাজের ক্ষতি পূরণ করে দেওয়া হবে।

সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, সুলতানের রাজ্য অল্প দিনের মধ্যে আবার পূর্ব গৌরব ফিরে পেল।

ইংরেজের কাছে এ ব্যাপারটা বিশেষ ভালো ঠেকল না। মহীশূরের উন্নতির প্রতি তারা লক্ষ রাখল ঈর্ষা ও আতঙ্কের সঙ্গে।

সুলতানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও তেমন ভালো লাগেনি এ ব্যাপার। তার প্রশাসকেরা, তার গবর্নরেরা, তার সামরিক অধিনায়করা সকলেই সাবধানে চলতে লাগল, জনগণের উপর জুলুম করার প্রলোভন থেকে নিজেদের তারা তফাতে রাখল।

## ৬৩. আমার শক্তিই কি আমার দুর্বলতা ?

ওয়েলেসলি জানত যে টিপু সুলতানকে তার খতম করতে হবে। কিন্তু এ কাজের জন্যে উদ্যোগ করতে সে দ্বিধা করছিল। মনে-মনে তার খুব রাগ ছিল, এই একটি মাত্র ভারতীয় শাসক অন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে কিছুতেই যোগ দিচ্ছে না। কেন ? আমি তাকে বিত্তশালী করে দিতে পারি, করে দিতে পারি ক্ষমতাশালী, টিপুর মতন একজন মিত্র আমার দরকার—যে নাকি বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। মনে-মনেই বলতে লাগল ওয়েলেসলি।

বৈভব শক্তি ও ধনসম্পদ সবই ক্ষণস্থায়ী। নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলেছে টিপু, কিন্তু সম্মানের উপর কলঙ্কের দাগ চিরস্থায়ী—কোনো শক্তিই তা মুছে ফেলতে পারে না। নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানহানিকর নয় কি ? একজন বিদেশীর কৃপার উপর তাকে ছেড়ে দেওয়াটা লজ্জাকর।

রাগ প্রকাশ করল না ওয়েলেসলি। সে প্রস্তুত হতে হতে সময় কাটিয়ে চলল। সে তার অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা এমন কিছু যেন না করে যাতে সুলতানের মনে সন্দেহ জাগে।

ওয়েলেসলি বলল, "আমরা ওর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে যাব।"

হ্যারিস বলল, "তুমি ওকে ভয় কর। তাই না ?"

"নিশ্চয়, আমি ওকে ভয় করি।" ওয়েলেসলি উত্তর দিল, "খুবই ভয় করি ওকে। যেসব ভারতীয় শাসকদের আমরা চিনি, তাদের মতন নয় ও। অন্যান্য শাসকদের সামনে সে দৃষ্টান্ত রাখছে তার জন্যেও ভয় করি ওকে। ভাগ্যক্রমে তারা সবাই তার দৃষ্টান্ত অনুসারে কাজ করতে অক্ষম। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের একটা বিভ্রান্তিকর প্রভাব পড়তে পারে সাম্রাজ্যের উপর। তার সম্বন্ধে আমরা একবার ভুল করেছি। কিন্তু পুনরায় ভুল করলে তার মোটা মাশুল দিতে হবে।"

"কি ভুল করা হয়েছিল ?"

"কর্ণওয়ালিশ বলেছিল সুলতান হয়ে গেছে ঠুঁটো জগন্নাথ, সে আর উঠতে পারবে না, তার এলাকা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো দেখছ কীরকম ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে সে জেগে উঠেছে।"

"সেইসঙ্গে দুর্বলতাও আছে।"

"কী দুর্বলতা?"

"তার পিছনে আছে তার দেশের মানুষ—এই তার শক্তি; হ্যাঁ, সে জনগণের লোক। তাদের সঙ্গে তার বুকের স্পন্দন একই রকমের। কিন্তু তার দুর্বলতাটাও দেখ। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ব্যক্তিরা, অভিজাতেরা, গবর্নরেরা, কম্যান্ডারেরা, সুবিধাভোগী লোকেরা—যাদের অর্থ আছে, পদাধিকার আছে—তারা কেউ ওকে ক্ষমা করবে না। যারা ছিল কর্তাব্যক্তি, যারা জনগণের উপর প্রভুত্ব করেছে তাদেরই এখন জনকল্যাণের কাজ করতে হচ্ছে, জনগণের অভাব-অভিযোগ মেটাতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় কিছুটা সুবিধা অবশ্যই হয়, কিন্তু সংকট দেখা দিলে, যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিলে? তখন জনগণকে নেতৃত্ব দেবে কে, তাদের পরিচালনা করবে কে? সকলেরই মোহ কেটে যাবে তাদের মনিবের প্রতি, অনেকেই তাকে ছেড়ে যাবে। সুবিধাভোগীরা তাদের সুবিধা ছাড়া সবই ত্যাগ করবে। টিপু সুলতান তার লোকজনের সামনে সুন্দর বক্তৃতা করতে পারে, তাদের আনুগত্য পেতে পারে, কিন্তু কে তাদের পরিচালনা করবে? সে একা? সুতরাং টিপু সুলতানের শক্তি যেটা দেখছ সেটা তার দুর্বলতাও। হ্যাঁ, তারা ওকে বলে বাঘ, বাঘের মত বিক্রমও তার আছে বটে, কিন্তু তার ভুলের জন্যে সে তার রাজ্য হারাতে পারে।"

এসব কথায় সায় দিয়ে ওয়েলেসলি মাথা নাড়ল, যেন সে সবই জানত। কিন্তু নতুন অনেক কিছু সে এখন জানল।

অল্পদিনের মধ্যেই ওয়েলেসলি পাঁচজন অফিসার দিয়ে এক কমিশন গঠন করল—তার ভাই কর্নেল ওয়েলেসলি, কর্নেল ক্লোজ, কর্নেল অ্যাগনিউ, ক্যাপ্টেন ম্যালকম ও ক্যাপটেন মেকলে হল এই কমিশনের সদস্য, এর উদ্দেশ্য হল টিপুর কম্যান্ডারদের ইংরেজের পক্ষে নিয়ে আসা। এই কমিশনের কাছ থেকে খুব বড়-একটা কাজের আশা করেনি ওয়েলেসলি। কিন্তু এর সাফল্য হল আশাতীত, এতে প্রীত হল ওয়েলেসলি। এই কমিশন যা করল তার ফলেই শেষপর্যন্ত টিপু সুলতানের পরাজয় ও পতন ঘটল।

ইতিমধ্যে ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে যে চিঠি লেখে তার সবগুলিই চিনিতে ও মধুতে মাখামাখি—তাকে দেওয়া হয় বন্ধুত্বের ও শুভেচ্ছার প্রতিশ্রুতি। ওয়েলেসলি ঠিক করে ফেলেছিল যে সে কেবল দেখিয়ে যাবে 'ভয়ংকর অসাধু আন্তরিকতা', যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হতে না-পারে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অবশ্য চলেছিল পুরোদমে।

## ৬৪. উপহাসের মূল্য

১৭৯২ সালের চুক্তির শর্ত টিপু সুলতান সর্বৈবভাবে মেনে চলল। তাকে আক্রমণ করার কোনো ওজর চুক্তিতে দেওয়া হয়ে ওঠেনি। সুতরাং একটা ওজর আবিষ্কার করে নিতে হবে। ওজর ছাড়া আক্রমণ ইংরেজের চরিত্রে নেই।

টিপু সুলতান আইল অব ফ্রান্সে ফরাসি গবর্নর-জেনারেলের কাছে মহম্মদ ইব্রাহিম ও হুসেন আলি খাঁকে দূত হিসাবে পাঠায় কয়েকজন কারিগরের জন্যে টিপু সুলতানের অনুরোধ জানাতে। গবর্নর-জেনারেল হচ্ছেন জেনারেল ম্যালাত্রিক। এটা নেহাতই একটা বাণিজ্যিক উদ্যোগ। ১৭৯৭ সালের অক্টোবরে তারা যাত্রা করে ম্যাঙ্গালোর থেকে, পোর্ট লুই'তে পৌঁছয় ১৭৯৮র জানুয়ারিতে। টিপু জানত, জেনারেল ম্যালাত্রিকও জানত কোনো সৈন্যসামন্তের প্রস্তাব এতে নেই। তার মাত্র ৬০০ জন সৈন্য ছিল, এই দ্বীপ রক্ষার জন্যে এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। কিন্তু কারিগর সম্বন্ধে টিপুর দূতদের সঙ্গে কথা বলে জেনারেল ম্যালাত্রিক সামরিক প্রসঙ্গ তুলল, তুলল প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ বিষয়ে মৈত্রীর কথা। ওরা দুজন বলল ও-বিষয়ে তারা কিছু জানে না, ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী ভালো জিনিস, কিন্তু এ বিষয়ে তারা টিপু সুলতানকে গিয়ে রিপোর্ট দেবে।

কিন্তু জেনারেল ম্যালাত্রিক যখন তার নিজের দ্বীপ রক্ষার জন্য ফরাসি সরকারের কাছে আরো লোকলস্কর ও যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বৃথাই আবেদন করে চলেছে, সে কেন মহীশূরের বাণিজ্যিক দূতের সঙ্গে এই মৈত্রীর কথা তুলল? এটা কি একটা সামান্য ও সৌজন্যমূলক কথোপকথন, অথবা সুলতানের দূতেদের জানানো সুলতানের প্রতি তার সহানুভূতি কতটা? অথবা সুলতানের সঙ্গে এরকম মৈত্রীতে আসার পক্ষে তার হাতও যথেষ্ট—এই দম্ভটা প্রকাশ করা? না। একটা ঘোষণার ভিত সে তৈরি করছিল, যার জন্যে তাকে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ দেওয়া হয়েছে।

টিপু সুলতান যে আইল অব ফ্রান্সে বাণিজ্য-প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে এ খবর পেয়েছিল ওয়েলেসলি। আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছয় ওয়েলেসলির এজেণ্ট

কর্নেল অ্যাগ্নিনউ। জেনারেল ম্যালাত্রিককে কর্নেল অ্যাগ্নিনউ টিপুর দূতের সংগে সামরিক ব্যাপারে আলোচনা করতে বলে, এবং পরে এ বিষয়ে একটা ঘোষণা জারি করতে বলে। জেনারেল এ'তে বিব্রত হয়। প্রথমে রাজি হয় না।

"আমি একজন ফরাসি, সম্মানিত ব্যক্তি।" বলল জেনারেল ম্যালাত্রিক।

ইংরেজ দূত বলল যে, তা সে জানে, একাজের জন্যে তাকে যা দেবার কথা ভাবা হয়েছে, অঙ্কটা তার চেয়ে অনেক বাড়ানো হবে।

জেনারেল ম্যালাত্রিক বাধা দিয়েই বলল, "লোকে আমাকে বিদ্রূপ করবে। যদি কোনো সামরিক ব্যাপারের আলোচনা হয় তাহলে ফরাসি সরকার ও টিপু সুলতান তা গোপনই রাখবে। কিন্তু তুমি আমাকে বলছ প্রকাশ্য ঘোষণা করতে? কোনো জাতি এমন কাজ করতে পারে ব'লে কখনো শুনিনি। লোকে যে হাসবে।"

ইংরেজরা তার যুক্তির তীক্ষ্নতা উপলব্ধি করল, কিন্তু লোকের হাসির দরুন সে যে অপদস্থ হবে তার মূল্য তারা দেবে। অবশেষে সে রাজি হল। এইভাবে ১৭৯৮ সালের ৩০ জানুয়ারী জেনারেল ম্যালাত্রিক এক ঘোষণা প্রচার করল, "মহীশূর থেকে দুজন দূত এসেছিল, ফরাসিদের সংগে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ সংক্রান্ত মৈত্রী করার জন্য। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার জন্য সামরিক সাহায্যও তারা চায়। যতদিন যুদ্ধ চলবে, ততদিন টিপু সুলতান ফরাসি সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তাদের মদ্য ছাড়া আর সব কিছুই দেবে।"

এই অর্থহীন ওজর তৈরিই ছিল। কিন্তু আক্রমণ আরম্ভ করার আগে ওয়েলেসলির আরো অনেক প্রস্তুতির দরকার ছিল।

## ৬৫. পরের নোটিস না-পাওয়া পর্যন্ত

ওয়েলেসলি টিপু সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করেই চলল। ৩০ জানুয়ারি ১৭৯৮র ম্যালাত্রিক-ঘোষণার কথা স্বয়ং ম্যালাত্রিকের আগেই সে জানত, কেননা ওয়েলেসলির নির্দেশ অনুসারেই তার খসড়া তৈরি হয়। ঘোষণা জারি হবার পরেই সে তার কপি পায়। অনেক সংবাদপত্রে এই ঘোষণার খবর বেরিয়ে যায়, কিন্তু কলকাতার একটি কাগজে সংবাদটি বেরোয় একটু দেরিতে—১৭৯৮ সালের ৮ জুন তারিখে। তখনও ওয়েলেসলি টিপুর সঙ্গে দোস্তী করেই চলেছে, যাতে তাকে মিথ্যা একটা নিরাপত্তা-বোধের মধ্যে রাখা যায়। ১৪ জুন ১৭৯৮ তারিখে টিপু সুলতানকে ওয়েলেসলি একটি চমৎকার চিঠি লেখে। চিঠিটা ওয়াইনাদ জেলা নিয়ে ইংরেজ ও টিপুর মধ্যে সামান্য বিরোধ নিয়ে—ইংরেজ এটা আগেই দাবি করেছিল, জায়গাটা ছিল টিপুর অধিকারে।

"আমার হাতে যত ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করেই আমি আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাবুঝি রাখার জন্য ব্যগ্র—যা নাকি [ ইস্ট ইণ্ডিয়া ] কোম্পানির ও তোমার হাইনেসের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে আছে…" ওয়েলেসলি আরো লেখে এই বিরোধের যেন মীমাংসা হয় "বেশ যুক্তিপূর্ণ ও ঠাণ্ডা আলোচনার মধ্য দিয়ে—সেইটেই হবে বিজ্ঞজনোচিত ও বন্ধুত্বপূর্ণ কাজ ; মতলববাজ লোকের চক্রান্ত এ'তে বানচাল হবে, যারা আমাদের মধ্যে ঈর্ষা জাগাতে চায়, শান্তি নষ্ট করতে চায়।"

পুনরায় ১৭৯৮ সালের ৮ আগস্ট তারিখে ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে জানায় যে, ওয়াইনাদের উপর টিপুর দাবি সে মেনে নিচ্ছে, কেননা ১৭৯২ সালের শ্রীরঙ্গপত্তম চুক্তিতে এমন কথা নেই যে, ওটা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পরেও টিপু সুলতানকে আরও অনেক চিঠি লিখেছে ওয়েলেসলি—প্রত্যেকটিতেই বন্ধুত্বের ও পারস্পরিক বোঝাবুঝির কথা। কোনো চিঠিতেই ওয়েলেসলি ম্যালাত্রিক-ঘোষণার কথা উল্লেখ করেনি।

তার সহকারীদের ওয়েলেসলি বলে, "যখন কাজে লাগাবার তখন ওটা কাজে লাগাব। টিপু সুলতান আমাদের প্রিয়তম বন্ধু হয়েই থাকবে, অর্থাৎ পরের নোটিস না-পাওয়া পর্যন্ত।"

## ৬৬ নেপোলিয়নের চিঠি

ওয়েলেসলি এবার যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত। তার প্ল্যানিং হয়েছে নিখুঁত, তার প্রস্তুতি অসামান্য। যে-কোনো জরুরি অবস্থার জন্য যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও সে নেয়। দুই বছর সে অপেক্ষা করেছে, তার এই ধৈর্যের ও প্রজ্ঞার জন্যে নিজেকে সে অভিনন্দন জানায়—তার তিনটি বাহিনী সে পরিদর্শন করে, তিন অধিনায়কের অধীনে এই তিন বাহিনী—জেনারেল হ্যারিস, কর্নেল ওয়েলেসলি, জেনারেল স্টুয়ার্ট। সুলতানের অফিসারদের (যাদের ক্রয় করা হয়েছে) দীর্ঘতালিকাও সে দেখে যা নিয়ে এসেছে ইংরেজরা, সে বুঝতে পারে এত বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ঐ রাজ্য বাঁচতে পারে না।

এসব বুঝতে পেরে টিপু সুলতানের কাছে লেখা তার চিঠির মেজাজ বদলে গেল। ১৭৯৮ সালের নভেম্বর মাসে সে লিখল টিপুকে, তাতে ফরাসিদের সঙ্গে সুলতানের বন্ধুত্ব নিয়ে অনুযোগ জানানো হল, যে ফরাসিরা ঐ রাজ্যে 'অরাজকতা ও অস্থিরতা'র নীতি আমদানি করার চেষ্টা করছে'। চিঠিটা সে শেষ করল একটু তোষামোদ করে ও বন্ধুত্ব দেখিয়ে এবং জানাল যে, সে মেজর ডাভটনকে সুলতানের কাছে পাঠাচ্ছে ভবিষ্যতে আরও গভীর বন্ধুত্বের প্রস্তাব-সহ।

মেজর ডাভটনের ভূমিকা কী হবে? কিছুদিন আগে নিজামের সঙ্গে যে ধরনের মৈত্রীচুক্তি হয়েছে ইংরেজের সঙ্গে সুলতানের সেইরকম চুক্তি হোক—এই হবে তার প্রস্তাব। নিজাম ভেবেছিল সকলকেই সে ধাপ্পা দিতে পারবে ও বোকা বানাতে পারবে, কিন্তু নিজাম নিজেই বোকা ব'নে গেল। মৈত্রীটা এই ভাবে হয়েছিল—ওয়েলেসলির পূর্বতন সার জন শো'র নিজামের এলাকায় ইংরেজ সেনাবাহিনী রাখা বিষয়ে নিজামের সম্মতি পেয়েছিল। এই বাহিনী ও তার নিজের মস্ত বাহিনী নিয়ে নিজাম নিজেকে নিরাপদ মনে করে। কারো বিরুদ্ধে সে অভিযান আরম্ভ করলে তার সীমান্ত কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। কিন্তু ওয়েলেসলির মতলব ছিল ভিন্ন। নিজামের সেনাবাহিনী ভেঙে দিলেই হয়; তার জায়গায় ইংরেজের অধীনে নূতন এক সহায়ক বাহিনী গঠন করে নিলেই

হয়। নিজামের দরবারের ইংরেজ রেসিডেণ্ট ক্যাপটেন কার্কপ্যাট্রিক নিজামের প্রধানমন্ত্রী ওয়াজির আজিমুল ওমরা'কে উৎকোচ দিয়ে হাত করে। খুব ধীরে-ধীরে ওয়াজির ভেঙে দিতে আরম্ভ করল নিজামের বাহিনী। ঠিক সময়ে নিজামের অবশিষ্ট সেনাদল বিদ্রোহ করল। সেই মুহূর্তে মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ-বাহিনী অকুস্থলে এসে পেঁছিয় ও হায়দরাবাদ ঘিরে ফেলে। নিজাম ফাঁদে পড়ল। কার্কপ্যাটি্রক'কে সে ডেকে পাঠাল তার সঙ্গে দেখা করতে, ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ এসে গেল কার্কপ্যাটি্রক। ভয়ার্ত নিজাম তাকে সসৈন্যে সরে যেতে বলল। উত্তরে কার্কপ্যাটি্রক বলল, "তোমার খুশি অনুসারে আমি এসেছি। চলে যাব আমার খুশি অনুসারে।" নিজাম বাধ্য হল মৈত্রীচুক্তির অতিরিক্ত অংশে সই করতে, যার দ্বারা সে তার নিজের বাহিনী রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, এবং তার খরচায় ইংরেজ বাহিনী পুষতে বাধ্য হল। ইংরেজের সম্মতি ভিন্ন কোনো ইউরোপীয়কে নিয়োগ করার অধিকার তার আর থাকল না। ইংরেজরা তাকে ইংরেজের মনোনীত ব্যক্তিকেই মন্ত্রী রূপে নিতে বাধ্য করল। ওয়াজির আজিমুল ওমরা'র মৃত্যুর পর ইংরেজের চাপে নিজাম বাধ্য হল মীর আলম'কে নিয়োগ করতে।

না। নিজামের মতন একজন তাঁবেদার হতে চাইল না টিপু সুলতান। ওয়েলেসলির চিঠির উত্তরে সে জানাল, মেজর ডাভটন আসতে পারে, তাতে তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যে চুক্তি আছে তাইই যথেষ্ট—শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষার জন্যে এর বেশি আর কিছুর দরকার নেই, আর কী কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারছে না। টিপু আরও জানায় 'শান্তি-চুক্তির শর্ত পালিত হবে', ইংরেজদের সঙ্গে 'বন্ধুত্বের ও একত্বের ভিত আরও শক্ত করে তোলা হবে।'

টিপুর উত্তর আসার জন্যে অপেক্ষা না-করে ওয়েলেসলি মহীশূর-আক্রমণের ব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্যে কলকাতা থেকে যাত্রা করল মাদ্রাজে। ব্যবস্থাদি দেখে সে খুশি হল। পাকা ব্যবস্থা। সে আরও জানত টিপু সুলতানের দরবারের যে লোকদের সোনা দিয়ে কেনা হয়েছে, তাদের ওজন হচ্ছে সাতটি সেনা ডিভিশনের তুল্য। সুলতানের চিঠি সে পেল, তার আন্তরিকতা উপেক্ষা করে ১৭৯৯ সালের ৯ জানুয়ারী সে উত্তর দিল, এবং এই চিঠিতে প্রথম উল্লেখ করল বারো মাস আগের সেই ম্যালাট্রিক-ঘোষণার কথা, অভিযোগ জানাল আইল অব ফ্রান্সে দূত পাঠিয়ে ফরাসিদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মৈত্রীচুক্তি

করা হয়েছে, ঐ দ্বীপে সৈন্য সংগ্রহ করে তার বাহিনী পুষ্ট করার কথা হয়েছে। এই চিঠি পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কৈফিয়ত না-পাওয়া যায় তাহলে 'ঘোরতর পরিণামের সম্ভাবনা' রইল।

হাতের ভেলভেটের দস্তানা এখন খুলে ফেলা হয়েছে। এখন মুষ্টি অনাবৃত। ওয়েলেসলির চিঠির মেজাজ, তার ভাষা ও তার দাবি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব চাই, এ'তে আর কোনো সন্দেহ-সংশয় রইল না। অকস্মাৎ এইরকম চরমপত্র পেয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইংরেজরা একটা হীন ও জঘন্য আক্রমণ করতে চায়।

পুরনাইয়াকে টিপু জিজ্ঞাসা করল, "এর কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে?"

"ওদের উপর বিশ্বাস রাখার মুখ তা, স্বাধীন মহীশূরের প্রতি দীর্ঘকালীন শত্রুতা, এবং একটা চুক্তি ভঙ্গ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

অবিলম্বেই টিপু সুলতান আর-একটা চিঠি পেল ওয়েলেসলির, সেই চিঠির সঙ্গে ওয়েলেসলি 'দি ইণ্ডিয়ান সভারেন টিপু সুলতান' সম্বোধন-করা তৃতীয়-খালিফ সেলিমের একটা চিঠি পাঠায়। চিঠির সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ফরাসিদের প্ররোচনায় টিপু যেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুতামূলক কাজ না-করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার যদি কোনো অভিযোগ থাকে তা যেন সন্তোষজনক ভাবে মিটমাট করে ফেলা হয়।

ওয়েলেসলির চিঠিটায় ফরাসি জাতিকেই গালাগাল দেওয়া ছিল যারা নাকি 'পৃথিবীর যাবতীয় রাজসিংহাসন, সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় মত তাদের সীমাহীন উচ্চাশার কাছে এক জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করে।'

এই চিঠি পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বের চিঠিতে একটু যে ভীতি দেখানো হয়েছিল তা তেমন কিছু না, টিপুর বিরুদ্ধে কোনোরকম আক্রমণাত্মক কাজের অভিপ্রায় ওয়েলেসলির নেই, কিন্তু টিপু যেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী না করে, সেইটেই তার অভিপ্রেত। টিপু এ চিঠির যে উত্তর দেয় তাতে ক্ষোভ তাপ তাই কিছুই ছিল না। সে সৌজন্যমূলক একটা চিঠি দেয়, মেজর ডাভটনকে তার কাছে পাঠাবার যে কথা ওয়েলেসলি লিখেছিল সে প্রসঙ্গে জানায়—

তুমি আনন্দের সঙ্গেই মেজর ডাভটনকে পাঠাতে পার (যার আসার কথা তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ কলম কয়েকবার লিখেছে), তার সঙ্গে যেন অল্প লোক থাকে (কিংবা কেউ না-থাকে)।

এর মধ্যে একটু কি ভেদ ছিল? সম্ভবত ছিল। সুলতান যখন ওয়েলেসলির দূতের সংগে যেন অল্প লোক থাকে কিংবা কেউ না-থাকে লিখল তখন সে স্পষ্টভাবেই বলতে চেয়েছে নিজামের আহ্বানে কার্কপ্যাট্রিক যেমন সেনাবাহিনী সংগে নিয়ে গিয়েছিল তেমনটি টিপু চায় না। মেজর ডাভটনকে সমাদর করে আনার ইচ্ছা টিপুর ছিল, সীমান্তে টিপু ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছিল মেজরকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু সুলতানের সংগে ডাভটনের আলোচনা হবার সুযোগ হল না। টিপুর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না-করেই ওয়েলেসলি জেনারেল হ্যারিসকে নির্দেশ দিল অবিলম্বে মহীশূর আক্রমণ করতে।

এইভাবে আরম্ভ হল টিপুর বিরুদ্ধে বিনা-প্ররোচনায় আক্রমণ, এইভাবেই লংঘন করা হল চুক্তি।

আশ্চর্যেরই ব্যাপার, প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ সংক্রান্ত মৈত্রীচুক্তির প্রস্তাব টিপুর তরফ থেকে গেল না, ফরাসিরা নিজেরাই দিল এই প্রস্তাব। ১৭৯৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে, ইংরেজরা যখন মহীশূর-আক্রমণ আরম্ভ করে দিয়েছে তখন টিপু সুলতানকে সম্বোধন করে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এক চিঠি এল। তার মর্ম এই—

### ফ্রেঞ্চ রিপাবলিক

লিবার্টি ইকোয়ালিটি

কায়রোর হেডকোয়ার্টার

৭ই প্লুভিওসি

রিপাবলিকের ৭ম বর্ষ, এক ও অবিভাজ্য

বোনাপার্টি, ন্যাশনাল কনভেনসনের সদস্য, জেনারেল-ইন-চীফ, কর্তৃক দি মোস্ট ম্যাগনিফিশেন্ট সুলতান, আমাদের সবার চেয়ে বড় বন্ধু, টিপু সায়েব'কে।

তোমাকে আগেই আমার লোহিত সাগরের কিনারে পৌছনোর খবর দেওয়া হয়েছে সঙ্গে আছে সুবৃহৎ ও অপরাজেয় সৈন্যবাহিনী, তারা ইংরেজের লৌহপাশ থেকে তোমাকে মুক্ত করার জন্য আগ্রহান্বিত।

এই সুযোগ আমি সর্বান্তকরণে বরণ করেছি, তোমার কাছে আমার জানার প্রবল বাসনা। তোমার রাজনৈতিক অবস্থা এখন কেমন, একথা মসকট ও মোচা হয়ে আমার কাছে পাঠাতে পার।

আমি আরও ইচ্ছা করি তুমি বেশ কয়েকজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে—যাদের উপর তোমার আস্থা আছে—কায়রোয় বা সুয়েজে পাঠাও, যাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতে পারি।
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তোমার শক্তিবৃদ্ধি করে ও শত্রু নাশ করে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

নেপোলিয়নের এই চিঠি নষ্ট হয়ে যায়নি, ইতিহাস এখন এর জিম্মাদার, কিন্তু চিঠিটা টিপু সুলতানের হাতে পৌঁছয়নি। মক্কার শেরিফ চিঠিটা পৌঁছে দেবে ঠিক ছিল, কিন্তু জেড্ডায় তা আটক করা হয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে টিপুর পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাবই যায়নি—ফরাসিদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ সংক্রান্ত কোনো চুক্তিও টিপু সুলতানের হয়নি। কিন্তু এসব ব্যাপার ওয়েলেসলির মনে কোনো রেখাপাতই করেনি। তার উচ্চাশা ছিল ক্ষমতা-লাভের, তার স্বপ্ন ছিল বিশাল এক সাম্রাজ্যের।

## ৬৭. কেউ ক্ষমা করবে না

ইংরেজ বাহিনী মহীশূরে প্রবেশ করল। ভেলোর থেকে এল কর্নাট-বাহিনী জেনারেল হ্যারিসের পরিচালনায়। জেনারেল স্টুয়ার্টের অধীনে বোম্বাই-বাহিনী পশ্চিম ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে গেল। গবর্নর জেনারেলের ভ্রাতার পরিচালনায় হায়দরাবাদ-বাহিনী অগ্রসর হতে লাগল—ইনি হলেন কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলি, পরে যিনি হন ডিউক অব ওয়েলিংডন, ওয়াটারলু যুদ্ধে ইনিই পরাস্ত করেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে। নিজামের বাহিনী এখন আর স্বাধীন নয়, ইংরেজের পোষ্য, কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলির সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগল।

আগের যুদ্ধে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল মারাঠা, এবার তারা তফাতে রইল। ওয়েলেসলির পূর্বের গবর্নর-জেনারেল সার্ জন শোর মহদাজি সিন্ধিয়ার হত্যা ঘটায়, এবং নানা ফড়নাবিসকে বন্দী করার জন্যে পেশোয়া বাজিরাওকে প্ররোচনা দেয়। পরে পেশোয়া নানা সাহেবকে মুক্ত করতে বাধ্য হয় মহদাজি সিন্ধিয়ার সাহসী পৌত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়ার প্রভাবে। একটা মিটমাট হয় এবং নানা ফড়নাবিসকে পেশোয়ার প্রধানমন্ত্রী রূপে আবার বসানো হয়। অনেকদিন ধরেই ওয়েলেসলি পেশোয়াকে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্যে মতলব এঁটে চলেছে। ওয়েলেসলির প্রস্তাবে পেশোয়া মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু নানা ফড়নাবিস ও দৌলতরাম সিন্ধিয়া টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধিতা করল।

"ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইএ সুলতানের কি দাঁড়াবার সম্ভাবনা আছে?" দৌলতরাম সিন্ধিয়াকে সে জিজ্ঞাসা করল।

"না। একেবারেই নেই।" উত্তর দিল সিন্ধিয়া।

"তাহলে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা কেন?" জানতে চাইল পেশোয়া, "জয় ও সম্মান যখন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।"

সিন্ধিয়া বলল, "জয় অবশ্যই আছে, কিন্তু সম্মান নৈব নৈব চ। ওয়েলেসলির মিত্র হওয়ায় কোনো সম্মান নেই।"

পেশোয়া বলল, "জয়ই সম্মান আনে বন্ধু। তোমার যৌবন ও অপরিণত রোমান্টিক মেজাজ তোমাকে যেন ভুলপথ না-দেখায়।"

"কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ইংরেজকে তোমার পথপ্রদর্শক হতে দেবে?" দৌলতরাও সিন্ধিয়া জিজ্ঞাসা করল, "ওয়েলেসলি হচ্ছে একটা নেকড়ে বাঘ। দু বছর ধরে সে টিপুর সংগে ভাব করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ এসে গেল এই যুদ্ধ।"

পেশোয়া তার দিকে করুণার চোখে তাকাল, "এই পাপের ও দুঃখের সংসারে কে পরোয়া করে ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক হলে বা ওয়েলেসলি নির্দয়-নিষ্ঠুর হলে? তাদের জয় নিশ্চিত, তারা যদি জেতে তবে সারা বিশ্ব তাদের সম্মান করবে, এবং ইতিহাসে ওয়েলেসলিকে বলা হবে এক মহৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। আর টিপু সুলতান? পৃথিবী হয় তাকে ভুলে যাবে তা না হলে এক দস্যু বলে মনে রাখবে, এবং যেহেতু সে জয়ী হতে পারল না তাই তাকে বলবে একজন বদমাশ। তবে বলো, নানা সাহেব, তুমি কি এখনো আমার সংগে একমত নও?"

"না। আমি তোমাকে অনুরোধ করি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পরামর্শ অনুসারে চলতে। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মারাঠা জাতির কোনোই লাভ নেই।" নানা ফড়নাবিস উত্তর দিল।

"তাই বুঝি! তবে জিজ্ঞাসা করি আগের বার টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজের সংগে যোগ দিয়েছিলে কিসের কারণে? কেবলমাত্র মারাঠার বিক্রমই ইংরেজদের জেতায়, যারা নাকি তখন ছিল পরাজয়ের মুখে। তখনকার সেই সিদ্ধান্তটি ছিল তোমার।" পেশোয়া বলল।

"হ্যাঁ। সিদ্ধান্তটি ছিল আমারই।" নানা ফড়নাবিস বলল।

পেশোয়া কিছু বলল না, নানা'র দিকে চেয়ে রইল আরও কিছু শোনার জন্যে, নানা আবার বলল, "সিদ্ধান্তটি ছিল আমারই। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সেই অপরাধ রয়ে যাবে আমার সংগে। নিজেকে আমি ক্ষমা করব না। মারাঠা জাতিও আমাকে ক্ষমা করবে না। কেউ ক্ষমা করবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নানা ফড়নাবিস বলল, "হ্যাঁ। এই দেশ থেকে ঐ বিদেশী বর্বরদের তাড়িয়ে দিতে পারত একা সে'ই। আমরা তার হাত চেপে ধরি, তার তরবারি ভোঁতা করে দিই, এবং অবমাননাকর একটা শান্তির শৃংখল তাকে পরাই।"

পেশোয়া তখন একটু বিদ্রুপের সংগে বলল, "আমাদের বিজ্ঞ কূটনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী কেবল আর-একটা যুদ্ধের ঝুঁকিই নিতে চান না, টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে পূর্বের যুদ্ধজয়ের গৌরবটাও মুছে দিতে চান। পূর্বের যুদ্ধের আগে

মহীশূরের রাজ্য যে রকম ক্ষমতাশালী ছিল আজও আবার তাই হোক এই তো তোমার অভিপ্রেত ?"

"যদি তা সম্ভব হত !" নানা উত্তর দিল, "মহীশূরের যে শক্তি ছিল আমার জীবনের বিনিময়ে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব। এটা মনে রেখো, টিপু সুলতানের পরাজয় যে কয় ঘণ্টা বিলম্বিত হবে সেই কয় ঘণ্টা মারাঠা জাতির স্বাধীনতা থাকবে। আরও একটা স্বীকারোক্তি আমি করতে চাই।"

পেশোয়া বলে উঠল, "কর কর। তোমার জ্ঞানের রত্ন দেখার জন্যে আমার বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না।"

এই শ্লেষ অগ্রাহ্য করল নানা। বলল, "আমার স্বীকারোক্তি হচ্ছে এই : তাদের পরাজিত শত্রুর উপর ইংরেজরা কী রকম নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে তা দেখেছ, কিন্তু বন্ধুদের ও মিত্রদের প্রতি তাদের ব্যবহার আরও ভয়ংকর। প্রত্যেককে বশ্যতায়, অপযশে ও দারিদ্র্যে ফেলে দিয়েছে।"

"দারিদ্র্য ? অপযশ ! বল কি ?" পেশোয়া বলল, "নিজাম ধনরত্নের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে বলে আমার মনে হয়েছে। তা ছাড়া তার দুর্নাম বরাবরই, ইংরেজ হোক বা না-হোক।"

"স্বীকার করে নিলাম। আর বশ্যতা ? এ সম্বন্ধে কী বলো ?" জিজ্ঞাসা করল নানা।

"আমি বলছি, বয়স হওয়ায় তোমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, মারাঠা জাতির শক্তিতে তোমার বিশ্বাস কমে গিয়েছে, তুমি সাধারণ ও সামান্য অবস্থাকেই সর্বত্র সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাও। তোমার পরামর্শকে কোনো ভাবেই যুক্তিপূর্ণ বলে গ্রহণ করা যায় না।" পেশোয়ার গলায় এখন যেন ক্রোধ প্রকাশ পেল।

পেশোয়া তখন পরশুরাম ভাউ ও তার পুত্র আপ্পা সাহেবকে ডেকে মারাঠা বাহিনী পরিচালনার ভার নিতে বলল। দুজনেই রাজি হল না।

মারাঠারা টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল না।

## ৬৮. মনস্তাপের আর্তস্বর

ইংরেজ সৈন্যেরা যতই এগিয়ে আসতে লাগল সারা মহীশূর জুড়ে ততই বেজে উঠতে লাগল আতঙ্কের আর্তনাদ, মনস্তাপের আর্তস্বর। হতাশার ক্রন্দন, দয়াপ্রার্থনার খণ্ডিত নিবেদন। আক্রমণকারীরা হাসতে লাগল। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য কেবল ভূমি অধিকার করাই নয়, এই রাজ্যের মানুষের মনোবল একেবারে ভেঙে দেওয়া ও তাদের সম্পূর্ণ ভাবে বশীভূত করে নেওয়া। অরক্ষিত শহর নগর গ্রাম খামার বসতবাড়ি মন্দির ও মসজিদ দগ্ধ করা হল, নষ্ট করে ফেলা হল। মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সেপাইদের মধ্যে বিলি করা হল। মেয়ে ও শিশু নির্বিশেষে সবাইকে এমন ভাবে হত্যা করা হল যেন সেপাইদের এটা একটা খেলা। প্রত্যেকটি গাছকে ব্যবহার করা হল ফাঁসিকাঠ হিসেবে। যারা এই অত্যাচারের বলি হল তাদের এমনভাবে বাঁধা হল যেন তা দেখতে হয় ইংরেজি আট-সংখ্যাটির মত। ইংরেজ পল্টনরা গর্ব করতে লাগল তারা এই ধরনের কি কি শিল্পকাজ উদ্ভাবন করেছে তা দেখিয়ে। এসবই তাদের খুশির খেলা। এদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল যারা এইসব অমানুষিক কাজ কিংবা অত্যাচার সহ্য করতে পারল না, আর্তরবের ধ্বনি যাদের কাছে অসহ্য মনে হল—তারা তাদের লোকজনদের দিকে তাকাত ভয়ার্ত দৃষ্টিতে, কিন্তু সেই লোকজনেরা দিব্য হাস্য করতে পারত—এসবে এতই তাদের খুশি। অনেকের মাথা নত হয়ে গেছে, তারা ভেবেছে যেসব শিশুর উপর অত্যাচার চলেছে তারা তাদেরই সন্তান-সন্ততির মত; যেসব নারীর উপর অকথ্য আচরণ করা হচ্ছে তারা তাদেরই ভগিনীর মতনই, স্ত্রীর কিংবা প্রেমিকার তুল্যই। কিন্তু সংখ্যায় এরা ছিল সামান্য, তাই তাদের প্রতিবাদে কেউ কানই করল না।

টিপু সুলতানের কাছে এসে পৌঁছুল একজন দূত—একটা প্রায় মুমূর্ষু ঘোড়া থেকে সে নামল, তাকে খবর দিল ইংরেজরা তাদের বিপুল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করেছে. কোনো রকম যুদ্ধঘোষণা না-করেই। টিপু সুলতান যখন ইংরেজদের আলোচক ডাভটনের জন্যে অপেক্ষা করছে, তখনই হঠাৎ আরম্ভ হল এই কাণ্ড।

আক্রমণকারী ইংরেজ-বাহিনী এগিয়েই যেতে লাগল। ওয়েলেসলি তার বাহিনী সম্বন্ধে গর্ব করে বলে, "প্রশ্নাতীত ভাবে এ-বাহিনী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত, এর সরবরাহ-ব্যবস্থা চমৎকার, শৃঙ্খলাবোধে নিখুঁত, অভিজ্ঞতায় পুষ্ট, প্রত্যেক বিভাগে এর অফিসাররা সামর্থ্যে অটুট—ভারতবর্ষের কোনো রণাঙ্গনে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সেনাবাহিনী ইতি পূর্বে আর হয়নি।"

টিপু সুলতানের কি কোনো আশা-ভরসা আছে? সারা পথে সুলতানের সীমান্ত দুর্গ কোনো প্রতিরোধ না-করে একে-একে আত্মসমর্পণ করে চলেছে।

মীর সাদিকের নেতৃত্বে সুলতানের যে গোয়েন্দা-বাহিনী পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে তার কী হল? ইংরেজের দলের সৈন্য-সংখ্যা সম্বন্ধে তাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল, ওরা 'যৎকিঞ্চিৎ গোছের'। তারা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে তাও ছেড়ে দিতে হয়েছিল অনুমানের উপর। এর চেয়েও মর্মান্তিক হচ্ছে যে, দুর্গগুলির আত্মসমর্পণের খবরও কেউ জানত না, সেইজন্যে সেসব জায়গায় সরবরাহ দেওয়া হয় দ্রুত। এগুলি'তে ইংরেজের আরও সুবিধে হয়।

অবশেষে তার কাছে খবর পৌঁছল জেনারেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে কোন্ পথে আসছে বোম্বে-বাহিনী।

তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল সুলতান, নেমে পড়ল প্রতিরোধে। তার অশ্ব ভাউসের পিঠে গিয়ে বসল দ্বিতীয় দিলখুশের মৃত্যুর পর এটি তাকে উপহার দেয় রাকেয়া বানু। বম্বে-বাহিনীকে আক্রমণের জন্যে সে রওনা হল সিদ্ধেশ্বরের দিকে। তার অনুগামীবা পিছনে পড়ে যেতে লাগল, ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু তাদের ক্লান্তিহীন ঐ নেতার কাছে হারতে তারা রাজি নয়।

কিন্তু আকস্মিক আক্রমণ এটা হয়ে উঠল না। প্রায় ষোলো ঘন্টা আগে জেনারেল স্টুয়ার্ট এক 'বন্ধু'র কাছ থেকে খবর পায়, শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে আসে এই খবর, এটা নিয়ে আসে হাশিম খাঁ। সুতরাং সে তৈরি রেখেছিল তার বাহিনীকেও। টিপু সুলতান যেসব সৈন্যকে পরিচালনা করে নিয়ে আসছে তাদের কথাও সে যেমন জানত, তেমনি জানত তার আক্রমণের পরিকল্পনাটিও।

টিপু সুলতান আক্রমণের জন্যে এগিয়ে চলল, কিন্তু শত্রুর বিপুল বাহিনী দেখে ও তার প্রস্তুতি দেখে বুঝল যে, তার অপেক্ষাতেই তারা আছে। শত্রুদের ঘাঁটিগুলি নিপুণভাবে দেখে নেবার জন্যে সে থামল, ঘন্টা-খানেক রইল কামানের গোলার মধ্যে খোলা জায়গায়। সে তার হাল্কা বন্দুক ব্যবহার করল না তার

গুলি বাঁচাবার জন্যে, কেননা তার সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। সুলতান বুঝল তার আক্রমণের পরিকল্পনা বদল করতে হবে খুব নিঃশব্দে অথচ দ্রুতবেগে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে চলল ইংরেজদের বাহিনীর পাশের দিকে। এত দ্রুত যে প্ল্যান পরিবর্তন করতে পারবে সুলতান, স্টুয়ার্ট তা ধারণা করেনি, তাই তার বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্যে তৈরি ছিল। ততক্ষণে সুলতান ইংরেজদের একটা ব্রিগেডকে পিছন থেকে ঘিরে ফেলল, তাদের নিপাত করে দিল। স্টুয়ার্টের বাহিনী এর পর টিপু সুলতানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ততক্ষণে টিপু সুলতান সরে পড়েছে।

বেশ বেদনার্ত হৃদয়ে টিপু সুলতান রণক্ষেত্র ত্যাগ করল। তার হতাহতের সংখ্যা হল ১৫০০। মৃতদের মধ্যে ছিল তার আত্মীয় মহম্মদ রাজা, যে নাকি বেংকি নবাব ( দুর্দান্ত অভিজাত ) নামেই পরিচিত। শত্রুবাহিনীকে পাশ থেকে আক্রমণ করায় টিপুকে সাহায্যের জন্যে সামান্য সৈন্য নিয়ে সে-ই ছিল পুরোভাগে —সব সময় এমন ভাণ্গ করে চলেছিল যে, সেই মুহূর্তেই সে আক্রমণ করবে। ইংরেজরা তার উপর আক্রমণের পর আক্রমণ ক'রে চলল, তার পর তারা দেখল সে সাংঘাতিক জখম—মৃতপ্রায়। তার মাথা কেটে নিয়ে একটা লাঠির মাথায় তা বসিয়ে প্রদর্শন করতে লাগল তাদের জয়গৌরব রূপে। এই ভাবে মরল বেংকি নবাব, মেজাজে সে অগ্নিশর্মা, কথায় সে গরম, কিন্তু নরম ছিল তার হৃদয়টি। টিপু তাকে খুব ভালোবাসত।

সুলতান স্বচক্ষে দেখেছে বম্বে বাহিনী কী বিশাল। কিন্তু মীর সাদিককে এই বাহিনী সম্বন্ধে এমন ভুল হিসাব দিল কে ?

সৈয়দ সাহেবই-বা কোথায় ? জেনারেল হ্যারিসের অধীনে কর্নাটকে ইংরেজ-বাহিনীকে লক্ষ রাখতে ও তাদের হয়রান করতে তাকে বলেছিল সুলতান। তারা যাতে রাজধানী পর্যন্ত যেতে না-পারে তার জন্যে বাধা দেবার তার কথা। কিন্তু সে বাহিনী বিনা-বাধায় এগিয়ে গেল। সৈয়দ সাহেব এখন ইংরেজের টাকা খেয়ে তাদের বেতনভুক্ত হয়ে গেছে।

আর, কামার-উদ্-দিন ? সে সুলতানের জ্ঞাতিভাই, ও বিশ্বস্ত জেনারেল। দু-দুবার কামার-উদ্-দিনের বাহিনী জয়ের মুখে এসেছিল, প্রতিবারই সে তার সেনাদের সরে আসতে বলে। তার কৈফিয়ত হল—আরও প্রাণহানি বাঁচাবার জন্যে, কিন্তু অনেকেই তার এ কথায় সন্দেহ করে, অবশ্য সুলতান তা করে না।

আর, সুলতানের আর সব কম্যাণ্ডাররা ? এদের কেউ-কেউ তাদের সেনাদের

নিয়ে গেছে অভ্যন্তর ভাগে, শত্রুকে বাগে পাওয়ার জন্যে সুলতানের আদেশেই যেন ঘুর-পথে তারা চলেছে। তাদের এই প্রতারণার কথা তারা কবুল করেনি। কবুল করে কী ক'রে? তাদেরই সেনারা ছিল সুলতানের অনুগত ও অনুরক্ত, তারা তবে ওদের জবাই করে ফেলত। কিন্তু নির্দিষ্ট সব জেনারেলই বেইমান ছিল না। কেউ-কেউ সুলতানের নামেই আদেশ পেয়েছে সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে, কামার-উদ্‌-দিন ও মীর সাদিকের কাছ থেকে, এবং আরও অনেকের কাছ থেকে - পুরোভাগ থেকে এই ভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তাদের।

ইতিমধ্যে জেনারেল হ্যারিসের নেতৃত্বে কর্নাটকের ইংরেজ-বাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। তাদের এই প্রভূত পরিমাণ উপকরণ বইতে ছিয়ানব্বই হাজার বলদ লেগেছিল। এ ছাড়া, অফিসার ও সৈন্যদের ব্যক্তিগত বলদ উট ও হাতি তো ছিলই। একজন ব্রিটিশ অফিসার এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> কাছের কোনো পাহাড় থেকে দেখলে আমাদের চলমান এই বাহিনীর দৃশ্যটি অদৃষ্টপূর্ব। মিশর থেকে ইজরাইলবাসীর বাস্তুত্যাগের মত দেখতে; চারদিকের প্রান্তর ও শহর যেন চলছে বলে মনে হয়েছে। গবাদি পশুর ও ভেড়ার পালের আচ্ছাদনে মাটি ঢাকা পড়ে গেছে। সৈন্যরা কোন্ দিকে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল তাদের অস্ত্রের ঝকমকানি দেখে, তাদের বিপুল সংখ্যক কামান দেখে মনে হচ্ছিল একটা রেখা বুঝি এগিয়ে চলছে।

এই বিশাল ও বিপুল ব্যাপার আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে বটে, কিন্তু নড়তে-চড়তে এর সময় লাগেই, দ্রুত চলতে পারে না। মাঝেমাঝেই একে থামতে হয়। এমন বাহিনীকে হয়রান করা কত সহজ! এর গতি থামিয়ে দেওয়া, এর গবাদিপশু, এর সামরিক উপকরণ ইত্যাদি আটক করা কঠিন না। কিন্তু এ কাজ করে কে? মহীশূর-বাহিনীর কম্যান্ডারদের চরিত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তারা এখন ইংরেজদের কাছ থেকে মাইনে পায়। সুতরাং বিনাবাধায় এগিয়ে চলল ঐ বাহিনী। তারা মাইনে পেয়ে ইংরেজের বশ্য তো হয়েছেই, এদিকে ভুল খবরও তারা পাঠাচ্ছে —ইংরেজদের উপর কোথায় কোথায় বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চলছে, তাদের কী বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে!

হ্যারিসকে বাধা দেবার জন্যে টিপু সুলতান মালভালির দিকে গেল। একটা এমন ঘাঁটি সে পেল যাতে হ্যারিস নদীটা পার হতে পারবে না। কিন্তু সৈয়দ সাহেব ও কামার-উদ্‌-দিন সুলতানকে চাপ দিতে লাগল, তাকে কাঠের সাঁকো'র যুদ্ধ না-করে খোলা প্রান্তরে লড়তে বলল। এর ফলে ইংরেজরা

অবলীল ক্রমে পার হয়ে গেল নদী। ইংরেজরা মালভালির দিকে এগতে লাগল। যেসব অফিসারকে পাঠানো হল শত্রুর অবস্থা দেখে আসার জন্যে তারা এসে খবর দিল যারা আসছে তারা অগ্রবর্তী পাহারাদার মাত্র, সহজেই তাদের শেষ করে ফেলা যাবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা জানার আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে যুদ্ধ। সে তার বন্দুকধারীদের এতটাই এগিয়ে দিয়েছে যে, হয় তাকে বর্জন করতে হবে তাদের কিংবা করে যেতে হবে লড়াই। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল সুলতান. সে কৃতকার্যও হল, কিন্তু লোকক্ষয় হল অনেক। তার পদাতিক বাহিনীও শত্রুর বেয়োনেটের আক্রমণ সত্ত্বেও এগিয়ে গেল। কামার-উদ্-দিন সুলতানের আদেশ অনুসারে তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করার পরিবর্তে মহীশূর-বাহিনীর উপরে গিয়ে পড়ল, ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। টিপু সুলতান তার বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরে আসতে পেরেছিল বটে, কিন্তু এক হাজার লোক হত হয়েছিল এখানে।

মীর সাদিক এল টিপু সুলতানের কাছে, সে এমন প্রমাণ দাখিল করল যে, ইংরেজ-বাহিনী সোজাসুজি রাস্তা ধরে চলেছে বাঙ্গালোর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তম। টিপু সুলতান আদেশ দিল শত্রুর খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করে দেওয়া হোক, এবং শত্রুর অগ্রগতিতে বাধা দেবার জন্যে পাঠাল সেনাবাহিনী। কিন্তু জেনারেল হ্যারিস দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে কাবেরি নদী পার হয়ে পৌঁছল সোসাইলে। এই ভাবে সে পেয়ে গেল প্রচুর খাদ্যসামগ্রী ও বিনা-বাধায় পৌঁছে গেল শ্রীরঙ্গপত্তমের কাছে। ইংরেজদের ঐ বিপুল পরিমাণ উপকরণ নিয়ে এগোতে হয়েছে খুবই ধীরে ধীরে, দিনে পাঁচ মাইলের বেশি না। কিন্তু এসত্ত্বেও তারা কোনো হয়রানির সম্মুখীন হয়নি। মহীশূরের অশ্বারোহীরা সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্বে একেবারে দৃষ্টির মধ্যেই আছে, তবুও তারা ইংরেজদের আক্রমণ করল না। ইংরেজদের অগ্রগতি বন্ধ সে করে দিতে পারে, তবু সৈয়দ সাহেব এত নিষ্ক্রিয় কেন, এ প্রশ্ন কি তার অফিসার ও সেনারা নিজেদেরই করেছে, বিস্মিতও কি তারা হয়েছে? তাদের মনে সন্দেহ হয়েছে বটে, কিন্তু তখনই সে সন্দেহ দূর করে দিয়েছে এই কথা ভেবে যে, ইংরেজদের হয়তো এই ভাবে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে যাতে তারা তাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা থেকে তফাত হয়ে যায়। যাতে তাদের সমগ্র বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলা যায়, তাদের শেষ করে ফেলা যায়, পালাবার কোনো পথ তারা পাবে না। যতক্ষণ অবস্থা না-আসে সৈয়দ সাহেব ততক্ষণ একজনও মহীশূরী সৈন্যের জীবননাশ না-হয় তাই দেখবে। কোনো-কোনো সৈন্য এমন কম্যান্ডারকে ভালো-

বাসে যে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদের মনে আনুগত্য এনে দিতে পারে, কেউ-কেউ ভালোবাসে এমন কম্যান্ডারকে যে নাকি ধ্বংসের ও রক্তবন্যার মাঝেও চমৎকার-ভাবে বিজয়ী হতে পারে, কিন্তু তার বাহিনীর একজন সেনারও প্রাণনাশ না-হয়, এটা যে দেখে সেই কম্যান্ডারই সবার শ্রদ্ধেয়। হ্যাঁ, সৈন্যারা বিশ্বাস করত সৈয়দ সাহেবকে। কে না করবে? সে কি সুলতানের জ্ঞাতি নয়, সে কি সুলতানের বিশ্বস্ত নয়? ইংরেজরা এগিয়ে আসছে দেখেও সে অবিচল, তাহলে সুলতানের সংগে আগেই তার একটা প্ল্যান হয়ে গেছে যে শত্রুদের এভাবে এগিয়ে আসতে দিয়ে তাদের একেবারে বিনাশ করে দেওয়া হবে। কোনো-কোনো সৈন্য উৎসাহের বশে যখন ইংরেজ-বাহিনীর এক অংশে আঘাত হেনেছে, তখন ক্রুদ্ধ হয়েছে সৈয়দ সাহেব। শত্রুর এক হাজার বলদ ছুটোছুটি করেছে, সারা রণাঙ্গনে ভাঙা মৃৎপাত্র ও সরঞ্জাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে, ত্রিশজন শত্রুসৈন্য ও তিন জন মহীশূরী সৈন্য মারা গিয়েছে। দেড় দিন শত্রুদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সৈয়দ সাহেব কী করেছিল? সে আদেশ দিয়েছিল মহীশূরী আক্রমণকারীদের চাই সুন্দরলালকে ফাঁসি দেওয়া হোক, সে বলে, "তোমার বীরত্বের প্রশংসা করতে পারিনে, তুমি সুলতানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করেছ।" পরে সে তার আগের আদেশ সংশোধন করে সুন্দরলালকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ইংরেজের অগ্রগতিতে যে বাধা দেবে সে'ই সুলতানের পরিকল্পনার যেন বিরোধী।

সুলতানের গোয়েন্দা দল আবার ব্যর্থ হল—কিংবা তারা কি কৃতকার্য'ই হল? সুলতানকে বেশ মুরুব্বিআনার সংগে জানানো হল যে, চেন্দগল দুর্গের কাছে হ্যারিস নদী পার হয়ে শ্রীরংগপত্তম দ্বীপে পেঁাছবে। তার সর্দারেরা সকলে শপথ নিল যে তারা আসন্ন সংঘর্ষে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত, পুর-নাইয়াকে ও তার বড় দুই ছেলেকে যে-কোনো ভাবে দুর্গ রক্ষার জন্য পাঠিয়ে টিপু নদী পার হয়ে তার সেনাবাহিনী নিয়ে চেন্দগলে অপেক্ষা করতে লাগল শত্রুর মোকাবিলার জন্যে। কিন্তু টিপু হতাশ হল, সে দেখল ইংরেজরা দক্ষিণ দিকে যাবার পরিবর্তে গিয়েছে বাম দিকে। এর মধ্যে আনন্দসংবাদ এল, কামার-উদ্-দিন জানিয়েছে যে জেনারেল স্টুয়ার্টকে সে বাধা দিতে পারবে এবং তাকে জেনারেল হ্যারিসের বাহিনীর সংগে যোগ দিতে দেবে না।

কামার-উদ্-দিন পেঁাছেছিল অবশ্য জেনারেল স্টুয়ার্টের বাহিনীর কাছা-কাছিই। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের হয়রান বা ক্ষতি না-করা।

সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, টিপ্‌ সুলতানের পতনের পর তাকে গুরুকুণ্ডার নবাব করা হবে বলে ইংরেজরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার সে প্রকৃতই যোগ্য। সত্যিই সে যোগ্য, কেন না, সে ইংরেজদের থেকে বেশ তফাতে থেকে গেল, জেনারেল স্টুয়ার্টের অনুরোধে সুলতানের বাহিনীর যাবতীয় তথ্য সে জানিয়ে দিল, জানিয়ে দিল কোথায় রাখা আছে চাল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। ইংরেজদের রসদে তখন টান পড়ে গেছে। তারা বিপন্ন, এই সময়ে এইসব তথ্য পেয়ে তাদের খুব উপকার হল। তারা প্রচুর-পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পেয়ে গেল। কামার-উদ্-দিনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আবার নতুন করে জানানো হল, তাকে নগদ অর্থও দেওয়া হল এইসব খবরের জন্যে। জেনারেল স্টুয়ার্ট জানাল জেনারেল হ্যারিস এই অঞ্চলের এ ধরনের কিছু তথ্য পেলে খুশি হবে, "নগদ মূল্যই এ জন্যে দেওয়া হবে"। কামার-উদ্-দিন আর-কিছু জানতে চাইল না, শ্রীরঙ্গপত্তমের দিকে সে যাত্রা করল।

টিপু সুলতানকে জানানো হল, কামার-উদ্-দিনের দেওয়া আঘাতের পর আঘাত খেয়ে জেনারেল স্টুয়ার্টের বাহিনী পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। জেনারেল হ্যারিসের সঙ্গে যুক্ত হবার উপযোগী শক্তি তাদের নেই।

## ৬৯. বংশীলাল কি দলত্যাগ করেছে ?

জেনারেল হ্যারিসের অধীনে ইংরেজ-বাহিনী বেশ শক্ত ঘাঁটি দখল করেছে। এর কিছু দূরে পাম ও নারিকেলের কুঞ্জ, নাম হচ্ছে সুলতানপেট তোপ, এর মধ্যে দিয়ে রয়েছে গভীর জলাশয়, দুর্গের মাইল-খানেক দূরে পূর্বদিক হেকে খালের মধ্যে দিয়ে এতে জল সরবরাহ করা হয়। সুলতানের সেনাদের পক্ষে এই কুঞ্জ গা-ঢাকা দেবার বেশ উপযোগী, তারা ইংরেজ-বাহিনীকেবেশ হয়রান করার সুবিধে পেল। সুলতানপেট তোপের সুলতানের কম্যাণ্ডার আবদুল শকুর তার বাহিনীকে দুর্গে ছেড়ে আসার আদেশ দিল। পদাধিকারে তার পরবর্তী অধিনায়ক বংশী-ল্যাল এ আদেশ শুনে অবাক হল।

"এটা আদেশ।" চীৎকার করে উঠল আবদুল শকুর। বংশীলাল আর কোনো প্রশ্ন করল না, তার লোকজন নিয়ে সে আবদুল শকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেল। তারা যখন কুঞ্জের বাইরে এসেছে তখন তাদের বলল আবদুল শকুর তারা যেন দুর্গে গিয়ে আরও আদেশের অপেক্ষায় থাকে। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গিয়েই বংশীলাল হঠাৎ থামল, তারপর বিপরীত দিকে দৌড়ে গিয়ে আবদুল শকুরকে ধরে ফেলল। হাঁফাতে-হাঁফাতে সে জিজ্ঞাসা করল, "এটা আদেশ অথবা এটা বিশ্বাসঘাতকতা ? অনুগ্রহ করে বলো, আবদুল, বলো।"

"তুমি কি পাগল ? আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দেবার সাহস পেলে কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করল আবদুল শকুর।

"তাহলে এমন জায়গাটা আমরা অরক্ষিত রাখছি কেন।"

"আদেশ, বুঝলে বুদ্ধু, এটা আদেশ।" বলেই আবদুল শকুরের রাগ পড়ে গেল। সে হাসল বংশীলালের কাঁধে হাত রাখল, "কতদিন তুমি আমাকে চেনো, বংশী ? পনেরো বছর। তুমি কি ভেবেছ সুলতানকে আমি পরিত্যাগ করব ? এটা কি সম্ভব ?"

"তা হলে আমাদের সঙ্গে দুর্গে গেলে না কেন ? তাহলে ঐদিকে যাচ্ছ কেন ?"

"আবার বলছি, তুমি বোকা। আদেশ আমাকে মানতে হবে। আমাকে

জিজ্ঞাসা কোরো না, যারা আদেশ দিয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করো। আমি কী করছি আমি তা জানি, আমি যা করছি তার সংগত কারণ আছে। যাও, সুলতানকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, যদি তেমন ইচ্ছা হয়। আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না।"

কিছুক্ষণ বংশীলাল কথা বলতে পারল না। আবদুল শকুরের দিকে সে চেয়ে রইল। না, বিশ্বাসঘাতকতা হতে পারে না। ঐ হাস্যময় মুখ, ঐ বিচক্ষণতা ও সততায় ভরা দুই চোখ—এখানে হতে পারে না বিশ্বাসঘাতকতা।

"আমি ভুল বুঝেছিলাম। মাফ করো।" বলল বংশীলাল। একজন পুরোতন বন্ধুকে এভাবে সন্দেহ করায় সে লজ্জিত, বলল, "ক্ষমা করো।"

'বোকা বন্ধুকে মার্জনাই করতে হয়। যাও, ঠিক আছে।"

বংশীলাল চলে গেল। একবার ফিরে তাকিয়ে সে হাত নাড়ল। এর পরে যখন সে ফিরে তাকাল তখন আবদুল শকুরের বন্দুক থেকে একটা গুলি এসে লাগল তার গলায়। আর-একটা গুলি লাগল তার কপালে। সে পড়ে গেল। আবদুল শকুর এগিয়ে এল, তার যেন মনে হচ্ছে বংশীলালের ঠোঁটে হাসি দেখা দিচ্ছে, এবং একটা প্রশ্ন করার চেষ্টা করছে, "এটাও কি কারো আদেশে?" তার তৃতীয় গুলি সে তাক করল বংশীলালের ঠোঁটে, কিন্তু দরকার হল না। বংশী লাল মারা গিয়েছে।

এক ঘণ্টা বাদে জেনারেল বেয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে ইংরেজ সৈন্য সুলতানপেট তোপে পৌঁছল, পরিত্যক্ত কুঞ্জ অধিকার করল তারা।

আবদুল শকুর'কে ও বংশীলাল'কে সুলতানের দরবার বিশ্বাসঘাতক ও দলত্যাগী আখ্যা দিল, কেননা বিনা আদেশে তারা সুলতানপেট তোপ থেকে সরে এসেছে, এবং দুজনেই নিরুদ্দেশ।

## ৭০. ডিউক অব ওয়েলিংটন

পুরনাইয়া এক বার্তা পাঠিয়ে সৈয়দ সাহেবকে জানাল যে সুলতানপেট তোপ থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ করে দিতে হবে, তার উত্তর এল এই মর্মে যে জেনারেল হ্যারিসের মূল বাহিনীকে বিব্রত করার কাজে এতই সে ব্যস্ত, এ সময়ে কুঞ্জ আক্রমণের জন্যে সে তার সৈন্যদের ছাড়তে পারছে না। জেনারেল বেয়ার্ডকে আক্রমণের জন্যে পুরনাইয়ার তত্ত্বাবধানে মহীশূর-বাহিনী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল। জেনারেলকে এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে সে কুঞ্জ অধিকার করে থাকতে পারবে, এখন সে পায়জামা পরেই পলায়ন করতে বাধ্য হল। মহীশূর সিল্কে তৈরি ও ফুলকারি কাজ করা এই পায়জামা তার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল তার স্ত্রী।

কুঞ্জ এখন পুরনাইয়ার দখলে। ভবিষ্যতের ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্নেল ওয়েলেসলির অধীনে দুইটি ইংরেজ বাহিনী সূর্যাস্তের পর এল, রাতের অন্ধকারে তারা আক্রমণ আরম্ভ করল। তাদের মোকাবিলা করা হল ভয়ংকর গোলাগুলি দিয়ে। ইংরেজ সেনারা গাছের আড়ালে ও জলার মধ্যে লুকালো, অবশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটল। অনেকে মারা গেল, অনেকে বন্দী হল। কর্নেল ওয়েলেসলির হাঁটুতে গুলির খোল লাগল, অল্পের জন্যে মহীশূর-বাহিনীর হাতে সে পড়ল না। ছত্রভঙ্গ হয়ে ইংরেজরা সরে গেল।

এর কয়েক বছর পরে কর্নেল ওয়েলেসলি যখন অনেক সম্মান ও খেতাব পেয়েছে, তার নাম হয়েছে, খ্যাতি হয়েছে, গৌরব বেড়েছে, যখন সে হয়েছে ওয়েলিংটনের ডিউক, তখন সে তার এক বন্ধুকে বলে—

"না হে। একগুঁয়েমি আমার তেমন নেই। এইসব জয়ই আমাকে আনন্দ দেয়, আমাকে খুশি করে, আমার বুক উল্লাসে ভরে দেয়। কিন্তু এসবে আমার মাথা ঘুরে যায় না। যদি দৈবাৎ কখনো কোনো একগুঁয়েমি আমাকে ছুঁতে আসে তখনই আমার মনে পড়ে সুলতানপেট তোপে আমি কী ভয়ংকর আক্রমণের সম্মুখীন হই। সেই ঘটনাই আমার মনে বিনীতভাব এনেছে। এজন্যে আমি পুরনাইয়ার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"পূরনাইয়া কে ?"

"সে ছিল টিপু সুলতানের প্রধানমন্ত্রী। সুলতানপেট তোপে সে টিপু সুলতানের বাহিনী পরিচালনা করে। পূরনাইয়া এখন এক বিস্মৃত ব্যক্তি।"

"কিন্তু টিপু সুলতান তা নয়, যদিও।"

"না। টিপু সুলতান নয়।" ডিউক অব ওয়েলিংটন জবাব দিল, "প্রকৃতপক্ষে এটা জেনে রেখো বন্ধু, পৃথিবী যখন তোমাকে আমাকে একেবারে ভুলে যাবে তখনও টিপুর স্মৃতি জীবন্ত থাকবে ভূভারতে।"

## ৭১. ঘরের মধ্যেই শত্রু

ক

খুব ভোরের দিকে সৈয়দ সাহেব পেঁছিল সুলতানপেট তোপে, এবং কর্নেল ওয়েলেসলির বাহিনীর সঙ্গে জয়লাভের জন্যে পূরনাইয়াকে অভিনন্দন জানাল।

সৈয়দ সাহেব বলল, "বাড়িটা আমাদের মত পেশাদারদের হাতে ছেড়ে দাও। তোমাকে দুর্গে ডাকা হচ্ছে, সুলতানের কাছাকাছি থাকার জন্যে।"

"কিন্তু কুঞ্জের ভার কে নেবে?" পুরনাইয়া বলল, "এর গুরুত্ব জানো?"

"ভাবনা কি? আমি নেব ভার।"

"গতকাল তুমি অন্যত্র ব্যস্ত আছ বলেছিলে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।"

"গতকাল ছিল গতকাল। আজ অন্য দিন।"

পুরনাইয়া জিজ্ঞাসা করল, "আমার কোনো বাহিনী এখানে রেখে যাব, কিংবা তোমার বাহিনী তুমি দিতে পারবে?"

"তোমার সংগেই ওদের নিয়ে যাও। ওরা বেশ লড়াই করেছে, কঠিন সংগ্রাম করেছে। তাদের বিশ্রাম দরকার। অনেক সেনা আমার আছে।"

বেশ আশ্বস্ত হয়ে পুরনাইয়া দুর্গে চলে গেল। সৈয়দ সাহেবের মত দক্ষ কম্যাণ্ডার যখন কুঞ্জের ভার নিচ্ছে তখন আর ভাবনা কী! সেই রাত্রে একটি গুলি বিনিময় না হওয়া সত্ত্বেও সুলতানপেট তোপের কুঞ্জ ইংরেজের করতলগত হয়ে গেল।

সৈয়দ সাহেব সব কটি কুঞ্জের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করল ইংরেজ বাহিনীর আগে-আগে থেকে। মহীশূর-বাহিনী তাদের বিব্রত ও বিরক্ত করতে পারত, এবং অবরোধ পদ্ধতিতে তাদের মতলব বানচাল করে দিতে পারত। সৈয়দ সাহেবের পূর্ণ অধিনায়কত্ব গ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় কুঞ্জ ইংরেজের হাতে চলে গেল। এইভাবে শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের এক হাজার গজের মধ্যে ইংরেজরা তাদের একটা মজবুত ঘাঁটি করে নিতে পারল।

খ

মীর সাদিক টিপু সুলতানের কাছে ইংরেজদের আক্রমণের যে পরিকল্পনা দাখিল করেছে টিপু সুলতান তা খুঁটিয়ে দেখছিল। মীর সাদিক তার গোয়েন্দা

দপ্তর নিয়ে খুব খুশি, তাদেরই কল্যাণে সে এই পরিকল্পনা পেয়েছে বলে দাবি করে। এর আগেও যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই ইংরেজদের প্ল্যানের একটা নকল সে পেয়েছিল। সেটা ছিল একটা খসড়ার মতন। তবুও বোঝা গিয়েছিল আক্রমণটা আসবে দুর্গের পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে। সেই প্ল্যানে চিহ্নিত ছিল 'টপ সিক্রেট', অর্থাৎ ভীষণ গোপনীয়, তাতে স্বাক্ষর করেছিল গবর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি, জেনারেল স্টুয়ার্ট, জেনারেল হ্যারিস। সবচেয়ে শেষের প্ল্যানটিতে স্বাক্ষর করেছে জেনারেল স্টুয়ার্ট ও জেনারেল হ্যারিস, এটি অনেক বিস্তারিত ভাবে তৈরি, কিন্তু আসল সব বিষয়ই প্রায় এক প্রকার, এবং আক্রমণ যেদিক থেকে হবে তাতে বলা আছে তাও আগেরটার মতই। সুলতানকে মীর সাদিক আরও বলেছে যে একজন ফরাসির কাছ থেকেও সে এর সমর্থন পেয়েছে। এই ফরাসিটি যুদ্ধবন্দী, জেনারেল স্টুয়ার্টের সে ছিল একজন দোভাষী। প্রাপ্ত খবর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজরা পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে আক্রমণের পরিকল্পনাই করেছিল। সুলতান যখন যুদ্ধবন্দীটির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জানাল, তখন মীর সাদিক আজ-না-কাল করতে লাগল। তাকে আবার মনে করে দেওয়ায় মীর সাদিক একটি চেম্বারে নিয়ে গেল সুলতানকে, সেখানে একজন ইউরোপীয় রক্তাক্ত অবস্থায় কাৎরাচ্ছে, তার উপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে স্পষ্টতই বোঝা গেল।

টিপু একটু যেন আর্তরব করে উঠল, বলল, "আমি দেখেছি দৃশ্যটা, ঈশ্বর করুন এমন দৃশ্য আর যেন না দেখতে হয়।"

টিপু চলে গেল, যাবার সময় মীর সাদিককে বলে গেল অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, যুদ্ধবন্দীদের অপদস্ত করা চলবে না। পরে মীর সাদিক টিপু সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ও বলে যে সে অত্যাচারে লিপ্ত নয়, তার অনুমতি ছাড়াই তার কোনো লোক এটা করেছে এবং এজন্যে সে গুরুতর শাস্তিও পেয়েছে।

অত্যাচারিত এই বন্দীর কথা বাদ দিয়েও টিপুর মনে এটা দাগ কেটে রইল যে আক্রমণটা আসছে পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে। ঐ দুই দিকে প্রতিরক্ষার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হল।

১৭৯২র চুক্তি সম্পাদন করার পর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তমের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা মজবুত করার দিকে টিপু সুলতানের মনোযোগ ছিল না, তার এমন-একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে ইংরেজরা তার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিকারক কাজ আর করবে না। গবর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি যখন বিনা প্ররোচনায় ও সরকারী ভাবে যুদ্ধঘোষণা না-করেই আরম্ভ করল যুদ্ধ, তখন সুলতান রক্ষা-প্রাচীর গড়া আরম্ভ করল,

কিন্তু দুর্গের চারদিক ঘিরে তা করার সময় পেল না।· সেইজন্যে, উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি মাত্র অস্ত্রক্ষেপণের ঘাঁটি নির্মাণ ছাড়া দক্ষিণে ও পূর্বে সে শক্ত ঘাঁটি বানাতে ব্যস্ত হল। এই দুই দিক থেকে আক্রমণ আসবে ব'লে মীর সাদিক, তার বিশ্বস্ত মন্ত্রী মীর সাদিক তাকে ছক দেখিয়েই বলেছে।

কিন্তু পূর্বের ও দক্ষিণের তার এই প্রতিকার ও প্রতিরোধের পাকা ব্যবস্থা কাজে এল না দেখে টিপু সুলতান ভীষণভাবে চমকিত হল। ইংরেজদের আক্রমণ এল পশ্চিম দিক থেকে ও উত্তর-পশ্চিম থেকে।

ইংরেজদের দুই বাহিনী জেনারেল স্টুয়ার্টের ও জেনারেল হ্যারিসের নেতৃত্বে এসে মিলিত হতে পারল। এই মিলন একেবারে অসম্ভব করে দেবে, শত্রুদের ধ্বংস করে দেবে বলে কামার-উদ্-দিন যে আশ্বাস দিয়েছিল তা ধূলায় ধূসরিত হল। টিপু সুলতান দেখল, চার মাইল দীর্ঘ হয়ে ইংরেজদের বাহিনী নিজেদের সজ্জিত করেছে এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের হাজার খানেক গজ দূরে এসে তারা পৌঁছে গেছে।

## ৭২. এতদূর তারা এল কী করে ?

মহীশূরের বিপদ ঘটেছে অনেক বার, কিন্তু এমন কঠিন বিপদ আগে কখনো আসেনি। ভয়ংকর যুদ্ধ অনেক ঘটেছে, ভীষণ শঙ্কার ব্যাপারও ঘটেছে আগে, তাতে মহীশূরবাসীর মনে এসেছে প্রেরণা, তারা তৎপর হয়ে উঠেছে, এবং নিঃশঙ্কচিত্তে তারা ফিরে পেয়েছে শান্তি। কিন্তু এবারের অবস্থা আলাদা—শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গটাই এখন অবরোধে।

যদিও লোকে পরিপূর্ণ দুর্গে এসে জড়ো হচ্ছে অসংখ্য শরণার্থী, তবুও কারো মনে কোনো আতঙ্ক নেই। দুর্গে প্রবেশের আগে তারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল বটে, কিন্তু দুর্গে প্রবেশের পর তাদের মনের সব ভয় দূর হয়ে যায়, বিশেষ করে টিপু সুলতানের উপস্থিতিতে। তারা সাহায্যের প্রার্থনা মনে-মনে জানাতে-জানাতেই এসেছে; ইংরেজ আক্রমণকারীর অত্যাচারে সমস্ত শহর কম্পিত, তাদের বিবেকবিহীন হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ দেখতে-দেখতে তারা পলায়ন করেছে, তারা রক্তবন্যা দেখতে-দেখতে এসেছে, বিভিন্ন পরিবারকে তারা নির্দয়ভাবে পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক ক'রে দিতে দেখেছে। অনেকে অনাথ হয়েছে। কেউ হারিয়েছে পুত্র, কারো কারো বা গেছে সব প্রিয়জন। বিধ্বস্ত শহর থেকে তারা এসে পৌঁছচ্ছে দুর্গের প্রাচীরের আড়ালে—তাদের চোখে জল, যে দুঃসহ দৃশ্য তারা দেখতে-দেখতে এসেছে তাতে তাদের হৃদয় বেদনার্ত।

টিপু সুলতান তাদের দিকে তাকাল ব্যথিতভাবে, তার হৃদয় বেদনায় ও দৃঢ়তায় পূর্ণ। এর প্রত্যুত্তরও সে পেল তখনই সেইভাবেই। তাদের চোখে রক্ত ভা। তাদের হৃদয় দ্রবীভূত। তাদের হতাশা দূর হল, তাদের আতঙ্ক দূরীভূত হল। তাদের মন হল শান্ত, হল শক্ত, তারা প্রার্থনা করতে লাগল।

এই পরিবর্তন লক্ষ করল পুরনাইয়া। এ সম্বন্ধে মীর সাদিকের সঙ্গে সে কথা বলল—কী ভাবে টিপু সুলতান ওদের মনে আস্থা এনে দিয়েছে। মীর সাদিক বিনীতভাবে সব শুনল, কিন্তু পুরনাইয়ার সঙ্গে একমত হতে পারল না।

মীর সাদিক বলল, "আতঙ্ক উদ্বেগ ভয়—সবই হচ্ছে শারীরিক ব্যাপার—

কিডনির কাজ, হৃৎস্পন্দন ও মস্তিষ্কের চাপ। ভালো খাবার পেলে ও ভালো ঘুম হলে এসবই সেরে যায়। এর মধ্যে আমি অদ্ভুত কিছু দেখছিনে।"

উত্তরে পুরনাইয়া বলল, "না, মীর সাদিক, তুমি ভুল করছ। আমি ঐ ভয়ার্ত মানুষদের মধ্যে বিলক্ষণ পরিবর্তন দেখলাম। এই দুর্গের প্রাচীরের আড়ালে চার দিন চার রাত্রি থেকেও তারা কোনো প্রবোধ পেল না, অবশেষে তাদের সব আত্মীয়-বন্ধুর বিয়োগের বেদনা দূর হয়ে গেল সুলতানের উপস্থিতিতেই, এইটেই যেন তাদের সান্ত্বনা। আমি তোমাকে বলছি, সুলতানের মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি আছে। মহীশূরের প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি তার সম্মুখে আনা যায়, সে যদি তাদের কিছু বলে, হাত দিয়ে যদি তাদের স্পর্শ করে, তাহলেও সকলকে শক্তি দান করা হয়ে যাবে বলে মনে করি।"

"এও কি তুমি বিশ্বাস কর যে, ইংরেজরা তাহলে দুর্গের কাছ থেকে সরে যাবে, ফিরে যাবে যে-যার গৃহে? না হে বন্ধু, তা নয়। হাতের স্পর্শের জাদু নয়, আসল শক্তি হচ্ছে বন্দুকের চোঙ। যে অদ্ভুত শক্তির কথা তুমি বলছ, বলো তো তার দ্বারা কোন্ উপকার হবে? এই দেশের সীমানায় পা দিতে ইংরেজদের কি তা বাধা দিতে পেরেছে? শত্রুরা এখন আমাদের দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে। যে অদ্ভুত শক্তির কথা তুমি বলছ তা কি ওদের প্রতিরোধ করতে পারবে?"

পুরনাইয়া চুপ করে রইল, মৃদুগলায় বলে যেতে লাগল মীর সাদিক, "আমাকে ভুল বুঝো না। অন্য-সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি সুলতানকে, তোমার চেয়েও হয়তো বেশি। কিন্তু বাস্তব ব্যাপারের প্রতি আমি অন্ধ নই।"

"মীর সাদিক," পুরনাইয়া বলল, "আমরা অন্য কথায় এসে পড়লাম। আমি যুদ্ধের অবস্থার কথা বলছিনে, সুলতানের উপস্থিতি যে প্রবোধ ও সান্ত্বনা এনে দেয়, সেই কথাই বলছি।"

মীর সাদিক উত্তরে বলল, "তাহলে তুমি অপ্রাসঙ্গিক কথাই বলছ। দুর্গের পাশের প্রান্তর থেকে তুমি শত্রুদের দেখতে পাচ্ছ, এ সময়ে তুমি সেইসব শরণার্থীদের ও ভবঘুরেদের কথা বলে সময় নষ্ট করছ—যারা দলে-দলে এখানে এসে আমাদের অসুবিধেকে আরও চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার যদি হাত থাকত তাহলে আমি ফটক বন্ধ করে দিতাম ওদের সামনে, তুমি নিয়ে এসেছিলে ঐ আশ্চর্য আদেশ, ঢুকতে দিতাম মাত্র তোমাকেই।"

"ওসব হচ্ছে সুলতানের আদেশ।"

"যার সংগে নিঃসন্দেহে তুমিও একমত।"

"তা সত্যি।"

"কেন বলো তো? আমাদের সৈন্য-চলাচলে বাধা দানের জন্যে, আমাদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ করার জন্যে?"

"না। এই রাজ্যের মানুষদের রক্ষা করার জন্যে।"

"কিন্তু রাজ্যটিকে রক্ষা করার জন্যে নয়?"

"রাজ্যের মানুষ ও রাজ্য উভয়েই প্রায় এক, এর একটি বাদ দিলে অন্যটির অর্থ হয় না।"

"বয়স বাড়লে আমরা শিশু হয়ে যাই, তাই না, পুরনাইয়া? বিশ্বাস কর, রাজ্যকে বাঁচাতে হলে দরকার হয় বর্বরতার, দরকার হয় ত্যাগের—প্রথমেই দরকার নিজের মানুষদের ত্যাগ করা। আপন জনের রক্তপাত করতে না-পারলে শত্রুর রক্তপাত করতে পারবে না। বর্বরতা এমনই জিনিস যার অভ্যাস করতে হবে নিজ-ঘরে, তার পরেই তা প্রয়োগ করা যাবে অন্যের প্রতি।"

"বর্বরতার খাতিরেই বর্বরতা! রক্তপাতের জন্যেই রক্তপাত! কিন্তু কতদূর পর্যন্ত?" মৃদু হেসে পুরনাইয়া বলল।

"বিশ্বাস কর, পুরনাইয়া, রক্তপাতই হচ্ছে শক্তির বুনিয়াদ। রক্তের নদীতে যে-দেশ ভেসে না-গেছে সে দেশ বা সে জাতি কি কখনো বড় হতে পেরেছে? জনতা ভালোবাসবে শাসককে, তার বদলে শাসক জনতার উপর ত্যাগের মহিমা চাপাবে।—এতেই আসে শক্তি। ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা দিচ্ছে শাসক—এটা অর্থহীন যুক্তিহীন, এ ধরনের বিনিময়-ব্যবস্থা হচ্ছে আত্মনাশের সামিল। সভ্যই হোক বা বর্বরই হোক—প্রত্যেক মানুষ চায় একজন মনিব। যে মনিব তার জন্যে ভাববে, তাকে শাসন করবে, তাকে শেকল পরাবে, তার জন্যে যুদ্ধ করবে, তার জন্যে মরবে পর্যন্ত। নেতার জন্যেই জনগণ আছে, এর উল্টোটা ঠিক নয়। এটা আমি বুঝেছি যে, জনগণ তাদের নেতাদের জন্যে মঞ্চ তৈরি করে দেবে যাতে তারা তার বক্তৃতা শুনতে পায়, ঘোষণা জানতে পারে। নেতারা যাতে বড়-বড় চাকুরিয়া বহাল করতে পারে, যাদের দৌলতে তারা বেশ মনোরম জীবন যাপন করতে পারবে, এমন ব্যবস্থা করে দেবে জনগণ। ত্যাগ-স্বীকার করাই মানুষের একমাত্র অধিকার, অন্য কোনো অধিকার তার আর নেই। অনেক স্লোগান দিয়ে, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেতারা জনগণের মন চাঙ্গা

রাখবে, তাদের নিত্যদিনের চাহিদা পূরণের শপথও জানাবে—তাতেই জনগণ উল্লসিত হয়ে উঠবে, কিন্তু এসবই যদি নিষ্ফল হয়ে যায় তখনই বন্দুকে বা তরবারিতে শক্তি দেখিয়ে জনগণের অনুগতা দাবি করা হবে।"

পুরনাইয়া বলল, "তরবারির শক্তি কি মানুষের মন জয় করতে পারে?"

"এ-পৃথিবীতে তা পারে। স্বর্গে বা নরকে পারে কিনা জানিনে। কিন্তু অচিরেই আমরা তা জানতে পারব।"

"অচিরেই? যথা?"

মীর সাদিক দুর্গপ্রাচীরের সেই দিকে হাত নেড়ে দেখাল যেখানে ইংরেজরা তাদের সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছে।

মীর সাদিক বলল, "আমাদের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে নিশ্চয়ই তুমি মনে কর না। শত্রুরা যদি এতটাই এসে পড়তে পেরেছে, এই দুর্গ কি তাদের রুখতে পারবে?"

"কিন্তু, মীর সাদিক, আমরা এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী। ওরা ওখানেই তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিঃশেষ করবে, রসদ ফুরিয়ে ফেলবে, মনোবল ভাঙবে। ঈশ্বর জানেন আমরা ওদের প্রলুব্ধ করে এখানে আনিনি, কিন্তু তারা কি বিনা-বাধাতেই সব জয় করে নিতে পারবে? অসম্ভব। এক বা দুই মাসের মধ্যেই তারা শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। এ অবরোধ সফল হতে পারে না। সব নেতৃত্ব এখন সুলতানের। আমাদের প্রাচীর সুরক্ষিত, সেরা সৈন্য এখানে মোতায়েন।"

"আমাদের সেরা সেনা অন্যত্রও ছিল," বলল মীর সাদিক. "কিন্তু কী হল সেখানে? তুমি কি ভেবেছিলে ইংরেজরা এত দ্রুত এখানে পৌঁছতে পারবে?"

"তা ভাবিনি অবশ্য।" বলল পুরনাইয়া একটু বিচলিতভাবে।

চোখে একটু তামাশার ভাব এনে মীর সাদিক বলল, "আমার সঙ্গে এস, পুরনাইয়া।"

তারা এল দুর্গের বাইরে, চন্দ্রের আলোকে তারা দেখতে পেল শত্রুর সৈন্য সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

মীর সাদিক বলল, "এ হচ্ছে একটা সমুদ্রের মত। আর আমরা আছি এক অভ্যন্তরে, আর ভাবছি সুলতানের রহস্যজনক প্রভাবের কথা।"

পুরনাইয়ার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে মীর সাদিক বলে যেতে লাগল, "না, আমি প্রভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছি না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়

এই প্রভাবের দাম কতটা আমি তাই ভাবছি। মানুষের মনের উপর এ প্রভাব অবশ্যই আছে, সকলের কল্যাণের উপরই এ প্রভাবের মূল্য আছে। যাদের এ প্রভাব আছে তারা কখনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে না, সাম্রাজ্য গড়ে না। তারা প্রতারিত হয়, তাদের ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, মস্তক ছেদন করা হয়, অথবা হত্যা করা হয়। যারা নিজেদের অমৃতের পুত্র বলে, ঈশ্বরের দূত বলে, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন না। আমার মনে হয় ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পৃথিবীতে তাঁর দূত যখন খ্যাতি ও সম্মান ভোগ করতে থাকে, তখন ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন, এই জন্যে তার বিপদে তাকে কখনো রক্ষা করেন না। বল পুরনাইয়া", মীর সাদিকের কণ্ঠে কৌতুকের আভাস ফুটে উঠল, "এই তত্ত্বকথা কি তোমাকে বিরক্ত করে তুলছে"

'তত্ত্ব কথা! আমার মনে হচ্ছে তোমার কথা কুৎসার মত, অনেকটা রাজদ্রোহের মত। একটা কথা পরিষ্কার হল, তা হচ্ছে সব আশা তুমি ছেড়ে দিয়েছ, এই যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে তুমি ভীত। আমার ইচ্ছে, অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমি একটু সংযম দেখিয়ো। ভয় হচ্ছে ব্যাধি, সংক্রামক ব্যাধি।"

মীর সাদিকের কথায় এবার আন্তরিকতা ফুটে উঠল, আর তামাশা নেই তাতে। সে বলল, "পুরনাইয়া তুমিই মাত্র একজন যার কাছে আমি আমার মন মেলে ধরতে পারি, মনের সব কথা ফাঁস করতে পারি। আমি যা বললাম তা কেবল তোমার জন্যেই, অন্যদের কাছে আমি নীরব। আমাদের দুজনের মধ্যে কি ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে? আমার মধ্যে রাজদ্রোহিতা নেই, তুমি জান। টিপু সুলতানের জন্যে আমি মরতে রাজ, সে ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু তুমি আমার উদ্বেগ তো বুঝেছ।" শত্রুরা যেদিকে আছে সেদিকে হাত নেড়ে সে বলল, 'বিনা-বাধায় তারা এসে গেছে এখানে। এতদূরই যদি তারা এসেছে, যাবে তারা কত দূর? কোথায় তারা থামবে? আমার জন্যে আমি ভীত নই, আমি ভীত টিপু সুলতানের জন্যে। তুমি যেন বলেছিলে শেষ পর্যন্ত তরবারিকে জয় করবে আত্মশক্তি? তা সত্যি, কিন্তু সুলতান, কি তুমি বা আমি কি সেই পরিণতি দেখার জন্যে থাকব? ভেবে দেখ পুরনাইয়া, শত্রুরা এতদূরে এল কী ক'রে?"

"ওসব কথা ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন্ কাজ আগে করণীয়? নিশ্চয়ই শত্রুকে আটকে রাখা, এগোতে না-দেওয়া, তাদের ক্লান্ত করে

দেওয়া। এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য। আমরা সেই দিকেই মনোযোগ দিই। তুমি যে প্রশ্ন করছ তা অবান্তর নয়। আশা করি এর উত্তর কোনো-একদিন দিতে পারব। কিন্তু ফটকের ওপারে যে শত্রু জমায়েত হয়েছে তাদের মোকাবিলায় নিযুক্ত হওয়াই এখন প্রধান কাজ। তাই না?"

"তাই।" উত্তর দিল মীর সাদিক।

মীর সাদিক চলে গেল, তার মুখে সেই ঠান্ডা ক্রোধের ভাব আর নেই। বৃথাই হল তাদের এত কথা, যেজন্যে মীর সাদিক এত কথার অবতারণা করল তার ফল হল কী? সে বুঝেছে পুরনাইয়া ভয়ের শিকার হয়নি।

মীর সাদিক নিজেকেই প্রশ্ন করেছে, "বেশ, বেশ, যারা নত হবে না তাদের গতি কী হবে? তারা ভাঙবে।" নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজে দিয়েই সে বিজয়ীবীরের মত হাসল, মানবজাতির চিন্তার জগতে এমন অসামান্য সত্য এর আগে কেউ যেন আর আবিষ্কার করেনি।

## ৭৩. আমাদের হত্যা করা হয়েছে

মীর সাদিকের এই একটি মাত্রই প্রশ্ন "শত্রুরা এতদূর এল কী করে ?"

এ প্রশ্ন পুরনাইয়ারও, কিন্তু সে তা মীর সাদিকের কাছে স্বীকার করেনি।

প্রশ্নটা তাকে তার আশুকর্তব্য থেকে বিচ্যুত করেনি, কিন্তু তার চঞ্চল মন সর্বদাই ঐ প্রশ্নে জর্জরিত। এর অনেক উত্তরই তার মনে এসেছে। কিন্তু তা তেমন স্পষ্ট নয়। সে তা পরিষ্কার করে নিতেও পারেনি, কথায় প্রকাশ করতেও পারেনি। কারো সঙ্গে আলোচনা করতেও সাহস করেনি। তার মনের এইস প্রশ্নের উত্তরের গতি-প্রকৃতি সে জানত। তার মনে এসব এমন হতাশার সৃষ্টি করেছে যা নাকি সে কারো কাছে বলবে না।

শত্রুরা এতটা পথ এল কী ক'রে ? এই ভীষণ প্রশ্নটা রয়েই গেল। টিপুর মনেও আছে এই প্রশ্ন। সে বিষন্ন, এতজন তাকে ছেড়ে গেল ? কামার-উদ-দিন, সৈয়দ সাহেব ও মীর সাদিক দলত্যাগীদের যে তালিকা তৈরি করছে তা দিন-দিনই দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কামার-উদ্-দিন, সৈয়দ সাহেব এবং আরো অনেকের সঙ্গে এখন তার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন। তারা সব এখন কোথায় ? টিপু সুলতান পুরনাইয়াকে এই প্রশ্ন করল—

"ওরা কোথায়—আমার কম্যাণ্ডাররা ও অনুগত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা ?"

মাথা নত করল পুরনাইয়া। চুপ করে রইল। এর উত্তর দেবার দরকার বোধ করল না। সে জানত কথা না-বলেও সে তার মনের ভাব টিপুকে জানাতে পারে। টিপু বলে যেতে লাগল—

"তোমার মনের উদ্বেগের কথা জানি, তোমার মনের প্রশ্ন কী তাও জানি। তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছ—শত শত জায়গায় আমাদের কম্যাণ্ডাররা শত্রুকে ধরে রাখতে পারত, তবু কেন তাদের এই পাগোলের মত পশ্চাৎ অপসরণ ? পথে অত সংরক্ষিত দুর্গ একে-একে ছেড়ে আসার হেতু কী ? শত্রুদের প্রচুর লোকক্ষয়, তাদের খাদ্যের অভাব, অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি, সৈন্যের দৈন্য—এসব রিপোর্টের তাৎপর্য কী! এসব অর্থহীন সংবাদ আমাকে পাঠাবার অর্থ কী! আমাদের কি বলা হয়েছিল না যে, ইংরেজের দুই বাহিনী সম্মিলিত হতে পারবে না ?

তাদের যা ক্ষতি করা হয়েছে তা মারাত্মক? প্রত্যেক দিন কি একজন দূত এসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেয় নি যে, কোন্ পথে চলেছে শত্রুরা? হঠাৎ আমরা দেখলাম বিপরীত দিক থেকে কাতারে কাতারে শত্রুসেনা এসে পৌঁছচ্ছে! এ কথা কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের কম্যাণ্ডারেরা হঠাৎ কাপুরুষ হয়ে গেল বা দ্বিধাগ্রস্থ হল, কিংবা এর চেয়েও জঘন্য কিছু মনে করতে হবে আমাদের? মনে করতে হবে কি শ্রীরংগপত্তম পর্যন্ত তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে শত্রুদের?"

গলার স্বর ছিল শান্ত, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছিল তার হৃদয়ে কতটা বেদনা।

পূরনাইয়া বলল, "এতটা···এতটা আমি ভাবিনি।" সে জানত না সে কি বলতে যাচ্ছে, হঠাৎ সে থামল, তার পব চাপা গলায় সে বলল, "এসবের উত্তর কি তুমি জান?"

"মনে হচ্ছে—জানি।" উত্তর দিল টিপু সুলতান। তার পর চিন্তামগ্ন হল সে। এই অদ্ভুত যুদ্ধের কথা সে ভাবতে লাগল, শত্রুরা যার একটাতেও জয়ী হতে পারেনি, তবুও তারা দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করেছে। তার বিশ্বস্ত কম্যাণ্ডারদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে তাদের সৈন্য সহ, এমনকি পৌঁছে গেছে শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের ফটকে। তার পর সে তাকাল বিমর্ষ পূরনাইযার দিকে, বলল, "এসবে যদি তুমি কোন সান্ত্বনা পাও যদিও পাবার কথা নয়, তবে আমি বলি তোমার সংগে আমি একমত।"

পূরনাইয়া তার অভিমতও জানায়নি, অভিপ্রায়ও জানায়নি—তাই টিপুর মন্তব্যের অর্থ সে বুঝল না। টিপু তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বলল—

"তুমি একসময়ে বলেছিলে না যে, বাইরের কোনো শক্তি আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না?"

"তাই কী?" হঠাৎ বলে ফেলল পূরনাইয়া।

"তা ঠিক এই—কোনো বাইরের শক্তি আমাদের পরাস্ত করতে আসেনি। বিপদটা আমাদের মধ্যেই, অসুখটা আমাদেরই মধ্যে—শত্রুও এখন আমাদের মধ্যে।"

"শত্রু আমাদের মধ্যেই", যেন কথাটার মানে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই পূরনাইয়া মৃদুস্বরে পুনরাবৃত্তি করল।

"বাইরে থেকে কেউ এ দেশ জয় করতে পারবে না। এ দেশ পরাজিত হবে ভিতর থেকে।"

"কিন্তু কেন ?" পুরনাইয়া অবান্তর প্রশ্ন করল, অবশ্য এর উত্তর তার জানা।

"কেন ? আমাদের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, আমরা সাহসে কম নই, আমরা বুদ্ধিতে ও বোধিতে কম নই, বিক্রমে ও উদ্যমেও আমরা কম নই। এমনকি চতুরতাতেও আমরা কম নই—এর অনেক নজির আছে। কথাটা হচ্ছে একতা। সত্যকে আমরা সকলে এক ভাবে দেখিনে। এমনকি আমাদের দেশের এই সংকটকালে, যখন আমাদের গৌরবোজ্জ্বল এই দেশের স্বাধীনতা এমন বিপন্ন, তখনও যে যার মত চলেছে, অনৈক্যের পথ ধরে চলেছে। এমন এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ ছিল একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী, জগতের কাছে সত্যের ও প্রেমের বাণী সে প্রচার করেছে। তার পর নতুন যুগ এল, এল অন্ধকার যুগ—এ দেশ তখন নিজেকে স্বমহিমায় আর ধরে রাখতে পারল না, লালসা লোভ চক্রান্ত ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের উস্কানি দিল। এর ফলে আমরা ক্ষুদে-ক্ষুদে আক্রমণকারীর শিকার হয়ে গিয়েছি, যারা এসেছে আমাদের লুণ্ঠন করতে। আজকের এই সংকটের দিনে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছ, এবং এতে ভবিষ্যতেরও শিক্ষা লাভ করছ। আমি তোমাকে বলে রাখছি, ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হবে, যদিও তার অনেক আগেই তুমি ও আমি চলে যাব।"

পুরনাইয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু টিপুর ইশারায় থামল।

টিপু বলে যেতে লাগল, 'আমরা বিনষ্ট হয়ে যাব, তার অনেক পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আমাদের রক্তে উর্বরা হবে এই মৃত্তিকা, এখানে দেখা দেবে এমন নারী ও পুরুষ যারা সব রকম ত্যাগস্বীকারে ব্রতী হবে। তারা ইংরেজদের সাম্রাজ্যের শক্তি ও দম্ভ তুচ্ছজ্ঞান করবে, সে সাম্রাজ্য ধূলিধূসরিত করবে। তারা আক্রমণকারীদের প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করবে, এবং মুক্ত হয়ে যাবে ভারতবর্ষ। কিন্তু মুক্ত হওয়াই শেষকথা নয়। আমার মনে এই প্রশ্নই জাগে—ভারতবর্ষের চেহারা তখন কেমন থাকবে? আমাদের দেশবাসী কি অতীত থেকে কিছু শিক্ষা নেবে, অথবা অনৈক্যের পুরাতন পথ ধরেই চলবে ? এবং ধ্বংসের মুখোমুখি হবে ? ভারতের আত্মাকে কি তারা সঞ্জীবিত রাখবে, অথবা সাম্প্রদায়িক ভাষাগত উপজাতিগত ছোটখাট বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে ? তারা কি এমনভাবে প্রদেশ বা রাজ্য গড়বে যাতে পরস্পর ঢিল-ছোড়াছুড়ি করবে, অথবা ব্যক্তিগতভাবে সম্মিলিতভাবে

সমবায়-ভিত্তিতে একই লক্ষের দিকে এগিয়ে এদেশকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দেবার চেষ্টা করবে?"

পুরনাইয়া বলল, "এখন কি ভবিষ্যৎ ভাবার সময়?"

"আমার মন সর্বদাই ভবিষ্যৎ ভাবে। এর আবরণ সরিয়ে আমার পছন্দমত অলংকারে তাকে সজ্জিত করতে চায়। তবু সন্দেহ জাগে মনে—আমরা কি চিরকাল এই রকম থাকব? এই নির্বুদ্ধিতা, এই স্বার্থপরতা, লোভে লুব্ধ হওয়া—এখন যা দেখছি তাই কি চিরকাল পিছু ধাওয়া করতে থাকবে? ভারত-বর্ষের এক অংশ কি অন্য অংশের চোখ উপড়ে দিতে চাইবে? প্রতিবেশী প্রতি-বেশীব বিরুদ্ধে, ভাই-ভাইয়ের বিরুদ্ধে যাবে? এর যে কোনো একটা প্রদেশ কি একাই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে যাবে? একটা আঞ্চলিক ভিত্তিতেই কি তারা তাদের পরিচয় দেবে? ভারতবর্ষের প্রতিটি অংশই কি সেই সব ব্যক্তির খপ্পরে থাকবে যারা নিজেরা নীতিভ্রষ্ট ও উচ্চাভিলাষী, যারা বড়-বড় স্লোগান ও স্তোকবাক্য দিয়ে লোকেদের ভোলাবে, তাদের ত্যাগস্বীকার করতে বলবে, আর নিজেদের পকেট ভারি করে চলবে? তা যদি হয় তাহলে অনেকেই পরস্পরকে প্রতারণা করবে, পরস্পরকে ঘৃণা করবে, আমি দেখতে পাচ্ছি এমন হলে এই দেশে কী দুর্দশা দেখা দেবে। তখন কোনো বিদেশী শক্তির একটা খেলার সামগ্রীই হয়ে উঠবে এ দেশ।"

"এখন দূরের অতীত বা সুদূর ভবিষ্যৎ দেখার কিন্তু সময় নয়।" পুরনাইয়া অনুনয়ের মতন করে বলল, 'আমি অনুরোধ করছি তোমার মন এখন বর্তমান অবস্থার দিকে ফেরাও।"

"বর্তমান অবস্থা!" টিপু প্রতিধ্বনির মত বলল, "বলেছি আমাদের অপদস্থ হবার সময় এসে গেছে। এই ভূমি—যাকে আমি আমার আত্মার চেয়েও বেশি ভালোবাসি সেই দেশ এখন এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর মুখোমুখি। আমাদের হত্যা করেছে—হ্যাঁ, আমাদের ঘরের শত্রুরা।"

## ৭৪ আমাদের দেশের ভাগ্য

সুলতানের কথা শুনেছে পুরনাইয়া তার মনে চলেছে আলোড়ন। আমাদের পতনের সময় আসন্ন। টিপু সুলতান বলেছিল। সে আরও বলেছিল, আমাদের হত্যা করা হয়েছে। হতাশার সংগে পুরনাইয়া নিজেকেই প্রশ্ন করল— সুলতান কি তবে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে? শত্রুর কামান নিস্তব্ধ। অল্পক্ষণ বাদে রাত্রির অবসান হবে, কামানও গর্জে উঠবে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে সহস্র কামানের গর্জন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, "শত্রু আছে দুর্গের বাইরে ভিতরে নয় আমরা তাদের ওখানেই আটক রাখতে পারি। আমাদের জীবন থাকতে তারা আমাদের জয় করতে পারবে না।"

উত্তরে টিপু বলল, "হ্যাঁ তা তারা পারবে না। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ পারবে না। এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। এ কথাও বলতে পারি যে, ওদের আক্রমণ প্রতিহত করেই আমি মরব।"

"ও কথা বোলো না টিপু, বৎস আমার।"

হঠাৎ এমন অন্তরঙ্গ সম্বোধন সে করল কী করে, টিপুর সিংহাসনে আরোহণের পর এমন তো সে করেনি।

"সময় ও পরিস্থিতি বিলম্ব সয় না, পুরনাইয়া। আমি তাদের গতি পরিবর্তন করতে পারিনে।"

"এমন যদি হয় যে তোমার জীবন বিপন্ন হয়েছে, তখন দুর্গ ত্যাগ করতে হবে তোমাকে। তার ব্যবস্থা হয়ে আছে।"

"জানি। আমি তা বাতিল করে দিয়েছি।"

"কেন। কী জন্যে"

'পুরনাইয়া, একটু আগে তুমি বললে আমাদের জীবন থাকতে তারা আমাদের জয় করতে পারবে না। এখন বিপরীত কথা বলছ কেন?"

"বিপরীত কিছু নয়। আমি আমার জীবনের কথা বলেছি আমার সহকর্মীদের জীবনের কথা বলেছি—বলেছি আমাদের অফিসার, আমাদের সৈন্যদের কথা, তোমার কথা বলিনি।"

"অন্যের জীবনের চেয়ে আমার জীবন দামী - এই ধারণায় ?"

"হ্যাঁ। তাই। তুমি আমাদের রাজা, রাজমুকুট তুমি মাথায় দাও, রাজদণ্ড তোমার হাতে, মশাল বহন কর তুমি। তোমার মধ্যেই আমাদের সব আশা ও স্বপ্ন। তুমি না-থাকলে কী থাকে ? তোমাকে অন্যত্র যেতে হবে।"

"অন্যত্র ? কোথায় ? কী করতে ? অপমান ও পরাজয় বিলম্বিত করতে ? বিজয়ীর হাতে চুম্বন করে বলতে যে আদরের সংগে আমাকে শৃঙ্খলিত করা হোক ? একজন সৈন্য যদি মরতে পারে, তবে এ কথা কেন ধারণার বাইরে যে, রাজাও মরতে পারে ?"

"সৈন্যদের সহচর হচ্ছে মৃত্যু।"

"বর্তমানে সমস্ত ভারতবাসীর সহচর হচ্ছে মৃত্যু।"

টিপু বলে যেতে লাগল, "না, পুরনাইয়া, আমার কাছে আগে যা মনে হয়েছিল সম্ভাবনা, এখন তা প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। আমার যে-কোনো সৈন্যের মতনই আমিও মৃত্যুবরণ করব। ত্যাগ কি কেবল তাদেরই একচেটিয়া ? কোন্ অধিকারে আমি সৈন্যদের মরতে বলব আমি নিজেই যদি আমার জীবন বিসর্জন দিতে না-পারি ? একটা বিপর্যয়ের মুখে কেবল কি রাজাই যাবতীয় দুর্দশা ও আত্মত্যাগ থেকে অব্যাহতি পাবে ? আর কেনই বা বিলম্ব করা হবে, যখন দেখা যাচ্ছে এ'তে কোনো লাভ নেই ? যদি অনর্থক জীবন আঁকড়ে বসে থাকি তাহলে লোকে আমাকে বিদ্রূপ করবে। একটি ব্যাঘ্রকে কি শৃগালের মত আচরণ করতে বল ?"

"ওরকম কিছু বলিনি।" পুরনাইয়া একটু তপ্ত ভাবে বলল, তার পর ধীরে ধীরে সে জানালে, "ভারতবর্ষের মহত্বের ও গৌরবের জন্যেই আমি তোমাকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি।"

"ভারতবর্ষের গৌরবের ও মহত্বের জন্যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভুলে যেয়ো না এজন্যে মৃত্যুও বরণীয়।"

পুরনাইয়ার মুখের ব্যাকুল ভাব দেখে টিপু একটু অভিভূত হল, সে হাত বাড়িয়ে পুরনাইয়ার কাঁধে হাত রাখল, "আমাকে যারা ভালোবাসে তারা আমাকে আমার প্রকৃতির বিরোধী এমন উপদেশ কেন দেয় ? জীবন কি এতই মূল্যবান, মৃত্যু কি এতই ভয়াবহ ? মৃত্যুকে আমি নবজাগরণ বলে মনে করি। ধরা গেল জীবন মূল্যবান, তাহলে জীবনের চেয়েও যা বেশি মূল্যবান, সে কারণে জীবন উৎসর্গ করাই দরকার। কেন তুমি ও মীর সাদিক আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছ ?"

পূরনাইয়া কান খাড়া করল, "আমি যা বলেছি মীর সাদিকও কি তোমাকে তাইই বলেছে?

"ঠিক তা নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে তারও একটা প্ল্যান আছে। সে মনে করে পৃথিবীর ব্যাপার আমি মেনে নিই, এর সঙ্গে রফা করি, জীবনে যা পাব তাই নিয়ে জীবনধারণ করি।"

"তার উপদেশটা কী ছিল?" অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল পূরনাইয়া।

ইংরেজের সঙ্গে সমঝোতায় আসি —এই তার পরামর্শ।"

"কিন্তু বরাবর তুমি সে চেষ্টা করে এসেছ। কিন্তু তাদের শর্ত ছিল অসম্ভব রকমের।"

'হ্যাঁ, ঐ অসম্ভব শর্তেই রাজি হতে পরামর্শ দিয়েছে মীর সাদিক।"

"ইংরেজদের তাঁবেদার হয়ে থাকতে! তাদের বশ্য হয়ে তাদের শিকলে বাঁধা হয়ে থাকতে!"

'দেখ, তোমার গলা চড়ছে, কিন্তু তোমার উপদেশটাও এর থেকে বিশেষ পৃথক নয়, যখন নাকি আমার জীবনরক্ষার কথা তুমি বলছ।"

পূরনাইয়ার মুখে ও মনে একটা পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করল। চিন্তান্বিত ও ম্রিয়মাণ ভাব দূর হল। যে মারাত্মক প্রশ্নের উত্তর বছরের পর বছর ধরে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল তা যেন তার কাছে ধরা দিল।

"টিপু, মৃত্যু ও অমর্যাদার মধ্যে কোন্‌টা তুমি বেছে নেবে তা আমি জানি। তোমার এ কাজে যদি বাধা দিই তাহলে আমি তোমার কাছে আমার নিজের কাছে, এবং যাদের এতদিন বিশ্বাস করে এসেছি সবার কাছে অবিশ্বাসী বলে মনে করব নিজেকে। যদি চাও, জীবন বিসর্জন দাও। যে-কোনো ভারতীয় শাসকের চেয়ে তুমি সাহসের সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে পেরেছ, মৃত্যু যদি আসে তাতে তোমার কোনো দুঃখ নেই, কেননা, টিপু, তুমি বেঁচে থাকবে, চিরকাল বেঁচে থাকবে। এই গর্বিত ও স্পর্শকাতর জাতিকে দাস করার জন্যে যে ভয়ংকর শত্রু তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছ।"

টিপু হাসল, "তোমার চমৎকার বক্তৃতার জন্যে ধন্যবাদ। অনেক সময় তুমি এমন ভাব দেখাও যেন সূর্য উঠছে আমার মাথার উপর, অস্তও যাচ্ছে আমার মাথাতেই। আমাকে মাত্রার বেশি উঁচুতে তুলো না, এই অনুরোধ। আমরা রাজার ও সাধারণ সৈনিকের কর্তব্য নিয়ে কথা বলছিলাম। কোনো পদাধিকারীকে বা

পদমর্যাদাকে খাতির করে না মৃত্যু। রাজপুত্র বা দেবতুল্য ব্যক্তিকে সে মানুষের মূল্য দেয়। একজন রাজার ও একজন সৈনিকের মৃত্যুর মধ্যে তুমি কি কোনো তফাত দেখতে পাও?"

"মানুষের স্মৃতিতে—ভবিষ্যৎকালের পটে—বিক্রমশালী রাজার আত্মত্যাগের কথা মুদ্রিত থাকে।"

টিপু জিজ্ঞাসা করল, "পরাভূত নৃপতির কথাও কি থাকে না?"

"জয় বা পরাজয়—ওসব হচ্ছে সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার। একটা জাতির আত্মত্যাগই বড় কথা। মর্যাদা ও মমতার সঙ্গে পৃথিবী মনে রাখে তার কথা। রণক্ষেত্রে কে জিতল? না, তার কথা নয়, যারা একটা আদর্শ রক্ষার জন্যে, একটা ন্যায়ের জন্যে লড়াই করে হারল—তাদের কথাই স্মরণ করে পৃথিবী। যে জাতির জন্যে তুমি জীবন বিসর্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত সে জাতি কি এই পথ পরিত্যাগ করবে? কখনো না। সে জাতি কি কখনো তোমাকে ভুলতে পারবে?

"এটা বুঝছ না কেন, আমাকে মনে রাখার প্রশ্ন না, যে আদর্শের জন্যে লড়েছি, মনে রাখবে সেইটে।"

"আমিও সেই কথাই বলছি। দেশের স্বাধীনতারক্ষা, নৈতিক মানের উন্নয়ন, এ দেশের মহত্ত্ব ও গৌরব—তোমার নামের সঙ্গেই যুক্ত।"

"না, পূরনাইয়া, না। আমিই প্রথম না, আমিই শেষ না। অতীতে অনেক বীর এদেশের মহত্ত্বের গুরুভার বহন করেছে, এর পরেও অনেকে এ ভার কাঁধে তুলে নেবে। আমাদের মধ্যে যে মহত্তম, এই জাতি তার চেয়েও বৃহৎ - কেননা যুগ-যুগ ধরে শত মানুষের ধারা এই দেশকে ক্রমে ক্রমে সঞ্জীবিত করে তুলেছে তাদের ধর্মে, তাদের শোণিতে, তাদের স্নেহে। ভবিষ্যৎকালের মানুষের উপর আমার আস্থা যদি না-থাকত, পতিত মশাল তারা তুলে ধরবে এ বিশ্বাস যদি মনে না-থাকত, যদি মনে করতাম এই জাতির প্রতি কর্তব্যপালনে তারা পরাঙ্মুখ হবে, তাহলে আমার হৃদয়ে শূন্যতার অনুভূতি হত, এবং ভয় হত—বুঝি বৃথায় যাবে আমার মৃত্যু। কিন্তু তা নয়। এমন দিন আসবে যখন আমাদের দেশের মানুষ সব ভয় সব ভীতি দূর করে দেবে। তা দূর হলেই, ইংরেজের অত্যাচারের ও প্রতারণার প্রাচীর ভেঙে পড়বে। এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ও আস্থা অসীম, সেইখানেই নিহিত রইল আমার স্বপ্ন, আমার আনন্দ, আমার শান্তি।"

## ৭৫. রাজদ্রোহীর রেখাচিত্র

চূড়ান্ত আঘাত আসার তিন দিন আগে পূরনাইয়া শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ ত্যাগ করে।

টিপু সুলতান পূরনাইয়াকে বলেছিল, "তোমার কাছে একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।"

"তুমি যা আদেশ করতে পার তার জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা কোরো না। যা চাও বলো, আমার ক্ষমতায় যা হয় তা করবই।" বলল পূরনাইয়া।

"তবে বলি, এসো, আমরা সঙ্গ ত্যাগ করি, এবং……"

পূরনাইয়া ঠিক বুঝতে পারল না, সে বলল, "তুমি তবে দুর্গ ত্যাগ করবে ঠিক করেছ?"

মাথা নাড়ল টিপু, বলল, "না। আমি কখনোই দুর্গ ছাড়ব না, কিন্তু তোমাকে দুর্গ ছাড়তে হবে।"

পূরনাইয়া টিপুর দিকে তাকাল, তার চোখে যেন একটু অবিশ্বাস, একটু উদ্বেগ। মহীশূরের উপর যে দুর্দশা আসছে তার জন্যে কি টিপু তাকে দায়ী করছে? সে চোখ নামাল যাতে টিপু তার উদ্বেগের আঁচ না-পায়, তার পর শান্ত গলায় সে বলল, "আমার উপর আস্থার অভাব যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কম্যাণ্ড থেকে অব্যাহতি দিতে পার, আমার সামরিক পদের চিহ্ন ছিঁড়ে নিতে পার, কিন্তু আমার এত দিনের কাজ আমাকে এ অধিকার দিয়েছে যে চূড়ান্ত আঘাত এলে তোমার সঙ্গে আমি মরতে পারব। আমাকে পরিত্যাগের কারণ কী ঘটেছে?"

"পূরনাইয়া, অনুগ্রহ করে আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। অনুরোধ করি, বাধা দিয়ো না। তবেই ভুল বুঝবে না। তোমার উপর আস্থার অভাব হবে কেন? তুমি অনেক দিয়েছ। সব দিয়েছ তুমি। একটা অনুগ্রহ তবু চাই। মন দিয়ে শোনো।"

স্তব্ধ হয়ে পূরনাইয়া টিপুর সব কথা শুনতে লাগল। টিপু তাকে সেদিনের আলোচনার কথা মনে করে দিল। ভিতরের শত্রুদের দ্বারা ভারতবর্ষকে হত্যা করার কথা। বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা এ দেশ কতটা দুর্বল হয়েছে, বাইরের লোকের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড হবার আগে কী ভাবে এ দেশকে বিষাক্ত করা হয়েছে।

"এখন আমরা যেন কিনারে পেঁছে গেছি, এখন দানবীয় শক্তি নিয়ে এসে গেছে শত্রু, তারা এই জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায়। আমরা পরাস্ত হবার পর কেউ কি ওদের বাধা দেবার জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে? না, কয়েক মাসের মধ্যেই অন্যান্য রাজ্যও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। শত্রুর অত্যাচার আরও বাড়বে, ভারতীয় শাসকদের দিয়েও তারা একাজ করাবে। যেমন নিজাম। তারা হবে তাদের হাতের পুতুল। তাদের আদেশ মেনে চলবে অনুগত ভৃত্যের মত, কোনো প্রশ্ন করবে না।"

এসব কথায় পুরনাইয়া বাধা দেয়নি। টিপু বলে যেতে লাগল, "এই জন্যেই আমি চাই তুমি দুর্গ ছেড়ে চলে যাও। আমি তোমার নিরাপত্তা চাই, মহীশূরের পরবর্তী শাসকের যেন তুমি কাজে লাগতে পার, তাকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে পার, ভারতের ঐক্যের স্বপ্ন সম্বন্ধে তাকে যেন অনুপ্রেরণা দিতে পার, যাতে পুনরায় মহীশূর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, মানুষের অধিকার নিয়ে যাতে কথা বলতে পারে।"

"কী করে সন্দেহ করছ যে যুবরাজের মধ্যে এই স্বপ্নই নেই?" পুরনাইয়া জিজ্ঞাসা করল. "সে বিফল হবে এ কথা ভাবছ কী করে? তোমার মতনই তাকে আমি জানি, সুলতান। আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এ বিষয়ে তোমার ভাবনা করার কিছু নেই। আমি স্বর্গ থেকে তার দিকে নজর রাখব, এটা আমি জানি যে, তাকে নিয়ে আমি গর্বিত।"

"তুমি কি বিশ্বাস কর যে, যুবরাজ আমার সিংহাসনে বসতে পারবে? ইংরেজরা যদি জয়ী হয় তবে তারা কি আমার রাজবংশ রক্ষা করবে? না, পুরনাইয়া, তারা সবই মুছে ফেলবে—আমার নাম, আমার পরিবার—সব।"

"যুবরাজকে না-হলে, তোমার বংশের কাউকে না-হলে, ইংরেজরা কাকে তোমার উত্তরাধিকারী করবে?"

"ইংরেজদের পক্ষে এটা বড় কোনো সমস্যাই নয়। তারা যে-কোনো অভিজাত বংশের কাউকে বেছে নেবে, কিংবা আত্মবিক্রয় করতে চায় দরবারের এমন কাউকে। কিংবা পুরাতন রাজবংশের কাউকে।"

"বেশ তো। তাহলে সেই নতুন শাসক আমাকে নিয়ে কী করবে? ইংরেজের কাছে নিজেদের যারা বন্ধক দিয়েছে তাদের মনে অনুপ্রেরণা জাগাব কী করে? তারাই-বা আমার কথা শুনবে কেন?"

"পুরনাইয়া, নিজের মূল্য তুচ্ছ কোরো না। এই রাজ্যের বাইরেও দক্ষ প্রশাসক রূপে তোমার খ্যাতি আছে। অনেকবার অনেক রাজকুমার তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। তুমি যদি চূড়ান্ত আঘাত আসার আগেই দুর্গ ত্যাগ কর তাহলে কেউই বুঝতে পারবে না যে আমার প্রতি তোমার আনুগত্য এত গভীর ছিল, তারা বুঝবে অন্য প্রভুরও তুমি উপযুক্ত কাজে লাগবে। এমনকি, ইংরেজরাও তোমাকে চাইবে। ইংরেজদের একটা গুণ আছে, তারা তাদের মনের মত ভৃত্য বেছে নিতে পারে।"

"টিপু, সাফ কথা বলো। যেমন বরাবর করেছ তেমনি স্পষ্ট করে বলো আমাকে। তুমি আমাকে প্রতারকের সাজ পরতে বলছ, যাতে আমি অন্য মনিবের কাজ পাই—এই কথাই কি তুমি বলতে চাও? পৃথিবী যাতে আমাকে বিশ্বাসঘাতক ও দলত্যাগী রূপে জানতে পারে, ইংরেজরা যাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মহীশূরের পরবর্তী শাসকের অধীনে কাজ করার সুযোগ দেয়? তুমি কি সত্যিই চাও যে, বিশ্বের কাছে আমি একজন জঘন্য রাজদ্রোহী ও বদমায়েশ রূপে গণ্য হই? আমার পরিজনদের সঙ্গে আমি আমার নিজেরও আত্মসম্মান বোধ ত্যাগ করি? আমার সারাজীবনের আনুগত্যের এই কি পরিণাম? তোমার পিতার ও তোমার কাছে কাজ করার এই কি প্রতিদান? জীবনের শেষ হতে চলেছে, এখন বিশ্বাসহন্তার সাজ পরতে তুমি বল?"

"যে সাজ ইচ্ছে পরো," দয়াহীন মমতাহীন গলায় বলল টিপু "এ'তে কী গেল-এল, যখন তোমার দেশ—এই জাতি—বিপদাপন্ন, হাঁটু গেড়ে বসেছে ক্ষত থেকে রক্তপাত হচ্ছে, তখন তুমি যদি তোমার বিবেকের কাছে সাফ থাক যে তুমি উচ্চ আদর্শ নিয়ে একটা জাতিকে বাঁচাবার জন্যেই এমন করেছ—তাতে ক্ষতি কি।"

"অসম্ভব প্রস্তাব তোমার। দলত্যাগী রূপে পরিচিত হতে আমি পারব না।"

"আমার মনোবাসনার প্রতিধ্বনির মতই তুমি একবার বলেছিলে যে, তোমার আত্মার চেয়েও তুমি বেশি ভালোবাস তোমার দেশকে। বলেছিলে না? তবে বলো, দেশের জন্যে কী ত্যাগ করতে ইচ্ছে করো? জীবন? অবশ্যই। কিন্তু ত্যাগের সেইখানেই ইতি। তোমার সুনাম বজায় থাক্—এটা চাও। এটা ত্যাগের বাইরেই রাখতে চাও, তাই না?"

"টিপু, আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর।" অনুনয় করে উঠল পুরনাইয়া, "তোমার কাজে না-লাগলে আমার জীবনের কোনো মূল্যই নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে

তোমার জীবন গেলে আমি তোমার পাশে থাকতে চাই। তোমাকে বাহুতে বাঁধব, কপাল মুছে দেব, রক্ত মুছে দেব, তোমার শরীর ধুয়ে দেব—তার পরে আর একটা দিনও আমি বাঁচতে চাইনে।"

পুরনাইয়ার এ কথায় টিপু অভিভূত হলেও তা গোপন করল, বলল, 'তবে এ কথা মেনে নাও যে তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে লড়ছি তার প্রতি অনুরাগ তোমার নেই।"

'এসব বিশ্লেষণ করার অবকাশ কোথায়? একই শত্রুকে একই উদ্দেশ্যে আমরা যদি বাধা দিতে গিয়ে মরি—তবে তাইই যথেষ্ট।"

"প্রত্যেক মানুষেরই নিজের একটা ভাগ্য আছে, পুরনাইয়া। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার ত্যাগ আশা করা হয়। পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার আসন্ন। অনতিবিলম্বেই ইংরেজরা চূড়ান্ত আঘাত হানবে। আমি জানি আমি অপরাজেয় নই, বেহেস্তের বিশেষ রক্ষাকবচও আমার নেই। আমি জানি আমি বিপদের মধ্যে আছি, এ বিপদ থেকে আমি পালাতে চাইনে। এ সম্বন্ধে আগেও আমরা কথা বলেছি। আমার অপরিবর্তনীয় ও অপ্রতিরোধ্য নিয়তি আমাকে আমার জীবনপাতের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—একজন ব্যক্তির জীবনের চেয়ে অনেক বড় একটা উদ্দেশ্য আছে এ'তে। কিন্তু তোমার…"

"আমারও তাই। সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হবে কেন?"

'মৃত্যু একটা সুযোগ নয়, পুরনাইয়া। এটা হচ্ছে প্রয়োজন। এটা বুঝে নিও। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি বাধা দিলে! পৃথিবী থেকে সরে যাবার জন্যে আমার সময় হয়ে আসছে, আমার মৃত্যু সন্নিকট। কিন্তু তোমার পক্ষে সে সময় এখনো হয়নি। তোমাকে এখন পথপ্রদর্শক হয়ে থাকতে হবে, এবং এ দেশের পরবর্তী শাসকদের সতর্ক করে দিতে হবে। এই জন্যেই তোমার বাঁচা দরকার।"

"তোমাকে ছেড়ে গেছি এই অপবাদ ও অভিযোগ বহন করে আমার বাঁচা হচ্ছে একটা অভিশাপের মত। লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে চরমতম প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছি। এর চেয়ে মৃত্যু কি শ্রেয় নয়?"

"তোমার মৃত্যুতে কোনো লাভ হবে না। এ'তে দেশের বেদনাই বাড়বে। আমাদের সম্মুখে এখন অনেক কাজ। উদ্দেশ্যটি যখন রয়েই গেছে তখন তুমি

মৃত্যুর কথা ভাবছ কী করে ? অনেক প্রতিশ্রুতি যখন পালন করতে হবে, অনেক কর্তব্য যখন অসম্পূর্ণ ? আমরা আমাদের নিজেদের জন্যেই সংগ্রাম করছি নে। তাহলে কেবল নিজেদের কথাই চিন্তা করি কী ক'রে ? সকাল যখন হবে —সকাল তো হবেই—তখন লোকে তোমার মত সহৃদয় মানুষের ভরসাই চাইবে যে নাকি ঘোর দুঃসময়ে জাতিকে পরিত্যাগ করেনি।"

পুরনাইয়া চুপ করে রইল। টিপু বলতে লাগল, "এক মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাস কোরো না যে মিথ্যারই চলন বেশি এবং সত্যকে তা চিরকাল কুয়াশ চ্ছন্ন করে রাখতে পারবে। ঈশ্বর করুন, সত্য বলার জন্যে তুমি বেঁচে থাকবে, তা যদি সম্ভব না ই হয়, তাহলে ইতিহাসকারেরা কি সত্যের ভিত্তি পাবে না ? নিশ্চয়, ইতিহাস তখন তোমার দিকে চাইবে, এবং দেশ তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।"

পুরনাইয়ার চোখ ঝাপসা হয়ে এল, সে যেন সুদূরে চেয়ে আছে। আর একবার সে নিজের কথা বলার চেষ্টা করল।

"তুমি মস্ত দাবি করে বসেছ। ওটা প্রত্যাহার করো।"

"আমি তোমাকে প্রথমেই বলেছি. আমি তোমাকে আদেশ করছি নে, আমি একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। আমি যখন থাকব না, তখন কোন্ অধিকারে আমি তোমার স্বাধীন কর্ম নিয়ন্ত্রণ করব ? তুমি যদি আমাদের এই অধঃপতিত দেশের নবজাগরণের জন্যে চেষ্টা করবে বলে জীবিত থাকো, তাহলে নির্ভয়ে আমি আসন্ন আঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকব, তার প্রতীক্ষা করব ; যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমার সে মৃত্যু হবে দেহ-গত, আশায় কম্পমান আমার আত্মা থাকবে জীবন্ত।"

এই কথোপকথনের দুই দিন পরে ভোর পাঁচটায়, যখন অন্ধকার পুরো কাটেনি, তখন শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ ত্যাগ করল পুরনাইয়া। টিপু সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে সে কেঁদেছিল। সে জানত এটাই তাদের শেষ সাক্ষাৎ। চোখ মুছে নিল সে, সোজা হয়ে দাঁড়াল, ফটক পার হল—শান্ত্রীরা খুলে দিয়েছিল ফটক। দুটো ঘোড়া নিয়ে তার ভৃত্য তার সংগে সঙ্গে গেল। এক্ষুনি গোলা পড়তে আরম্ভ করবে ব'লে প্রহরীদের প্রধান তাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলল। পুরনাইয়া ম্লান হেসে তাকে উদ্বিগ্ন হতে বারণ করল ! প্রহরী-প্রধান কী করে জানবে যে পুরনাইয়া ইংরেজদের গোলাগুলি সর্বান্তকরণে এখন প্রার্থনা করছে !

পুরনাইয়া চলে যাবার পরের রাত্রে মীর সাদিক কম্যাণ্ডারদের এক সভ ডাকল। তাদের কাছে সে এই ঘোষণা করল—

"টিপু সুলতান আমাকে এই আদেশ দিয়েছেন যে আমি যেন আমার নিজে কাজ ছাড়াও পুরনাইয়া সাহেবের যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করি। আমা দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই আমি মহীশূর-বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহ করলাম। পুরনাইয়া সাহেবের কাছে যাদের দায়দায়িত্ব ছিল এখন তার কেবলমাত্র আমার কাছেই দায়ী হবে। আমি অনেক পরিবর্তন সাধন করব টিপু সুলতানের ইচ্ছাতেই এ কাজ করব। আমি সকলের আনুগত্য চাইব ইংরেজদের আসন্ন আঘাত প্রতিহত করার জন্যে আমি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ঢে সাজাব। আমাদের নারীপুরুষদের অহেতুক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাব। আমি আবার বলি—আমি পরিবর্তন সাধন করব—অনেক পরিবর্তন। তোমাদে সহযোগিতা পেলে ভালো লাগবে, কিন্তু তার জন্যে প্রার্থনা আমি জানাচ্ছিনে আমি যা চাই তা হচ্ছে, আমার আদেশ সকলে সম্পূর্ণ ভাবে পালন করবে। এ কাজ করতে যে না-পারবে সে কর্তব্য পালনে অক্ষমতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে সে এর মূল্য দেবে তার মস্তক দিয়ে। তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বিশ্বস্তত আশা করি। এসব তোমাদের কাছে চাই, দাবি করি, টিপু সুলতানের নামে, যে অধিকার তিনি আমার উপর ন্যস্ত করেছেন সেই ক্ষমতায়।"

বৈঠক ভাঙল। এর আগে কম্যাণ্ডারদের সামনে এমন ভাষণ কখনো কেউ দেয়নি। মীর সাদিক না, পুরনাইয়া না, এমনকি টিপু সুলতানও না। তাদে কেন এভাবে প্যারেড গ্রাউণ্ডের আনকোরা সেপাইয়ের মত গণ্য করা হল?— এসব চিন্তা তারা করল। নীরবে তারা সভা ত্যাগ করতে লাগল। কেবলমা সাহসে ভর করে একটা প্রশ্ন করল রুদাদ খাঁ—

"মীর সাদিক, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি পুরনাইয়া সাহেব কোথায়?" এ প্রশ্ন সবারই মনের, উত্তর শোনার জন্যে সকলে দাঁড়িয়ে গেল।

মীর সাদিক বলল, 'পুরনাইয়া সাহেব কোথায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্যে এ সভা ডাকা হয়নি।"

সকলে চলে গেল, তাদের মন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মীর সাদিক উত্তর দিতে অস্বীকার করল কেন? পুরনাইয়া গেল কোথায়? এখনই বা সে কোথায়

সে কি তার প্রভুকে পরিত্যাগ করার ঝুঁকি নিয়েছে? পরস্পরের মুখের দিকে তারা চাইতে লাগল। তাদের সকলেরই মন এক ভৌতিক ভাবে পূর্ণ হল। প্রত্যেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে লাগল, কারো সঙ্গেই কারো যেন যোগ নেই, সকলেই একা ও অসহায়, এবং ভীত।

তাদের আস্তানায় এসে কেউ কেউ কাঁদতে লাগল। কোনো ব্যক্তিগত দুঃখে নয়, পুরনাইয়া দলত্যাগ করেছে জেনে সুলতানের মনে যে বেদনা জমে উঠেছে বলে তারা অনুমান করতে পারছে তারই সমবেদনায় এই কান্না। সে-চোখের জল ভালোবাসার, করুণার ও মমতার। আরো অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল—তাদের নিজেদের নিরাপত্তা, তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ, তাদের নিজেদের কল্যাণ। তাদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে এল।

## ১৬ শেষ দিন

মহীশূরের শেষ দিন এসে গেল। এত শীঘ্র এদিন এসে যাবে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। এই শহরের কপালে কী যে লেখা আছে, কেউ জানত না

এত তাড়াতাড়ি কী করে এল এমন দিন-- এত দ্রুত, এত সহসা ?

পুরনাইয়ার চলে যাবার পর সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের বদল ঘটে গেল। সেই দিন বিকালেই মীর সাদিকের আদেশে কয়েক দল সেনাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হল। তাদের সেনাদের কাছ থেকে অনেক কম্যাণ্ডারকে আলাদা করে ফেলা হল নূতন দলের ভার দেওয়া হল ; একটা আদেশ আসার সংগে সংগে বিপরীত আদেশ এসে গেল কিংবা আদেশটা আমূল পরিবর্তন করা হল। যেসব দল বছরের পর বছর একযোগে ছিল তা ছত্রখান করা হল ; অনেক সেনাকে তাদের কম্যাণ্ডারের সংগে যোগাযোগ রাখতে বলা হল, কিন্তু দুর্গে তাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। অবশেষে যদি পাওয়া গেল, দেখা গেল যে তাকেই অন্য জায়গায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আদেশের পর আদেশ আসতে লাগল, তাদের যোগফল দেখা গেল এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

সারা রাত কাজ করে চলেছে মীর সাদিক, কনুইয়ে ভর দিয়ে সে পরবর্তী আদেশ কী হতে পারে তা ভাবছে। অনেক সময় সে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো কোনো ঘাঁটি পরিদর্শন করছে। কম্যাণ্ডাররা তাকে বিপরীত আদেশের ফলে যে অসুবিধা ঘটছে সে সম্বন্ধে অনুযোগ জানাচ্ছে। সৈন্যদল ভেঙে দিলে কী কী অসুবিধে হবে, সে সম্বন্ধে কেউ তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে। মীর সাদিক তাদের দিকে করুণ ভাবে তাকাল, তার মুখের ভাব ও কথা বলার ভংগি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে এব্যাপারে তার কিছু করার নেই ; সে নিজেই আদেশেয় আওতায় পড়ে গিয়েছে, যা ঘটছে তা তারও ধারণার বাইরে। সকলেই দেখতে পাচ্ছিল যে এই বিক্রমশালী নিরলস ব্যক্তিটি ভয়ংকর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। তাকে দেখতে হচ্ছে সমগ্র সেনাবাহিনী ও যাবতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। সামান্য অভিযোগ নিয়ে তাকে বিব্রত করা কি ঠিক ? কম্যাণ্ডাররা চুপ করে রইল। কিন্তু গাজি খাঁ বাদে।

মাঝরাতে গাজি খাঁ মীর সাদিকের কামরায় ঢুকে পড়ল, এবং জানার দাবি জানাল মহতব বাগ থেকে সৈয়দ গফরকে কেন তার অধিনায়কত্ব রদ করা হল। দুর্গের একটা জরুরি জায়গা সেটা।

গাজি খাঁর কথায় গুরুত্ব না-দেওয়া মীর সাদিকের পক্ষে সহজ নয়, যে নাকি তার সহকর্মী, হাইদর আলির বিশ্বাসভাজন, টিপু সুলতানের সামরিক শিক্ষক ছিল, এবং এখন যে কিনা টিপুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ফৎ হাইদরের সামরিক অভিভাবক। হাত ইশারা করে বিনীতভাবে মীর সাদিক তাকে একটা চেয়ার দেখাল। গাজি খাঁ দাঁড়িয়ে রইল এবং পুনরায় প্রশ্ন করল।

মীর সাদিক বলল, "এখন অনেক কঠিনতম জিনিসের দাবি করা হচ্ছে আমাদের কাছে।"

উত্তরে গাজি খাঁ বলল, "ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।"

"ও, তোমার প্রশ্নটি? ভেবেছিলাম মহতব বাগ থেকে সৈয়দ গফরকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণটা স্পষ্টই বোঝা গেছে।"

"অনুগ্রহ করে খুলে বল।"

"গাজি খাঁ, নিশ্চয়ই জান, আমরা কী বিপদের মধ্যে আছি। সৈয়দ গফরকে আমরা চাই একেবারে দুর্গের অভ্যন্তরে। সে অনুগত, সাহসী, ও শক্ত মানুষ।"

"বুঝলাম। সেই জন্যে মহতব বাগ বুরুজের ভার দিলে শুসতারির মতন এক ভাঁড়কে। শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে মজবুত যে জায়গাটা সেটার এই দশা হল?"

"জয়নাল আবিদিন শুসতারি একটা ভাঁড় নয়, এটা তুমি জান।" মীর সাদিক বলল, "সে একটা নামকরা সামরিক গ্রন্থ লিখেছে 'ফৎ-উল-মুজাহিদিন' [ পবিত্র যোদ্ধাদের জয় ]।"

"পড়েছি। আমি আবার বলি, সে একটা ভাঁড়, আমি অনুরোধ করি, তাকে এক্ষুনি মহতব বাগ থেকে সরাও। সৈয়দ গফরকে পুনর্বহাল করা হোক সেখানে কম্যান্ডার রূপে।"

"আমাকে বিশ্বাস কর গাজি খাঁ, সৈয়দ গফরকে আমরা এখানে ভীষণভাবে চাই। সে দুটো জায়গার ভার একই সঙ্গে নিতে পারে না, এটা তো মানো?"

"মহতব বাগ যদি শত্রুর করুণার উপর ছেড়ে দাও, তবে দুর্গের মধ্যে তাদের প্রবেশকে ত্বরান্বিতই করা হবে। এটা ভয়ংকর ব্যাপার, এবং ভেবে দেখো, এটা নির্বোধ কাজ।"

"তোমার কড়া উক্তির জন্যে রাগ করছি নে, গাজি খাঁ। আমরা যে কাজে অনুপ্রাণিত, জানি, তুমিও তাই। কিন্তু তোমার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা রেখেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমি এখন সামগ্রিক ভাবে অধিনায়ক। এসব আদেশের দায়িত্ব আমার।"

"তাই বুঝি? আমার ধারণা ছিল টিপু সুলতানই সমগ্রভাবে যাবতীয় বাহিনীর অধিনায়ক।"

গাজি খাঁর ব্যঙ্গ বুঝতে পারল মীর সাদিক, বলল, "বটেই। সুলতানই সর্বসর্বা। তার নামেই সৈয়দ গফরের অব্যাহতির আদেশ দেওয়া হয়েছে।"

"তার জ্ঞাতসারে?"

"এধরনের আদেশ তাকে না-জানিয়ে, তার অনুমোদন না-নিয়ে কি জারি করা যায়?"

এ কথা শুনে গাজি খাঁর মাথা হেঁট হল, মীর সাদিক বুঝল যে এক বিরক্তিকর আলোচনার শেষ হল এখানে। কিন্তু তা হবার নয়।

গাজি খাঁ বলল, "বেশ, তবে তার সঙ্গেই কথা বলা যাক।"

"কার সঙ্গে?"

"টিপু সুলতানের সঙ্গে?"

"এতে এগোবে কতটা?"

"তার আদেশ প্রত্যাহার করতে তাকে বলা হবে।"

"এ সময়ে সুলতানকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে মনে কর? তার কি যথেষ্ট উদ্বেগ নেই?"

"উদ্বেগ? তোমাকে বলে রাখি, শুসতারি যদি মহতব বাগেই বহাল থাকে তবে সুলতানের উদ্বেগ ক্রমশই বাড়তে থাকবে।"

"তুমি ভাবছ যথেষ্ট বিবেচনা না-করেই দেওয়া হয়েছে এ আদেশ?"

"নিশ্চয়। আমি তো বললাম এটা একটা নির্বোধ সিদ্ধান্ত হয়েছে।"

"এ কথা সুলতানকে বলতে চাও?"

"শোনো, মীর সাদিক, কোনো কঠিন সংবাদ বা নির্মম সত্য কখনো কি সুলতানকে ভীত করেছে? শেষ সিদ্ধান্ত তার—এটা সত্য। কিন্তু সমালোচনা বা বিরোধিতা কি সে সর্বদা চেয়ে আসেনি? আমাদের মত তার সামনে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে কি সে বলেনি? এখন আমরা চুপ করে থাকি কী করে? একটা অন্ধও বুঝতে পারবে মহতব বাগের গুরুত্ব কতটা। শুসতারির মতন একটা

ভাঁড়'কে সেখানকার দায়িত্ব দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এক ভয়ংকর সর্বনাশ ডেকে আনা। কোনো সন্দেহ নেই যে, সুলতান যে আদেশ তোমাকে দিতে বলেছে তা একেবারে ভুল—এ কথা তাকে আমরা বলব। এ আদেশ সম্বন্ধে আমার কি অভিমত জানতে চাও ?"

"অনুগ্রহ করে বল। বিনীত ভংগীতে সহাস্যমুখে বলল মীর সাদিক, "যদি বসে-বসে বল তবে অনুগৃহীত হই।'

গাজি খাঁ একটা চেয়ারে বসল।

'মীর সাদিক, তুমি মদ্যপান কর না, সুলতানও করে না। অন্যথায় আমি বলতাম—একটা অত্যদ্ভুত আদেশ দেবার পরিকল্পনা করেছিল দুই মাতাল।"

খুবই যেন মজার কথা শুনল, এইভাবে হাসল মীর সাদিক, বলল, "এখন আমাদের কী করণীয় ;"

"চলো, সুলতানের কাছে যাই, এ আদেশ রদ করিয়ে আনি।"

"এখন ?"

"নিশ্চয়।"

"আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাল হবে।"

' আগামী কাল হয়তো বড়ই বিলম্ব হয়ে যাবে।"

"তোমার কোনো বদল হল না, গাজি খাঁ।" মীর সাদিক একটু তোয়াজ করে বলল, "সত্যিই এবার বুঝলাম। কিন্তু সুলতানকে এখন বিরক্ত করে দরকার নেই। আমি কি করব তোমাকে জানাব। সৈয়দ গফরকে আমি ডেকে পাঠাব, তাকে অবিলম্বে মহতব বাগের দায়িত্ব নিতে বলব। কিন্তু কাল সকালে তুমি ও আমি সুলতানের সংগে দেখা করছি। সে যদি রাজি না হয়, সৈয়দ গফরকে আমরা ফিরিয়ে দেব আগের জায়গায়, কিন্তু আশা করি সুলতান রাজি হবে। ভেবে দেখ সুলতানের সংগে আমি তেমন পরিষ্কার করে কথা বলতে পারিনে—আমার আরও জোরালো আপত্তি জানানো উচিত ছিল। কিন্তু এখন আমরা তাকে বিরক্ত না-করলাম। কী বল ?"

"সৈয়দ গফর'কে তার জায়গায় পাঠিয়ে দিলেই হয়।"

"এক্ষুনি পাঠাব।"

' ধন্যবাদ।"

তারা করমর্দন করল, গাজি খাঁ হাত ছাড়াবার আগেই শুনল সান্ত্রীকে ডেকে সৈয়দ গফরকে খবর দিতে বলছে মীর সাদিক।

গাজি খাঁ চলে যাবার জন্যে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে মীর সাদিক তাকে থামতে বলল। "তোমার আস্তানায় কখন থাকবে?" জিজ্ঞাসা করল সে।

"ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই। কেন?"

"কম্যাণ্ডাণ্ট মীর নাদিম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই।"

"তার এখন মতলব কী?"

"সেইটেই আলোচনা করতে চাই। কিছু কাগজপত্র আমার হাতে এ'সে পেঁছেছে।"

"বিশ্বাসঘাতকতা?

"তাই মনে হয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তা ছাড়া তিন-চার জন লোক তার সম্বন্ধে মারাত্মক খবর দিয়েছে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি তাদের সংগে মিলিত হচ্ছি। তাদের সঙ্গে কথা বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এমনও হতে পারে, তাদের আমি সংগে করে তোমার কাছে নিয়ে যাব।"

গাজি খাঁ বলল, "তেমন যদি ইচ্ছে কর, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে আমি তোমার কামরায় এসে যেতে পারি।"

"না। আমিই যাব তোমার কাছে। আমার ঘরে যাওয়া-আসা অনেকে লক্ষ করে। মনে হয় তোমার কামরায় অন্য-কেউ থাকবে না।"

"আমার ভৃত্য ছাড়া, আর প্রহরী ছাড়া কেউ না।"

"তাদের আজ ছুটি দিয়ে দাও।"

"তাদের উপর নির্ভর করা যায়, বিশ্বাস রাখা যায়।"

"তবুও···কম্যাণ্ডাণ্ট মীর নাদিমকেই যদি সন্দেহ করা হচ্ছে, তবে আমরা কি বলতে পারি কে আছে সন্দেহের ঊর্ধ্বে? তাদের ছুটি দাও, বা কোনো কাজ দিয়ে অন্যত্র পাঠাও।"

"তারা তাহলে ভাবতে পারে আমার এই বুড়োবয়সে কোনো মহিলা হয়তো আসবে আমার ঘরে। আমার সুনাম তুমি নষ্ট করছ, জান?"

"এর উলটোই কিন্তু। এ'তে তোমার পৌরুষ সম্বন্ধে বরাবরের সুনাম আরও বেড়ে যাবে।"

"কখন তোমাকে আশা করব?"

"এক ঘণ্টা পরে। একটু দেরি হলে অপেক্ষা কোরো।"

দু ঘণ্টা বাদে গাজি খাঁর দরজায় একটা টোকা পড়ল। দরজা খুলল গাজি খাঁ। মাথা নত করে ঢুকল চার জন, তাদের মধ্যের একজন গাজি খাঁর হাতে

সীল-করা একটা খাম দিল। "মীর সাদিক তোমার কাছে এসে এটা তোমাকে দিতে বলল।"

"মীর সাদিক কোথায় ?" বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করল গাজি খাঁ।

"একটু বাদেই আসবে। ইতিমধ্যে এই কাগজপত্রে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে বলেছে।"

খামটা নিয়ে গাজি খাঁ টেবিলের কাছে গেল, সেখানে ছিল লণ্ঠন। আগন্তুক-রাও তার সংগে সংগে এসে তার পিছনে দাঁড়াল। গাজি খাঁ খাম খুলে তার ভেতরের কাগজপত্র বের করতে যাচ্ছে এমন সময়ে এক লোহার হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘা পড়ল তার মাথায়, তার খুলি ফাটিয়ে দিল। গাজি খাঁ বাধা দিতে গেল। লণ্ঠন আঁকড়ে ধ'রে সে তার আক্রমণকারীদের দিকে ফিরল। যে লোকটা তাকে খাম দিয়েছে তার মুখের উপর মারল লণ্ঠনের ঘা। লোকটার আর্তনাদ সে শুনে খুশি হল, ইতিমধ্যে অন্য তিনজন তাকে ঘিরে ধরে লোহার পাইপ দিয়ে পিটতে লাগল। পা ভাঁজ করে সে পড়ে গেল মেঝেতে। কোন যন্ত্রণা সে বোধ করল না কেবল ক্রোধ ও অসহায় ভাব তাকে আচ্ছন্ন করল। তারপর সব শান্ত। সে মারা গেল।

মীর সাদিকের আদেশ অনুসারে, ভোর হবার অনেক আগে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মহীশূরের গোলন্দাজেরা শত্রুর ঘাঁটির উপর কামান দাগতে আরম্ভ করল। কর্তব্যের খাতিরে ইংরেজরাও পালটা গোলা চালাল। সকাল হবার অনেক পরে গাজি খাঁর লাশ পাওয়া গেল যেখানে ইংরেজরা ভীষণ ভাবে গোলা ফেলেছে, সেখানে।

দেহটা ধোয়া হল, সজ্জিত করা হল। কিছুক্ষণের জন্যে তা রাখা হল রাজকীয় টেবিলে। যারা তাকে ভালোবাসত তারা দক্ষ শিল্পীর মত সাজালো সেটা তার শেষ যাত্রার জন্যে। জীবদ্দশায় সৈন্য হিসাবে যে সাহস বিক্রম আভিজাত্য ও মর্যাদায় সে বিশিষ্ট ছিল তা ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা হল। একটা খোলা শবাধারে রাখা হল সেই মৃতদেহ যাতে সবাই তাকে দেখতে পারে ও শেষ নমস্কার জানাতে পারে।

খুব বেদনার সংগে মীর সাদিক টিপু সুলতানের কাছে এই শোকবার্তা জানাতে গেল। টিপু সুলতান নীরবে শবাধারের সামনে প্রার্থনা করল। তার পর নত হয়ে তার কপালে চুম্বন করল। তার চোখে জল ছিল না। কিন্তু যখন কথা

বলতে গেল তখন কণ্ঠস্বর কাঁপল। সামান্য কয়েকটা কথাই সে বলল, "তুমি আমাকে প্রান্তর ভেদ করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলে। তাই না?" শবাধারের দিকে চেয়ে সে বলল।

মীর সাদিক যে অগ্রবর্তী ঘাটি পরিদর্শনে গেল সেখানেই বলল, "আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ো না। অনেকে দলত্যাগ করেছে বলে তোমরা চিন্তিত আছ জানি, কিন্তু তোমাদের মনোবল অটুট রাখ। এখনো বিস্তর লোক আছে যারা নিজেদের কর্তব্য করবে ও সুলতানের গৌরব ও ত্যাগের আদর্শ শিরোধার্য করবে।"

গৌরব ও ত্যাগ! চমৎকার কথা। এসব কথা সে বলতে লাগল আনুষ্ঠানিক নিয়ম অনুসারে। আর কোনো কথা দিয়ে কাউকে, এমনকি নিজেকেও, সে অনুপ্রাণিত করতে পারবে না বলেই ঐ কথা তার মুখে। কাউকে আতঙ্কগ্রস্ত না-হতে সে বলছে, কিন্তু যারা শুনছে তাদের মনে বিপরীত ক্রিয়া হচ্ছে। আতঙ্ক কি এতই ছড়িয়ে পড়েছে যে মীর সাদিককে ঐ কথাই উচ্চারণ করতে হচ্ছে? দলত্যাগীর সংখ্যা কি এতই বেশি? আগে তারা এসব না-জানলেও এখন তা জানতে পারছে। যাদের মন বিচলিত ছিল না তারাও বিচলিত হয়ে উঠছে। মীর সাদিক যখন কথা বলত তখন খুবই চাপা গলায় ও শোকার্ত ভঙ্গিতে বলত, পাছে কেউ শুনতে পায়। যেদিকে ইংরেজদের ঘাঁটি সেদিকে প্রথমে তাকিয়ে, তার পর তার চারদিকের লোকজনের প্রতি তাকিয়ে কথা বলত। অবশেষে সে তাকাত বিপরীত দিকে, তাতে বোঝা যেত যে, সে জানে তার সঙ্গীসাথিরা পালিয়ে গেছে যত দূরে পালানো যায় আত্মগোপন করেছে যত গভীরে তা করা যায়। কেউ যদি বিশেষ কোনো প্রশ্ন করত তবে তার যা উত্তর দিত তা অস্পষ্ট ও এড়িয়ে যাবার মত—যেন তার কোনো রকম প্ল্যান নেই, যেন সে সব ব্যাপারেই ভীত। কিন্তু যখন সে তার আস্তানায় থাকত তখনই মাত্র তার মনে সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরে আসত। তার পর সে নিজেকে আড়াল করত কাগজপত্র দিয়ে টিপু সুলতানের কাছে পাঠাবার জন্যে মস্তমস্ত রিপোর্ট ও কম্যাণ্ডার ও সেনাদের জন্যে আদেশের পর আদেশের স্তূপ সেসব।

প্রত্যেক কম্যাণ্ড পোস্টে মীর সাদিক আদেশ পাঠালো যে, রাত্রি বা দিন—যে-কোনো সময়ে যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ আরম্ভ হতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সৈন্যদের সাজপোশাক ও অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত রাখা হল। দৃশ্যটা মনোহর, কিন্তু

দুই দিন ( ও রাত্রি ) পরে সৈন্যরা বিবর্ণ বিশীর্ণ ক্লান্ত হয়ে গেল, তাদের চোখের চার ধারে কালো দাগ পড়ে গেল। তাদের যথেষ্ট সাজা হয়েছে বটে। সূর্যাস্তের পর পনেরো মিনিট অন্তর যে ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগল তারা অভিসম্পাত করতে লাগল তাকে, যে রাত্রির প্রহরীরা যথারীতি ড্রাম পিটে সকলকে সতর্ক করে বেড়ায়, তাদেরও অভিশাপ দিতে লাগল তারা। তাদের শরীর, শিরা-উপশিরা সবই ক্লান্ত। তাদের চোখেমুখে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। কর্তব্যকাজের প্রতি, জয়ের প্রতি, গৌরবের প্রতি আকর্ষণ আর তাদের নেই। তারা বিশ্রামের জন্যে ব্যস্ত, গার্হস্থ্য শান্তির জন্যে লালায়িত। অনেকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে চলে গেল অন্যেরা গেল তাদের পিছন-পিছন। বিন্দু-বিন্দু করে যা পড়ছিল তা-ই নিল বন্যার রূপ। দলে-দলে আরম্ভ হয়ে গেল দলত্যাগ।

শুসতারি যুদ্ধে লিপ্ত না-হয়েই মহতব বাগ বুরুজ ইংরেজের হাতে তুলে দিল। মূল দুর্গ আক্রমণ করা ইংরেজদের কাছে সহজ হয়ে গেল। তবুও মহতব বাগে টিপু সুলতানের পতাকা উড়ছে, দুর্গের কেউ জানতে পারল না যে ওর পতন ঘটেছে। কিন্তু মীর সাদিক জানত। সে ডেকে পাঠাল সৈয়দ গফরকে।

মীর সাদিক তাকে বলল, "মহতব বাগ নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন।"

"সত্যিই ?" তার কথায় একটু ব্যঙ্গ মিশ্রিত ছিল, সেখান থেকে তাকে সরানো হয়েছে, এ'তে অপমানই করা হয়েছে।

"হ্যাঁ।" ব্যঙ্গ যেন বুঝতে পারল না মীর সাদিক, "মনে হচ্ছে শুসতারি আমাদের ডোবাবে।"

"ও, না না। আমার মনে হচ্ছে এখনো সে একটা নতুন বই লিখতে মশগুল। শুনলাম, সেটা একটা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম হবে। বিশ্বাস কর, শুসতারি আমাদের ডোবাবে না। সাহিত্যের ব্যাপারে মহীশূর হবে সকলের ঈর্ষার পাত্র।"

"তামাশা কোরো না সৈয়দ গফর। সেখানে আমরা তোমাকে চাই। পুরনাইয়া চলে গেলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় টিপু সুলতানের মনে। তার বেদনার কথা ভাবো, তার ভয়ের কথা চিন্তা করো। তার বিশ্বস্ত অফিসারদের সে যদি তার কাছে চাইত, এটা কি তার দোষ ? সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, হাতের কাছে শক্ত মানুষ ও শক্তিমান হৃদয় ছিল তার কাম্য। তোমাকে সে চাইলে আমি

আপত্তি করিনি, যদিও জানতাম যে, মহতব বাগে তোমাকেই দরকার, শুসতারিকে নয়।"

সৈয়দ গফর অভিভূত হল। তবুও সে জানতে চাইল, "কিন্তু এতজনের মধ্যে থেকে শুসতারিকে বেছে নিলে কেন? তার কলমে জোর আছে ব'লে?"

"এক দিন বা দুদিন বাদে ফিরিয়ে আনতে গেলে আপত্তি করতে পারে ব'লে আমি ওখানে খুব যোগ্য লোক পাঠাতে চাইনি। আমি এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী একটা ব্যবস্থা করেছিলাম, যার মেয়াদ আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি হবে না।"

তার মনের আশা দমন করে সৈয়দ গফর বলল, "এখন?"

"এখন তুমি আবার মহতব বাগের ভার নেবে। শুসতারিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমার হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে।"

সৈয়দ গফর বেশ আনন্দের সঙ্গেই বলল, "আশা করি সে ইতিমধ্যে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়নি।" তার মনে একটা চিন্তা এল, বলল "পুরনাইয়া চলে গেলে আমাকে তুমি এখানে ডেকেছিলে। এখন গাজি খাঁ নেই—ঈশ্বর তাকে শান্তি দিন। এ বিষয়ে সুলতানের কী ইচ্ছা?"

"তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তার হৃদয় এখন লৌহকঠিন। সে জানে মহতব বাগ রক্ষা হলেই আমাদের নিরাপত্তা। তার আদেশ-বলেই আমি তোমাকে মহতব বাগে যেতে বলছি।"

"আমি এক্ষুনি যাব।"

"এক ঘণ্টা পরে যাও। শুসতারিকে আমি বলেছি ঠিক দুটোর সময় তাকে ছেড়ে দেব। আমি আমার কথা রাখিনি—এ কথা যদি সে তার কোনো বইতে লেখে, তবে ভবিষ্যৎকাল আমাকে ক্ষমা করবে না।" একটু হেসে বলল মীর সাদিক।

"ও, সে কথা আমরা কখনো বলতে দেব না। সময়ানুবর্তী নই বলে আমিও যেন গাল না খাই।" উত্তর দিল সৈয়দ গফর।

এক ঘণ্টা পরে সৈয়দ গফর মহতব বাগের দিকে রওনা হল। সে তার জায়গায় পৌঁছনো মাত্র বুরুজের কামান, এখন যা ইংরেজের হাতে, তার উপর গর্জে উঠল। প্রথম গোলা তার দুই পা উড়িয়ে দিল। চিত হয়ে পড়ে গেল সে, রক্তাক্ত সে। তার দুই চোখ খোলা। কামান নিক্ষেপ করতে লাগল গোলার পর গোলা। সে আর তা শুনতে পেল না। তার চারদিকে যে গোলা পড়ছে, তাও সে দেখতে পেল না। সে কেবল তার উপরে অসীম আকাশ দেখতে লাগল।

একটু পরেই সে চোখ ঘোরালো। দেখতে পেল, সুলতানের পতাকা বুরুজের উপর থেকে নেমে আসছে, সেখানে উঠছে ইংরেজের পতাকা। সে উঠতে চেষ্টা করল, প্রতিবাদ জানাতে চাইল। সে নড়তেও পারল না, আর্তনাদও করতে পারল না। এক অসহ্য বেদনায় মুহ্যমান হল সে। চোখ খুলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগল, সুলতানের পতাকা আবার উঠবে, ইংরেজের পতাকা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে শপথ করতে লাগল, ততক্ষণ সে মরবে না। অনন্ত আকাশ তার আচ্ছাদন হয়ে রইল, সে কল্পনা করতে লাগল, অজস্র পতাকা উড়ছে আকাশে। সে পতাকার রং বা তার চিত্র সে দেখতে পেল না, কিন্তু সে নিশ্চিত যে সে-পতাকা তার—তার দেশের পতাকা। সেই শান্তির মুহূর্তে ও নিশ্চিতভাবে একথা জেনে যে—চিরকাল ঐ পতাকা উড়বে, সে মারা গেল নিজের মনের প্রশান্তির মধ্যে।

"আমরা নিয়মানুবর্তিতার অভাবের ও দলত্যাগের হিড়িকের মধ্যে পড়েছি।" মীর সাদিকের কাছে অনুযোগ করল কম্যান্ডারেরা।

"সেজন্যে আমাকে দোষী করছ? আমি একজন সৈন্যকেও পরিচালনা করি নে। তোমরা আছ কিসের জন্যে?" এই হল মীর সাদিকের উত্তপ্ত জবাব। কিন্তু একটু পরেই তার সুর নরম হয়ে এল, বলল, "আমি জানি, আমিই সর্বেসর্বা। দোষ আমার—একা আমারই। আমি একাই এই গুরু দায়িত্ব পালন করব।"

"দায়িত্ব আমাদের সকলের।" ভাস্কর বলল।

"ধন্যবাদ।" উত্তরে বলল মীর সাদিক, তারপর নিজেরই সেই পুরাতন প্রসঙ্গে বলল, "ইঁদুরেরা দলত্যাগ করছে, করুক। ওরা বেরিয়ে গেলে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব। যারা সরে পড়তে চায় তারা কি কখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারে? না। তাদের উপস্থিতিটাই আমাদের দুর্বলতা এনে দেয়। যাই হোক, এ জন্যে চিন্তা কোরো না। দু-এক দিনের মধ্যেই এই কাপুরুষেরা পালাবার সুযোগ আর পাবে না।"

"কী করে? তাদের আটকাবার কোনো পন্থা বের করেছ কি?"

"দুর্গের চারদিকে লৌহবেষ্টনী আঁট হয়ে বসছে। সর্বত্র ইংরেজরা তাদের কামান-বন্দুক বসাচ্ছে। দুর্গের যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো দিকে কেউ পালাবার চেষ্ট করলেই তাকে গুলি মেরে শেষ করে ফেলা হবে।"

"তা কেন? ইংরেজরা তো দলত্যাগই চাইবে।"

"তারা কী করে জানবে কে প্রকৃত দলছুট লোক? দু-একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা পাকা করে আমি কয়েকটি লোক নিয়ে গড়া কয়েকটি দল চারদিকে পাঠাব। কেউ-কেউ দলছুটের বেশ নিয়ে যাবে, কেউ কেউ নিয়ে যাবে শান্তির পতাকা, কারো-কারো সঙ্গে থাকবে আগ্নেয়াস্ত্র, ইংরেজদের ঘাঁটিতে তারা গুলি ছুড়ে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এ'তে ইংরেজরা নিখাদ দলছুটদের ও ছদ্মবেশী লড়ুকের মধ্যে তফাত বুঝতে পারবে না।"

"মীর সাহেব, সুলতান কি শান্তির পতাকার এ ভাবে ব্যবহার অনুমোদন করবে?" ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, "ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত ছোট দল পাঠিয়ে কী লাভ হবে? আমাদের সাহসী বীরদের পাঠাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে?"

"মৃত্যু সর্বত্রই আছে, আমাদের চতুর্দিকেই আছে। খোলা জায়গায় কেউ মরতে পারে, কেউ মরতে পারে এই দুর্গের ভিতরেই। এর আর পার্থক্য কি?"

হা ঈশ্বর, ভাস্কর ভাবতে লাগল, মীর সাদিকের মনের নেপথ্যে কি এই ব্যাপার আছে যে, আমরা এখানে আছি সবাই কোতল হবার জন্যে। না, যে কথা সে বলেছে তা অন্য, তা ভিন্ন। সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল ভাস্কর, তার মনে হল সবাই যেন একই চিন্তায় মগ্ন।

ভাস্কর অনুনয় জানিয়ে বলল, "ইংরেজদের বন্দুকের সামনে ও-রকম অরক্ষিত দল পাঠাবার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করে দেখা কিন্তু দরকার।"

"আমি এখনো পাকা সিদ্ধান্ত নিইনি। আমি কেবল তোমাদের সঙ্গে একটু সশব্দে চিন্তা করছিলাম।"

"এত বড় জনসমাবেশে এ কথা বলায় এর গোপনীয়তা কিন্তু রক্ষিত হবে না —সাহেবের সঙ্গে এটা আমায় বলতে দাও। এখানে কী কথা হচ্ছে ইংরেজরা তা জানার ব্যবস্থা করে রেখেছে।" ভাস্কর বলল।

যেন কিছু বুঝতে পারেনি এই ভাবে ভাস্করের দিকে তাকাল মীর সাদিক, বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ পুত্র। আমাকে মনে করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতক আমাদের মধ্যেই আছে।"

ভাস্করের আরও কিছু বলার ছিল, "আমার আরও মনে হচ্ছে বিভিন্ন দিকে এই রকম ইউনিট পাঠাবার জন্যেই এই দলত্যাগ বাড়ছে। কম্যান্ডাররা জানে না কারা তাদের সৈন্য, সৈন্যরা জানে না কে তাদের কম্যান্ডার। অনেক সেনাদলই তাই ভেসে বেড়াচ্ছে, কেউ জানে না কে তাদের জন্যে দায়ী।"

মীর সাদিক বলল, "ঠিকই বলেছ। সেনাদল এভাবে পাঠানো বন্ধ হচ্ছে।

তারা যেমনকার তেমনি থাকবে। এ সম্বন্ধে আমি সুলতানের সঙ্গে কথা বলেছি।
এ কথা বলেই হঠাৎ সে চলে গেল।

মীর সাদিক চলে যাবার পর কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ চিন্তায় মগ্ন। মীর সাদিক ঠিক কী কথা বলে গেল তা তারা ভাবতে লাগল। সে কথায় এমন কিছু ছিল না, কিন্তু সকলের মনেই ভয় আরও বেড়ে গেল। সে ভয় ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে আরম্ভ করল, মীর সাদিকের কথাগুলো তাদের কানে যেন আওয়াজ তুলতে লাগল—মৃত্যু আমাদের চতুর্দিকে আছে ; যারা থেকে যাবে তারা নিহত হবে ; যারা এখনই ছেড়ে না-যাবে তারা আর যেতেই পারবেনা ; লৌহবেষ্টনী দুর্গের চারদিকে ক্রমশ আঁট হয়ে আসছে। লৌহবেষ্টনী। লৌহবেষ্টনী। লৌহ···

মীর সাদিককে টিপু সুলতান বলেছিল, "সোনা, রুপো, ও আরও অনেক ধনরত্ন দুর্গে জমা আছে। এসব সরানো হচ্ছে না কেন ? গত সপ্তাহে এগুলি সরাবার কথা বলেছিলাম।"

"অনেক সময় আছে আমাদের।"

"তবুও। একটু বুঝদার হলে হয় না ? পরে আর সময় না-পেতেও পারি। আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইনে—তা যতই কম হোক—এসব ইংরেজের হাতে যাতে না-যায় তা দেখতে হবে।"

"তা কখনোই যাবে না। দু-এক দিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে ওগুলি সরিয়ে ফেলব, তাড়াহুড়ো করতে চাইনে, তাতে সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠবে।"

"ভালো। কিন্তু যা বললে তাই কোরো। দু-এক দিনের মধ্যেই সরিয়ে ফেল।"

বলরাম বলতে লাগল, "আবার বলছি, সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

প্রহরীদের ক্যাপ্টেন জাফর আলি বলল, "অনুরোধ করছি, আমাকে অস্বস্তিতে ফেলো না। মীর সাদিকের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে এস।" জাফর আলি হচ্ছে বলরামের পুরনো বন্ধু, কিন্তু তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মীর সাদিকের হুকুম না পেলে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না সুলতানের কাছে।

বলরাম বলল, "কিন্তু মীর সাদিক অগ্রাহ্য করে দিয়েছে আমার আবেদন।"

"দুঃখের সঙ্গে আমাকেও তাই করতে হচ্ছে।"

"এটা জীবনমৃত্যুর ব্যাপার, জাফর।"

"বিনা-হুকুমে তোমাকে যেতে দিলে আমার জীবন ও আমার মৃত্যু নিয়েও ঐ একই কথা।"

"সুলতানের কাছে যেতে দেওয়া বারণ হল কবে থেকে?"

"গত দু দিন থেকে।"

"কার আদেশে? সুলতানের, না, মীর সাদিকের?"

"ওরা দুজন একই সুরে কথা বলে।"

"কিন্তু কেন?"

"কিসের কিন্তু, কিসের কেন? একই সুরে ওরা কেন কথা বলে?"

"না হে গর্দভ। বলছি সুলতানের কাছে যেতে না দেওয়ার অর্থটা কী।"

"বলরাম, তুমি এমন হাঁদা কেন? হাজার রকমের কাজ আছে সুলতানের। দুর্গ অবরুদ্ধ! আমরা বিপন্ন। এটা বুঝছ না? খাবার বা বিশ্রাম করার সময় পাচ্ছে না সুলতান। তার সংগে দেখা করতে আসছে শতশত লোক, বিস্তর রিপোর্ট তাকে পড়তে হচ্ছে, অনেক চার্ট খুঁটিনাটি করে দেখতে হচ্ছে। সৈন্যদের পরিদর্শন করতে হচ্ছে, অনবরত সলাপরামর্শ করতে হচ্ছে মীর সাদিকের সঙ্গে, এবং অন্যান্যদের সংগে। তবুও তোমার মত লোক এসে জানতে চায় আগের মত সুলতানের কাছে যাওয়া এখন কেন সহজ নয়! সুলতানের কাছে যাওয়া নিষেধ করে মীর সাদিক যে আদেশ দিয়েছে, তা ন্যায্যই হয়েছে।"

"কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আমার গুরুতর কথা বলার আছে?"

"তুমি তো সর্বদাই গুরুতর। অসুবিধেটা এই যে, তুমি অনবরতই আয়নায় মুখ দেখ, সেইজন্যে পৃথিবীকে পরিহাস করতে জান না। বেশ, গুরুতর যদি কিছু থাকে তবে মীর সাদিককে বলছ না কেন? হাজার হাজার লোককে সুলতানের কাছে পাঠাচ্ছে। তোমাকেই বা পাঠাবে না কেন।"

"সে চেষ্টাও করেছি। আমার বলা কথায় সে কান করতে চায় না। সুলতানের সংগে দেখা করতেও দেয় না। আমার কথা সে শুনবেই না।"

"আমাকেও তার মতই বিজ্ঞ তবে হতে হবে, তোমার কথায় আমিও কান দেব না।"

"কিন্তু ব্যাপারটা ভীষণ। দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছে, একথা সুলতানকে কেউ বলছে না।"

'সত্যিই কি দুর্গের প্রাচীর ভেঙেছে ?',

"হ্যাঁ। নিজের চোখে দেখেছি।"

'সত্যিই তবে ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু সুলতানকে এখবর দেওয়া হয়নি এমন মনে কোরো না। প্রতি ঘণ্টায় মীর সাদিক রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। এখবরটাই বা দেবে না কেন।"

"তবে তা দেখার জন্যে প্রাচীরের কাছে কেন এল না সুলতান? এটা কি বিশ্বাস করা যায়? আমার মনে হচ্ছে তাকে খবর দেওয়া হয়নি। আমি তার সঙ্গে দেখা করবই।"

"কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, বন্ধু, তা তুমি পারবে না। মীর সাদিকের হুকুমটা দেখাও, তখন আমি নিজে গিয়ে সুলতানের দোরগোড়ায় তোমাকে পৌঁছে দেব, দরজা খুলে দাঁড়াব, তুমি যখন ভিতরে ঢুকবে মাথা নীচু করে তোমাকে অভিবাদন জানাব।"

"তবে অন্তত শিবজীর সঙ্গে দেখা করতে দাও।" শিবজী হল টিপু সুলতানের সেক্রেটারী।

"শিবজী, আহা বেচারা! সুলতানের চেয়েও কাজের চাপ তার বেশি। সুলতান জেগে থাকলে তাকেও জেগে থাকতে হবে; তার পরে সুলতান ঘুমলে তাকে প্রহরায় বসে থকতে হবে, যেন ঘুমে কেউ বিঘ্ন না-ঘটায়। আজই কোনো সময়ে তোমার বার্তাটা আমি তার কাছে পৌঁছে দেব।"

"না। এখনই।"

'এখন না। এখন সে সুলতানের সঙ্গে ব্যস্ত আছে।"

ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম চলে গেল। আবার চেষ্টা করে দেখার জন্যে সে মীর সাদিকের কামরার দিকে গেল। কয়েক পা যাবার পরেই সে দেখতে পেল মীর নাদিম ও অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে তার পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সুলতান। বলরাম চীৎকার করে উঠল, "সুলতান, সুলতান, দাঁড়াও, আমার কথা শোনো।" সবাই থেমে গেল। মীর নাদিম ও অন্যান্যরা বিরক্তি দেখিয়ে কড়া চোখে তাকাল বলরামের দিকে। সুলতানও তাকাল একটু আশ্চর্য হয়ে।

সুলতান জিজ্ঞাসা করল "কে ও?" দূর থেকে তাকে চিনতে পারেনি।

'কোনো বেকুব ওটা। তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যায়। আমরা চলতে থাকি। প্রহরীরা ওকে সামাল দেবে।" মীর নাদিম বলল।

"না। কি হল দেখি," বলল টিপু সুলতান, তার পরেই বলে উঠল, "ও, ও যে বলরাম, মহীপালের ছেলে। ওকে আসতে দাও।"

বলরাম এলে টিপু জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কী হয়েছে, বলরাম ?"

"দুর্গের দেয়াল ভেঙেছে, প্রাচীর ভাঙা হয়েছে।" বলল বলরাম, তার দম ফুরিয়ে এসেছে বুঝি, সে হাফাচ্ছে, চীৎকার করছে।

"শান্ত হও, একটু দম নিয়ে নাও, তার পর বল—কী বলতে চাও।"

ইতিমধ্যে মীর নাদিম একজন প্রহরীকে ফিসফিস করে কি-যেন বলল, মীর সাদিকের কাছে খবর দিতে চলে গেল সে।

বলরাম বলল, "আমাকে মাফ করো সুলতান, এভাবে তোমার কাছে আসার বেয়াদপি মাফ কোরো, কিন্তু জরুরি একটা কথা আমার বলার আছে।"

মৃদু হেসে সুলতান বলল, "আমি তা শোনার জন্যেই দাঁড়িয়েছি। সব আদব-কায়দা আমরা বর্জন করতে রাজি—তোমার যদি তেমন কথা বলার থাকে। আশা করি তা আছে।"

"আমার মনে হচ্ছে, দুর্গের প্রাচীরের ভাঙন সম্বন্ধে তোমাকে কেউ কোনো খবর দেয়নি।" বলে উঠল বলরাম।

"আমাকে এ সম্বন্ধে জানানো হয়নি। এটা কী ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ? মীর সাদিক কি এটা জানে ?" শক্ত গলায় বলল টিপু সুলতান।

"বিশ্বাসঘাতকতা নয় সুলতান, তোমার কথা বিবেচনা করেই খবরটা তোমাকে জানানো হয়নি।"

"আশ্চর্য এ বিবেচনা ! কিন্তু প্রাচীর যে ভেঙেছে এটা তো ঠিক ?"

"আমি নিজে দেখেছি।"

"ঠিক কোন্ জায়গাটায় ?"

বলরাম তা বুঝিয়ে বলল।

টিপু জিজ্ঞাসা করল, "বড় রকমের কিছু ?"

"আমার মনে হয়, তাই। তুমি নিজে দেখলে ভালো হয়।"

টিপু বলল, "চলো, দেখব। আমাদের সঙ্গে এস, বলরাম। তুমিও এস, মীর নাদিম। মীর সাদিককে ডেকে পাঠানো হোক, সেও আমাদের সঙ্গে যেন যোগ দেয়।"

মীর সাদিক এদিকেই আসছিল, সুলতানকে সে বলল, "তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।" তার বলার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল সে গোপনে কথা বলতে চায়।

অন্যান্য সকলে সরে গেল। সুলতান ও সে এখন একত্র, তাদের কথা কেউ এখন শুনতে পাবে না।

মীর সাদিক বলল, "সৈয়দ গফর মারা গিয়েছে।"

চুপ করে শুনল টিপু। তার হৃদয়ে সে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করল। মৃত্যু অনেককেই ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, এবার নিয়ে গেল তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত কম্যাণ্ডারকে। একটা নিঃসংগতার বেদনা সে অনুভব করতে লাগল। সে মীর সাদিকের বেদনার্ত মুখের দিকে তাকাল, নিজের বেদনা যেন সে ভুলল। অনেকক্ষণ পরে সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "কী ভাবে মারা গেল?"

"মহতব বাগ রক্ষা করার সময়ে।"

আবার চুপ করল টিপু, তারপর অনেক চেষ্টা করেই জিজ্ঞাসা করল, "মহতব বাগের পতন হয়েছে?"

"দুঃখের সংগে বলছি, হ্যাঁ।"

আবার চুপ করে রইল টিপু অনেকক্ষণ। মীর সাদিক বলল, "সৈয়দ গফরের দেহ দুর্গে আনা হয়েছে। বাইরের চত্বরে রাখা হয়েছে। তার ইচ্ছে" মীর সাদিক বলতে লাগল বাষ্পরুদ্ধ গলায় "তার দেহ অবিলম্বে যেন সুলতানের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে সুলতানকে সে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারে।"

"তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরাই যাব," দুই চোখে জল নিয়ে সুলতান বলল, "আমার সংগে এস।"

বাইরের চত্বরের দিকে মীর সাদিকের সংগে চলল সুলতান। কিছু মনে পড়াতেই বুঝি থামল, তার পিছনে ওদের কথা বলল। মীর নাদিম, শিবজী, বলরাম ও অন্যান্য যারা একটু দূরে অপেক্ষা করছিল, তারা কাছে এগিয়ে এল।

তাদের উদ্দেশ্য করে বলল টিপু সুলতান, "গফর খাঁ আজ শহীদ হয়েছে, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছি। বলরাম, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে আমার পড়ার ঘরের সামনে আমার সংগে দেখা কর। আমরা প্রাচীরের ভাঙন দেখতে একসংগে যাব।"

টিপু সুলতান ও মীর সাদিক দ্রুত চলে গেল, সংগে আরও অনেকে গেল, বলরামও যাচ্ছিল, কিন্তু মীর নাদিম তাকে থেকে যেতে বলল। বলল, "তোমার সংগে কথা আছে।" কিছুক্ষণ অবশ্য মীর নাদিম কিছু বলল না, কী চিন্তা করতে লাগল।

অবশেষে বলল, "সৈয়দ গফরের মৃত্যুটা ভীষণ দুঃসংবাদ।" বলরাম মাথা নেড়ে তার দুঃখ জানাল।

"দুর্গের প্রাচীরে ভাঙনের ব্যাপারটা কী?" মীর নাদিম বেশ দুঃখের সঙ্গেই বলল, "আমাকে এ কথা বলা তোমার উচিত ছিল। আমি যখন দুর্গের কমান্ডান্ট। আমার জানা দরকার ছিল।"

"মীর নাদিম, বিশ্বাস কর, আমি অনেক চেষ্টা করেছি। তোমাকে পাইনি। জব্বরকে জিজ্ঞাসা কর, খালিককে জিজ্ঞাসা কর। তাদের অনুনয় করে বলেছি তোমাকে দেখলেই যেন আমাকে জানায়।"

"বেশ। তবে তোমাকে দোষ দিতে পারিনে। তোমার উদ্যমের প্রশংসাই করি। কিন্তু বল, জব্বর ও খালিককে কি বলেছিলে কী খবর আমাকে দিতে চাও?"

"তা বলি কী ক'রে। সকলে এ খবর জানুক—এটা চাইনি। এ'তে আতঙ্ক সৃষ্টি হত।"

"তোমার অনেক উন্নতি হবে, যুবক।" বেশ তারিফ জানিয়েই যেন বলল মীর নাদিম, 'এবার আমার সঙ্গে আমার পড়ার ঘরে চল। কোথায় ভাঙন ঘটেছে চার্টে তা দেখে নিই। এর মধ্যে জেনে নিতে হবে মীর সাদিক কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা। তা না হলে এক্ষুনি মেরামতির জন্যে আমাদের এঞ্জিনিয়র ও রাজমিস্ত্রি কারিগর ইত্যাদিকে পাঠাব।"

মীর নাদিমের পাঠাগারে তারা অবিলম্বে পেঁাছে গেল। বলরামকে একটা চেয়ারে বসাল মীর নাদিম! ডেস্কের উপর লেখার সরঞ্জাম, কয়েকটি চার্ট—তাতে দুর্গের কোথায় কোন্ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, কোন্ মসলা ব্যবহার করা হয়েছে তার উল্লেখ আছে।

"এক্ষুনি ফিরে আসছি" বলে মীর নাদিম বেরিয়ে গেল। বলরাম দেখতে লাগল সব চার্ট।

ডেস্কের পিছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে তিনটি লোক প্রবেশ করল। বলরাম কিছু লক্ষ করেনি। কে-যেন তার চুল ধরে টানল। একটা রেশমী দড়ি তার গলা জড়িয়ে ধরল। বলরামের শরীর শূন্যে উঠে পড়ল, ডেস্কে ঘা খেল, ডেস্ক উল্টে গেল। চেয়ার উলটে পড়ল মেঝেয়। রেশমী দড়ি ক্রমে আঁট হয়ে আসছে, তার গলার চামড়া ভেদ করে বসছে, তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। ঘাতক তার সঙ্গীদের ইশারা করল, একজন বলরামের হাত চেপে ধরল, অন্যজন

ডেস্কের সঙ্গে তাকে সেঁটে ধরল, দড়ির ফাঁস যতই শক্ত হয়ে উঠছে, বলরামের চোখ ততই বেরিয়ে আসছে, অবশেষে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

দড়ি খুলে ফেলল ঘাতক। একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করল, "কাজ খতম, খালিক?"

খালিক উত্তরে বলল, "নিশ্চয়।" রেশমী দড়িকে চুম্বন করে সে সেটা পকেটে রাখল।

"তলোয়ার দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে পারলে কাজটা আরও সহজ হত।"

"জব্বর, দোস্ত, তুমি তো জান আমাদের কম্যাণ্ডাণ্ট নাদিম সায়েব তার পাঠশালায় রক্ত ভালোবাসে না।"

"এ রকম ফাঁস লাগানো কাজে আমি আগে কখনো নামিনি।"

"এটা হচ্ছে এমন একটা অর্জিত রুচি যা কিনা শুধুমাত্র উন্নতমানের মনই তারিফ করতে পারে। তোমাকে নিয়ে বিপদ এই যে, তোমার মধ্যে কোনো শিল্পী-সত্তা নেই।"

টিপু সুলতানের পাঠাগারের বাইরে অপেক্ষা করছিল মীর নাদিম। দুর্গ-প্রাচীরের কাছে তাদের নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। মীর সাদিকের সঙ্গে টিপু এল, সৈয়দ গফরকে শেষ নমস্কার জানিয়ে এসেছে। তার বিশ্বস্ত বন্ধুর মৃত্যুতে ও মহতব বাগ পতনে টিপুর মন বিষণ্ণ। মীর নাদিম ও অন্যান্যদের দেখে সে তার নিজের বেদনা ভুলল, জিজ্ঞাসা করল, "বলরাম কই?"

মীর নাদিম চারদিকে তাকাল, বলল "জানি নে তো! যে ভাঙন নিয়ে সে চিন্তিত ছিল, তা চিহ্নিত করে আমাকে চার্ট দিয়ে সে চলে গেছে। হয়তো সে আগে-আগেই ওখানে গেছে। তাকে খুঁজতে কাউকে পাঠাব?"

"দরকার নেই," টিপু বলল, "আমরাই যাই চলো। তুমি আগে-আগে চলো, আমাদের নিয়ে চল সেখানে। সেখানেই বলরামকে আমরা পাব।"

তারা ঘোড়ায় চাপল। "এত ঘটনা ঘটে চলেছে," মীর সাদিককে বলল টিপু সুলতান, "এর মধ্যে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গিয়েছি। ভাঙনটা কি গুরুতর?"

"আদৌ নয়। অতি সামান্যই। বলরাম আমার সময় নষ্ট করেছে, এখন

তোমার সময় নষ্ট করছে। প্রাচীর দেখতে না-গেলেও হয়। ইচ্ছা করলে তা করতে পার।"

"না। চলোই। নিজে না-দেখলে সন্দেহটা থেকেই যাবে।"

তারা ঘোড়ায় চেপে চলতে লাগল। আর কোনো কথা নেই তাদের।

হঠাৎ টিপু সুলতান জিজ্ঞাসা করল, "মীর নাদিম আমাদের এমন ঘুর-পথে নিয়ে যাচ্ছে কেন।"

"আমরা প্রাচীরের দিকেই যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, শত্রুর গোলাগুলি এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করছে ও।" বলল মীর সাদিক।

"কোথায় গোলা পড়বে আর, কোথায় গোলা পড়বে না আমাদের কুশলী কম্যাণ্ডাণ্ট তা জানে। চমৎকার!"

অবশেষে, মীর নাদিম ওদের একটা জায়গায় নিয়ে এল, চার্টের উপর বলরাম যে জায়গাটার চিহ্ন দিয়ে দিয়েছে বলে তারা বলছে, সেখানে। ঘোড়া থেকে নামল সকলে। জায়গাটায় প্রহরার খুব ভালো ব্যবস্থা আছে, সর্বত্রই সুলতানের সেনাদের দেখা যাচ্ছে।

মীর নাদিম টিপু সুলতানের কাছে অনুনয় করে বলল, "একেবারে খোলা জায়গায় যাওয়া ঠিক হবে না।"

সে অনুনয়ে কান করল না টিপু।

দেয়ালের গায়ে একটু চোট লেগেছে বটে, কিন্তু কোনো ভাবেই এ'কে ভাঙন বলা চলে না। হাজার হাজার গোলা পড়ায় দেওয়ালে দাগ পড়েছে অনেক, কিন্তু যেমনকার শক্ত তেমনি আছে। কয়েক জন মিস্ত্রি এক-দুই ঘণ্টায় এর চেহারা ঠিক করে দিতে পারে, যে আস্তর খসে গেছে তা সাজিয়ে দিতে পারে।

"এটা তো ভাঙন নয়। বলরাম যে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছে, এটা সেই জায়গা, এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত?" টিপু জিজ্ঞাসা করল।

মীর সাদিক বলল, "আজ সকালেই সে আমাকে ঠিক এই জায়গায় নিয়ে এসেছিল।"

টিপু বলল "এরই জন্যে আমাদের আসতে হল!"

"সত্যি। কিন্তু একদিক থেকে দোষ আমার।"

"যথা—"

"বলরাম কার কাছ থেকে এই গুজব শোনে। আমার কাছে সে আসে। আমরা এখানে আসি। দেখে যাই। তখন সে জিজ্ঞাসা করে—এটা গুরুতর

কিনা। এখানেই আমি ভুল করি। তাকে শান্ত না-ক'রে আমি বলি হ্যাঁ, এটা গুরুতর। তার পরে বলি—এই দেওয়ালে যত গোলা পড়ে, আমদের সৈন্যদের যত গুলি আঘাত করে, এসবই আমাদের কাছে গুরুতর ; এবং এইসব ব্যাপার প্রতিরোধ করার জন্যে বলরামের মত লোক নূতন উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে লড়াই করবে।"

টিপু একটু হালকা চালে বলল, "আশা করি ভবিষ্যতে এরকম বক্তৃতা দেওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষা পেয়েছ।"

"ও, নিশ্চয়। কেননা, যেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করেছি, অমনি সে আবদার নিয়ে এল যে ভাঙনের খবরটা তোমাকে যেন জানাই। যখন আমি রাজি হলাম, তখন সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন নিজে তুমি দেখতে যাচ্ছ তা জানার জন্যে।"

"এখন আমি এখানে এলাম, কিন্তু সে এখানে নেই।"

"হ্যাঁ, এইটেই আশ্চর্য," মীর সাদিক বলল, "এর কারণ কি, মীর নাদিম ?"

মীর নাদিম কাঁধ ঝাঁকি দিল, "হয়তো সে পরে সব বুঝেছে, কিংবা কেউ তাকে বুঝিয়েছে যে, এ ভাঙনই নয়। আমরা এবার এস্থান ত্যাগ করার অনুরোধ জানাতে পারি কি ?"

"হ্যাঁ।" টিপু জবাব দিল, "আমার বড়ই আশ্চর্য লাগছে, বলরামের মত অমন বুদ্ধিমান ছেলে এমন আশ্চর্য একটা অনুমান করল কী করে ? করলই-বা কেন ?"

"হয়তো তোমার নজর কাড়বার জন্যে, কিংবা হয়তো…" মীর নাদিম কপালে টোকা দিল, বলল, "এত রকম ঘটনা এখন ঘটে চলেছে। সকলের মনোবল ঠিক থাকার কথা না।"

টিপু একটু মাথা নাড়ল, ঘোড়ায় চাপল। পিছন-পিছন চলল মীর সাদিক ও মীর নাদিম।

মীর নাদিমকে মীর সাদিক বলল খুব চুপে-চুপে "লক্ষ রেখ, নির্ধারিত সময়ের আগে আসল ভাঙনের কাছে যেন কেউ যায় না।"

"সেদিকে লক্ষ আমার আছে।"

"তবুও সতর্ক থেকো।" বলেই মীর সাদিক দ্রুত কদমে এগিয়ে সুলতানের পাশ নিল।

সৈন্যদের মাইনে দেওয়ার অছিলায় সব সৈন্যদের ডেকে এক জমায়েত করা হল, সেখানে মীর সাদিকের হয়ে কম্যাণ্ডাণ্ট মীর নাদিম সবাইকে জড়ো করেছিল। দুর্গপ্রাচীরের কাছে বা দুর্গপ্রাচীরে যে সব সৈন্য মোতায়েন ছিল তারাও এল। এটা মাইনের দিন ছিল না, সময়ও এখন সংকটময়, হয়তো নিয়মিত এমন জমায়েত করা সম্ভব হবে না, সুতরাং সদাশয় সুলতান ঠিক করেছেন আজকে সকলকে তিন মাসের বেতন দিয়ে দেওয়া হবে। আগামী তিন মাসের মাইনে। সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল।

এই ভাবে মহীশূরের শেষ ও চূড়ান্ত দিনের পথ একেবারে পরিষ্কার করে রাখা হল।

## ৭৭. শেষ ঘণ্টা

দুর্গের প্রাচীরে যেখানে ভাঙনটা মস্ত বড় হয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সৈয়দ সাহেব। বিশ্বাসঘাতকতা করে শ্রীরঙ্গপত্তমের একেবারে ফটক পর্যন্ত ইংরেজদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল কামার উদ্-দিনের সঙ্গে সে'ই। ইংরেজদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্যে টিপু সুলতান তার উপর এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার ন্যস্ত করে। ইংরেজরা তাকে মোটা ঘুষের প্রলোভন দেখায়, তার ফলে সে ইংরেজদের হয়রান করাই কেবল বাদ দেয় না, তাদের কাছে অনেক শক্ত শক্ত ঘাঁটি ছেড়ে দেয়, তাদের বাহিনীর লোকেদের ও গবাদি পশুর জন্যে খাদ্য ও অন্যান্য রসদ জোগান দেয়। দুর্গে ঢুকে তা অধিকার করার জন্যে সুতরাং তাকেই থাকতে হবে তার বাহিনীর পুরোভাগে। বাকিটা পরিকল্পনা অনুসারেই চলবে। সৈয়দ সাহেবই ইংরেজ-বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাবে। দুর্গের মধ্যে সে'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে ইংরেজদের। তার পদাধিকার ও পদমর্যাদাই মহীশূর-বাহিনীর কাছে তাকে মান্য করার জন্যে যথেষ্ট, সে যদি তাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বলে তারা তাইই করবে। তা না করলে ইংরেজরা যথোচিত ব্যবস্থা নেবে। সুতরাং শৃংখলার সঙ্গে সে ইংরেজদের নিয়ে আসবে মীর সাদিকের কাছে, মীর সাদিক জানাবে তাদের স্বাগত। এবং মহীশূরের সুলতান ও ইংরেজদের বন্ধু বলে ঘোষণা করবে। ইতিমধ্যে মীর সাদিক ও মীর নাদিম টিপুকে অসহায় করে ফেলেছে, হয় বন্দী করে, অথবা ··। নিজের জন্য সৈয়দ সাহেব অনেক সম্মান মর্যাদা খেতাবসম্পত্তি ও ধনরত্ন পাবার আশা রাখে।

সৈয়দ সাহেব যখন আরও ষাট জনের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ইংরেজদের এগিয়ে আসার সংকেত স্বরূপ সাদা রুমাল নাড়াচ্ছিল তখন ঐসব কথা মনে হচ্ছিল তার। পরিখার মধ্যে ইংরেজ সেনাদের জমায়েত করা হয়েছে, এই সংকেতের জন্যে তারা প্রস্তুত। সংকেত পেয়েই ইংরেজ-বাহিনী এগতে আরম্ভ করল। পরীখা থেকে নদী-কিনার ১০০ গজ মাত্র। নদীটায় এক-হাঁটু বা এক-কোমর জল, নীচে অনেক পাথর, ২৮০ গজ চওড়ায় হবে, তার পরে আছে

পাথরের দেওয়াল, তার পরে খানা, ৬০ গজ চওড়া, তার পরেই কিনার। এসব সত্ত্বেও সাত মিনিটের মধ্যে সেখানে ব্রিটিশ পতাকা পুঁতে দিতে সক্ষম হল মাত্র কয়েকজন লোক। তার পরে ইংরেজদের বাকি সেনাদল স্রোতের মত এসে পড়তে লাগল।

এই ভাবে, সুলতানের অজ্ঞাতসারে মহীশূরের মূল বাহিনীর অজ্ঞাতসারে, ইংরেজরা এসে নদীর ধার দখল করে নিল। পরিখা থেকে এই কিনার পর্যন্ত সবটা এলাকা মহীশূর-বাহিনীর ভারি কামানের নিশানার মধ্যেই ছিল, কিন্তু সেসব ছিল নিঃস্তব্ধ ও কোনো সেনা ছিল না সেখানে। নদী-পারে একজন মহীশূর সেনাও নিহত হয়নি। বিশ্বাসঘাতকেরা ছাড়া কেউ উপস্থিত ছিল না সেখানে, যারা সংকেত দিল ইংরেজদের। একমাত্র মারা গেল বলরাম—অযথাই তার মৃত্যু, সুলতানের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করতে চেয়েছিল।

ইংরেজদের আক্রমণ শুরু হল। ইংরেজদের অভ্যর্থনা জানাবার অবকাশ পেল না সৈয়দ সাহেব। আগুয়ান ইংরেজ সেপাইরা তাকে একজন শত্রু বলেই মনে করল, রাইফেলের কোঁদা দিয়ে তাকে আঘাত করল। মেজর ডালাস নামে একজন ইংরেজ অফিসার তাকে ধ'রে তুলল, ও অস্ফুটে বলল "সৈয়দ সায়েব!' তাকে একটু জল দেওয়া হল, সে একটু আরাম পেল, কিন্তু ইংরেজদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। তাকে ছেড়ে চলল ডালাস, তার সেনাদলের সঙ্গে সে যুক্ত হতে চলে গেল। তাকে চলে-যেতে দেখল সৈয়দ সাহেব। একজন ইংরেজ সেপাইয়ের পায়ে টান লাগায় সে পিছিয়ে পড়েছিল, সে ছাড়া সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আর কেউ রইল না। তারপর সে সেই সেপাইটিকে বলল, "তোমরা ই রেজরা বর্বর। যাও, সেনাদের ডাকো। আমি তাদের নিয়ে যাব।"

ইংরেজ সেপাইটা ওতে কান করল না, তার বন্দুক অবশ্য তৈরিই ছিল, তাকে আক্রমণ করা হলে মোকাবিলা করার জন্য। সেপাইয়ের সাড়া না-পেয়ে সৈয়দ সাহেব হতাশ হয়ে গেল। সে হেঁটে চলবার জন্যে পায়ের উপর ভর দিতে চেষ্টা করল। সে গড়িয়ে পড়ে গেল খানায়, ও ডুবে গেল হাঁটুজলে।

ইংরেজরা নিজেদের বাহিনী দুভাবে ভাগ ক'রে নিল। ডান দিকের বাহিনী দক্ষিণের বুরুজ আক্রমণ করবে, বাঁ দিকের বাহিনী উত্তরের বুরুজের দিকে যাবে। দুই বাহিনী মিলিত হবে পূব দিকের ফটকে। কোন বাধা নেই দুটি বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। মাইনে দেবার জন্য সেনাদের জমায়েতের তামাশা তখনও

চলেছে, তারা বাইরের যে হল-ঘরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে গেছে তাতে তালা লাগানো হয়েছে। ইংরেজদের অগ্রগতি চলতে লাগল।

হঠাৎ খবর রটে গেল যে ইংরেজদের দুর্গ-আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তারা নদী-কিনার দখল করেছে, পতাকা গেড়েছে, এবং দুর্গের প্রায় মধ্যেই ভিতরের বুরুজ অধিকার করেছে। টিপু সুলতান তখন দুর্গের পিছনে শহরে আছে। সে দুপুরের আহার যখন শেষ করেছে তখন এল এই খবর। সে হাত-মুখ ধুয়ে নিল, ঘোড়ায় চাপল, এবং কয়েকজন অফিসার নিয়ে দুর্গের দিকে ধাওয়া করল, পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল দুর্গে।

মীর নাদিমের আদেশ অনুসারে মাইনে-দেওয়ার জমায়েতে ছোট্ট খবর ঘোষণা করা হল এই যে "ইংরেজরা দুর্গের মধ্যে এসে পড়েছে, টিপু সুলতান তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেপাইরা, কোনো বাধা দিয়ো না। যেখানে আছ, সেইখানেই থাকো।"

মীর নাদিমের অনুচরেরা এই বার্তা সর্বত্র প্রচার করতে লেগে গেল, অতিরিক্ত এ কথাও তারা প্রচার করল "সব ফটক খোলা, ইচ্ছে করলে দুর্গ ছেড়ে যেতে পার, যত তাড়াতাড়ি পার যাও।"

বিভ্রান্তি। বিশৃঙ্খলা। মাত্র একঘন্টা আগে ইংরেজরা পরিখা ছেড়েছে, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তারা বাইরের ও ভিতরের বুরুজ ও বিশাল দুর্গের প্রতিটি অংশ দখল করে নিয়েছে। পরিখা থেকে উঠে সাত মিনিটের মধ্যে তারা দখল করে এই ভাঙনের জায়গাটা। তার পর ইংরেজদের কাছে বাধা হয়ে দেখা দেয় খানা – বাইরের ও ভিতরের বুরুজ এর দ্বারা বিভক্ত। মীর সাদিকের লোকেরা সাঁকো করে দেবার জন্যে নিয়ে আসে পাটাতন। কোনো বাধা নেই। জায়গাটা এমনভাবেই পরিত্যক্ত করা হয়েছিল যে, হিজ ম্যাজেস্টির রেজিমেন্টের কেবলমাত্র আঠাশ জন লোক দুটি খানা পেরিয়ে পশ্চিম দিকের মজবুত ঘাঁটির যাবতীয় বন্দুক কামান ইত্যাদি অধিকার করে নিতে পারল। এ কাজ করতে লাগল মাত্র কয়েকটি মিনিট। তার উপর, ইংরেজদের ডান দিকের বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে বলে মনে করা গিয়েছিল দক্ষিণদিকের যে ঘাঁটি থেকে, সেখানেও কোনো বাধার ব্যবস্থা নেই। অমন বিপুল প্রতিরোধব্যবস্থা বিফলে গেল। ইংরেজদের এ বাহিনী যাবতীয় এলাকা নির্বিঘ্নে অধিকার করে নিতে পারল। এক ঘন্টার মধ্যে ইংরেজরা সব দখল করে নিল।

এখনো প্রাসাদের উপর কোনো ঘা পড়েনি।

ইংরেজরা এখন গুলি চালাতে আরম্ভ করল ভীত পলায়মান নিরস্ত্র লোকেদের উপর, যারা কোনোরকম বাধা দেয়নি, এবং যারা মীর নাদিম ও মীর সাদিকের আদেশেই পলায়ন করছে।

টিপু সুলতান এই নৃশংস কাণ্ড দেখল। সে বুঝেছিল অনেক দেরি সে করে ফেলেছে। সে একবার ভাবল, "ফটক এখনো খোলা, এখন কি ফিরে যাব?" এই ভাবে যুদ্ধ সমাপ্ত হবে তা সে ভাবেনি। সে মনে করেছিল, সে এক গর্বিত শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাবাহিনীর অধিপতি, যে বাহিনী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে। এ কথা সত্যিই যে, সে ভেবেছিল ইংরেজ-বাহিনী বিপুল শক্তিধর ও তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে যুদ্ধ দরকার হবে বলেই সে জানত। এ রকম কাপুরুষের মত আপমানকর হীন পলায়ন! ফিরে যাবার কথা মন থেকে সে একেবারে দূর করে দিল, "একাই যুদ্ধ করব আমি, তেমন দরকার হলে তাই করব। হ্যাঁ, একাকীই। জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার জন্যে এবং তাকে স্বাধীনতার ও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে কাউকে চাই। এ সবের জন্যে দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চাই। আমার জীবন যদি যায়—যাক। যারা এখনো জন্মায়নি তাদের সামনে একটা ত্যাগের উদাহরণ থেকে যাক।"

সৈন্যদের গুছিয়ে নিতে সে চেষ্টা করল। অনেকেই তাতে যোগ দিল। কিন্তু ভিতরের ও বাইরের বুরুজ থেকে নিক্ষিপ্ত ইংরেজদের গুলির মধ্যে তারা অনাচ্ছাদিত। সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক এল। অনেকে পালাল। মাত্র কয়েকজন রয়ে গেল টিপুর সঙ্গে।

যারা তার-সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল তারা তা পারল না। ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টিপু সুলতান যাতে পালাতে না-পারে সেজন্যে মীর নাদিম মতলব করেই ফটক বন্ধ করে দেয়। এতে মহীশূরের সেনাদলও টিপুর পাশে আসতে পারে না। টিপু যখন ফটক খুলে দেবার জন্যে হুকুম করল, তখন তা শোনা হল না। দুর্গের কম্যাণ্ডাণ্ট মীর নাদিম ফটকের ছাদে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সে টিপুর আদেশ অগ্রাহ্য করল।

চীৎকার করে মীর নাদিম জানাল, "আমার প্রভু মীর সাদিক। তার কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।" এই কথা বলেই সে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

এত হট্টগোলের মধ্যেও টিপু সুলতান শুনতে পেল মীর নাদিমের জবাব। সে নিজের বুকে হাত রাখল। তার মুখে এমন বেদনার ছায়া যা আগে কেউ

কখনো দেখেনি। তার এই অবস্থা দেখে, টিপুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজা খাঁ চিন্তিত হল। চারদিকে ছোটাছুটি করছে বুলেট? এর একটা কি লেগেছে ওই বুকে?

টিপুর হাত বুক থেকে সরিয়ে রাজা খাঁ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি জখম হয়েছে?"

"রাজা, এ জখম বাইরের নয়, ভিতরের। আমার হৃদয়ের অনেক গভীরে এই জখম।"

কিন্তু বাইরের যে জখম তাও তো দেখা যাবে।

টিপু সুলতান বুঝতে পারল সে এখন বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ঘেরাও হয়ে গিয়েছে। তবুও তার পালাবার সুযোগ আছে। অনুগত কিছু সৈন্যও আছে এখানে। তাদের নিয়ে লড়তে-লড়তে সে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তা করতে চাইল না। তা ছাড়া, যদি সে পালাতেই চায় তবে দুটি গোপন পথও আছে তার জানা যেখান দিয়ে সে চলে যেতে পারে। তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকে প্রাসাদে যে ষড়যন্ত্র হয় তখন হাইদর আলি বানিয়েছিলেন এই পথ। এই গোপন পথের কথা জানত তিন জন—পুরনাইয়া, গাজি খাঁ, টিপু সুলতান। "না, একটা প্রতিশ্রুতি আমাকে রাখতে হবে" মনে-মনে সে বলল। সে বেপরোয়া হয়ে আবার তার সেনাদলকে জমায়েত করার শেষ চেষ্টা করল। সে খাপ থেকে বের করল তরবারি, চীৎকার করে যুদ্ধের হুংকার করল "সরকার-ই-খুদাদাদ"। এর আগে এই হুংকারে কম্পিত হয়েছিল ইংরেজ। এক বা দেড় যুগের মধ্যে মহীশূরে এই আওয়াজ একটা শক্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যে চিরতরে তার সমাপ্তি ঘটে গেল, এবং আজ সূর্যাস্তের পর থেকে এ আওয়াজ আর শোনা যাবে না।

একে-একে তার সঙ্গীদের মৃত্যু ঘটতে লাগল। এখন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজা খাঁ ও একজন তরুণ সৈন্য ছাড়া তার পাশে আর কেউ নেই। হঠাৎ পিছন থেকে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য টিপুর দিকে ধেয়ে এল, সে ফিরে দাঁড়াবার আগেই তরুণ মহীশূরীটি তার তরবারি নিয়ে ইংরেজদের বাধা দিয়ে তাদের ঘায়েল করল। ইংরেজ সেনাদের নজর তখন লুণ্ঠনের ও সহজ শিকারের দিকে, তারা তাদের দুই সঙ্গীকে ফেলেই পলায়ন করল।

"শাবাশ, পুত্র। তুমিই এখন আমার সমগ্র বাহিনী। বলো, তাই কি না। তোমার নাম কি?" গলা ধরে এল তার। অনেক সময়ই সে ভেবেছে সে কি ভাবে আচরণ করবে ও কী-বা বলবে যদি কখনো টিপু সুলতানের

সম্মুখীন সে হয়, কিন্তু সেই সময় এখন এসেছে, সে এমন কি তার নামটাই বলতে পারল না। একটা গুলির শব্দ হল, গুলিটা লাগল তার বুকে। সে মৃত্যুর মুখে। টিপু তাকে ধরল। "আমি শামাইয়ার পুত্র। আমার বাবা তোমাকে প্রতারণা করেছে। যদি পার, তাকে ক্ষমা কোরো।"

"পুত্র, তুমি তোমার বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছ। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করব যেন তাকে তিনি ক্ষমা করেন ও তোমাকে আশীর্বাদ করেন।"

তরুণটি মারা গেল।

মহীশূর-বাহিনীর অবশিষ্টাংশ তার চোখে পড়ল। রাজা খাঁর সঙ্গে সুলতানকে দেখে তারা থামল। আশ্চয হয়ে তাদের দলপতি চিন্তামণি সুলতানকে জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কি করছ, জনাব ?"

"কী করছি ?" রেগে সুলতান বলল, "শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে এখানে আছি, দরকার হলে মরব।"

"কিন্তু মীর সাদিক সর্বত্র আত্মসমর্পনের পতাকা ওড়াতে হুকুম দিয়েছে, অস্ত্র ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। তোমার নামেই এ আদেশ দিয়েছে সে।"

"মীর সাদিক বিশ্বাসঘাতক। যাও, বৎস। যদি পার পালাও। তোমাদের আটকাব না। একাই লড়ব।"

"আমরা সবাই লড়তে চাই," বলল চিন্তামণি, তার চোখ জলে ভেজা, সে হুংকার দিয়ে উঠল "সরকার-ই-খুদাদাদ"। তার সেনাদলও ঐ আওয়াজ তুলল। সুলতানকে বাঁচাবার জন্যে তাকে তারা ঘিরে দাঁড়াল, তাদের তরবারি ও বন্দুক উঁচানো। তারা এগিয়ে চলল, এই সামান্য সংখ্যক সেনা নিয়ে তারা মোকাবিলা করল ইংরেজ সেনাদের।

ইতিমধ্যে মীর সাদিকের দুই ভাড়াটে গুন্ডা, খালিক ও জব্বর, সুলতানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মীর সাদিক আদেশ দিয়েছে, 'সে যেন আর না-থাকে।' সুলতানের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে ফটকগুলি যে বন্ধ আছে তা সে দেখে নিয়েছে, তবুও তার চিন্তা ছিল যে, ইংরেজরা যেন তাকে জ্যান্ত পাকড়াও না-করে। বন্দী সুলতানের সঙ্গে ইংরেজরা আবার কী ব্যবস্থা করে বসে, তার ঠিক কী ? তাতে তার নিজের স্বপ্নটাই একেবারে ভেস্তে যাবে। দূর থেকে খালিক ও জব্বর চিন্তামণির সেনাদলকে দেখল, সম্পূর্ণ সশস্ত্র। সুলতানও তাদের মধ্যে আছে, তা তারা দেখতে পায়নি। যেমন সে করে আসছে সেইভাবে মুখে চোঙ দিয়ে সে বলতে লাগল : "হুয়

আত্মসমর্পণ করো, না-হলে পালাও। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অস্ত্র বর্জন করো। এ আদেশ সুলতানের নামে মীর সাদিকের দেওয়া।"

চিন্তামণি চীৎকার করে জবাব দিল : "ওরে কাপুরুষ ! সুলতান আমাদের মধ্যে। এ কথা তোমার চক্রান্তকারী প্রভুকে বলো।"

বেহায়ার মত খালিক এগিয়ে এল, সত্যিই সুলতান আছে কিনা দেখতে। তার হাত বেল্টে ঝোলানো ছোরার উপর রাখা। তার ভয় নেই। মীর সাদিকের সে দক্ষিণহস্ত। ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে চিন্তামণির ও তার তথাকথিত সেনাদের দিকে তাকাল। চিন্তামণি তাক করল তার মাথায়, গুলি ছুড়ল। খালিক মাথা ফেরালো। গুলিটা তার মসৃণ করে কামানো খুলিতে গিয়ে লাগল। চিন্তামণি যেন দেখতে পেল খালিক মাটিতে পড়ে যাবার আগেই তার খুলির কয়েকটা টুকরো ছিটকে পড়ল। খালিক মরে গেল। চিন্তামণি জানত না এই লোকটাই তার ভাই বলরামকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরেছে।

জব্বর দ্রুত পলায়ন করল। তার দিকে বন্দুক তাক করা সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া, মীর সাদিককে খবর দিতে হবে যে, সুলতান এখনো আছে, সে দেখেছে।

টিপু সুলতান এখন বুঝল যে খালিক ও জব্বর কী মতলবে এসেছিল। মনে-মনে সে প্রার্থনা জানাল, "আমার দেশবাসীর হাতে আমার মৃত্যুর অগৌরব যেন না হয়।"

জব্বর মীর সাদিককে পেল, দেখল সে ইংরেজ অফিসার কম্যান্ডিং জেনারেল বেয়ার্ড ও কম্যান্ডান্ট মীর নাদিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনা বন্ধ রেখে মীর সাদিক বেরিয়ে এল। তার পর ফিরে গিয়ে জেনারেল বেয়ার্ড'কে সুলতান প্রসঙ্গ না জানিয়ে, জানাল কয়েকজন বিপথগামী মহীশূরী কোন জায়গাটায় একত্র হয়ে প্রতিরোধের আয়োজন করছে তার খবর। বেয়ার্ড তক্ষুনি জবাব দিল, "তার মোকাবিলা করা হচ্ছে", এবং তার আর্দালীরা ইংরেজ-বাহিনীকে এই মারাত্মক খবরটি জানাতে চলে গেল।

ইতিমধ্যে চিন্তামণির বাহিনীতে এসে যোগ দিল কয়েকজন ভবঘুরে-গোছের লোক, সুলতানকে দেখেই তারা তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে বলে শপথ করল।

বেয়ার্ডের নির্দেশ অনুসারে কাজ আরম্ভ হল। চারদিক থেকে ইংরেজরা বিধ্বংসী গুলিগোলা ছুড়তে লাগল, যেখানে মহীশূরীরা দলবদ্ধ হচ্ছে বলে

অনুমান করা যাচ্ছে সেইসব দিকে পড়তে লাগল গুলিগোলা। বেয়ার্ড আদেশ দিয়ে দিয়েছে মহীশূরী হলেই তাকে গুলি করতে হবে, সে সশস্ত্রই হোক বা নিরস্ত্রই হোক। সবাইকে তেড়ে এক জায়গায় এনে ফেলতে বলা হয়েছে যাতে এক কোপেই সবাইকে খতম করা যায়। বেয়ার্ড এখন রেগে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার সেনারা সব বুরুজ ও সব ঘাঁটি কব্জা করে নিয়েছে। মীর সাদিক তাকে কথা দিয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সর্বত্র আত্মসমর্পণ করা হবে। প্ল্যান অনুযায়ীই কাজ চলছিল। জয়টা প্রশ্নাতীত ভাবে নিশ্চিত ছিল. শ্রীরঙ্গপত্তম-জয় হবে পরিপূর্ণ ভাবে সফল। তার ইচ্ছে ছিল, ইতিহাসে তার নাম লিখিত হবে এইভাবে যে এক ঘণ্টার মধ্যে সে বিখ্যাত শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ জয় করেছে, মহীশূরকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেছে, তার সাহসী সুলতানকে পরাস্ত করেছে। এক ঘণ্টায় মাত্র। সে জানত এটা একটা রেকর্ড, ভবিষ্যৎকালে কেউ এ রেকর্ড ভাঙতে পারবে না, এমনকি এর ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এই সময়ে খবর এল মহীশূরীদের প্রতিরোধের। ওদের সাফ করে দাও, সাফ করে দাও সকলকে। তার মনে আরো অনেক চিন্তা এল "এটাকে গৌরবপূর্ণ জয় কে বলবে, যদি বহুলোক নিহত না হয়? সকলেই তখন বলবে আমি সহজেই পেয়ে গেছি, আর, মীর সাদিক আমাকে এটা দিয়েছে যেন প্লেটে সাজিয়ে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বা আর কম সময় লেগেছে বলায় কে তাতে গুরুত্ব দেবে? আমি ওদের মৃত্যু ঘটাবো না, ওদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করব না ইত্যাদি বিষয়ে শর্ত অনুসারে কাজ করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু এখন তারা প্রতিরোধ করতে চায়! এটা তো বাড়তেও পারে। জানিনে, কে দোষী, কে দোষী নয়। সকলেই এখন আগুনের স্বাদ পাক, ভয়ার্ত হোক, যদি হতাহতের তালিকা দীর্ঘ হয়, হোক। আমারই তাতে গৌরব বাড়বে।"

যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের উপরও অগ্নিবর্ষণ চলল, যে সব দালানে ও হল-ঘরে মহীশূরীরা আটকে ছিল, সেই সবগুলিতে আগুন লাগানো হল।

অগ্নি ও ধোঁয়ার মধ্যে কাতারে-কাতারে মহীশূরীরা ছুটোছুটি করছে, তার থেকে কাউকে উদ্ধার করা অসাধ্য। চিন্তামণি ও তার সেনা-দলের সঙ্গে যুক্ত হল এক পাল মহীশূরী। ইংরেজদের বন্দুক অগ্নিবর্ষণ করেই চলল। বুরুজ থেকে মহীশূরী কামান—এখন যা ইংরেজের করায়ত্ত,

অগ্নিগোলা ছুড়তে লাগল, যাদের রক্ষা করার কথা তাদের উপর চলল এই তান্ডব।

দুর্গের বাইরে ছিল শেখর। সে জানত, সুলতান ভিতরে আটক পড়ে গেছে এবং সব ফটক বন্ধ। সেসব পাহারা দিচ্ছে মীর নাদিমের লোক। কুড়ি জন লোক সংগ্রহ করে নিয়ে সে আক্রমণ করল ফটক। প্রহরীরা ছুটে পালাল, কিন্তু ফটক ভালোভাবেই তালা-দেওয়া। তারা মস্ত এক কাঠের গুঁড়ি নিয়ে এসে ফটকে ঘা দিতে লাগল। আরও লোক নিয়ে মীর নাদিমের লোকেরা ফিরে এল ও গুলি বর্ষণ আরম্ভ করল। শেখর তার সঙ্গীদের অনেককেই মরতে দেখল। কাঁধে একটা বুলেটের ক্ষত নিয়ে সে পলায়ন করল। রক্তক্ষরণের দরুন দুর্বলতায় সে বেশিক্ষণ দৌড়তে পারল না, খালের পাশে শুয়ে পড়ল। খালের জল দিয়ে মুখে ঝাপটা দেওয়ায় একটু আরাম পেল, অদ্ভুতভাবে থেমে গেল রক্তক্ষরণ।

হঠাৎ শেখর দেখল, পাশের একটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে মীর সাদিক। তার সঙ্গে চারজন ইংরেজ সৈন্য, তাদের একজনের বেশ যেন পদমর্যাদা আছে মনে হল। তাদের পিছনে কয়েকজন মহীশূরী আসছে, তাদের মধ্যে আছে মীর নাদিম ও জব্বর। আগে কিছু না-ভেবেই, কোনোরকম বিবেচনা না করেই, কিন্তু তাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে এই ভয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মীর সাদিক, মীর সাদিক, সুলতান তোমার সাহায্য চায়।" মীর সাদিক তার দিকে এগিয়ে এল, তার সঙ্গে সঙ্গে এল ইংরেজ ও মহীশূরীরা।

"সুলতান কোথায় ?" তার ক্ষতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল মীর সাদিক।

কয়েকটা দালান দেখিয়ে সে বলল, "ওখানে, ওখানে। তাকে বাঁচাও, সে তোমার সাহায্য চায়। তোমার জন্যে একটা বার্তা সে আমাকে দিয়েছে।"

"কী সেই বার্তা, ঝটপট বলো হে।" মীর সাদিক বার্তাটি জানার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াল। সুলতান কোথায় আছে এ কথা আর কাউকে সে শুনতে দিতে চায় না। সে তার নিজের গরজেই জানতে চায়, সুলতানকে মৃত ভাবে পেতে চায়, জীবিত অবস্থায় নয়।

"আমার পকেটে আছে।" শেখর নিজের ক্ষতের দিকে তাকাল, সে যে অসহায় তার জন্যে করুণা উদ্রেকের জন্যেই যেন।

শেখরের পকেটে হাত দেবার জন্যে মীর সাদিক তার হাঁটুতে ভর দিল।

যন্ত্রণায় গুংরে উঠল শেখর, তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে একটু পাশ ফিরেই লাফ দিয়ে উঠল। ধারালো ছোরা বসে গেল মীর সাদিকের গলায়। রক্তে তার পোশাক ভিজে গেল, সে পড়ে গেল। জব্বরের তরবারির আঘাতে শেখর কাবু হল। বেদনায় কেঁদে না-উঠে সে হেসে উঠল কেন না সে জানে মীর সাদিক শেষ হয়েছে। তার শেষ চিন্তা হল, "ঈশ্বর শুনেছেন আমার হাসি", তার পরেই সে মারা গেল।

ইংরেজটি তার কাঁধ ঝাঁকি দিল। তার দলের লোকদের মনের কথাই সে বলল, "দুঃখিত মীর সাদিক। তুমি খুব ভালো মিত্র, ও চোস্ত শাসক হতে পারতে। তোমার জায়গায় এখন অন্য লোক খুঁজতে হবে।"

এখনো কোথাও মীর সাদিকের নাম উঠলেই উপস্থিত লোকেরা তাকে অভিসম্পাত করে। যারা টিপুর স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তারা মীর সাদিক যেখানে মরেছে সেখানে ইঁট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। কিন্তু শেখরও মরেছে ওখানেই, যারা সব ইতিহাস জানে তারা বলে, "তোমাকে না, শেখর।" এমন কথিত আছে যে, যখন একথা শোনে তখন শেখরের আত্মা হাসে। যারা ইতিহাস জানে না, তারা নির্বিচারেই সেখানে ঢিল ছোড়ে। এতেও হাসে শেখরের আত্মা।

ইতিমধ্যে চিন্তামণির সেনাদল টিপু সুলতানের চারধার বেশ ঘিরে দাঁড়ায় এবং বহুকষ্টে তারা হাজার-হাজার ভীত, আহত ও মৃতপ্রায় জনতা এবং আরোহী-বিহীন ঘোড়ার স্রোত থেকে নিজেদের তফাত করে নেয়। তারা চলে বাম দিকে। তাদের উপর গুলি পড়তে থাকে বৃষ্টিধারার মত। অবশেষে রাজা খাঁ, চিন্তামণি ও তার এগারোজন সঙ্গী সহ টিপু সুলতান নিজেকে দেখল ফটক ও গম্বুজের তলা দিয়ে ভিতরের বুরুজের পাশ দিয়ে একেবারে শহরের মধ্যে। টিপু ইতিমধ্যে বেয়নেটের আঘাতে আহত হয়েছে। পুনরায় সে বেয়নেটের অপর-একটা আঘাত পেল। তার পর পেল বেয়নেটের তৃতীয় আঘাত, তারপর গুলি এসে লাগল তার বাম বুকে, তার ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়েই নিহত হল। রাজা খাঁ অনুরোধ করতে লাগল ইংরেজদের কাছে তার পরিচয় দিতে, আত্মসমর্পণ করতে, কিন্তু গর্বের সঙ্গে সে তা প্রত্যাখ্যান করল।

"তুমি পাগোল হলে? চুপ করো।" সুলতান চীৎকার করে বলল রাজা খাঁকে। তার পর শান্তভাবে তাকে নজর দিতে বলল চিন্তামণির দিকে।

কোনো চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়েছে চিন্তমণি, রাজা খাঁ জানাল। পুনরায় রাজা খাঁ বলল, "এটা মরাব পন্থা নয়—একা, নিঃসহায় ও নিরালম্ব ভাবে।"

"না রাজা, না। যখন আমি শপথ করি তখন তো তাতে কোনো শর্ত ছিল না। সুতরাং এই রকমই হোক।" উত্তর দিল টিপু। টিপু কী কথা বলল রাজা খাঁ তা ঠিক বুঝতে পারল না। তবু সে বুঝল নিয়তি যা নির্ধারিত করে দিয়েছে, সে তার কোনো বদল করতে পারবে না।

গুলিবর্ষণ আরও ঘোরতর হতে লাগল। তার চারদিকে তার সংগীসাথীরা একে-একে ধরাশায়ী হচ্ছে। এক মাত্র রাজা খাঁ তার পাশে রইল। হঠাৎ থেমে গেল গুলিবর্ষণ। টিপু এগোবার চেষ্টা করল। রাজা খাঁ তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল, পারল না। পাঁচ বার সে আহত হয়েছে। সারা দুর্গেই থেমে গেছে গুলিবর্ষণ। দুর্গ জয়ের জন্যে যে এক ঘণ্টা ধার্য করেছে বেয়ার্ড তার মাত্র চার মিনিট বাকি। যেখানে যেটুকু বাধার চিহ্ন আছে সবই নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে সৈন্যবাহিনী ও খুচরো সৈন্যেরা উদ্যোগ আরম্ভ করে দিয়েছে। আহতদের আর্তরব ছাড়া সর্বত্র নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। সব বাধা উধাও হয়ে গিয়েছে। একজন মাত্র মহীশূরী তার শরীরে তিনটি জখম নিয়ে হাতে তরবারি ধারণ করে মহীশূর-রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান। মাত্র একজনই মহীশূরী—সেই মহীশূরী হচ্ছে টিপু সুলতান।

ইংরেজদের একটা দল এল। তাদের চোখ পড়ল একটা তরবারির রত্নখচিত কোমরবন্ধের প্রতি, যা নাকি আহত টিপু সুলতান পরেছিল। "এসো, এটাকে পাকড়াই", একজন বলল, তারা বন্দুক ও বন্দুকের কোঁদা নিয়ে তেড়ে গেল। রক্তক্ষরণে তখন টিপু অর্ধমৃত, তার শেষ মুহূর্ত এসে গেছে বুঝতে পেরে সে হাসল। ওদের তরবারির সংগে তার তরবারির সংঘাত হল। ওদের দুজনের আঘাত লাগল তরবারির। একজন ইংরেজ সেপাই, যে এই সংঘর্ষে যোগ দেয়নি, দূরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ফিরে এস। ওকে আমরা গুলি করে সব শেষ করে দিই।" সৈন্যেরা সংঘর্ষের মধ্য থেকে চলে এল। তার পর একটা গুলির শব্দ হল, সে গুলি টিপুর কপাল ভেদ করে গেল।

মহীশূরের শেষ প্রতিরক্ষক মারা গেল।

তরবারির কোমরবন্ধটি খুলতে-খুলতে একজন সেপাই মন্তব্য করল, "বাঘের মত লড়াই করেছে লোকটা।"

সে তো ব্যাঘ্রই ছিল।

পরে যখন তার পরিচয় জানা গেল, তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হল, তখনও তরবারি তার হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা। যারা আগে কখনো অভিভূত হয়নি, এই দৃশ্যে তারাও অভিভূত হল।

ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্নর-জেনারেল, রিচার্ড ওয়েলেসলি, মরনিংটনের দ্বিতীয়-আর্ল, কয়েকজন নির্বাচিত ব্যক্তিকে যখন নৈশভোজে আপ্যায়ন করছিল, টিপু সুলতানের মৃত্যুর খবর তখন তার কাছে পেঁছিল।

উঠে দাঁড়াল ওয়েলেসলি, হুইস্কি ও মদ্যের আমেজে তার পা টলছিল, তার গ্লাস উঁচুতে তুলে ধরে সে বলল :

"ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, ভারতবর্ষের মৃত আত্মাকে স্মরণ করে আমি পান করছি।"

---